সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৯

২০২৪ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৯

২০২৪ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ⑨

২০২৪ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ

অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-99136-2-7

মূল্য

৪০০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

সিপিডি পরিচিতি

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করে। নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপের প্রসার এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে নিরলস কাজ করছে এই থিংক ট্যাঙ্কটি।

দীর্ঘ ৩০ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হলো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা। গবেষণা ও সংলাপ এই দুই কার্যক্রমের সমন্বয়ে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে সিপিডি দেশের উন্নয়ন গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিপিডি তার পথপরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে একটি স্বনামধন্য থিংক ট্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে যা কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। সিপিডি'র গবেষণা ফলাফল বরাবরই সুশাসন, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর গুরুত্ব দেয়। এর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি, রাজস্ব নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যাংকিং খাত, শ্রমবাজার, তৈরি পোশাক শিল্প, সুশাসন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, জলবায়ু ইত্যাদি।

সিপিডিই প্রথম বাংলাদেশে সংলাপের ধারা চালু করেছে যা গঠনমূলক মতবিনিময়কে উৎসাহিত করে। সিপিডি তার গবেষণার ফলাফলগুলোকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে সংলাপের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে এমনকি প্রান্তজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সেইসাথে সামগ্রিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনমতকে প্রতিফলিত করে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরে।

এই কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ), দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন (সায়েস), বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার) অর্থনৈতিক করিডোর ফোরাম, সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ (সাসেপস), সাউদার্ন ভয়েজ ইত্যাদি বিভিন্ন খ্যাতনামা নেটওয়ার্ক ও পার্টনার-এর সাথে সিপিডি কাজ করছে। সিপিডি একটানা

দুইবার বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থিংক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভ (টিটিআই) পুরস্কার লাভ করেছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, সাময়িকপত্র, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি-পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৫৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য ও অসমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ রূপান্তর, তৈরি পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রভৃতি নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে আসছে। নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেই গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর পরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য সিপিডি'র গবেষকরা নিরলস কাজ করছেন।

উন্নয়ন ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সিপিডি'র গবেষণাধর্মী মতামতসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যা তার তিন দশকের কর্মকান্ডের এক ঐতিহ্যগত অংশ। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত মতামত ও সাক্ষাৎকারগুলো ২০১৫ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০২৪ সালে প্রকাশিত সিপিডি'র গবেষকদের নির্বাচিত বিশেষ মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকারের সংকলন।

এ লেখাগুলোতে সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাত, বাজার ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে। এছাড়াও জুলাই-আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও বিশ্লেষণ রয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে ৮টি আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক, সহনশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা প্রতিনিয়ত কাজ কাজ করে যাচ্ছেন। বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধ তারই প্রতিফলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

প্রকাশনার সময়ানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো সাজানো রয়েছে। বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যাস করার পর যে প্রবন্ধগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে ঐ অধ্যায়ে আগে রাখা হয়েছে। আশা করছি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ সম্বলিত এই বইটির জন্য বরাবরের মতই গবেষক, তরুণ সমাজ ও বৃহত্তর জনমানুষের আগ্রহ থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্ম বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব গণমাধ্যম সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষ থেকে আমি সেসব গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

সিপিডি'র সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগের সহকর্মীরা, বিশেষ করে *ইমা আক্তার* লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, পাশাপাশি সেগুলো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশনা উপযোগী করে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এছাড়াও *সারোয়ার জাহান, এইচ.এম. আল ইমরান খান* এবং *এস. এম. খালিদ* এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) *মোঃ সাইফুল হাসান* সংকলনটি প্রকাশে একনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক *অভ্র ভট্টাচার্য* এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ নয়

অধ্যায় ১: সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট

নতুন বছরে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে করণীয় ৩
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

রাজস্ব আদায় বাড়লে অর্থনীতিতে আসবে গতি ৬
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

প্রণোদনা কমানোর কারণে যেনো লোকসান হবে না ৮
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রাজস্ব আদায়ের নতুন খাত হতে পারে ডিজিটাল অর্থনীতি ১১
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

কেমন বাজেট চাই ১৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট অনেক জটিল ১৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশে ভোগের বৈষম্য বাড়ছে ২০
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রবৃদ্ধি ছাড় দিয়ে হলেও মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ব্যবস্থা নিতে হবে ২২
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেট বাড়িয়ে বলা হয় ২৪
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতিতে ডায়াবেটিস হয়েছে! ২৭
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জটিল প্রেক্ষাপটে আসছে এবারের বাজেট ৩৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের নিরিখেই বাজেটকে দেখতে চাই ৪২
ড. মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত যেন অবহেলিত না থাকে ৪৭
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেট ২০২৪–২৫ ও ঘাটতি অর্থায়ন ৪৯
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বে-নজির বাজেট ৫২
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্বস্তি-অস্বস্তির বাজেট ৫৪
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কেমন হলো বাজেট ৫৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নতুন অর্থমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ ৭১
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাজেট ও ধূসর টাকা ৮৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ব্যতিক্রমী সময়ে গতানুগতিকতার বাজেট ৯৮
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

জনসাধারণের স্বস্তির দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল ১০১
ড. ফাহমিদা খাতুন

শর্তগুলো যেন আমাদের অনুকূলে থাকে ১০৫
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিহীন বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার অন্তরায় ১০৭
ড. ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির গল্পে মানুষের মুখ নেই ১১২
ড. ফাহমিদা খাতুন

অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারের তাগিদ ১১৬
ড. মোস্তাফিজুর রহমান

সামষ্টিক অর্থনীতির দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন দরকার ১২০
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

চতুর্মুখী প্রত্যাশা পূরণই হবে মূল চ্যালেঞ্জ ১২৭
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ২: অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও মূল্যস্ফীতি

নতুন বছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যা জরুরি ১৩৩
ড. ফাহমিদা খাতুন

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কি ভুল পথে নামছি ১৩৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটাতে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' দেখাতে হবে ১৩৮
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে ১৪০
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মোকাবেলায় এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে ১৪৩
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

মূল্যস্ফীতি ও করের চাপে পড়বে মানুষ ১৪৫
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে এটা অবাস্তব ১৪৭
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জোর দিতে হবে ১৫২
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি কেন? ১৫৪
ড. ফাহমিদা খাতুন

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলাই বড় চ্যালেঞ্জ ১৫৮
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ৩: ব্যাংকিং খাত

ব্যাংকিং খাত সংস্কারে চাই রাজনৈতিক অঙ্গীকার ১৬৩
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ব্যাংক খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংকিং কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে ১৬৫
ড. ফাহমিদা খাতুন

ব্যাংক খাতে জঞ্জাল তৈরি হয়েছে, চার ধরনের সমস্যা দূর করতে হবে ১৬৯
ড. ফাহমিদা খাতুন

অধ্যায় ৪: বাজার ব্যবস্থাপনা

চালের দাম নিয়ন্ত্রণে হাত দিতে হবে যেখানে ১৭৫
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করাই বড় চ্যালেঞ্জ ১৭৮
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও দাম বেঁধে দিয়ে আমাদের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ১৮২
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৫: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুবাই বৈঠক: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাৎপর্য ও করণীয় ১৮৭
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অন্য দেশের সঙ্গে বাজারসুবিধা সম্প্রসারণে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সুফল ১৯৩
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট, করিডোর ১৯৭
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৬: বৈদেশিক ঋণ

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় সতর্ক হতে হবে ২১৩
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের যেন ঋণ এনে ঋণ পরিশোধ করতে না হয় ২১৫
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আমরা একটি প্রতারণামূলক বাস্তবতার মধ্যে আছি ২২০
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আমরা আবার ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছি ২২৪
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণব্যবস্থাপনা এবং করণীয় ২৩৪
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৭: রাজনীতি ও সংস্কার

নির্ধারিত ফলাফল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ২৪১
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন ভোটগ্রহণ শেষ, গণনা শুরু ২৬২
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক বিভাজন সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে ২৬৫
অধ্যাপক রওনক জাহান

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা যাবে না ২৭৩
ড. ফাহমিদা খাতুন

রাজনৈতিক নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব চলে গেছে ২৮০
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উন্নয়ন চাইলে সংস্কারের বাজেট করতে হবে ২৮৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকার মুখে যেসব নীতির কথা বলে বাস্তবে তা মেলে না ২৮৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাস, নতুন প্রয়াস ২৯০
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য আসবে আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবতা ও নেতৃত্বের সক্ষমতার সমন্বয়ে ৩০৯
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকারকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতা ও সক্ষমতার সামঞ্জস্য রাখতে হবে ৩১৩
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আর্থিক খাত সংস্কারের সময়নির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা উচিত ৩২১
ড. ফাহমিদা খাতুন

রাজনৈতিক পচন অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে ৩২৬
ড. ফাহমিদা খাতুন

সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু প্রশ্ন ৩৩৩
অধ্যাপক রেহমান সোবহান

'গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না' ৩৩৯
অধ্যাপক রওনক জাহান

অধ্যায় ৮: অন্যান্য

হয়ে উঠুন বন্ধু ৩৪৭
ড. ফাহমিদা খাতুন

ড. ইউনূসকে নিয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নিবন্ধ কার জন্য ঘণ্টা বাজছে... ৩৪৯
অধ্যাপক রেহমান সোবহান

তৈরি পোশাকের বাইরে অনেকগুলো খাত আছে যেগুলো খুবই সম্ভাবনাময় ৩৫৪
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

শ্রম ও প্রযুক্তিনির্ভরতা সমন্বয় করলে অগ্রগতি হবে ৩৫৯
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

টাঙ্গাইল শাড়ির মালিকানা সঠিক পথ কোন দিকে ৩৬৩
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
নাইমা জাহান তৃষা

আমাদের রক্তের ঋণ এখনো শোধ হয়নি ৩৬৭
অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বাংলাদেশ একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হবে ১৯৭১ সালে এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন ৩৬৯
অধ্যাপক রওনক জাহান

১২ অর্থনীতিবিদের ঐতিহাসিক দলিল ৩৭৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১

সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট

নতুন বছরে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে করণীয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাসে নজর দিলে আমরা বিভিন্ন খাতে বেশ অর্জন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই। জীবনযাত্রার মান, গড় আয়ুষ্কাল, মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আর্থ-সামাজিক যে সূচকগুলো রয়েছে সব ক্ষেত্রেই আমাদের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করি। পরবর্তী প্রজন্ম আগের প্রজন্ম থেকে ভালো থেকেছে। তার ধারাবাহিকতায় আমি আশা করি, ২০২৪ সালে আমরা পেছনের সেই অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাব। পাশাপাশি এ কথা স্বীকার করতে হবে, আমরা ২০২৪-এ প্রবেশ করছি এমন একটি বছর থেকে যে বছরে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনি আমরা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি তেমনি সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আমরা সমান ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছি। সুতরাং এসব ঝুঁকির বিষয় আমলে নিয়ে আমাদের নতুন বছরে পা রাখতে হবে। এসব ঝুঁকি যে শুধু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, এখানে আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনারও ভূমিকা রয়েছে। যেমন আমাদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনাও এসব ঝুঁকি সৃষ্টির জন্য দায়ী। ২০২৪ সালের দিকে তাকিয়ে সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশা করি। আবার আমাদের যে অর্জন হয়েছে তার শক্তিমত্তার ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতে হবে। এ দুই ধরনের প্রত্যাশা নিয়েই আমি নতুন বছরকে দেখছি।

২০২৩ সাল জুড়েই উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভুগেছে সর্বস্তরের মানুষ। বিশেষ করে যারা স্বল্প আয়ের মানুষ তাদের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হয়েছে। এছাড়া নিম্ন মধ্যবিত্তদের ওপরও মূল্যস্ফীতির একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি, এ বছর আমাদের প্রথম কাজ হিসেবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আমাদের নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রমবাজারে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। নতুন বছরে বিনিয়োগ চাঙ্গা না হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমাদের জন্য কঠিন

হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত যেসব বিষয় রয়েছে সেসব দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে।

পাশাপাশি সুদহার নীতিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুদহার নীতি প্রণয়ন করতে হবে। অন্যদিকে সঞ্চয়কারীদেরও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি। এক্ষেত্রে বাজারের সঙ্গে যদি সমন্বয় করে আমাদের সুদহার নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে সঞ্চয়কারীর সংখ্যা বাড়বে। এছাড়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার যে বিনিময় হার রয়েছে সেটাকে বাজারের সঙ্গে সমন্বয়ের হার অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালু রাখতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে বাজারে মুনাফালোভীদের একচেটিয়া যে আধিপত্য বিগত সালগুলোয় আমরা লক্ষ করেছি সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরদারি বাড়াতে হবে।

২০২৪ সালে আমাদের পদক্ষেপের ফলাফল নির্ভর করবে আমরা বাড়তি যেসব পদক্ষেপ নেব তার ওপর। এক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার সঙ্গে কাজগুলো করতে পারি তাহলে আমাদের এ বছরটা গত বছরের তুলনায় ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা। অন্যদিকে আমরা যদি শুধু গড়পড়তা পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা ভালো হবে বলে আমি মনে করি না।

এছাড়া ঋণখেলাপি বা করখেলাপি ছাড়াও আমাদের যেসব বিষয়ে এ বছর বাড়তি নজর দিতে হবে তা হচ্ছে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দেয়া। অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। এসব জায়গায় বহু বছর ধরেই দুর্বলতা রয়েছে যার প্রভাব কিন্তু আমাদের অর্থনীতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। শুধু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে সেজন্য আমরা কাজ করব বিষয়টি যেন এমন না হয়, আমাদের নিজস্ব গরজেও কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া প্রকৃত অর্থে আমাদের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় আমরা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারব না। সুতরাং আমাদের নিজস্ব তাগিদ থেকেই এসব সংস্কার আমাদের করতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে যেসব আইনের কথা বলা হয়েছে আমরা যেন সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি সেদিকটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। খেলাপি ঋণের ফলে সরকার যে বোঝা বহন করছে সে বিষয়েও সতর্ক হতে হবে। কারণ সরকারের হাতে অর্থ না থাকলে তারা ব্যয় কীভাবে করবে? সরকারের হাতে ব্যয়ের জন্য যখন প্রয়োজনীয় অর্থ থাকবে কেবল তখনই ব্যয়ের প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত। সরকার এ বছর এসব বিষয়ে খেয়াল রেখে নতুন নতুন পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় বৈদেশিক বিনিয়োগের বিকল্প নেই। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামসহ যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা রয়েছে সেসব দেশেও কিন্তু বৈদেশিক বিনিয়োগ রয়েছে অনেক। এসব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫-২০) আমাদের আশা

ছিল প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বিনিয়োগ আমরা পাব, কিন্তু সেখানে আমরা পেয়েছি ১০ বিলিয়ন ডলারেরও কম। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ সামষ্টিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) সঙ্গে তুলনা করলে ১ শতাংশেরও কম। আর বিনিয়োগ যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগের লভ্যাংশের বিনিয়োগ। তবে নতুন যে বিনিয়োগ প্রয়োজন সেটা আমরা পাচ্ছি না।

সেক্ষেত্রে দেশে নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, আমাদের যে কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে, দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। হাল আমলে এক ধরনের যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে সেটি কাটিয়ে উঠতে হবে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ ডলার এক্সচেঞ্জ খাত ও সুদহার নীতিতে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। এ অবস্থায় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা আমাদের জন্য দুষ্কর হবে। অন্যদিকে আমাদের ইতিবাচক যে দিকগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রেও কাজ করতে হবে। আমাদের যেসব নন-স্টপ সেবা রয়েছে সেগুলো শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। দেশের অর্থনীতিতে যদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমরা বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব।

এক্ষেত্রে স্মর্তব্য গত বছর আমদানিতে যে সংকোচন নীতি নেয়া হয়েছে তাতে সার্বিক অর্থনীতিতে এর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে আমি মনে করি। উচ্চ মূল্যসম্পন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি সংকোচন নীতি এক রকম প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংকোচন নীতি মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয়। রিজার্ভ সীমিত থাকার ফলে আমরা আমদানি সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছি, ফলে আমাদের অর্থনীতিতে দুই ধরনের নেতিবাচক প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি। প্রথমত, আমরা অনেক প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে পারছি না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংক যে মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করছে ব্যবসায়ীদের তার চেয়েও বেশি মূল্যে মুদ্রা ক্রয় করতে হচ্ছে। এর ফলে আমদানি ব্যয় বাড়ছে এবং তাকে পণ্যটি অধিক দামে বাজারে ছাড়তে হচ্ছে। এসব কারণে আমাদের উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। এছাড়া আমাদের বাজারে আমদানি সংকোচন নীতির ফলে একটি দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে কিছুটা হলেও আমাদের সংকট উত্তরণের পথ সুগম হবে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বাজারের সমন্বহীনতা দূর করতে পারলে আমদানির জটিলতা কিছুটা কমবে। এছাড়া যারা দেশের টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করছে তাদের ক্ষেত্রে যদি কঠোর নীতি নেয়া যায় তাহলেও আমাদের বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা সম্ভব।

বণিকবার্তা
৪ জানুয়ারি ২০২৪

রাজস্ব আদায় বাড়লে অর্থনীতিতে আসবে গতি

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এরই মধ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারটি নতুন হলেও অর্থনীতি বা দেশ চালানোর বিষয়টি তাদের কাছে পুরনো। এবার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে নতুন মন্ত্রীরা নিয়োগ পেয়েছেন। অর্থ, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সবাই নতুন মন্ত্রী।

সরকারের জন্য বর্তমান অর্থনীতিতে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে নতুন মন্ত্রীদের জন্য সেগুলো অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সময়ে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থনীতি যে পরিস্থিতিতে থাকে এবার ভিন্ন। নতুন সরকারের সামনে অর্থনীতি সবচেয়ে দুর্বলতম অবস্থায় রয়েছে। এ থেকে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে অর্থ মন্ত্রণালয়কে।

এই মন্ত্রণালয়ের বড় জায়গা হবে রাজস্ব বৃদ্ধি। এ জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের কৌশল সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ঢেলে সাজাতে হবে। যদি এনবিআরের কার্যক্রমকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে রাজস্ব আদায় বাড়িয়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

সচরাচর যেটি হয়ে থাকে মন্ত্রণালয়গুলোতে যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তাঁরা এক ধরনের প্রচলিত উপায়ে মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে থাকেন। যার কারণে চ্যালেঞ্জের জটিলতা ও সমস্যা-সমাধানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট ছাপ দেখা যায় না। মন্ত্রণালয়গুলোতে যেসব নতুন মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের প্রথম কাজ হবে তাঁদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ও অর্থনৈতিক যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সম্মুখ অনুধাবন করার চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে যত ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে, শুরুতেই তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা উচিত এবং বিষয়গুলো বোঝা উচিত। মন্ত্রীদের উচিত হবে, নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এই আলোকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমগুলো যাতে যথাযথভাবে করেন।

এগুলোর কার্যকর অপারেশনাল বিষয়গুলোর দিকে যেন তাঁরা নজর দেন।

যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কথা বলি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগুলোকে আরো মসৃণ করা এবং রপ্তানির বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি নতুন নতুন বাজারে যাতে পণ্য রপ্তানি করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করা। আবার একই সঙ্গে আমদানি পর্যায়ে বাজারে যেসব জটিলতা রয়েছে, বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা সেটির ক্ষেত্রেও নির্বাচনী ইশতেহারে বলা আছে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়ার। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ইশতেহারে বলা নেই, কিন্তু উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেটি হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনাটি এখন অনেক বেশি বড় বড় গ্রুপকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এসব গ্রুপ তাদের অবস্থান থেকে বাজারে সঠিকভাবে প্রতিযোগিতা কাঠামোতে বাজার পরিচালনা করছে কি না, সেই জিনিসগুলো তদারকির প্রয়োজন রয়েছে। সেই অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর, প্রতিযোগিতা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাগুলোকে আরো শক্তিশালী করা জরুরি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে কৃষি ও মৎস্য পশু পালনের ক্ষেত্রে অনেক সময় সাপ্লাই চেইনগুলোতে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। এগুলোতে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা। কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারের যে উদ্যোগ সেটি যাতে বাস্তবায়ন হয়। সেই দিক থেকে সার ও বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়।

কালের কণ্ঠ
১৪ জানুয়ারি ২০২৪

প্রণোদনা কমানোর কারণে যেনো লোকসান হবে না

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা বা ভর্তুকি কমানোর প্রথম ধাপে সরকার বিভিন্ন পণ্যে ১০ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা কমিয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের পাঁচটি পণ্যে প্রণোদনা বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে রপ্তানিকারকেরা ক্ষোভ জানান। তবে অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এটা ইতিবাচক। এ নিয়ে কথা বলেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুভংকর কর্মকার।

প্রথম আলো: রপ্তানিকারকদের একটি অংশ বলেছে, প্রণোদনা কমানোয় বিভিন্ন খাতের পণ্য রপ্তানিতে ধাক্কা আসবে। আপনার কী মত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পর পণ্য রপ্তানি করতে শুল্ক দিতে হবে, ভর্তুকি রাখা যাবে না। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, 'ব্যবসায়ের খরচ বাড়ছে, আয়ও সংকুচিত হয়েছে। নতুন করে প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্ত তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।' তবে চাপ নেওয়ার বিষয়টি ব্যবসায়ে পরিপক্বতা, ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ভর করবে। সেটি বিবেচনায় নিলে তৈরি পোশাক খাত চাপটি নিতে পারবে। তা ছাড়া পোশাক খাতের ২১১টি পণ্যের মধ্যে মাত্র ৩১টি (আট ডিজিটের এইচএস কোড অনুযায়ী) রপ্তানি থেকে প্রণোদনা তুলে নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা রয়ে গেছে। সেগুলো ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া হবে। আইনিভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মতও। কারণ, ভর্তুকি অব্যাহত থাকলে (এলডিসি থেকে উত্তরণের পর) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) কেউ অভিযোগ করলে আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে যাব। ফলে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার অংশ হিসেবে এই উদ্যোগটি যৌক্তিক বলেই মনে করছি।

প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্তে তৈরি পোশাকের বাইরে অন্যান্য পণ্য রপ্তানিতে প্রভাব বেশি পড়তে পারে। তাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভর্তুকির বাইরে অন্য সহায়তার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তকে সব খাতের উদ্যোক্তাকে ভর্তুকি থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা উচিত।

প্রথম আলো: অনেক ব্যবসায়ী নেতা বলছেন, হঠাৎ প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্তটি নেওয়া ঠিক হয়নি। তাঁরা লোকসানে পড়বেন। কমপক্ষে ছয় মাস আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। কারণ, প্রণোদনাকে ভিত্তি করে রপ্তানির ক্রয়াদেশ নেন তাঁরা। আপনি কী মনে করেন সিদ্ধান্ত আরেকটু সময় দিয়ে তারপর বাস্তবায়ন করার সুযোগ ছিল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আগেই বলেছি, উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে পণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি রাখা যাবে না। ব্যবসায়ী নেতা ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বেশ আগে থেকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। অনেক আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। আমাদের দেশে এসব সিদ্ধান্ত আয়োজন করে নিতে গেলে বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসে। তাতে বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হয়। তবে প্রণোদনা যেভাবে ধাপে ধাপে কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে ব্যবসায়ীরা প্রস্তুতির সময় পাবেন। ফলে ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করা দরকার।

প্রণোদনা কমানোর কারণে ব্যবসায়ীদের লোকসান হবে না। কারণ, প্রণোদনার মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রণোদনা পাওয়ার জন্যও একটি চক্র গড়ে উঠেছিল। পণ্যের দামের সঙ্গে এটি যুক্ত হতো বলে আমাদের মনে হয় না। একধরনের মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়েছিল। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা পুরো সুবিধাটা পেতেন না।

এখন ব্যবসায়ীদের উৎপাদন ব্যবস্থায় অপচয় হ্রাস, ব্যয় সাশ্রয় ও দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য এবং বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এতে ব্যবসায়ীরা পণ্যে আগের দামই বিদেশি ক্রেতাদের অফার করতে পারবেন। এত দিন ক্রেতারা এই প্রণোদনার অজুহাতে পণ্যের দাম কম দিত। তাই সামনের দিনগুলোতে দর–কষাকষিতে কৌশলী হওয়ার সুযোগ থাকবে।

প্রথম আলো: রপ্তানিতে প্রণোদনা কমানোর কারণে সরকারের রাজস্ব বাঁচবে। পণ্য রপ্তানিতে সক্ষমতা বাড়াতে সেই অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি আছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সরকারের রাজস্ব ব্যয় ধাপে ধাপে কমবে। সেই অর্থ বিকল্প ব্যয়ের সুযোগ রয়েছে। তবে ভর্তুকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ ডব্লিউটিওর নিয়ম মেনে রপ্তানি খাতে কী

ধরনের সহযোগিতা করে, সেসব বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বা ভিয়েতনামের 'ট্রেড পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন প্রজেক্ট'–এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

রপ্তানি প্রণোদনা থেকে বেঁচে যাওয়া অর্থ সামাজিক খাত কিংবা শ্রমিক ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে।

প্রথম আলো
৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

রাজস্ব আদায়ের নতুন খাত হতে পারে ডিজিটাল অর্থনীতি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সরকারি আয় বৃদ্ধির তাগিদ, আয় বণ্টনে ন্যায্যতা বিধান, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সরকারি ব্যয় নির্বাহ এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের প্রেক্ষাপটে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ইস্যুটি এখন বাংলাদেশের সামনে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জিডিপি'র শতাংশে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক নিচে। আর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলঙ্কাকে বাদ রাখলে সর্বনিম্ন (২০২০–২১ অর্থবছর অনুসারে)।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর ও করবহির্ভূত আয় বৃদ্ধি ও রাজস্ব ফাঁকির পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। তা না হলে রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত আয় (রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্য) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না এবং উন্নয়ন বাজেটের সম্পূর্ণটাই ঋণনির্ভর অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল থেকে যাবে।

রাজস্ব আদায় কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ পরিষেবার চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ ঋণ পরিষেবায় (সুদ ও আসল) ব্যয়িত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের জন্য ঋণের ফাঁদে পড়ার একটি আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। তাই এখনই সময় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অগ্রাধিকারে রাখা যেতে পারে। এগুলো হলো, করভিত্তির সম্প্রসারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকায়ন, কর ফাঁকির বিরুদ্ধে আইনি প্রয়োগ নিশ্চিত করা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

বর্তমান লেখার সংক্ষিপ্ত পরিসরে করভিত্তির সম্প্রসারণের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ডিজিটাল অর্থনীতিকে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ডিজিটাল অর্থনীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, সেবা খাতমূলক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং সেবাগ্রহণকারী ও সেবাপ্রদানকারী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা (আইটি এনাবল্ড সার্ভিস) প্রদান করছে, যা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় বাংলাদেশে এ ধরনের সেবা, বিশেষভাবে খুচরা ব্যবসা খাতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

নিকট অতীতে ইন্টারনেট সেবার সম্প্রসারণে সরকার ও ব্যক্তি খাতের উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ (যেমন আইটি পার্ক প্রতিষ্ঠা) ও নীতি সহায়তা ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ খাতের ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান। গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন, নেটফ্লিক্স, ইউটিউবসহ বিভিন্ন বহুজাতিক ও বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি খাতের পরিধিকে আরও ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ফ্রিল্যান্সিং খাতের সঙ্গে জড়িত কর্মীসংখ্যা দিক থেকে (সেপ্টেম্বর ২০২২) বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় (প্রায় ৩৭ হাজার, যা বৈশ্বিক মোট সংখ্যার ১৬ শতাংশ, ভারত ৬২ শতাংশ নিয়ে প্রথম স্থানে)। এসব ফ্রিল্যান্সার জড়িত আছেন ক্রিয়েটিভ ও মাল্টিমিডিয়া, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সাপোর্ট, লেখা ও অনুবাদ, ডেটা এন্ট্রি ও প্রফেশনাল সার্ভিস সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী কর্মকাণ্ডে।

ই-কমার্স, এফ-কমার্স ও আইটি এনাবল্ড বিভিন্ন সেবার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির আকার নিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ঘাটতি আছে। বাংলাদেশ বি টু সি ই-কমার্স মার্কেট রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, দেশের বিজনেস টু কনজিউমার্স ই-কমার্সের আকার প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। ২০২২–২০২৬ সময়কালে এ বাজার বার্ষিক ১২ দশমিক শূন্য শতাংশের বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ই-কমার্স সংগঠন ই-ক্যাবের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ২ হাজার ৫০০ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম আছে। এদের ১ শতাংশ বৃহদাকার, ৪ শতাংশ মধ্যম আকারের ও ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্রাকার। বেসিসের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪ হাজার ৫০০ সফটওয়্যার ও আইটি এনাবল্ড সার্ভিস কোম্পানি আছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪০০ কোম্পানি ৮০টি দেশে সফটওয়্যার ও বিভিন্ন সেবা রপ্তানি করে থাকে।

বর্তমানে ২৮টি সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে আইটি এনাবল্ড সার্ভিস (আইটিইএস) হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফাইন্যান্স অ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েবসাইট পোস্টিং, ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং, ডিজিটাল ডেটা অ্যানালিটিকস, কল সেন্টার সার্ভিস ও আইটি ফ্রিল্যান্সিং।

এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর ১ জুলাই, ২০০৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ আয়কর না বসানোর বিধান আছে (যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়)।

ই-কমার্সের ওপর আরোপিত মূসক (ভ্যাট) নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অবশ্য তর্কবিতর্ক হয়েছে। ৫ শতাংশ মূসক আরোপের পর তা আবার পরবর্তী সময়ে প্রত্যাহারের উদাহরণও আছে। মূসকের ভিত্তি (কমিশন বা ফি নাকি সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য, তা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে দ্বৈত করারোপের আশঙ্কা থেকে যায়)। যেসব প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও অনলাইন দুই ধরনের কার্যক্রমই আছে, তাদের জন্য প্রযোজ্য কর কী হবে, এসব বিষয়ে স্পষ্টতার অভাবের কারণে কর আদায়কারী সংস্থা ও কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

কর আইনে এসব বিষয়ে স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। যে ২৮টি আইটি এনাবল্ড সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রদেয় প্রত্যক্ষ কর সুবিধার আশু সমাপ্তি হওয়ার কথা (৩০ জুন ২০২৪), এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনই। এই সুযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা সময়-নির্দিষ্টভাবে করাই যুক্তিযুক্ত হবে। কর অব্যাহতির ক্ষেত্রে ‘সানসেট ক্লজ’-এর উল্লেখ থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর স্পষ্ট ধারণা থাকে, কোন সময় পর্যন্ত তাদের জন্য প্রদেয় প্রণোদনার সুবিধাবলি কার্যকর থাকবে।

অনাবাসিক (নন-রেসিডেন্ট) কোম্পানিগুলো দ্বারা প্রদেয় কর নিয়েও জটিলতা রয়েছে। ইউটিউব, গুগল, ফেসবুক জাতীয় বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশীয় কোম্পানি ক্রীত সেবার (যেমন বিজ্ঞাপন সেবা) ওপর ১৫ শতাংশ মূসক আদায়ের বিধান রয়েছে এবং এসব কোম্পানি কর্তৃক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর (বিন) নেওয়ার বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। এ পর্যন্ত এ ধরনের নয়টি কোম্পানি ‘বিন’ নিয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, এসব কোম্পানির বাংলাদেশে কর জমা দিতে হয় না, যেহেতু বর্তমানে তাদের ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিন) গ্রহণের বিধান নেই। এসব কোম্পানি অন্য দেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়ে থাকে (অনেক ক্ষেত্রে ট্যাক্স হেভেনগুলো)।

ফলে এসব কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা করে যে লাভ করে, তার ওপর করারোপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সুযোগ থেকে সরকার বঞ্চিত হয়। এ সমস্যা কেবল বাংলাদেশের নয়, এটি একটা বৈশ্বিক সমস্যাও বটে। এ সমস্যার নিরসনে ও.ই. সি.ডি.-এর পক্ষ থেকে একটি

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় ১০০টি প্রধান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কোম্পানির লাভের ওপর ১৫ শতাংশ হারে প্রদেয় আয়কর একটি ফর্মুলার ভিত্তিতে যেসব দেশে তারা ব্যবসা করছে, তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের উচিত হবে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকা।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, আইটি এনাবল্ড ২৮টি খাতের ওপর থেকে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করা হলে এবং বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের ওপর কর আরোপ করা হলে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ই-কমার্সের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ১৯৯৮ সাল থেকে বলবৎ আছে, তা ৩০ মার্চ ২০২৬ বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চতুর্দশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক—যেটিই আগে হবে তার পরে উঠে যাবে।

সিপিডির হিসাবমতে, বাংলাদেশ এ কারণে বছরে অন্তত ৩৫০ কোটি টাকার শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষত, এ কারণেও যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে বাংলাদেশের ই-কমার্স রপ্তানির ওপরেও আমদানিকারক দেশ কর্তৃক শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা থাকবে।

এ লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে কর কাঠামোর আওতায় এনে কেবল রাজস্ব আহরণের জন্য একটি বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাতের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা বা তার অবদানকে সীমিত করা।

এখানে যা বলা হয়েছে, তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ই-কমার্স খাত ও তার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এ খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের কথাও ভাবতে হবে এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারের কথা বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়নের জন্য করণীয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এগুলো হলো:

(ক) ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রণোদনা, অবকাঠামো নির্মাণ, ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি ও ইন্টারনেট সেবার মূল্য সাশ্রয়ী রাখার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

(খ) একই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল অর্থনীতির পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল আকারে সম্পাদিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ খাতের বিকাশ ও এ খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ডিজিটাল অর্থনীতিকে রাজস্ব আদায়ের কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(গ) ডিজিটাল অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রদেয় প্রণোদনা ও সহায়তা সময়-নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ ও প্রদান করতে হবে (যেমন 'সানসেট ক্লজ'-এর মাধ্যমে), যাতে এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা প্রদত্ত সুযোগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানতে পারেন।

(ঘ) কর আদায় ও কর ব্যবস্থাপনার সব পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন চালু করার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতি থেকে কর আহরণ সহজ করতে হবে। (ঙ) ডিজিটাল (ই-কমার্স, এফ-কমার্স) প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রমিতকরণ (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) করতে হবে, যাতে অবচয় বেশি ও লাভ কম প্রদর্শনের মাধ্যমে কর ফাঁকির সুযোগ বন্ধ করা যায়।

(চ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ই-কমার্সের ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপের ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞা নিকট ভবিষ্যতে প্রত্যাহার করা হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রক্ষণাত্মক (ডিফেন্সিভ) ও আক্রমণাত্মক (অফেন্সিভ) স্বার্থ বিবেচনায় রেখে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং ই-কমার্স সেবা আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) গুগল, অ্যামাজন, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, ফেসবুকসহ যেসব গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে ব্যবসা করছে, তাদের আয়ের ওপর কর আরোপের ক্ষেত্রে ও.ই.সি.ডি. যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশকে সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে।

(জ) ডিজিটাল অর্থনীতিকে রাজস্ব আদায় কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যথোপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম আলো
৩০ এপ্রিল ২০২৪

কেমন বাজেট চাই

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশের জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশের আগামী বাজেট হবে অত্যন্ত দুরূহ একটি বিষয়। সরকার করোনার প্রভাব ও বিশ্বমন্দাকে দায়ী করছে দেশের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য। অথচ সরকার ঋণ করে ঋণ শোধ করছে। সরকার বাজেট দিচ্ছে রাজনৈতিক সংখ্যার বিবেচনায়। গত ১৫ বছরের হিসেব যদি ধরেন, তাহলে এত জটিল ও আর্থিক বাজেট হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই জটিল আর্থিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে কারণ হলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে। সেটা আপনি পণ্য মূল্যই বলেন আর বাজারে মন্দার কথাই বলেন ইত্যাদি কারণে।

এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে আবহাওয়াগত কারণে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করছি এটা অর্থনীতির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে এখন যে ধরনের রাজনীতি হচ্ছে তার ফলে আমাদের আঞ্চলিক রাজনীতি এবং ভূ-কৌশলগত বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি আমাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। সেহেতু সাধারণভাবেই যদি আপনি বলেন, এই বাজেট অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির ভিতরে আসছে। তাই এই বাজেট অন্য যে কোনো বছরের থেকে কঠিন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ এই মুহূর্তে আইএমএফএর সাথে একটি শর্তযুক্ত ঋণের মধ্যে রয়েছে। সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করাটা এখন বাধ্যবাধকতা হয়েছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে আগামী বাজেটে আমরা কী চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।

এ মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে দেশ। আমাদের অর্থনীতিতে এ মুহূর্তে আরও এক বড় সমস্যা হলো প্রকৃতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। সরকারের অর্থনীতিতে সমস্যা হলো রাজস্ব বাড়েনি। এ মুহূর্তে সরকারের খরচ বাড়ানোর কোনো অবস্থা নেই। বিদেশি ঋণ শোধ করার মতো অবস্থা নেই। আমাদের রাজনীতি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে শরীরে অন্যান্য জায়গায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গতবার থেকে এবার কী এসেছে। আপনারা যদি

দেখেন গত ১০ বছরে আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে রাজস্ব সেভাবে বাড়েনি। আজকে যদি করোনার কথা বলেন, তাহলে অর্থনীতির বিবেচনা ঠিক হলো না।

গতবার আমি যখন আলোচনা করেছি তখন আমি বলেছি এবং যা কথাগুলো বলবো আইএমএফআইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, আমাদের সাথে অনেক সময় আইএমএফআইয়ের সাথে মিলবে না, কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদের মধ্যে আমরা মোটামুটি একটা ঐক্যমত্যে এসেছি। সেটা হলো মূল্যস্ফীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির। এটা আমরা যেভাবে বলি না কেন, এটা বিনিময় হার দিয়ে বলি, পণ্য মূল্য দিয়ে বলি অথবা সুদের হার দিয়ে বলি। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ১ নম্বর বিষয় হিসেবে সবার কাছে প্রতিপালিত হবে। কারণ এটা অনেকটা শরীরে ডায়েবেটিকের মতো।

এনটিভি
১৭ মে ২০২৪

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট অনেক জটিল

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মোঃ মাহবুবুল আলম: শুরুতেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে। কী চ্যালেঞ্জ দেখছেন আপনি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুভসন্ধ্যা সকলকে। সম্মানিত সভাপতি, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা, ড সালেহ উদ্দীন, ড জায়েদি সাত্তার এবং হাতেম সাহেব, এবং সামনে উপবিষ্ট বাংলাদেশের আমাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগের কর্ণধাররা যারা বসে আছেন তাদের সকলকে আমি সালাম জানাই। আমি বহুদিন এই অনুষ্ঠানে এসেছি, ধারাবাহিকভাবে এসেছি। সেহেতু আমার জন্য এটা বাজেটের আগে একটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটা আমন্ত্রণ। আমি আজকে এখানে থাকতে পেরে, অনেক ধন্যবাদ। দু'টোর সময় আমি সাতক্ষীরা থেকে রওনা হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি এবং আমি খুশি যে সময়মত এখানে আসতে পেরেছি। এইবারের বাজেট নিয়ে আমরা একটু শুনলাম। আমি কথাটাকে কীভাবে বুঝি। করোনা ঠিক কিন্তু করোনার পরে বা গত পনেরো বছরের হিসাব যদি ধরেন করোনা বাদ দিলে। এরকম জটিল অর্থনৈতিক, আর্থিক পরিস্থিতিতে কোনোদিন বাজেট হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় না। এবং এই জটিল আর্থিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে কারণ হলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে। এবং আমি যেই কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো আইএমএফের সাথেও মিলবে আবার অনেক সময় আইএমএফের সাথে মিলবে না কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদদের ক্ষেত্রে এটা মোটামুটি একটা ঐক্যমতের জায়গায় এসেছে। সেটা হলো যে মূল্যস্ফীতি বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এটা আমরা যেভাবেই বলি না কেন, এটা বিনিময় হার দিয়েই বলি, পণ্যমূল্য দিয়েই বলি, অথবা সুদের হার দিয়ে বলি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এক নম্বর বিষয় হিসেবে সবার কাছেই প্রতিভাত হবে। কারণ ওইটা যদি না থাকে, এটা অনেকটা শরীরে ডায়াবিটিসের মতো, যদি ওইটাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে শরীরের অন্যান্য জায়গাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু গতবারের চেয়ে এইবার নতুন কী এসেছে? এইবার নতুন এসেছে, এই যে আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের যে খাত, যেটা আমাদের শক্তির জায়গা ছিল।

আমাদের কিন্তু, দশ-পনেরো বছরে যদি লক্ষ্য করেন, আমাদের আর্থিক খাতের চেয়ে, মানে যেটাকে ফিসক্যাল সাইট বলি আমরা। ফিসক্যালের চেয়ে আমাদের এক্সটার্নাল সেক্টার কিন্তু বেশি শক্তিশালী ছিল। সেটা আপনাদের রপ্তানির কারণে, রেমিটেন্সের কারণে, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহের কারণে এবং টিমটিম করে হলেও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের কারণে। তৃতীয় যে সমস্যাটা এটার সাথে যুক্ত হয়েছে সেটা হলো যে মন্দা দেখা দিয়েছে প্রবৃদ্ধিতে। মন্দা প্রবৃদ্ধিতে দেখা দেওয়ার ফলে এটার পিছনের কারণ যদি দেখেন, গত দশ পনেরো বছরে আমরা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারিনি। আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের সভাপতির মাধ্যমে। আপনারা তো নয়-ছয়ের জন্য দাবী করেছিলেন। নয়-ছয়ের দাবীকে যে সুদের হারকে, সেইটা দিয়েও তো বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয়নি কারণ অর্থনীতি তো আরো দশ রকমের সমস্যার ভিতর ছিল। একইরকমভাবে যদি আপনি দেখেন যে এই সময়কালে রাজস্ব সেইভাবে বাড়েনি। আজকে যদি শুধু করোনার উপর এটা বলেন, তাহলে এইটা অর্থনীতির বিবেচনায় ঠিক হলো না। এইটার ভিতরে অনেক দীর্ঘমেয়াদি বেশ কিছু সমস্যা জমে ছিল। এই সমস্যাগুলো এই সংকটের সময় অনেক উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেটা হলো যে এই মুহূর্তে বাজেটে মূল জায়গাটা হবে সরকারের যে খরচ করার মতো সম্পদ, এইটাকে বৃদ্ধি করা। এইটাকে বৃদ্ধি রাজস্ব দিয়ে করবে। কিন্তু আইএমএফ এখন যে সমস্ত সংস্কারের কথা বলছে, যেটার ভিতরে আমি অনেক স্বচ্ছতার অভাব দেখি। কোন খাতে কমানো হচ্ছে শুল্ক, কোন্ খাতে রেয়াতগুলোকে তুলে নেয়া হচ্ছে এইটার ব্যাপারে স্বচ্ছতা এখন পর্যন্ত নেই। আমরা একদম শেষ মুহূর্তে হয়তো জানবো। আর এইটার সাথে যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো যে বিদেশ থেকে যে ঋণগুলো আসছে, বিশেষ করে আমাদের বাজেট সাহায্যের কথা যেটা আমরা বলি। এবং অনেক ক্ষেত্রে এখন ট্রেড ক্রেডিট নিয়ে এসে আমরা আমদানিকে চালু রাখার চেষ্টা করছি। এইগুলো আপনার মনে রাখতে হবে, এখন এইগুলো আমার ঋণের সুদ শোধ করার জন্য যাবে। আর শেষ কথা আমি বলি, আমরা যেই বাজেটের কথা বলি, দেখুন যে বাজেট তিরিশ শতাংশ– চল্লিশ শতাংশ বাস্তবায়ন করতে পারিনি তার উপরে আবার পাঁচ পার্সেন্ট বাড়িয়ে একটা বাজেট ঘোষণা করি। এটা তো রাজনৈতিক একটা সংখ্যা। এটার সাথে অর্থনৈতিক সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আমি মনে করি।

এনটিভি
১৭ মে ২০২৪

দেশে ভোগের বৈষম্য বাড়ছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মোঃ মাহবুবুল আলম: আমি এখন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনার কাছে শেষ বারের মতো আবার আসছি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সকলেই আপনারা জানেন। আমি সাধারণভাবে আপনাদের বলি। আবার যেইটা হবে আরকী। আমার যেইটা ভয় লাগছে আরকী। ইতোমধ্যে আমরা যে সমস্ত রাজস্ব এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাঠামো দেখছি, এটা ধারাবাহিকভাবে, গতানুগতিকভাবে আগে দশ পার্সেন্ট বাড়ানো হতো এবার পরিস্থিতির কারণে পাঁচ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেয়া হবে। এইটার সাথে আর্থিক পরিস্থিতির কোনো সংযোগ সেই অর্থে বাস্তবতাতে নাই। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এইটা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে। আমি একটা উদাহরণ হিসেবে আপনাদের বলি, এইবারের লক্ষ্যমাত্রা, চলতি বছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হলো সাড়ে সাত শতাংশ। দ্বিতীয় প্রান্তিকে আমাদের প্রবৃদ্ধির যে অনুমিতি এসেছে সেটা হলো চার শতাংশের নিচে। ৩.৮। এইবার সমস্যা হয়ে গেছে আইএমএফের কারণে আমরা এতদিন ধরে যেটা বলছিলাম, এখন ত্রৈমাসিক জিডিপি এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে। যার ফলে একবারে একটা বড় সংখ্যা দিয়ে একটা বিতর্কিত হওয়ার যায়গা থেকে একটু সরিয়ে আনা গেছে। তাহলে এইটা যদি সাড়ে সাত পার্সেন্ট হতে হয় তাহলে বাদবাকি ছয় মাসে আপনার দশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে হবে। সেইটা আপনার এই মুহূর্তে ঋণ, আমদানি, ইত্যাদির সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না।

সেহেতু আবার যদি আমরা প্রবৃদ্ধি ধাবিত একটা উন্নয়নের চিন্তা করি তাহলে এইটা এই সময়ের জন্য খুব কাজ না। বিজনেস সাইকেলে যেমন একটা সময় যায় যে আপনার উত্থানও যায় আবার কোনো সময় ওই বিজনেসকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কনসলিডেশন করতে হয়। This is the consolidation time. এই কনসলিডেশন টাইমের জন্যই আমি সংস্কারের টাইম বলছি। এইটা করার ব্যাপার ছিল। অনেকে বলেছিলেন আমাকে নির্বাচনের পরে এটা করবো, ওটা করবো, ডলারের দাম এখানে হবে, এলসি খুলতে পারবেন। কিছু কি

হলো? হলো না। কারণ কী? কারণ হলো, ওই সংস্কারগুলোকে করার জন্য যে তেজ দরকার, যে রাজনৈতিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপগুলো দরকার, সেগুলো আমরা এখনো দেখছি না। এইটাই এই সরকারের নির্বাচনী ইস্তিহারের ভেতরেও আছে। সেই নির্বাচনী ইস্তিহারের জিনিসগুলোতে কাজ করা। আমি আরেকটা কথা বলে এখানে শেষ করি। আপনারা বারবার রপ্তানির কথা বলছেন। বাংলাদেশে যেই ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি আমরা দাঁড় করালাম তার তো বড় অংশই তো হলো অভ্যন্তরীণ বাজার। অভ্যন্তরীণ বাজারে এখন বিভিন্ন ধরনের কৃষিভিত্তিক conglomerate থেকে আরম্ভ করে, এভরিডে হাউজহোল্ড এপ্লায়েন্স থেকে আরম্ভ করে কত কিছু তৈরি হচ্ছে। তো এইগুলোর বাজারকে রক্ষা করার জন্য, এই মানুষগুলোর আর্থিক সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে বৈষম্য বাড়ছে। বিত্তের বৈষম্য, আয়ের বৈষম্য, আপনার সুযোগের বৈষম্য, ভোগের বৈষম্য। এত সরকারি বিভিন্ন সুরক্ষার পরেও। এদের রক্ষা করবেন।

আমি ব্যক্তিখাতের নেতৃত্বদেরকে অনুরোধ করবো, আপনাদের ব্যবসা বাঁচাতে পারে সবচেয়ে বড়, বাংলাদেশের এই কোটি মানুষের ভোক্তার বাজার। যতখানি না পারবে আপনাকে ইউরোপ বা এমেরিকার বাজারের কথা। সেহেতু এদের কথা ভুলবেন না। এদের সুরক্ষার ব্যাপারটা আপনারা একইসাথে মনে রাখবেন। আগামী বাজেটে যদি উনারা সুরক্ষা পায়, আপনাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে, আপনাদের বিনিয়োগ বাড়বে, আমরাও বাংলাদেশকে নিয়ে সামনে এগোতে পারবো।

এনটিভি
১৭ মে ২০২৪

প্রবৃদ্ধি ছাড় দিয়ে হলেও মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ব্যবস্থা নিতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

এমদাদুল হক তুহিন: 'সামনে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ সময়ে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট মেনে নিতে হবে। বাজেটের আকার বিগত সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী হবে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনায় নিলে তা গতবছরের তুলনায় কম হতে পারে। প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। বাজেটের আকার যাই নির্ধারণ করা হোক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— বাজেট কতটা দক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। বাজেট বাস্তবায়নে এবার দক্ষতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পূর্নস্থাপন সবচেয়ে বেশি জরুরি।' সারাবাংলার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনটিই বলেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বাজেটের আকার যাই নির্ধারণ করা হোক, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো- বাজেট কতটা দক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। বাজেট বাস্তবায়নের ফলাফল তার উপরই নির্ভর করবে। তাই বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। খাতওয়ারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হতে হবে; সেটি বর্তমানে কতটুকু অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবিদার সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। রাজস্ব বাড়াতে এনবিআরকে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের উপর অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে প্রত্যক্ষ করের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এনবিআরকে ডিজিটালাইজড করে কর ফাঁকি প্রতিরোধ করতে হবে।'

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো বলেন, 'আইএমএফ'র প্রেসক্রিপশন আছে। কিন্তু, দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহাল থাকা কর অব্যাহতি উঠিয়ে নেওয়ার চাপ থাকবে।

কিছু ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি উঠিয়ে নেওয়ার কথা বিবেচনায় নিতে হবে। তেমনি কিছু ক্ষেত্রে তা অব্যাহত রাখতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনী পণ্যের ক্ষেত্রে কর ছাড় রাখতে হবে, যেন সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা না হয়। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।'

তিনি বলেন, 'টাকার অবনমন হয়েছে। আমদানি মূল্য বাড়বে। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। আমদানি শুল্কে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি কাঠামো পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। কর অব্যাহতি কাঠামো এবং সামগ্রিকভাবে কর কাঠামো বিনিয়োগবান্ধব হতে হবে, নিম্ন আয়ের মানুষ বান্ধব হতে হবে। কর খেলাপী ও অবৈধ টাকা যারা নিয়েছে তাদের যেন কোনো ছাড় দেওয়া না হয়। তাদের ক্ষেত্রে শূন্য-সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে।'

রাজস্ব আহরণকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরকে শক্তিশালী ও ডিজিটাল করতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, 'এনবিআরকে শক্তিশালী করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে আরও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এনবিআরে বিনিয়োগ করলে আমদানি, ভ্যাট ও কাস্টমস পূর্ণ ডিজিটালাইজড করলে, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ইন্টার অপারেবিলিটি প্রতিষ্ঠা করলে, সরকারের রাজস্ব আহরণের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।'

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'দেশে আয় বৈষম্য বাড়ছে। তাই প্রত্যক্ষ কর আদায়কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বৈষম্য কমাতে হবে। কর কাঠামোর সংস্কার, কর আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা- এগুলোতে বেশি মনযোগ দিতে হবে। প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা ছাড় দিয়ে, মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে প্রণোদিত করতে সরকারি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।'

রিজার্ভ কমে আসছে- কি করা যেতে পারে? এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এখন সবেচেয়ে বেশি প্রয়োজন— আমাদের যে রফতানি হচ্ছে, রেমিট্যান্স আসছে— তার সবটুকু দেশে নিয়ে আসা। রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স যেন দেশে ফেরত আসে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এখানকার সক্রিয় সিন্ডিকেট নির্মূল করতে হবে। রেমিট্যান্সের পুরো আয় যেন ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আসে তা নিশ্চিত করতে হবে। টাকার অবনমন হয়েছে। কিন্তু রফতানি ও রেমিট্যান্সে তা নতুন প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে। সরকার এসব খাতে ভর্তুকি কমাতে পারে। এতে সরকারের ব্যয়ের বোঝা কিছুটা হলেও কমবে।'

সর্বোপরি, বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনর্স্থাপনে সবচেয়ে বেশি জরুরি বলে মনে করেন মোস্তাফিজুর রহমান।

সারাবাংলা.নেট
১৯ মে ২০২৪

বাজেট বাড়িয়ে বলা হয়

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের আগামী ২০২৪–২৫ অর্থবছরে 'কেমন বাজেট চাই', এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও অংশীজনদের মতামত জানতে চেয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রেদওয়ানুল হক।

ভয়েস অফ আমেরিকা: কোন কোন খাতে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত? কেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এক. কর্মসংস্থান বাড়াতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দুই. মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তিন. সামাজিক সুরক্ষা আরও বেশি বিস্তৃত করা এবং বরাদ্দ বাড়ানো।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাজেট বাস্তবয়ন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী কী করা দরকার?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একদিকে যেমন প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানো দরকার অপরদিকে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর সোচ্চার হওয়ার সুযোগ রাখা দরকার। গণতন্ত্র যত বেশি চর্চা হবে বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা তত সহজ হবে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আমলা-কর্মচারীদের জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা। তবে, অবশ্যই এক্ষেত্রে মিডিয়া (গণমাধ্যম) বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আয় বাড়ানোর জন্য কী করা দরকার?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অপচয় রোধ এবং দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: কোন কোন খাতে খরচ কমানো উচিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অতি মূল্যায়িত প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। যেখানে ১০ টাকার জিনিস ১০০ টাকায় কেনা হয়। আর প্রকল্প সময় মত শেষ করতে হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আইএমএফ বাজেটের আকার ছোট রাখতে বলেছে, আপনি কী একমত? কেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রকৃত বাজেট আর ঘোষিত বাজেটের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাজেট যেটা করা হয় সেটা লোক দেখানো একটি বড় সংখ্যা। এরপর যখন সংশোধন হয় তখন ২০ শতাংশ কমে, এরপর বাস্তবায়ন হয় আরও কম। আসলে বাজেটের আকার ছোটই আছে। সরকার রাজনৈতিক কারণে বড় বাজেট করে, আর অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ছোট বাজেট বাস্তবায়ন করে। আইএমএফ-এর এটা বোঝার কথা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: কোন তিনটি খাতে সংস্কার সবচেয়ে জরুরি কেন? কী করা উচিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: *এক,* ব্যাংকিং খাতের সংস্কার দরকার। এক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ ও মালিকানা প্রশ্নে বর্তমানে যে একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার নাটক চলছে তা বন্ধ করতে হবে।

দুই, কর আদায়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার করা উচিৎ। এর মধ্যে কর আহরনের জায়গা বিস্তৃত করা এবং যারা কর দেয় না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। অর্থ পাচার বন্ধ করা।

তিন, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। কারণ জনগণের জন্য সরকার যে সমস্ত কাজ করে, জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেগুলো জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাজেট তৈরির সময় কোন কোন চ্যালেঞ্জের কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাথায় রাখা দরকার?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রধান তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, একটি হলো মূল্যস্ফীতি; এটি নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। পৃথিবীর অন্য দেশে কমলেও আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতি কমেনি। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের ঋণ পরিশোধে ঝুঁকি বাড়ছে। তৃতীয়ত. সাম্প্রতিককালে প্রবৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে আসছে; এর মানে বিনিয়োগ কমে গেছে এবং সরকারি সম্পদ সীমিত হয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থান কমবে এবং দারিদ্র পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: গত পাঁচ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে কোন দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা বা ভুলগুলো চোখে পড়েছে? এগুলো এড্রেস করা হয়েছে কি? কী করা উচিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজেট বাড়িয়ে বলা হয়, যেটা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া যাদের উদ্দেশ্যে বাজেট করা হয় তারা এর সুফল পায় না; মধ্যস্বত্বভোগীরা টাকাও নিয়ে যায় ফলাফলও নিয়ে যায়। অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নেই; এটা সবচেয়ে বড় লক্ষনীয় বিষয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শক্তভাবে মানুষের কথা তুলে ধরতে পারছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে লিঙ্গসমতা অর্জনের জন্য বাজেটে কী সংযোজন বা বর্জন করা যেতে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জেন্ডার বাজেটের প্রবর্তন করা হয়েছিল সেটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। এবার জেন্ডার বাজেট প্রবর্তন করা উচিত। শিশু বাজেট প্রবর্তন করা হয়েছিল সেটাকেও একসাথে নেওয়া উচিত। এছাড়া আমরা যুব বাজেটের কথা বলে আসছি। এককথায় নারী, শিশু এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যে বরাদ্দ হয় তা স্বচ্ছ, সঠিকভাবে হিসাব করা এবং কি খরচ হলো সেটা মূল্যায়নের ভিতরে প্রতিফলন ঘটানো; এটা সবচেয়ে বড় বিষয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: গত পাঁচবছরে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতার বিচারে সরকারকে ১০ এ কত দেবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি গণিতে কাঁচা, তাই নম্বর দিতে পারবো না। আপনি ভালো থাকবেন।

ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা
২০ মে ২০২৪

অর্থনীতিতে ডায়াবেটিস হয়েছে!

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আহসান: আমরা যে রোগ বালাই নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের কাছে যাই বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাই, আমরা আজকে একজন অর্থনীতিবিদের কাছে এসেছি। আমরা যদি আপনাকে বলি যে অর্থনীতির স্বাস্থ্যটা নির্ণয় করেন, আপনি কীভাবে নির্ণয় করবেন?

ড. দেবপ্রিয়: দেখুন স্বাস্থ্য যে সুরক্ষা করার জন্য শুধু যে রোগ নির্ণয় করতে হয় তা না। আপনাকে স্বাস্থ্য ফিট থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা জীবনে আমাদের পরিচালিত করতে হয়। কী খান, কীভাবে চলেন, ইত্যাদি বিষয় থেকে। সেহেতু, অর্থনীতির স্বাস্থ্য বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে যে রোগটার চেয়ে, কেন এই রোগটা হলো, সেই জিনিসটা আপনার বোঝার ব্যাপার।

আহসান: কী রোগ হয়েছে অর্থনীতির এবং সেটা কীসের মতো? ডায়াবেটিস? ক্যান্সার? এবং যদি হয়ে থাকে এর দায়টা কার?

ড. দেবপ্রিয়: আমি মনে করি, অর্থনীতিতে ক্যান্সার হয় নাই। ডায়াবেটিস হয়েছে। অর্থনীতিতে ডায়াবেটিস হয়েছে। ডায়াবেটিসটা এমন একটা রোগ যে তাকে যদি আপনি সময়মতো নজর না দেন, যথাযথভাবে আপনি তার পরিচর্যা না করেন। যেমন আমি বললাম যে আপনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শুধু রোগ না, আপনি অন্য জায়গায় যেন এই রোগটা সংক্রমিত না হয়, তার জন্য আপনি প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেন। সরকার সেই ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে বলে আমার মনে হয়। সরকার অনেক যৌক্তিক সমালোচনাকে গ্রহণ করেনি। এবং সেটা করলে পরে হয়তো সরকারের উপকারই হতো অপকারের চেয়ে। এই জায়গাটাতেই আমি বড় পরিতাপের সাথে কথাটা বলছি। কারণ যেই কথাগুলো আমরা এখন বলছি, এই কথাগুলোই কিন্তু তিন—চার—পাঁচ বছর আগেও সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম আমরা। কোভিডের আগে বলেছি, কোভিডের পরে বলেছি। কিন্তু এখন যে সরকারটা করছে, গত দেড় বছর যাবৎ বিশেষ করে আইএমএফের সাথে চুক্তি করার ফলে, এই কথাগুলো তো দেশের অর্থনীতিবিদরা বহুদিন

যাবৎ বলেছে। কিন্তু সেই কথাগুলো গ্রাহ্য করা হয়নি। এইটাই পরিতাপের জায়গা। একটা গণতান্ত্রিক দেশে, যদি একটা নির্বাচিত সরকার থাকে, তাহলে কেন তারা এই ব্যাপারে এতখানি অমনোযোগী হলেন এইটাই ব্যাখ্যার বিষয়।

আহসান: তার মানে সিম্পটম আগেই থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু প্রিমেজারস নেয়া হয় নাই ব্যাপারটা এরকম। মানে দায়টা কি আপনি তাহলে যারা প্রিমেজারসটা নিতে পারতেন, তারা নেননি, তাদেরকে দিবেন?

ড. দেবপ্রিয়: এখন এই এইটার যে রোগের যে সংকেত সেটাতো বেশ কিছুদিন যাবত প্রকাশ হচ্ছিল। এবং যেমন আপনি ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়ছে না এইটা তো আপনি দশ-বারো বছরের ব্যপার। যে এইটা তেইশ-চব্বিশ শতাংশ থাকছে না। কোনো জায়গাতে জিডিপি'র তেইশ-চব্বিশ শতাংশ থেকে নেমে জিডিপি'র বাইশ শতাংশ হয়ে যাচ্ছে। গতবছরের আগের বছর হয়েছে। কোভিডের পরবর্তীসময়ে বা তারপরে। একইরকমভাবে কর বাড়ছে না। এইটা তো সবাই চোখের সামনে দেখছে। আপনার বিদেশের থেকে বিনিয়োগ আসছে না। সেটাতো সকলেই দেখতে পাচ্ছে। এবং প্রকল্পগুলো অতিমূল্যায়িত হচ্ছে। খাতের ভেতরে ভারসাম্য নাই। শিক্ষা-স্বাস্থ্যতে অর্থ আমরা কার্যকরভাবে দিতে পারছি না। এইটা তো দৃশ্যমান ছিল। ঐ পদ্মা ব্রিজ যেমন আমার দৃশ্যমান, ঐ টানেল যেমন দৃশ্যমান, ঐ আমার ফ্লাইওভার যেমন দৃশ্যমান। শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে আমি যেমন কিছু দিতে পারছি না এইটাও তো দৃশ্যমান। এবং এইটার ফলে যে বাংলাদেশে বৈষম্য বাড়ছে, গরীব মানুষের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন সক্ষমতার সমস্যা হচ্ছে, যেই মধ্যবিত্ত এই সরকারের আমলে গড়ে উঠেছে সেই মধ্যবিত্ত আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, নিম্নবিত্ত মানুষরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং তার নিজস্ব সঞ্চয় ভাঙছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকারি হিসেবে আমরা এটা পাচ্ছি। এইটা তো বিবেচনায় কেন গেল না। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য এইটা একটা বড় ধরনের কিন্তু প্রশ্ন সকলের কাছে এটা থাকবে। এইটাই আমার কাছে বিষয়।

আহসান: এই সরকার প্রথমবার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে, শুরু থেকেই আপনারা এই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেভিনিউ, ইনভেস্টমেন্ট এই বিষয়গুলোতেই আপনারা জোর দিয়ে কথা বলছেন। আমরা এই সময়ের ব্যবধানে যদি দেখি জিডিপি'র আনুপাতিক হারে আমাদের রেভিনিউ আর্নিং, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট, খুব বেশি যে ভালো কোনো অবস্থানে গেছে তা না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো পতন হয়েছে। এইটা আসলে কী কারণে হয়েছে? আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ আসলে নিতে ব্যর্থ হয়েছি যার রেজাল্ট এখন আমাদেরকে এরকম ভোগ করতে হচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয়: দেখুন,প্রথম কথা হলো যে, প্রবৃদ্ধির হারের যে হিসাব সরকার দিয়েছে সেইটা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে। যদি প্রবৃদ্ধি এত হবে, তাহলে তো আয়ও বেড়েছে। আয় বাড়লে তো তার উপর কর আহরণ হওয়ার কথা। তাহলে হয় প্রবৃদ্ধির হিসেবে সমস্যা আছে, অথবা আয়কে আমাদের করের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে। সমস্যা

হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় সমস্যা। যে সমস্ত আয় হয়েছে সে সমস্ত আয়গুলো আমি বলেছি খুব পবিত্র ছিল না। পবিত্র ছিল না মানে হলো এই আয়গুলো আপনার বিভিন্ন ধরনের যোগসাজশ বলেন, আপনি বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক বলেন বা যে বিভিন্ন ধরনের দূর্নীতি বলেন এইরকমভাবে যখন সৃষ্টি হয়, সেই আয়কে আপনি চট করে করের আওতায় আনতে পারেন না। এবং সেই আয় অনেক সময় দেশে থাকে না। অর্থ পাচার হয়ে যায়। সেই অর্থ পাচারও একই সাথে হয়েছে। এইটা একটা বড় বিষয় এইটার ভিতরে ছিল। আর যেটা ছিল যে, যেই সমস্ত বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে, সেই বিনিয়োগের প্রকৃত দক্ষতা নিয়েও সমস্যা ছিল। আমরা সকলেই জানি যে অতিমূল্যায়িত প্রকল্প তৈরি হয়েছে। আমি নাম ধরছি না এই মুহূর্তে। এইটা আপনার পত্র-পত্রিকায়, গণমাধ্যমে এইটা প্রকাশ হয়েছে। সেইটার জন্যও কোনো ব্যবস্থা সেইভাবে হয়নি। অর্থাৎ আপনি একদিকে করও আহরণ করতে পারেননি, আরেকদিকে আপনি যে ব্যয়টা করেছেন, সেই ব্যয়টাও অনেক বেশি ছিল যেইটা যৌক্তিকতার ভিতরে পড়ে না। এইটার জন্যই সরকারের এসছে।

আমি বারবার যা বলবো সেইটা হচ্ছে যে এই ধরনের বাজেট প্রস্তুত, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য যে ধরনের রক্ষা কবজ আছে, একটা গণতান্ত্রিক দেশে, সেই রক্ষা কবজগুলো কাজ করে নাই। এই রক্ষা কবজগুলো যদি কাজ করতো, ইংরেজিতে যাকে safeguard বলে, তাহলে হতো। আমি সাধারণ উদাহরণ হিসেবে বলি। এই দেশে অর্থ, সরকারি অর্থের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করার জন্য আইন করা হয়েছে। এই আইন এই সরকারের সাথে মিলেই করা হয়েছে। সেই আইনকে আমরা বাস্তবায়ন করিনি। যেমন হলো, যে আপনি কতখানি দায়-দেনা নিতে পারবেন এইটার একটা স্বচ্ছতা থাকতে হবে, প্রাক্কলন থাকতে হবে, এবং জনপ্রতিনিধিদের সামনে আপনার এইটা বলতে হবে। আপনি এইরকম কোনো আলোচনা কী মন্ত্রিসভা, কী সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, কী সংসদে আমরা কিন্তু কোনোদিন শুনেছি? আমরা তো শুনি নাই। এবং দেখুন যে সরকারের পক্ষ থেকে তিন মাস পরপর যে অর্থনৈতিক বিবৃতি দেয়ার কথা, আর্থিক বিবৃতি সংসদে দেয়ার কথা এই নিয়মই তো পালন করা হয়নি। এই নিয়মানুবর্তিতারও যদি পরিপালন করা হতো, তাহলেও কিন্তু সরকার সময়মতো এক ধরনের সংকেত পেত। সেই সংকেতটাও আসে নাই। স্থায়ী কমিটির সভা, অর্থনীতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনার স্থায়ী কমিটি, অনুমিতি কমিটি, সরকারের বিভিন্ন আন্ডারটেকিং প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটি কারোর সভা সেরকমভাবে নিয়মিতভাবে হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের যে এইটার উপরে যে এক ধরনের জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতাকে বাস্তবায়ন করার যে প্রক্রিয়া আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, সরকারকে, সেটা হয়নি। আপনি দেখেন, সরকারের যে প্রকিওরমেন্ট কমিটি মানে যেটা দিয়ে ক্রয় কমিটি আছে, এইটা তো অর্থনৈতিক বিষয়ক উপ-কমিটি। অর্থনৈতিক অন্যান্য নীতিমালা ওখানে আলোচনা হবে। উনারা একদম কেনা-বেচা ছাড়া আর কোনো আলোচনা সেখানে হয়নি। এবং সেগুলো সেইটার ভিত্তিতেই আপনার হয়েছে। অর্থাৎ আমি বলছি যে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিতরে যেই সমস্ত কার্যকর ব্যবস্থাগুলো থাকে, সেই ব্যবস্থাগুলো, রক্ষাকবজগুলো অলস হয়ে গেছে, বিকল হয়ে গেছে অনেকক্ষেত্রে। সেইটার ফলে, আমাদের মতো বিশ্লেষকদের দায় পরিস্থিতি আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে।

আহসান: তার মানে রোগটা কি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে এখন ছোটখাটো কোনো বটিকা দিয়ে এটা সমাধান করা বা নিরাময় করা সম্ভব?

ড. দেবপ্রিয়: প্রথম কথা হলো যে আপনার তো স্বীকার করতে হবে যে আপনি অসুবিধার মধ্যে আছেন।

আহসান: সেটা কি স্বীকার করছি কি না?

ড. দেবপ্রিয়: আমরা দেখছি যে এখন বাস্তব পরিস্থিতি এমন উৎকট হয়ে গেছে যে আপনার স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় থাকছে না। খুব ধীরে হলেও বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। এবং এইটা আগে তো আসলে তো এই আলোচনা তো মানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরাতো এটাতে যুক্তই হচ্ছেন না। হচ্ছেন প্রশাসনিক ব্যক্তিরা। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক দেখি বা আমরা কোনো সময় সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় দেখি বা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন দেখি। উনারা কথা বলেন অনেক সময়। বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কথা বলে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু কথা এখনো আমরা দেখি না। এবং যেই নেতৃত্ব এখন এই মুহূর্তে সরকারের কাছে এসেছে,তারা তো এখনো সেইরকমভাবে আপনারা যেরকমভাবে প্রশ্ন করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করেন তাদের তো সেরকমভাবে ব্যতিব্যস্ত করার সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। তো এইটাও একটা সমস্যা। একটা গণতান্ত্রিক দেশে আপনি যদি একটা কৌশল নেনও, সেই কৌশলটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয়। সেই ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা বলি পাবলিক ফেস লাগে। একটা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা মুখ লাগে। এই মানুষটা মুখপাত্র হয়ে জিনিসটা ব্যাখ্যা করে। এইটা যদি আপনি ব্যাখ্যা না করেন, তাহলে নীতি, শুধু নীতি করলে হয় না, নীতির প্রতি আস্থা লাগে। তো বাজার তখন আস্থা পায়। যে এই নীতিটা করা হয়েছে এইটার ফলে এইটে এইটে উদ্দেশ্য হাসিল হবে। সেটা হয় না। বাজার আস্থা পায় না। আপনার বিদেশি যারা আমাদের সাথে বিনিয়োগ করে, যারা আমাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগীতা করে, তারা আস্থা পায়। সবচেয়ে বড় কথা ভোক্তা আস্থা পায়। নাগরিকরা আস্থা পায়। তারা তখন কর দিতে আস্থা পায়। সেই জায়গাটাতে একটা বড় ধরনের ঘাটতি হয়ে গেছে। সেহেতু আপনি যতই বাজেটে সবচেয়ে সুন্দর বাজেটও করেন না কেন এইটা কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে দক্ষতা এবং যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দরকার সেইখানে এখন বড় ঘাটতি। সেহেতু আপনি যে বলছেন যে খোল নালচে বদলানো হতে হবে কি না। এইগুলোর দরকার নাই। বর্তমান সরকারের যে সমস্ত অঙ্গীকার আছে, বিশেষ করে এইবারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যেগুলো আছে, সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে আপনি একটা একটা করে ধরে আপনি যদি মিলিয়ে দেখেন তাহলে এটা যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো যে এইটাকে কার্যকর করার জন্য একটা সমন্বিত চেষ্টা দরকার। এই মুহূর্তে আমি তো সরকারে নীতি নেতৃত্বের ঘাটতির কথা বললাম একটু আগে। একইরকমভাবে নীতি নেতৃত্বের ঘাটতির অপর ফলাফল হলো নীতি সমন্বয়হীনতা। আপনি মুদ্রানীতি করবেন, আর্থিক নীতি করবেন, বাণিজ্যনীতি করবেন, তিনের ভিতরে যদি সমন্বয় না থাকে তাহলে দেখেন। এই মুহূর্তে আপনি টাকা মূল্যমান কমাচ্ছেন, সুদের হার ওইদিকে বাড়বে অবধারিতভাবে, এইদুটোর ভিতরে সমন্বয় করে, আপনি কীভাবে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন? কীভাবে আপনি যারা

বিনিয়োগ করবে তাদের যে বিনিয়োগের যে হিসাব সেটাকে আপনি রক্ষা করবেন? কীভাবে আপনি ব্যবস্থা করে আগামীদিনে তাদের যে আমদানিগুলোকে অর্থায়ন করবেন? এগুলো তো বড় বিষয় হয়ে উঠেছে আর কী। সেহেতু আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, এই সমস্যার স্বীকৃতি, তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এবং তার ভিতর দিয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচি যদি না আসে বাজেটে তাহলে ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড় যদি করেন, তাহলে এবং যদি বাগাড়ম্বরের ভিতরে থাকেন, এই বাগাড়ম্বর নীতিপ্রণেতাদেরই প্রতারণা করবে। আর এইটার ফলভোগী হবে বাংলাদেশের নাগরিকরা।

আহসান: বাজেটের বিষয়ে সুস্পষ্ট দু'একটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানবো। আমরা যদি অতীত ইতিহাসে গেলে দশ-বারোটা বাজেট বিশ্লেষণ করি প্রতিবছরই মোটামুটিভাবে একটা থাম্বরুল মেনে বারো-পনেরো শতাংশ হারে আয়তন বাড়াতে পেরেছি। এবার আমরা দেখছি সেটা পাঁচ শতাংশের বেশি হয়তো বাড়বে না সরকারের নানারকম সীমাবদ্ধতা আছে যে কারণে। এইটা যদি হয় তাহলে এই পরিমাণ আয়তন বাড়িয়ে আমার একটা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হবে, আরো অনেক লক্ষ্যই ধরা হবে। সেটা কীভাবে এচিভ করবে সরকার?

ড. দেবপ্রিয়: প্রথম কথা হলো যে আপনারা সবসময় এই যে বাজেট যখন হয় এইটা আমি গণমাধ্যমের সমালোচনা করে বলছি। সেটা হলো আপনারা সবসময় ঘোষিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন। কোনো সময় বাস্তবায়িত বাজেট নিয়ে সেইভাবে আলোচনা হয় না। এবং ঘোষিত বাজেটে কিছু বাড়িয়ে বলা হবে এটা রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে করে এটাও আমরা সকলে বুঝি। কিন্তু মনোযোগটা দেয়া উচিৎ যে কী পরিমাণ বাজেটটা আপনার অর্জিত হয়েছে। এবং সেটা হলে আপনি দেখবেন সত্তর-আশি শতাংশের বেশি আপনার বাজেটে হয় না এবং সেটাও যেটা হয় সেটা হলো আপনার সংশোধিত বাজেটের। এবং সংশোধিত বাজেটেও সেইটা আবার দশ-পনেরো শতাংশ কমানো হয়। সেহেতু আপনি প্রকৃত অর্থে কিন্তু বাজেটের আয়তন, অর্থনীতির আয়তনের তুলনায় বেড়েছে গত পনেরো বছরে, এ কথা আপনি বলতে পারবেন না। কারণ হলো আপনি যদি দেখেন, অর্থনীতির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে যে কোনো দেশের বাজেটের আয়তন বাড়ে, সেটা নিয়ে আর্থিক পরিমাণ দিয়ে কোনো সময় পরিমাপ হয় না। সেহেতু এখনো পনেরো-ষোলো শতাংশ জিডিপি'র বেশি কিন্তু বাজেট না। মানে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ এইটার বেশি না। অথচ আপনি আয়ের পরিমাণ কিন্তু কমে গেছে সেই অর্থে, জিডিপি'র দশ শতাংশের নিচে নেমে গেছে, নয় শতাংশে। আর শুধু কর তো সাত-আট শতাংশ। সেহেতু, বাজেটের এবারের যেই আয়তনের বিষয় এটা আমার কাছে খুবই, আমি এটাকে বলি, মানে এক ধরনের আর্থিক পরাবাস্তবতা। পরাবাস্তবতা হলো তাই যেটা আমি চোখের সামনে দেখি এবং সেটার বাইরেও আরেকটা বাস্তবতা অবস্থান করে। অনেক সময় এটাকে আমি বলি সমান্তরাল বাস্তবতা। সেহেতু আপনি কোন বাস্তবতাটাকে নিয়ে আলোচনা করবেন সেটা নির্ভর করে বাজেটের সময়। সেহেতু এই আয়তন নিয়ে এই আলোচনাটা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি মনে করি অপ্রাসঙ্গিক। এবং সরকারে এখানে অনেক বেশি আপনার একটি আমরা এটাকে আমরা যেটাকে বলি সংহত করার চেষ্টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধির চেষ্টার চেয়ে। এইটা প্রবৃদ্ধির বাজেটের সময় না। এবং আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রবৃদ্ধির হারের পতন ঘটছে সরকারের ত্রৈ-মাসিক জিডিপি'র হিসাবে এটা চার

শতাংশের নিচে নেমে যাচ্ছে। এবং আমরা বলেছি যদি আপনি বাদবাকী সময় সাড়ে সাত শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আপনার বাকী তিন মাসে এখানে দশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে হবে। ওইটা একটা অবাস্তব জিনিস আরকী। সেহেতু প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এখন বড় বিষয় না। এখন হলো সংহত করা, বাজারকে স্থিতিশীল করার ব্যবস্থা। এবং যে অর্জনগুলো সরকারের হয়েছে সে অর্জনগুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থা। সেহেতু আপনার একটা খুবই মনোযোগ দিয়ে, এক ধরনের ইংরেজিতে যেটাকে prioritisation বলেন অগ্রাধিকারগুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই অগ্রাধিকারের জায়গায় আপনি কোথায় কোথায় যাবেন। এখন এখানে আরেকটা এবারের নতুন বাড়তি জিনিস হলো, সেটা হলো যে যেহেতু আপনি আইএমএফের কর্মসূচির অধীনে আছেন, সেহেতু আপনার কিছু ওখানে প্রতিশ্রুত কর সংস্কার কর্মসূচি আছে। সেই জায়গাটাতে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপার। যেমন হলো আইএমএফ থেকে বলা হয়েছে যে আপনাকে যত ধরনের আপনি সুবিধা দিয়েছেন, রেয়াত দিয়েছেন, এগুলোকে সব বন্ধ করতে হবে। আমরা মনে করি যে এওই রেয়াত কোথায় রাখবেন, কোথায় রাখবেন না, এটা যেমন একটা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দিয়ে হবে, একইরকমভাবে এখানে স্বচ্ছতাসহ জনপ্রতিনিধিদের মতামতটাও সাথে নেয়া উচিৎ। কারণ আপনি কোথায় কমাবেন, কোথায় কমাবেন না? কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য মানে উদ্দেশ্যই হলো কত বেশি কোথায় থেকে আহরণ করা যায়। আর জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য হলো যে কীভাবে অর্থনীতির এমন ব্যবস্থা রাখা যায় যেটা জনমানুষের কল্যাণে কাজ করে। দু'টোর ভিতরে কিন্তু তফাৎ আছে লক্ষ্যের ভিতরে। উনাদের কাজ হলো একটা। সেইটাই উনাদের কাজ্। উনাদের অন্য দায়িত্ব নাই। সেহেতু অন্য এই জায়গায় যে বলেছি যে রক্ষাকবজগুলো যদি ঠিকমতো না হয়। একইরকমভাবে আপনি যদি এইটার ফলে আপনি যে সমস্ত জাতীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি সুবিধা দিয়েছেন, এইটার কারণে যে শিল্পগুলো গড়ে উঠেছে, আমার অভ্যন্তরীন বাজারকে তারা এই মুহূর্তে সরবরাহ করছে সেগুলোর উপর যদি আঘাত আসে তাহলে তো আরেক ধরনের সমস্যা হবে। তো এইগুলোর ক্ষেত্রে এইবারে খুব বড় মনোযোগ দিতে হবে। আরেকটা মনোযোগের জায়গা যেটা আছে সেটা হলো যে খাদ্য নিরাপত্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই মুহূর্তে হলো ফসল ভালো হয়েছে। ফসল ভালো হওয়ার কারণে সরকারের স্ংগ্রহ অভিযান কীরকমভাবে হবে, সেই সংগ্রহ অভিযানের ভেতর দূর্নীতি যাতে না হয় সেটা একটা বড় বিষয়। সেটাকে স্টক করা, মজুদের থেকে খোলা বাজারে বিক্রি এবং ইত্যাদি বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তৃতীয়ত, যেটা হবে, সরকার যে এক কোটি পরিবারকে যে কার্ড দিয়েছে, এখন এই কার্ডের কি তালিকা আপনি দেখেছেন কোনোদিন? যে মানুষগুলো পেয়েছে তারাও কি ভালো করে জানে? সেহেতু আপনার তো এখানে স্বচ্ছতা নাই। সেহেতু, এইখানে, এই তালিকাটা অনতিবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিৎ। এবং যাতে দেখাও উচিৎ যে এই তালিকা, প্রথমত এই মানুষগুলো সঠিক। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। সরকারের পদক্ষেপটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক পদক্ষেপ। একই সাথে আমরা দেখতে চাই, এর সাথে সরকার যে সমস্ত ভাতা দিচ্ছে, সেই ভাতাগুলোরও তালিকাগুলো যদি সমন্বিতভাবে একটা তথ্য ভিত্তিতে যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে এটাতে দক্ষতা বাড়ে এবং সরকারের যে লক্ষ্য নিয়ে সে মানুষকে রক্ষা করতে চাচ্ছে সে কাজটা এখানে হবে। সেহেতু

আপনাকে এখানে বিনিয়োগও দেখতে হবে। আপনাকে এখানে একইরকমভাবে কর আহরণ দেখতে হবে। একইভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ, অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে সুরক্ষা দিতে হবে।

আহসান: এখানে একটা বিষয় অনেকদিন ধরে আপনি নিজেও বলেছেন যে অর্থনীতির বাইরে থেকে একরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার সরকারের তথ্য উপাত্ত বা ভিতরের একরকম চিত্র হয়তো সেখানে আছে। এইবার একটা আর্জি সবজায়গা থেকে আসছে। আপনারা নিজেও বলেছেন যে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে চড়া মূল্যস্ফীতি আছে সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এবং সুবিধাভোগীদের যদি সাহায্যের পরিমাণটা বাড়ানো যায়। সরকার কি এরকম কোনো স্বস্তির মধ্যে আছে কি না যে চাইলে এটা বাড়াতে পারবে?

ড. দেবপ্রিয়: সরকার যদি চায় তাহলে সরকার অনেককিছু এখনো করতে পারে। এখন সরকারের চাওয়াটা, সরকার তো সরকার না, সরকার কারোর পক্ষ হয়ে চায়। সে জনগণের পক্ষ হয়ে চাইবে? নাকি অতিমূল্যায়িত প্রকল্পগুলো যাদের জন্য দিয়েছেন সরকার, তাদের পক্ষ হয়ে চাইবে? এইটাই হলো বিষয় আরকী। দেখুন আপনার এখন তো যদি আপনার দু'টো টাকা থাকে, আপনি কি সরকারের সুরক্ষাতে দিবেন? নাকি আপনি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে দিবেন? ঐ প্রকল্প চালানোর জন্য ঐ দুই টাকা খরচ করার জন্য কি আপনি আরো তিন টাকার ঋণ নিবেন? নাকি আপনি, সরকারের ঐ দুই টাকা আপনি শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে গুণমান বৃদ্ধি করার জন্য দিবেন? বিল্ডিং বানানোর জন্য না। ইমারত তৈরি করার জন্য না। সেহেতু এই জায়গাগুলোতো খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এই জায়গাগুলো পরীবীক্ষণ করার জন্যই কিন্তু গণতান্ত্রিক নজরদারী দরকার করে। এই দেখুন, আপনি যে সমস্ত আমার সংসদ সদস্যরা আছে, যেভাবেই তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন না কেন, তাদের তো জানা উচিৎ যে তার এলাকাতে কত টাকা খরচ হচ্ছে। কোন প্রকল্পে কত টাকা যাচ্ছে। উনারা কি সেটা বলতে পারবেন? কিন্তু সরকারের কাছে কিন্তু এই তথ্য আছে। উনারা এই তথ্যের দাবীও করেন না ঠিকমতো। এবং আমলারাও উনাদের সেইভাবে কিন্তু সেবা দেয়ার জন্য মন-মানসিকতার ক্ষেত্রেও এই মুহূর্তে নাই। উনারা অনেক সময় অনেক উদ্ধত আচরণ করেন। তো সেহেতু এই জায়গাগুলোও তো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট তো শুধু বাজেট না। বাজেট হলো সেই অর্থে বললে একটা সামাজিক এক্সপেরিমেন্টের মতো। এটা একটা রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্টের মতো। ঐ রাজনৈতিক সামাজিক এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে আপনি কী ফলাফল নিয়ে বেরোবেন এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার তার প্রথম বছরে আছে। এইটেই সময়। যে কোনো সরকারের বড় কাজ করার জন্য ধাক্কা দেয়ার সময় হয় প্রথম বছর বা দুই বছর। এরপরে কিন্তু এই যে কথাগুলো আমরা বলছি এটার তাৎপর্যও থাকবে না, এইতার প্রেক্ষিতও বদল হয়ে যাবে।

আহসান: মানে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? রাজনৈতিক বাস্তবতা? মানে রাজনৈতিক ইচ্ছা? নাকি অর্থনৈতিক বাস্তবতা?

ড. দেবপ্রিয়: অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে তো আপনার রাজনৈতিক ইচ্ছা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থনীতি তো নিজের মতো চলে না। অর্থনীতি চলে নেতৃত্বের যে সমস্ত ইঙ্গিত আছে,

যে নীতি তৈরি হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে। তাহলে সেহেতু এই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝতে হবে তার প্রকৃত রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তিটা কী? আপনি যদি সমর্থনের ভিত্তি মনে করেন যে ঋণখেলাপীরা বা যারা ব্যাংক জবরদখলকারীরা তারা হলো আমার ভিত্তি, যদি আপনি মনে করেন যে যেসমস্ত বড় বড় প্রকল্প করছে সেই প্রকল্পের ঠিকাদাররা আমাদের ভিত্তি, যদি আপনি মনে করেন যে সমস্ত আপনার এনার্জি খাতে, জ্বালানি খাতে, যাদের আমি ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছি তারা আমার ভিত্তি, তাহলে একরকমের নীতি বাস্তবায়ন হবে। আর যদি আপনি মনে করেন যে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ যাদের আপনি ঘর দিয়েছেন, যাদের জমি দিয়েছেন, যাদের আপনি কাজের চিন্তা করেন, সেই মানুষগুলো আপনার সমাজের ভিত্তি তাহলে অন্যরকমের চিন্তা হবে। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আপনি বলেন এদের কথা করেন অন্যের জন্য। এইটেই হলো সমান্তরাল বাস্তবতা। এইটেই হলো প্রতারণামূলক বাস্তবতা। যে আপনি একজনের কথা বলেন মুখে, বাগাড়ম্বরে কিন্তু করেন কিন্তু কাজ আরেকজনের পক্ষে।

আহসান: ব্যাংকখাত নিয়ে, এখন মোটামুটি বলা যায় যে পুরো অর্থনীতি নিয়ে যতটা না আলোচনা হয় শুধু ব্যাংক খাত নিয়ে তার চেয়ে বেশি আলোচনা এবং সমালোচনাও হয়। এবং সাম্প্রতিক বড় বড় কিছু সিদ্ধান্ত আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে দেখলাম, যে ডলারের দাম বড় একটা সমন্বয় করা হলো, বাজারের উপর ঋণের সুদহার ছেড়ে দেয়া হলো, এতে কি আসলে শৃঙ্খলা ফিরবে কি না, আপনার কী মনে হয়? শৃঙ্খলা বলতে আমরা কী বুঝি?

ড. দেবপ্রিয়: দেখুন শৃংঙ্ক্ষলা বলতে তো আমরা সবাই বুঝে যে যেকোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত, আমরা ইংরেজিতে বলি prudent rules and regulations আছে, অর্থাৎ যেগুলো এক অর্থে মানে সঠিক নীতিমালা আছে, যেগুলোকে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে সেগুলোকে আপনি স্বচ্ছতার সাথে, জবাবদিহিতার সাথে কার্যকর করবেন। এইটেই হলো বিষয়। এখন সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি লক্ষ্য করেন ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থার জন্য একদিকে যেমন এই ব্যাংকগুলো ব্যক্তিখাতের ব্যাংকই বলেন আর সরকারি খাতের ব্যাংকই বলেন। তার ভিতরে যেই পরিচালন পদ্ধতি ছিল, সেই পরিচালন পদ্ধতি নি:সন্দেহে দুর্নীতি পরায়ণ ছিল। এবং সেই পরিচালনের ক্ষেত্রে যেই সমস্ত পরিচালকরা ছিলেন তারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে। এবং তার দায় এখন সঞ্চয়ীদের কাছে, আমানতকারীদের এবং সরকারের কাছে এসে উপনীত হয়েছে। একইরকমভাবে আপনি দেখবেন যে এদের দেখভাল করার জন্য, সব নজরদারী করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা, পরীবীক্ষণ টিম পাঠিয়েছে, তাদের রিপোর্ট আছে। সেই রিপোর্ট গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা নেয়নি। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ব্যবস্থা নিতে পারে নাই কারণ উনারা এইটার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক সমর্থন বা রাজনৈতিক ইঙ্গিত পেতে হয়, সেটাও উনারা পাননি। সেহেতু আপনি তিন জায়গাতেই এই সমস্যা দেখবেন। যেমন ওইটা মানে ইন্সটিটিউশনাল গভার্নেন্সের ইস্যু, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের অভাব। আবার নজরদারি করার ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে তার সুশাসনের অভাব বা তার দায়িত্বজ্ঞানের অভাব বা পরিচালনের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব। একইরকমভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেই ইঙ্গিতটা দেয়ার দরকার সেই ইঙ্গিতটার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়ে গেছে। এই তিনটে ঘাটতি যদি আপনার মেটাতে হয় তার জন্য,

আপনার মোকাবেলা করার জন্য একটা রাজনৈতিক শক্তি লাগে। আমরা মনে করেছিলাম অনেকেই বা আমাদের আস্বস্ত করা হয়েছিল যে নির্বাচনের পরে অনেক বড় বড় সংস্কার করা হবে যেই সংস্কারগুলো এতদিন আটকে আছে। এবং সেইটার প্রতিশ্রুতিটা আরো এসেছিল কারণ আইএমএফের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি এটার সাথে যুক্ত ছিল। যদিও আইএমএফের প্রতিশ্রুতি আমি আগেই বলেছি, আমাদের মতো অধমরা এটা বহুদিন যাবৎ বলে এসেছে এগুলো করা দরকার। এখন লক্ষ্য করে দেখেন, সবচেয়ে বড় একটা জায়গাটা ছিল যে আপনার খেলাপী ঋণের ভারে নূহ্য হয়ে যাওয়া, এই সমস্ত দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাংকগুলোর জন্য একতা ব্যবস্থা নাও। এবং যেই খেলাপি ঋণগুলোকে আদায় করার জন্য একটা ব্যবস্থা নাও। সরকার কী বললো? একীভূত করা হবে। কীভাবে বললো? প্রশাসনিক পদ্ধতি দিয়ে বলে দিল। অভ্যন্তরীণ কোনো আলোচনার মধ্য দিয়ে গেল না। এখন তো সরকারের মুখের সামনে তারা বোর্ডের থেকে বলে দিয়েছে আমরা যাবো না। উনার কী করার আছে? আর এর মধ্যে আমরা কী দেখলাম? যে রাতারাতি কোনো ব্যাংকের মালিকানাসুদ্ধা বদল হয়ে গেল। তো আপনি খেলাপী ঋণও আদায় করতে পারলেন না, আবার যারা এই খেলাপী ঋণ সৃষ্টি করলো তারাও দায়-দেনার থেকে, জবাবদিহিতার থেকে বের হয়ে গেল কি না এইটাও আমরা বুঝতে পারলাম না। তো এইটা তো চোখের সামনে হচ্ছে। এইটা করতে কেন পারেননি? আমি আবার ফিরে আসি আপনার কাছে। এই সরকার, এই কাজগুলো করার জন্য, যে রাজনৈতিক শক্তি দরকার, যেই নতুন গোষ্ঠী স্বার্থসংশ্লিষ্টভাবে গড়ে উঠেছে সেটা যদি আপনি বলেন যে ঐ যে আমি বললাম জ্বালানি খাত বলেন বা ঠিকাদাররা বলেন বা রপ্তানিকারকরা বলেন বা অন্যান্য যে সমস্ত সুবিধা যারা পেয়েছে বা খেলাপী ঋণকারীরা বলেন বা যারা আপনার পুঁজিবাজার লুট করেছে বিভিন্ন সময়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তি বর্তমান সরকার এখন পর্যন্ত দেখাতে পারে নাই। এই রাজনৈতিক শক্তি যদি দেখাতে না পারে তাহলে সরকারের অনেক শুভচিন্তা বাস্তবায়িত হবে না।

আহসান: আপনি নিজেও তো ব্যাংকের পরিচালনায় ছিলেন কোনো এক সময়। সেই সময়ের সাথে এই সময়ের যদি গুণগত পার্থক্যটা করতে চাই আসলে ক্ষয়টা কোথায় হয়েছে?

ড. দেবপ্রিয়: দেখুন আমি ব্যাংকের পরিচালনায় ছিলাম আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে। ’৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে আমি ছিলাম। এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছে এমন একজন অর্থমন্ত্রীর সাথে কাজ করার যিনি এই দায়িত্ব উনার পক্ষ থেকে আমাদের দিয়েছেন। আমি কিবরিয়া সাহেবের কথা বলছি। যে এইটার ফলে উনারা কোনোদিন কাকে ঋণ দিতে হবে, কোনো ঋণ আদায় করা যাবে না এরকম কোনো ধরনের বক্তব্য আমরা কোনোদিন শুনি নাই। এবং একইরকমভাবে ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে বা কাকে ঋণ দিয়ে তাদের ওই প্রকল্প অতিমূল্যায়িত করার জন্য কোনো ধরনের ব্যবস্থাপনাগত প্রণোদনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি নাই। এবং আমরা যারা ওখানে ছিলাম, ওখানে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরও প্রতিনিধি ছিল এবং প্রথমবারের মতো সরকারের পক্ষ থেকে পেশাজীবীদের আনা হয়েছিল সেখানে। সেই দায়িত্বটা প্রতিপালন করা, নিঃকণ্টকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। এই পরিস্থিতি তো সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে এখন। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, ওই যেই আমি বললাম, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় যে ব্যক্তিরা ছিলেন তাদের পিছনের ইতিহাস, আগামী

দিনের ইতিহাস, এগুলো পর্যালোচনা করলেই আপনার খুবই এইগুলো পরিষ্কার হবে। ওই আওয়ামীলীগ সরকার আর এই আওয়ামীলীগ সরকার দু'টো গুণগতভাবে ভিন্ন সরকার।

আহসান: আমরা শেষদিকে চলে এসেছি। আপনি দায়-দেনা পরিস্থিতি নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বা আপনার বক্তব্যে বা ইন্টারভিউয়ে আমরা দেখেছি। আসলে কি আমরা খুব বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছি কি না বা পড়তে যাচ্ছি কি না?

ড. দেবপ্রিয়: ঝুঁকি তো সৃষ্টি হয়েছে এটা তো এখন সকলেই মানতে বাধ্য হচ্ছেন। দু'বছর আগে বলেছিলাম। তখন যদি ব্যবস্থা নিতো তাহলে হয়তো ঝুঁকিটা আরেকটু কমতো। এই ঝুঁকি কমবে না। ২০২৬ সাল নাগাদ আরো বেশি বাড়বে। রূপপুরের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের টাকা শোধ করার সময় আসলে, সবচেয়ে বড় প্রকল্প বাংলাদেশের ইতিহাসে, বারো-চৌদ্দ বিলিয়ন ডলারের, সেটা যদি আসে তাহলে তো এটা তো একটা কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হবে। এবং সেটা দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে দুই বছর পেছানোর জন্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বলেছি। সেহেতু সরকারের এখন সুস্থিরভাবে এইটাকে টেকসই করার জন্য একটা কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। এই যে বাজেট, এর সাথে আমার বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ লেনদেনের বা ঋণের, কারণ অভ্যন্তরীণ ঋণ তো দুই গুণ, সেগুলোকে মিটাবো কীভাবে এইটা সমন্বয়সাধন কতখানি করবে সেটা খুব বড় বিষয়। আমি আবার বলছি, বাজেট শুধু বাজেট না, বাজেট একটা নীতি কাঠামোর ভিতরে অবস্থান করে। তার মুদ্রানীতি, তার সেই অর্থে বাণিজ্যনীতি, শুল্ক, কর ইত্যাদি রয়েছে। এবং একইরকমভাবে আপনার বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেই অর্থায়নের জন্য কী ধরনের আমার, আমি মনে করি একটা কর্মসূচি নেয়া দরকার। ইআরডির পক্ষ থেকে আমাদের ডেবট সাসটেইনেবিলিটির হিসাব করা হয় অর্থাৎ কোন ঋণ কতখানি টেকসই, কতদূর নেয়া যায়, এইটাকে পর্যালোচনা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আহসান: আমরা গত বছর যখন এডিপির হিসাবটা করছিলাম বা বাজেটের হিসাবটা করছিলাম, এডিপির জন্য যে বাজেটটা রাখা হয়েছিল আমরা দেখছিলাম যে পুরা অর্থটাই সমপরিমাণ ধার করে আমাদের মিট-আপ করতে হবে। এইবার সেই অঙ্কটা আরো খানিকটা বাড়ছে।

ড. দেবপ্রিয়: আজকে যারা নীতি করছেন, আমলাতন্ত্রের ভিতরে বা প্রশাসনের ভিতরে, দু'বছর পরে তো উনারা থাকবেন না। কিন্তু দু'বছর পরও কিন্তু এই সরকার থাকবে ধরে নিচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব কিন্তু অনেক বড়। কারণ উনারা নির্বাচিত হয়ে কথা রাখাটা উনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আবার যদি নির্বাচনে কোনো সময় মুখোমুখী হতে হয় তাহলে তার জবাব দিতে হবে। সেহেতু আমি আবার ফিরে আসছি। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে ঘাটতিটা, যে জবাবদিহিতার ঘাটতিটা, যেই জনপ্রতিনিধিরা সংসদে আছেন, তারা যেভাবে আলোচনা করেন, যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আছে সেগুলো যেভাবে কাজ করছে না, এইগুলো যদি না মেটানো যায়, তাহলে ঐ আরেকটি পুস্তক যদি আমি প্রকাশ করি, এটা খুব এদিক ওদিক হবে না। বাজেট বাজেটের জায়গায় থাকবে, অর্থনীতি অর্থনীতির মতো চলবে। একটা আরেকটাকে পরিপুষ্ট করতে পারবে না।

আহসান: আমরা একেবারেই শেষ করবো। যদি আপনার কাছ থেকে দু'চারটা পরামর্শ চায়, সরকার একটা ভালো বাজেট দিতে চায়, তার সীমিত সম্পদ এবং নানারকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে। আপনার পরামর্শটা কী আসলে? কোথায়, কীভাবে ব্যয়টা করা দরকার?

ড. দেবপ্রিয়: বিষয়টা তো ব্যয় না। আমি আবার বলছি। মনোভঙ্গীর ব্যাপার। মনোভঙ্গী হলো তথাকথিত প্রবৃদ্ধিমুখী বাজেট তৈরি করার সময় এটা না। এখন হলো, আপনার যেটুকু আপনি প্রস্তুত করেছেন বাংলাদেশকে গত দশ-পনেরো বছরে, সেটাকে রক্ষা করার সময়। সংহত করার বাজেট আসতে হবে। এইটা তথাকথিত প্রবৃদ্ধিমুখী বাজেট না, এইটা স্থিতিশীলতা এবং সংহতকরণের বাজেট আসতে হবে। সেই সংহত করার জায়গাগুলোকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে মূল্যস্ফীতির কারণে যেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত এরা যেন কষ্টপ্রাপ্ত না হয়। এবং আমার শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে যেন আমার গুণমান রক্ষা করা হয়। এইটেই সবচেয়ে বড় জায়গা। এই জায়গাটায় মনোযোগ না দিয়ে আবার যদি আমি ওই দৃশ্যমান প্রকল্পের অর্থায়নে জায়গাতে চলে যাই তাহলে খুবই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে আরো অনেক বেশি বলে আমি মনে করি। আর যেটা বিবেচনার বিষয় সেটা হলো যে আমি আগামীদিনে কোথা থেকে টাকা নিব, কার কাছ থেকে টাকা নিবো, আমাদের এই মুহূর্তে চীনের সাথে আলোচনা হচ্ছে আমাদের দায়-দেনা পরিস্থিতি মেটানোর জন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি বহি:রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আমাদের আমাদের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন বহুভাবে আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চয়নকে প্রভাবিত করছে। এগুলোর ব্যাপারে সংবেদনশীল থাকা দরকার। এইটার জন্য আবার রাজনৈতিক বিবেচনাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। আমি আবার বলছি, বাজেট শেষ বিচারে একটি রাজনৈতিক দলিল। এই রাজনৈতিক দলিলকে অবশ্যই এই সরকারের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে মুখের কথায় না, কাজের ভিতর দিয়ে। কারণ বাজেট হলেই তো আপনি আমি আবার এটাকে মূল্যায়ন করবো। তখন যেন আবার এই কথাগুলো আবার বলতে না হয়।

আহসান: অনেক ধন্যবাদ। আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করতে চাই আজকের আলোচনা।

ড. দেবপ্রিয়: ভালো থাকবেন।

চ্যানেল টুয়েন্টিফোর
২১ মে ২০২৪

জটিল প্রেক্ষাপটে আসছে এবারের বাজেট

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে ২০২৩–২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আমরা। বর্তমান পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। ফলে বাজেট ঘোষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব পরিস্থিতি, রাজনীতি, কূটনীতি এবং ভূকৌশলগত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে, এবারও একটি গতানুগতিক বাজেট ঘোষিত হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রভাবে কার্যকর বাজেট হবে আরেকটি। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তার মতে, সরকারি কর্মকর্তাদের আয় নিয়ে সরকার যতটা চিন্তিত, বেসরকারি এবং অন্যান্য খাত নিয়ে সে চিন্তা একেবারেই নেই। এছাড়াও রাজনৈতিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন দেশের শীর্ষস্থানীয় এ অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মনির হোসেন।

যুগান্তর: এবারের বাজেটে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ কী?

ড. দেবপ্রিয়: গত দুই দশকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবারের বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা সামনে আসছে। জটিল পরিস্থিতির একটি দিক হলো, দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব আয় কম এবং বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের উত্থান-পতন হচ্ছে। পণ্যমূল্যে বড় ধরনের উল্লম্ফন, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাধা এবং করোনার সংকট কাটিয়ে

অর্থনীতি এখনও আগের অবস্থানে যেতে পারেনি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূকৌশলগত দ্বন্দ্ব, ভূরাজনীতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এ পরিস্থিতি পরাশক্তিগুলোকে নতুন ধরনের শীতল যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছে। এসব কিছু বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রকাশ্যভাবেই প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে জড়িয়েছে, তা নয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশও এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ইতোমধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। খাতগুলো হলো- বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশি বিনিয়োগ, বিশ্বে বাজার সুবিধা এবং প্রযুক্তির লভ্যতা অন্যতম। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখছি, সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের প্রশ্ন তৈরি করছে।

সম্প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিদেশি নিষেধাজ্ঞার (স্যাংশন) সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যুক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, স্যাংশন দেওয়া দেশের কাছ থেকে পণ্য কিনব না। অর্থাৎ আমাদের ওপর স্যাংশন আছে এটি যেমন সত্য, এর বিপরীতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে, এটিও সত্য। এসব বিষয়ের মধ্য দিয়েই বর্তমান জটিল প্রেক্ষাপটের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

যুগান্তর: বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবেলায় আইএমএফ’র কাছ ঋণ নিয়েছে সরকার। এটি বাজেটে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

ড. দেবপ্রিয়: এমন সময় বাজেট ঘোষণা হতে যাচ্ছে, যখন বাংলাদেশ আইএমএফ’র কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মোকাবেলায় আইএমএফ’র কাছ থেকে আমরা ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চেয়েছি। ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা চলে এসেছে। একইভাবে সরকারি আয়-ব্যয়, আর্থিক খাত ও রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে সাশ্রয়ী সুদে ৪ বিলিয়ন ডলারের মতো বাজেট সাহায্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেহেতু আইএমএফ’র সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে, তাই বিশ্বব্যাংকসহ অন্য সংস্থাগুলো কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হয়তো সাহায্য দেবে। তবে এর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি জড়িত। এসব সংস্কার এক দশক আগে করা উচিত ছিল। দীর্ঘদিন থেকে আমরা এসব বিষয়ে বলে আসছি। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। এখন আইএমএফ’র কাছে নীতি সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক মূল্যে তা বাস্তবায়ন করছে। ফলে এই বাজেটে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলে এবার কতটুকু জোর দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে আইএমএফ’র শর্তের বিষয়ে কতটুকু জোর দেওয়া হবে। আমি মনে করি লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক, আইএমএফ’র কাছে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে রচিত হবে এবারের বাজেট। আরও সহজ করে বললে, হয়তো ঘোষিত বাজেট একটা থাকবে। কিন্তু কার্যকর বাজেট থাকবে আরেকটা। ঘোষিত বাজেট হবে গতানুগতিক। কিন্তু ভেতরে কার্যকর বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ হবে-কর আদায়, বিভিন্ন কর সুবিধা তুলে দেওয়া, ভর্তুকি কমানো, সুদের হার শিথিলকরণ ও মুদ্রা বিনিময় হার

একীভূতকরণ। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের বিষয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যুগান্তর: বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাজেটে কী ধরনের কৌশল নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয়: এবার এমন একটি বাজেট তৈরি হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন করবে দুটি সরকার। বর্তমান সরকার অর্ধেক বাস্তবায়ন করবে। বাকিটা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন পরবর্তী সরকার। যদিও এই সরকার বাজেট তৈরি করে ফেলেছে, পরে তা বাস্তবায়নে-ধারাবাহিকতা ধরে রাখা ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ জীবন মানের অবক্ষয়ের কারণে আমাদের অর্জন যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাজেটের আর্থিক কাঠামোর চেয়ে গুরুত্বত্বপূর্ণ হলো কোনো আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে আগামীতে আমরা বাজেট বাস্তবায়ন করব। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক সংযোগগুলো আগামী এক বছরে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে সামনে আসবে। যা বাজেট বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বাজেট বাস্তবায়নে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রত্যাশা করব।

যুগান্তর: সামনে নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে। এছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশসহ সরকার বেশকিছু পরিকল্পনার কথা বলেছে, এক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ আশা করছেন?

ড. দেবপ্রিয়: ২০২৪–২৫ সাল হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর। ২০২৩–২৪ থেকেই তাই এই পরিকল্পনার মূল্যায়ন শুরু হবে। অথচ করোনা পরবর্তী সময়কালে এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ করা নিয়ে কোনো উদ্যোগ দেখছি না। উপরন্তু চলমান বছরে (২০২২–২৩) অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিয়ে নীরব হয়ে গেছে। অপরদিকে এলডিসি থেকে মসৃণ-উত্তরণের জন্য কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা কমে গেছে। বরঞ্চ এর বদলে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছি। স্মরণ করছি দূরবর্তী ২০৪১-এর কথা।

যুগান্তর: নির্বাচনি বছরে অর্থ পাচার বাড়ে। পাচার বন্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয়: চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে সমালোচিত বিষয় মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া। নীতিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে বলেছি। আমরা তখন বলেছিলাম, এটি রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক এবং সামাজিকভাবে অন্যায় পদক্ষেপ। এ বছরও এরূপ ব্যবস্থা বহাল রাখতে একটি গোষ্ঠী চাপ দিচ্ছে। অন্যদিকে এবার রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল অবস্থানে। সে কারণে এবার পাচারের আশঙ্কা আরও বেশি।

যারা আগামীতে নির্বাচনে অংশ নেবে, সেখানে যাতে কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি এবং বিদেশে সম্পদ থাকলে, ওইসব ব্যক্তি যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংস্কার করে বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।

যুগান্তর: উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্তরা বিপদে। বাজেটে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ কী?

ড. দেবপ্রিয়: নির্ধারিত বেতনের মধ্যবিত্তরা সমস্যায় রয়েছেন। সেক্ষেত্রে নিত্যপণ্য আমদানিতে যেসব জায়গায় শুল্ক আছে, কোথাও দুবার করে কর নেওয়া হয়, ভ্যাটের ইস্যু রয়েছে, এগুলো সমন্বয় করা উচিত। আর কোনো পণ্যের দাম বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দিলে তার ওপর থেকে উৎস করা প্রত্যাহার করা উচিত। যেমন বর্তমানে জ্বালানি তেল, বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছে সরকার। এক্ষেত্রে কথা হলো-কর নেবেন, এরপর দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেবেন, দুটি একসঙ্গে চলে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, একদিকে বিদ্যুৎ কোম্পানি বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হবে, অপরদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়বে, এটিও অন্যায়। আর আয়ের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতা নিয়ে সরকার মনে হয় বেশ চিন্তিত, কিন্তু বেসরকারি খাতের কর্মজীবীদের কথা সেভাবে আলোচনায় আনেইনি। এটা আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। এছাড়াও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সেখানে যিনি উদ্যোক্তা, তিনি শ্রমিক। তাদের কাছে ব্যাংকিং, কর, ভ্যাট কোনো সুবিধা নেই। তাদের জন্যও সরকারের কোনো চিন্তা দেখছি না। ফলে সুবিধাভোগী সরকারি কর্মকর্তাভিত্তিক এক ধরনের বাজার চিন্তা সরকারকে ব্যস্ত রাখে। করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হবে।

যুগান্তর: দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাবনার দিক কী আছে?

ড. দেবপ্রিয়: বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনা হলো কৃষি খাত। খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এ কৃষিই আমাদের রক্ষা করছে। তাই এ খাতের যত্ন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে কৃষকের কথা। বর্তমান বাজার ব্যবস্থা কৃষকের বিরুদ্ধে কাজ করছে। উৎপাদিত পণ্য এবং নিজের চাহিদার জন্যও কৃষক বাজার থেকে সুবিধা পায় না। তাই আগামী বাজেটে কৃষিতে শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাশা করছি। আর আছে প্রবাসী কর্মজীবীদের কথা। দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের গুরুত্ব সম্প্রতি আরও বেড়েছে। তাই তাদেরও যত্ন নিতে হবে, সহায়তা দিতে হবে।

যুগান্তর
৪ জুন ২০২৪

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের নিরিখেই বাজেটকে দেখতে চাই

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

চলতি বছরের জানুয়ারির শেষের দিকে বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করে আইএমএফ। যার প্রথম কিস্তির ৪৭৬ দশমিক ২৭ মিলিয়ন ডলার আসে গত ফেব্রুয়ারিতে।

বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত কিস্তিতে এই অর্থ দেওয়া হবে। তবে এই ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমএফ বেশ কিছু সংস্কারের শর্তও বেঁধে দিয়েছে। রাজস্ব সংস্কার, মুদ্রা ও বিনিময় হারের সংস্কার, আর্থিক খাতের সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংস্কার এবং সামষ্টিক কাঠামোগত সংস্কার। এসব শর্ত ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। তবে আগামী এক বছরের মধ্যে কয়েকটি শর্ত বাস্তবায়ন করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। তৃতীয় কিস্তির ঋণ পেতে চলেছে বাংলাদেশ খুব শিগগিরই।

আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যে বাজেটটি আসতে চলেছে, সেখানে আইএমএফের এই ঋণ শর্ত কীভাবে প্রতিফলিত হবে, তা নিয়ে সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সানজিদা শম্পা।

সংবাদ প্রকাশ: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আইএমএফের ঋণশর্ত কতটুকু পরিলক্ষিত হবে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: এবারের বাজেট তো ব্যতিক্রমী সময়ে হচ্ছে, বাজেটটি ব্যতিক্রমী হবে কিনা সেটি দেখার বিষয়। আমি মনে করি বাংলাদেশের বাজেট বাংলাদেশের অগ্রাধিকার এবং যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটির পরিপ্রেক্ষিতে হতে হবে। আইএমএফ বেশকিছু শর্ত দিয়েছে এবং সে শর্তগুলোর মধ্যে অনেক শর্ত রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমরাও অনেকবার আলোচনা করেছি। সুতরাং সেদিক থেকে আইএমএফের শর্তপালনের নিরীক্ষা নয়, বাংলাদেশের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত যে কার্যাবলি আছে, সেটার নিরিখেই আমি বাজেটকে দেখতে

চাই। আইএমএফও বলেছে, আমাদের যে সম্পদ আহরণ তা জিডিপি'র ৫ শতাংশের মতো বাড়াতে। সেটার একটা উদ্যোগ বাজেটে থাকতে হবে। এ বিষয়টি আইএমএফ না বললেও তা আমাদের রাখতে হবে। কারণ গত বেশ কয়েকবছর ধরে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে ধরলে তা ৮ শতাংশে নেমে গেছে, যা ১১ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। সেদিক থেকে আমাদের একটা তাগিদ থাকতে হবে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে আয় করি (ট্যাক্স, নন ট্যাক্স, এনবিআর বহির্ভূত ট্যাক্স) সেসব ক্ষেত্রে একটি উদ্যোগ থাকবে বলে আশা করি। এটি নিশ্চিত করতে গেলে আমাদের মূলত চাপ দিতে হবে অপ্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ করের দিকে। প্রত্যক্ষ কর আমাদের এক তৃতীয়াংশ এবং অপ্রত্যক্ষ কর ২ তৃতীয়াংশ। অপ্রত্যক্ষ করের চাপ পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। আমরা যদি রেভিনিউ বাড়াই অপ্রত্যক্ষ করের ওপর ভিত্তি করে, এটি একদিকে সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতার বিরুদ্ধে হবে; অন্যদিকে এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। আইএমএফ যাই বলুক না কেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যদি ভর্তুকি প্রত্যাহার করি, যদি প্রণোদনা পুনর্বিবেচনা করি যা আইএমএফ বলছে; এটির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের সাধারণ মানুষের উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে যারা জর্জরিত, তাদের কীভাবে আমরা কিছুটা সুরাহা দিতে পারি, সেক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপরে যাতে নতুন কর আরোপ না হয় বরং সেখানে যদি কিছু রেয়াত দেওয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের করতে হবে সামাজিক সুরক্ষা, যেটি আইএমএফও বলেছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতের ভিত্তি প্রাপ্তি, স্থায়িত্ব বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।

বাড়তি হিসেবে আমরা চাচ্ছি, আরবান এলাকাতে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক সুরক্ষা করতে পারি। আরবান ওয়ার্কারদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করতে পারি কিনা, তা বাজেটে থাকতে পারে। বেশির ভাগ জরিপে আমরা দেখতে পাই, সাধারণ মানুষ, নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের খাদ্য প্রাপ্তিতে অবনমন হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। তাদের বাচ্চাদের জন্য মিড ডে মিলের বরাদ্দ যদি বাজেটে রাখা হয়, সেটির আবেদন আমরা করি। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সুসংহত বিন্যাস আমরা কামনা করি।

অন্যদিক থেকে, রপ্তানি খাতে রপ্তানিকারকরা এখন প্রতি ডলারের বিনিময়ে ১১৭ ডলার পাচ্ছেন, সেখানে পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব। রেডিমেড গার্মেন্টসে বৈশ্বিক বাজারে কটন বহির্ভূত মেন মেইড ফাইবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে প্রণোদনার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। অন্যান্য খাতে বন্ড সুবিধা বাড়িয়ে কীভাবে রপ্তানি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে।

এবার সংকোচনমূলক বাজেট হতে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতির নিরিখে বাজেটের সাইজ কম হতে পারে এবার। আমার মনে হয় উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে মূল না ধরে কীভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করতে পারি, সেদিকে নজর দিতে হবে। নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা, নির্বাচিত করা, চলমানগুলোকে দ্রুত শেষ করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে, বাজেট দিয়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তা সামাল দেওয়া যাবে না। তবে বাজেট একটি ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট। কিন্তু এর সাথে সাথে সুশাসন, প্রজেক্ট বাস্তবায়ন, পাবলিক সার্ভিস যারা দিয়ে থাকেন তাদের শক্তিশালী যেন করতে পারি। যাতে করে এ ধরনের সংকোচনমূলক বাজেটে বিরূপ প্রভাব না পড়তে পারে।

সংবাদ প্রকাশ: আইএমএফের শর্তে ভর্তুকি কমানোর কথা বলা হয়েছে। বাজেটে ভর্তুকি কমানোর বিষয়টিকে কীভাবে দেখতে চান?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: ভর্তুকির একটি পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন আছে এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। তবে কোন খাতে ভর্তুকি অব্যাহত রাখা উচিত, কোন খাতে প্রত্যাহার করা উচিত, সেটা আমাদের দেশের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। আইএমএফ এক সময় ঢালাওভাবে কৃষি খাতে ভর্তুকি তোলার কথা বলতো। আজকাল কিন্তু তা বলছে না। কিন্তু আমরা মনে করি, ভর্তুকি পুনর্বিন্যাস করা গেলে কোন ফার্টিলাইজার বেশি ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রয়োজন নেই, আবার সেখানে ভর্তুকি বেশি। এ ব্যাপারগুলো পুনর্বিবেচনা করার দাবি রাখে, যা আইএমএফও বলেছে।

বিদ্যুতের কথা যদি বলি, সেখানে পৌনঃপুনিকভাবে মূল্য বাড়ানো হচ্ছে। এখন আবার নতুন করে ফর্মুলা করে বাজারের সাথে সমন্বয় করে মূল্য বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে যে ধরনের অপচয় হয়, এখানে যে ধরনের ক্যাপটিভ পাওয়ারগুলোকে বছরের পর বছর ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, এই ধরনের পদক্ষেপের চাপটা কেন ভোক্তার ওপর এসে পড়বে? এই চাপের ফলেই কিন্তু মূল্য বারবার পুনর্নির্ধারণ করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলারিটি কমিশন আগে যেমন জনশুনানি করতো, সে জনশুনানিও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানেও আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে যে ধরনের ব্যত্যয় বিচ্যুতি রয়েছে, সেটা যেন কোনোভাবে ভোক্তা, উদ্যোক্তা, উৎপাদকের ঘাড়ে যেন ফেলে দেওয়া না হয়, বরং এখানে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার কী কী কারণে এ খাতে ভর্তুকিটা প্রয়োজন। কোন জায়গায় ভর্তুকি কমানো যায়, কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে এবং এসব জায়গাগুলোতে নীতি নির্ধারকদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

সবকিছুর অদক্ষতা যখন ভোক্তা, উদ্যোক্তা, উৎপাদকের ঘাড়ে দেয়, তখন কিন্তু ভোক্তাকল্যাণ কমে এবং উদ্যোক্তা ও উৎপাদকেরা প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং অর্থনীতিতে পৌনঃপুনিক একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এগুলো স্ট্র্যাটেজিক কমোডিটি। বাজারের সাথে সমন্বয় করে মূল্য নির্ধারণ করছে ঠিক, কিন্তু তা থেকে সরকার বড় ধরনের শুল্ক আরোপ করে আবার শুল্কও আদায় করছে। সুতরাং বাজারের সাথে সমন্বয় করলে বাজারের সাথেই করুক, সেখানে বড় ধরনের শুল্ক আদায় করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা শুল্ক আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু বাজারে যখন মূল্য বাড়ে তখন সমন্বয় প্রয়োজন যাতে সহনীয় হয়।

সংবাদ প্রকাশ: বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরে বাজার ব্যবস্থায় মনিটরিংয়ের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে আমরা জ্বালানি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ছি, নগর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ছি। নতুনভাবে আবার ভর্তুকি দেওয়া হবে, তখন কোনো কিছুর বিচ্যুতি ঘটলে আমরা নতুনভাবে মূল্যস্ফীতির মধ্যে পড়বো কি?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের যে চলমান অবস্থা, তাতে গত দুই বছরে মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিটে আছে। এখন টার্গেট করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে সাড়ে ছয় শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। ইকোনোমির ভাষায় বেস ইফেক্ট বলে টার্ম রয়েছে। আমাদের মূল্যস্ফীতির বেসটা অনেক ওপরে উঠে গেছে। সেখানে কিছুটা মূল্যস্ফীতির হার যদি কমেও মূল্যস্তরটা কিন্তু অনেক ওপরে থেকে যাবে। সেটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। তারপরেও মূল্যস্ফীতির পথে আমাদের হাঁটতে হবে, সেটাতো অস্বীকার করা যায় না।

এখন আমাদের মূল্যস্ফীতির যে চাপ, সেটা কেবলমাত্র আমরা যদি ভোক্তা উৎপাদকের ওপর দিয়ে দেই, মূলকারণগুলো কে অবলোকন যদি না করি, তখন তা একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যাবে।

মূল্যস্ফীতি শুধু মনিটরিং ফেনোমেনা না বা বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নির্ধারণ করে দিলে মূল্যস্ফীতি কমবে তা কিন্তু নয়। সেটার একটা প্রভাব আছে, পুরোটা নয়।

একদিকে আমাদের এখানে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে, আমাদের এখানে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির চাপ কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে অর্থনীতিতে থেকেই যাচ্ছে। এটা অজুহাত দেখিয়ে নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আমদানি স্তর থেকে বা উৎপাদক স্তরের মাঝে যে মধ্যসত্ত্বভোগীরা আছে, তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সমন্বয় করতে হবে।

বাজারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে বাজারকে সুসংহত করতে হবে, যেটি এক বাজেটের ব্যাপার না। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা, বাজার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, আমাদের প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলো কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ প্রকাশ: রাজস্ব আদায় নিয়ে জানতে চাচ্ছি।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: করের আওতা বাড়াতে হবে অবশ্যই, কর ফাঁকির জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি, যদি ডিজিটালাইজেশন করা যায়, মানুষে মানুষের ইন্টারফেস কমানো যায়, তাহলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। আমাদের রেভিনিউ জিডিপি রেশিও বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন, যা ৮ শতাংশের কাছাকাছি। পাবলিক যে

রাজস্ব দেয় তার জিডিপি'র অনুপাত রেভিনিউর অনুপাত থেকে বেশি, সেটি সবারই জানা। কারণ পাবলিক যেটা দেয় তার পুরোটা সরকারের কাছে যায় না। তাই ডিজিটালাইজেশন এবং ইন্টারফেস কমিয়ে যদি এনবিআরের সাথে যারা তথ্য সংগ্রহ করছে তাদের ইন্টার অপারেবল সিস্টেম করা যায় তাহলে কর ফাঁকি কমিয়ে আনতে পারি। ভারতের আধার কার্ড একটা উদাহরণ হতে পারে। টেকনোলিজক্যালে ইনোভেশনকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়াতে পারি। আমাদের আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য এবং বিভিন্ন বৈষম্যের একটা বড় কারণ আমরা প্রত্যক্ষ কর সঠিকভাবে আদায় করতে পারছি না। আমরা আশা করবো এবারের বাজেটে এনবিআরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ থাকবে এসব টেকনোলোজিক্যাল ইনোভেশনে কাজে লাগানোর জন্য।

সংবাদ প্রকাশ: বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জটি আসলে কোথায়?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটের বাস্তবায়ন সামগ্রিক অর্থনীতির কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। আমরা যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিই, তার পুরোটা বাস্তবায়ন করতে পারি না। প্রথমে ডাউনওয়াইড রিভাইস করি, সেটারও পুরোটা বাস্তবায়ন করতে পারি না। এর ফলে বাজেটে নেওয়া প্রকল্প প্রলম্বিত হয়, খরচ বাড়ে, যে রিটার্ন আসার কথা তা আসে না।

এবার যেহেতু নতুন সরকার প্রথম বাজেট দিচ্ছেন, সেখানে নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে। সম্পদ আহরণ, সম্পদ বণ্টন বিতরণে এক বছরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায় না, সেটি আমরা বুঝি; কিন্তু বাস্তবায়নের দিক থেকে এর উৎকর্ষতা বিধান, শূন্য সহিষ্ণুতা, কোনো কিছুর ব্যত্যয় হলে আইনের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশক যদি দিতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি বাজেট বাস্তবায়নও ভালো হবে এবং এর প্রাপ্ত ফলাফলও দেশের অর্থনীতিতে কাজে লাগবে।

তবে আবারো বলছি, বাজেট অর্থনীতির একটি অংশ। আমরা যদি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা আবার আনতে চাই, তাহলে বাস্তবায়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীল অর্থনীতি, নিম্ন মূল্যস্ফীতির দেশ পাবো।

সংবাদ প্রকাশ: আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সংবাদ প্রকাশ
৪ জুন ২০২৪

ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত যেন অবহেলিত না থাকে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

চলতি বছরের বাজেট একটি ব্যতিক্রমী সময়ের মধ্যে হচ্ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি চাপের পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না ফেরায় বিভিন্ন ধরনের চাপ রয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেট প্রণীত হতে যাচ্ছে এমন একটি সময়ে যেখানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই হবে মূল উদ্দেশ্য। এখানে প্রবৃদ্ধির থেকেও মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বাজেটের প্রকৃত আকারও গতবারের তুলনায় ছোট হবে বলে মনে হচ্ছে। এবারের বাজেট বেশকিছু সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে হবে। তাই এটা জনবান্ধব কতটা হবে সেটি দেখার বিষয়। আমরা আশা করবো, যেসব খাত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত যেমন- সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত এগুলোতে যাতে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকে। এসব খাতের বরাদ্দ যেন সংকোচন না হয় ববং আরো বাড়ানো হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। তবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার কিছুটা সীমাবদ্ধ এবং সীমিত রাখতে হবে। এসব বিষয় এবার মেনে নিতে হবে।

অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ছেই। এদিকে যেহেতু ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, সেহেতু এবারের বাজেটে ব্যয় সংকোচনের একটা চাপ থাকবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এই ব্যয় সংকোচনে যেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সমস্যা সৃষ্টি না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ঋণের বোঝা থেকে উত্তরণের সবচেয়ে বড় উপায় হলো রাজস্ব-জিডিপি'র হার বাড়ানো। কারণ বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি'র হার দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের চেয়ে অর্ধেক। যদি দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের সমান হতো তবে ঋণ নিতে হতো না। এখন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) পুরোটাই ঋণ নির্ভর হয়ে গেছে। তাই এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রথমত, নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহরণে অন্তত দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য রাজস্ব আহরণ, রাজস্ব ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়- এসব বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রাজস্ব আহরণে অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহরণ করতে সক্ষম হবো। ফলে ঘাটতি বাজেট কিছুটা সীমিত রাখতে পারবো। তা না হলে ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন করতে হবে অভ্যন্তরীণ ঋণ দিয়ে কিংবা বিদেশি ঋণ দিয়ে। এর বাস্তবায়ন সম্ভব হলে আগামীতে ঋণ পরিশোধের যে চাপ সেটি অনেকাংশেই কমাতে পারবো।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবায়ন সাশ্রয়ীভাবে এবং সুশাসনের সঙ্গে করতে হবে। এছাড়া সময়মতো প্রকল্প শেষ করতে হবে। কারণ এর কারণে ব্যয় বাড়ে। ফলে ঋণও বাড়ে। এসব বিষয় আমলে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত দিকের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আরও কিভাবে বাড়াতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, এক টাকা সাশ্রয় করতে পারাটা এক টাকা আয়ের সমান। তাই বাজেট বাস্তবায়নে খুব বেশি নজর দিতে হবে। বাজেটের আকার যদি ছোটও হয় সেটি যাতে প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে যেন বেশি সমস্যা তৈরি না হয়। তবে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেটি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে আমরা যদি বাস্তবায়নে সাশ্রয়ী এবং দক্ষ হতে পারি তাহলে ব্যয়গুলোকে কিছুটা হলেও সীমিত রাখতে পারবো।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যে শুল্ক সেটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারি। তবে রাজস্ব দিয়ে মূল্যস্ফীতি খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তা নয়। এর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বিত কার্যক্রমে জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনো ধরনের সমস্যা যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাজারের ওপর নিয়মিত নজরদারি বজায় রাখতে হবে।

তথ্য-উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি আমদানি কখন করতে হবে, কতটা মজুদ রাখতে হবে অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাপনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটের মাধ্যমে সেখানে কিছুটা অভিঘাত রাখতে পারবো। সেক্ষেত্রে নিত্যপণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কিছুটা ছাড় দিয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো। এর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে।

আগামী বাজেটে কর সংগ্রহের চেষ্টা থাকতে হবে। এর সঙ্গে সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। যারা এর ব্যত্যয় করবে তাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা টাইমস
৫ জুন ২০২৪

বাজেট ২০২৪–২৫ ও ঘাটতি অর্থায়ন

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সরকারি ব্যয় সীমিত রেখে, ঘাটতি অর্থায়ন কম রেখে, কম ঋণ গ্রহণ করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ছাড় দিয়ে তূলনামূলকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাজেট ঘাটতির কারণই হলো বাজেটের প্রাক্কলিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে প্রাক্কলিত রাজস্ব (চলতি) ও উন্নয়নমূলক ব্যয় (সরকারি মোট ব্যয়) বেশি, যে কারণে একটা পার্থক্য বা ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এ ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকারকে বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থায়ন অনুসন্ধান করতে হয়।

এখানে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য— সরকারি ব্যয়ের প্রথম অংশ রাজস্ব ব্যয়, বাংলাদেশে তার প্রায় সম্পূর্ণটাই রাজস্ব আয় দিয়ে মেটাতে হয় এবং সেখানে রাজস্ব বাজেটে কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না। উদ্বৃত্ত থাকলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির(এডিপি) ব্যয়ের একটি অংশ অন্তত এই উদ্ধৃত্ত দিয়ে মেটানো যেত, তাহলে ঘাটতি কম হতো।

কিন্তু যেহেতু রাজস্ব-জিডিপি'র (মোট দেশজ উৎপাদন) হার বাংলাদেশে অনেক কম, তাই ঘাটতি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

দ্বিতীয়ত জিডিপি'র আকার বৃদ্ধির ফলে শতকরা হিসাবে আমরা ঘাটতি অর্থায়নের যে পরিমাপ করি (যেমন— জিডিপি'র ৫ শতাংশের সমপরিমাণ), টাকার অঙ্কে এ পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে; তৃতীয়ত এটা যেহেতু ঘাটতি, তাই ঋণ দিয়েই অর্থায়ন করতে হবে। বাস্তবতা হলো আমাদের ঋণের পরিমাণ বাড়ছে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দু'দিক দিয়েই।

এটা ঠিক যে আর্থিক গভীরতার অভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঋণ অনেকাংশে ব্যাংকনির্ভর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দিতে পারে। কিন্তু তা চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে

আরো উসকে দেবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সাথেও সাংঘর্ষিক হবে; সুতরাং, এটা অপরিহার্য।

সরকার বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমেও এ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবতা হলো, অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশই ব্যাংক খাত থেকেই করতে হবে। এভাবে ব্যাংক খাত থেকে ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কারণ যেটা আগে বলা হলো, ঘাটতি অর্থায়নের পরিমাণ বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ কম রাজস্ব আহরণের কারণে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

ব্যাংকিং খাতে যথেষ্ট তারল্য থাকলে এবং সরকারের প্রদেয় ঋণের সুদের হার আকর্ষণীয় হলে, এখানে আপাত দৃষ্টিতে তাৎক্ষণিক সমস্যা হবার কথা নয়। সরকারও ঋণ পাবে, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের জন্য অর্থপ্রাপ্তির সমস্যা হবার কথা নয়।

কিন্তু সরকারের ঘাটতি অর্থায়ন মেটাতে ব্যাংক ঋণের নির্ভরশীলতা বাংলাদেশে বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংক ও বৈদেশিক ঋণের পরিষেবা (সুদ ও আসল পরিশোধ) রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ নিয়ে নিচ্ছে। ঘাটতি অর্থায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদাসল শোধের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অন্যদিকে চলতি ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের জন্য সরকারের কাছে কম অর্থ থাকছে। এতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আরো বেশি ঋণ নিতে হচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সরকারকে অব্যাহত রাখতে হবে, দ্বিমত নেই। ঘাটতি অর্থায়নও থাকবে, এবং ঋণ (অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং) ও বৈদেশিকের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে; প্রশ্ন হলো রাজস্ব-জিডিপি দ্রুত না বাড়ালে (বাংলাদেশে এ হার দক্ষিণ এশিয়ার গড় হারের অর্ধেকেরও কম), বিপজ্জনক ও বাধ্যতামূলক ঋণ নির্ভরতা এবং ঋণ পরিষেবার দায়ভার আগামীতে আরো বাড়তে থাকবে। এজন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস টেনে, ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কিছুটা সামাল দেয়ার চেষ্টাও করতে হবে।

সরকারের ঘাটতি অর্থায়নের ব্যাংক ঋণ নির্ভরতা ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রাপ্তিতে যাতে সমস্যার সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এক টাকা বিনিয়োগ করলে ব্যক্তিখাত করে তার চার গুণ। সুচিন্তিত, সাশ্রয়ী, সরকারি বিনিয়োগ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে প্রণোদিত করে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও শোভন কর্মসংস্থানে অবদান রাখে। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদে বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজন্য সরকারকে নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে। সরকারের ঋণ-আশ্রয়ী বিনিয়োগ যাতে সাশ্রয়ীভাবে, সুশাসনের সাথে ও দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর মূল সমস্যায় শক্তভাবে হাত দিতে হবে, অর্থাৎ রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের বড় অংশ নিজস্ব অর্থায়নে করতে সচেষ্ট হতে হবে।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের একটি অংশের জন্য সরকার ব্যাংক ঋণ নিতেই পারে, প্রশ্ন হলো পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা, সরকারের পুঞ্জীভূত ঋণ পরিষেবা বর্তমান ঋণ সক্ষমতা ও ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে প্রণোদিত করার শক্তিমত্তা কমাবে। অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে দেখতে হবে বাজেট ২০২৪–২৫ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে হচ্ছে।

এ বছর সরকারি ব্যয় সীমিত রেখে, ঘাটতি অর্থায়ন কম রেখে, কম ঋণ গ্রহণ করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ছাড় দিয়ে তূলনামূলকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পূণরুদ্ধারকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

Bdnews24.com
৬ জুন ২০২৪

বে-নজির বাজেট

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের ২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের কোনো কোনো প্রস্তাব 'বে-নজির' বা অনন্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বাজেটে ঘোষিত 'কালোটাকা সাদা করার' বিশেষ পদক্ষেপ বিবেচনা করে।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রত্যক্ষ করের ওপর আলোচনায় একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। সেটা হলো, 'প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী, দেশের প্রচলিত আইনে যা-ই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা স্থাবর সম্পত্তি, যেমন ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট ও ভূমির জন্য নির্দিষ্ট করহার এবং নগদসহ অন্যান্য পরিসম্পদের ওপর ১৫ শতাংশ কর পরিশোধ করলে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।'

এই প্রস্তাবের সুযোগভোগীদের তিনটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, বিদ্যমান করহারে বিভিন্ন ধরনের স্থাবর সম্পত্তির ওপর কার্যকর কর হবে অন্যান্য তুলনীয় করহারের চেয়ে অনেক কম। দ্বিতীয়ত, যথাসময়ে এই আয় বা সম্পত্তি ঘোষণা না করার জন্য আর্থিক দণ্ড দিতে হবে না। তৃতীয়ত, এবং বিষয়টি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-এই সম্পদ বা অর্থ যদি দুর্নীতি বা অন্য কোনো অসৎ উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে, তবে দেশের সুশাসন নিশ্চিত করায় নিয়োজিত কোনো নজরদারি প্রতিষ্ঠান এই ধারার সুযোগভোগীদের আইনের আওতায় আনতে পারবে না।

পরিহাসের বিষয় হলো, নতুন বাজেটে অন্য একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক করদাতাদের বার্ষিক আয়ে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ করহার নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সৎভাবে অর্জিত এবং ঘোষিত আয়ের ওপর আয়কর হবে অঘোষিত এবং সম্ভবত অসদুপায়ে অর্জিত আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। কর ব্যবস্থাপনায় এটা বে-নজির, যেখানে সৎ করদাতাদের নিপীড়ন করে অসৎ ব্যক্তিদের তোষণ করা হচ্ছে।

এই নৈতিক বৈপরীত্য আরও প্রকটভাবে প্রকাশ পায় যখন আমরা ক্ষমতাসীন দলের ২০২৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রাসঙ্গিক ধারা স্মরণ করি। ওই দলিলের ‘সুশাসন’-সম্পর্কিত ৩.২ অধ্যায়ের ‘চ’ অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ’। সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য ও দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান থাকবে।’ প্রশ্ন হলো, কী পরিস্থিতিতে সরকার জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে এ রকম বে-নজিরভাবে বিচ্যুত হয়?

বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রকাঠামোর অতি উচ্চপর্যায়ে অবস্থিত বা সংযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর অকল্পনীয় বিত্তবৈভব অর্জনের তথ্য উৎকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ায়। এটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে ‘কালোটাকা’ (ধূসর টাকা নয়!) ‘সাদা’ করার এই নীতি বিবর্জিত প্রস্তাবটি কোনো পরাক্রমশালী গোষ্ঠী দ্বারা প্রণোদিত।

সত্য হলো, এসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিপুল আয় বহুলাংশে ‘পবিত্র’ নয়, তাই তা প্রায়ই করের আওতায় আসে না। অনেক ক্ষেত্রে তা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। যেটুকু থাকে, তা ‘জায়েজ’ বা বৈধ করার জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বিষয়টি এসেছে। এটি আর্থিক শৃঙ্খলাবিরোধী, সামাজিকভাবে অন্যায্য, রাজনৈতিক বিবেচনা বর্জিত ও নৈতিকভাবে গর্হিত।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, এরূপ করসুবিধা ফলপ্রসূ হয় না। সে অর্থে এই নতুন প্রস্তাব একেবারে বে-নজির নয়। মনে রাখতে হবে, এরূপ অন্যায্য এবং কার্যত বেআইনি আর্থিক সুবিধা প্রদান সরকার কর্তৃক আর্থিক সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয়ভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন অঙ্গীকারের পরিপন্থী।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র এখন দেশের বিত্তশালী বা জাতীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র কিন্তু পরাক্রমশালী দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠীকে পরিপালন করছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে সার্বভৌমভাবে তার রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষমতা বে-নজিরভাবে হারিয়ে ফেলেছে, সেটাও আবার নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হলো।

যাঁরা এই বাজেট প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন, হয় তাঁরা জনগণের কাছে প্রদত্ত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবহিত নন, না হয় তাঁদের আনুগত্য অন্য কোথাও আবদ্ধ।

প্রথম আলো
৭ জুন ২০২৪

স্বস্তি–অস্বস্তির বাজেট

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় একটি সংযমী বাজেট দেওয়াটা ছিল অবধারিত। তাই প্রশমিত প্রবৃদ্ধির মাত্রা, সীমিত বিনিয়োগ, পরিমিত কর আরোপ এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রত্যাশিত।

তবে বর্তমান সমস্যাসংকুল ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কোনো আস্থাবর্ধক ও সুগ্রথিত কৌশল লক্ষ্য করা যায়নি। প্রচলিত বাজেট প্রস্তাবনায় যেন আটকে রইল স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল। মনে হয়, নীতিনির্ধারকরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছেন, কিন্তু পুরোটা উপলব্ধিতে নেননি। এটা একদিকে যেমন স্বস্তির, অন্যদিকে অস্বস্তির।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একদিকে বলা হচ্ছে, সংকোচনমূলক পদক্ষেপের কথা। সেক্ষেত্রে আগামী অর্থবছরে ব্যক্তি খাতের ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির হার কমে ৯ শতাংশ হবে এবং সরকার তার বাজেট ঘাটতির প্রায় ৫৫ শতাংশ মেটাবে ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আগামী বছর ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দেশজ আয়ের ২৭ শতাংশের ওপর, যা এ বছরের অর্জিত মাত্রার চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের অর্থায়নের এই হিসাব মেলানো কঠিন।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আগামী বছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশই থাকবে, রেমিট্যান্স আয়ের বৃদ্ধি হারের পতন হবে প্রায় ৩ শতাংশ। বৈদেশিক খাতের চলতি হিসাব কোনোক্রমে ইতিবাচক হবে না। অথচ এই রূপ সীমিত মাত্রার কার্যক্রমের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এই হিসাবও মেলানো কঠিন। তবে কি সরকার আগামী অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যাপক পরিমাণ বিদেশি ঋণ পাওয়া যাবে বলে মনে করছে? সেক্ষেত্রে দায়-দেনা পরিস্থিতির দক্ষ ব্যবস্থাপনা আগামী বছর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সংখ্যাসমূহের মধ্যে সাযুজ্য কম পাওয়া গেলেও সরকার কর ভিত্তি সম্প্রসারণে বেশ উচ্চকণ্ঠ হয়েছে বাজেটে। কিন্তু এই বর্ধিত করের দুই-তৃতীয়াংশ আসবে পরোক্ষ কর থেকে। আমরা জানি, পরোক্ষ কর আয় নির্বিশেষে সবার ওপর বর্তায়। করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম মাত্রা সাড়ে ৩ লাখ টাকা থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি। যদিও প্রান্তিক করের হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক সমন্বয়ের সুবিধা বাজারে পাওয়া যাবে কিনা, তা দেখার বিষয়। তবে বিনা প্রশ্নে যে কোনো ধরনের টাকা বৈধ করার অনৈতিক সুযোগ সরকারকে রাজনৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

শেষ বিচারে বরাদ্দের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তার সুষ্ঠু ব্যবহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমরা এখনও একটা ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। আয় সম্পদের দক্ষ ও জনবান্ধব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নকালে আমরা তা পাব?

সমকাল
৭ জুন ২০২৪

কেমন হলো বাজেট

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ইকবাল আহসান: আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে, চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন মুনতাহা স্টিল প্রেজেন্টস নিউজ ভিউজ টিয়েন্টি ফোর বাজেট স্পেশাল। ২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এরই মধ্যে আপনারা বিভিন্ন উৎস থেকে এই আলোচনার ডালপালা যে যে জায়গায় ছড়িয়েছে সেগুলোর কিছু কিছু খবর শুনেছেন বা দেখেছেন। মোটাদাগে বাজেটটি কেমন হলো? এই বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে সাধারণ মানুষের উপযোগী কিংবা ব্যবসা বিনিয়োগবান্ধব বাজেটের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা অর্থমন্ত্রী কতটুকু পূরণ করতে পেরেছেন? সেই বিশ্লেষণ শুনবো। গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমাদের আজকের অতিথি। স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা গেল কয়েকটা বাজেট থেকেই মোটামুটি বাজেটের পরদিন এরকম একটা সময়ে আপনাকে পাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ সেজন্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: *ধন্যবাদ।*

ইকবাল আহসান: শেষ কথাটা দিয়ে শুরু করি। মোটাদাগে বাজেট যদিন আপনি বিশ্লেষণ করেন। আমরা পত্র-পত্রিকায় আপনার তাৎক্ষণিক মন্তব্য দেখেছি। সেটার বাইরে গিয়ে যদি আমাদের মতো করে এনালাইসিসটা জানতে চাই। কেমন হলো বাজেট?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো সবাই বোঝে যে এবারের বাজেট অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক জটিল একটা পরিস্থিতিকে ধারণ করে করতে হয়েছে তো সেই দিক থেকে বাজেট সাধারণভাবে পড়লে মনে হয় যেন আগে সরকারের যেমন সমস্যাগুলো অস্বীকার করার একটা প্রবণতা আমরা দেখেছি এবার কিছুটা হলেও স্বীকার করার এবং এটার ব্যাপারে একটি সচেতনতা আসার সেটার লক্ষণ আমরা একটা প্রবণতা আমরা দেখেছি এবার কিছুটা হলেও স্বীকার করার এবং এটার ব্যাপারে একটি সচেতনতা আসার সেটার লক্ষণ আমরা দেখি বক্তৃতার ভিতরে।

ইকবাল আহসান: এইটা কি অঙ্কের মাধ্যমে নাকি বক্তৃতার মাধ্যমে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না আমি সেইটাই আপনাকে বলছি। যে বর্ণনা বা বিবৃতির ভিতরে এটা প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু বাজেটিয় কৌশল এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ এবং সেগুলোর যে পূর্বশর্ত এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সেগুলো সম্বন্ধে এটা সমানভাবে বলা যাচ্ছে না। সেহেতু আমি যেটা বলি কিছুটা চেতনা এসেছে কিন্তু উপলব্ধি আসে নাই। আর উপলব্ধি যেটুকুও এসেছে সেটা কর্মক্ষমতার ভিতর দিয়ে, আপনার অভিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে সেভাবে আমরা প্রকাশ সেভাবে পাইনি। এইটেই এক কথায় বললে পরে তাই আসে।

ইকবাল আহসান: আমরা এই পর্যন্ত যাদের কাছেই মন্তব্য জানতে চেয়েছি, যাদের সাথে কথা বলেছি...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সবাই তো খুব উৎফুল্ল হয়ে মন্তব্য দিয়েছে না?

ইকবাল আহসান: এক জায়গায় একমত সবাই যে বাজেট সরকার যেহেতু আয়তনে কম বাড়িয়েছে, তার মানে সংকটটাকে স্বীকার করে একটা সময়োপযোগী বাজেট দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। আমরা এর আগের বাজেটগুলো যত বড়ই করি না কেন দিন শেষে তো আমরা ছোটই বাস্তবায়ন করেছি। তো এবার আসলে এতটা বাহবা পাওয়ার কারণটা কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না আমি মনে করি না যে এটাতে বাহবা পাওয়ার খুব সুযোগ আছে। কারণ হলো এটা কোন মানে আমরা অর্থনীতিতে বলি, সেটা হলো যে what are the policy variables and what are the really circumstantial variables। তো যেইটা আমরা এখানে দেখি, যেটা আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে বাজেট যে আকারটা করা হয়েছে, যে পাঁচ-ছয় শতাংশ আর্থিক মূল্যে বাড়ানো হয়েছে, এর চেয়ে বাড়ানোর ক্ষমতা তো সরকারের ছিল না। এটা হলো বাস্তবনার প্রতিফলন। কারন এর পরেও যদি আপনি বাড়াতে চাইতেন, তাহলে আপনাকে অর্থায়নের যে সংস্থানটা করতে হতো সেটা খুবই কৃত্রিমভাবে আপনাকে কিছু অংক বসাতে হতো। এমনি এখনো কৃত্রিমভাবেই আছে। এবং তার ফলে হয় আপনার বাজেট ঘাটতিকে ধরে আপনি তখন। তো আপনি এখন যেটা করেছেন সেটা হলো বাজেট ঘাটতিকে ৪.৬ ধরে রেখে বাকিটাকে আপনি দাঁড় করিয়েছেন আপনার অর্থায়ন এবং তারপরে এবং আপনার প্রাক্কলনগুলো সেইটা হিসেবে। সেহেতু সেই হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এবং দেখেন সাধারণ আলোচনা করলেই দেখবেন যে আপনার পুরো যে সরকারি ব্যয় আর সরকারের যে আয়, মোট ব্যয় এবং মোট আয়, তো আপনার ঘাটতি হলে ৩৩ শতাংশ। আর আপনার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিও প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ তার মানে হলো পুরোটাই ঋণ করে আপনি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিটা করছেন।

ইকবাল আহসান: সেটা গত বছরও ছিল।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা কার্যত ছিল। কিন্তু প্রথমে দেখায়নি। এবার এখন প্রাথমিকভাবেই সংখ্যায় আসছে। সেহেতু আপনারা যে বলেন এর চেয়ে বড় করে নাই, করে নাই। এইটা ইচ্ছার ব্যাপার না। এটা বাস্তবতার কারণে করা সম্ভব হয়নি।

ইকবাল আহসান: আরেকটা ব্যাপার আপনি যদি বলেন আমাদেরকে, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আমি বছর ব্যবধানে মাত্র দু হাজার কোটি টাকা বাড়িয়েছি। সেটা যদি আমি আগের প্রজেকশন এবং এবারের প্রজেকশন কমপেয়ার করি। বাজেট তার মানে যতটা বাড়ানো হলো সবগুলোই আমার অনুন্নয়ন খাতের পেছনে গেল। সেটা আমার সুদ পরিশোধে আছে, বেতন ভাতা আছে। তার মানে কি আমি যে কৃচ্ছতা সাধনের নীতির মধ্যে ছিলাম, এই ব্যয় বাড়ানোর মাধ্যমে কি সেটা প্রমাণিত হলো কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কৃচ্ছতা সাধনের নীতির তো কোনো কার্যকর প্রকাশ দেখি নাই। কারণ ধরুন কৃচ্ছতা সাধনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ভিতরে সরকার থেকে আমিও বলেছিলাম এবং সরকারও এটা করেছিল। সেটা হলো যে আপনি এটার ভিতরে পরিবীক্ষন করে, শত শত বছর যাবত যে সমস্ত প্রকল্প চলছে, আপনি ২ টাকা - ৫ টাকা দিয়ে এগুলোকে বাড়িয়ে রাখেন, আমি বলি এটা সুইটহার্ট প্রজেক্টস। সেগুলোকে আপনি ফেলে দেন। দিয়ে গ প্রকৃতির, এটা ক খ গ, গ প্রকৃতির যেগুলো, ফেলে দেন। এগুলো ২০-৩০ বছর ধরে চলছে। দশ লাখ পাঁচ লাখ দিয়ে আপনি ছুঁয়ে রাখেন। চালু রাখেন। মানে জীবন নেই। এটা হলো আপনার ভেন্টিলেটরে রাখার মতো। দ্বিতীয়ত হলো যেগুলো এখন না করলেই না, মানে ক প্রজেক্ট। আর ইন বিটউইন হলো কিছুকে দেরীতে, অল্প দিয়ে, এইটা হলো খ। দেখেন আপনি, এটা তো সরকার করেছিল। আপনি কি বাজেট বক্তৃতায় দেখেছেন এইটার মূল্যায়ন? যে আমরা দেখেছিলাম দুই হাজার প্রকল্পের ভিতরে ৫০০টা ক, ৬০০টা গ এবং বাদবাকিগুলো খ তে আমরা রেখেছি। মানে আপনি যেই নীতি করেন, নিজে মুখে যেটা বলেন, সেটার কোন প্রয়োগ করে, সেগুলোর তথ্য দিয়ে তো আপনি আমার সামনে দেন না। এইটাই সমস্যা। কারণ হলো সরকার যখন কোনো আর্থিক প্রাক্কলন করে, বাজার তাকে কিভাবে দেখে? বাজার কি তাকে মনে করে ও কথার কথা বলেছে? নাকি বাজার এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়ে, সে তার ব্যাংকের সুদ কত হবে, বিনিময় হার কত হবে, বিনিয়োগ করবে কি করবে না এই সিদ্ধান্তগুলো নেয় কি না? দুঃখের কথা হলো যে, সরকার রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বা বিভিন্ন কর সিদ্ধান্ত করছে এইটা বাজারের উপরে খুব প্রতিক্রিয়া ফেলছে বলে মনে হয় না। এইটাই দুঃশ্চিন্তার বিষয়।

ইকবাল আহসান: তাহলে ভালো দিকটা কী বাজেটের?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওই বছর শেষে আরেকটা অনুষ্ঠানটা হয়েছে। একটা নিয়ম রক্ষা হয়েছে। এইটাও তো একটা বড় জিনিস। এ ও তো না হতে পারতো। বাজেট না হলেই

বা কী হতো? আপনি শুধু চিন্তা করেন একটা দেশের অবস্থা। যদি বাজেট না হতো তাতে কী হতো? সেইটা তো আপনার অর্থবিলটুকু শুধু উত্থাপন করে ওটাকে অনুমতি দিয়ে দিলে, খরচের অনুমতি পেলে সরকার রাষ্ট্রখরচ করে বের হয়ে চলে গেল। কিন্তু তার আগে এই যে ব্যাখ্যা করে আপনার সামনে বললো যে এই বিনিয়োগ, এইটা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হয়েছে। তারপরে ওইটা বলে আপনার কালো টাকা সাদা করার জন্য ১৫ টাকায় চোর ও বাটপারদের টাকা সহজ করে দিলো। দেখেন এটা তো আপনার জন্য উপকার হলো। এইটাও তো উপকার একটা। কারণ একটা দলিল পেয়েছেন। দলিলের ভিতরে উনি উনার যৌক্তিক কথাগুলো তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক সরকারের। এইটাও একটা বড় জিনিস। কারণ এইটা না বললেও আপনি কি কিছু করতে পারতেন? আপনার তো কিছু করার ছিল না। দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা না দিলে আপনার কী হতো?

ইকবাল আহসান: অর্থমন্ত্রী আজকে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এটা রীতি মেনেই তিনি করেন প্রতি বছরই। আমরা একটা দুইটা পয়েন্ট আমরা তার কাছ থেকে শুনে আসি যে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন কোন বিষয়ে কী বলেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কারণে বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আমাদের এই যে সংযত আচরণ আরো কিছুদিন থাকবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি বরঞ্চ। আপনারা কি প্রশ্নগুলো আগে দিয়ে দিয়েছিলেন? মন্ত্রী মহোদয় কেমন করে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন? আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করি।

ইকবাল আহসান: সেটা উনার স্টাইল হতে পারে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি। হয় আপনি প্রশ্নগুলো আগে দিয়ে দিয়েছিলেন, আপনারা সাংবাদিকরা, যে এগুলো হতে পারে। অথবা উনি আন্দাজ করেছেন যে এইরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে এবং সেইটার জন্য উনি লিখিত প্রস্তুতি নিয়ে এসছেন। এইটা অভিনব ব্যাপার। আমি এর আগে বাংলাদেশের অন্তত চার-পাঁচজন মন্ত্রীর সাথে খুবই ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছি। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দেন এইটা একটা অভিনব ব্যাপার।

ইকবাল আহসান: না। এইটা হয়তো উনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে এইটুকু বলা দরকার বলে উনি মনে করেছেন। কিন্তু উনার যে বিষয়টা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান এই কারণে আরো কিছুদিন উনি কনট্রাকশনারি পলিসির মধ্যে দিয়ে যাবেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তো কনট্রাকশনারি পলিসি দেখি নাই। আমি এইটাই তো আপনাকে বলতে চাচ্ছি। আমি তো সেই অর্থে সংকোচনমূলক পদক্ষেপ দেখি নাই। সংকোচনমূলক পদক্ষেপ হলে তো যেইটুকু আপনি বাজেটকে তারপরেও বাড়িয়েছেন সেটা আপনার হতো না।

আপনার যে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে আপনি তাহলে একধরনের শৃঙ্খলা আনতেন, ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। আপনি সুদের হারের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছেন সেইটাতে আপনি ব্যাংক সংস্কারের সাথে এইটা দিতেন। শুধু সুদের হার করতেন না। ব্যাংক সংস্কারের বিষয়টা এটার সাথে যুক্ত হতো। এটার সাথে যেই সাপ্লাই সাইডের কথা তো বলেছেন উনি, সেই সাপ্লাই সাইডের সবচেয়ে বড় হলো দেশের ভিতরে আপনি আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী যেসমস্ত ক্ষেত্রে রেয়াতগুলো ছিল তুলে দিচ্ছেন। সেগুলোকে আপনি কারটা তুলছেন, কারটা রাখছেন, ওটা স্বচ্ছভাবে বলতেন। আপনি কি বলতে পারবেন কারটা উঠেছে আর কারটা আছে? সেটা কি বক্তৃতার ভিতরে বা অন্য কোথাও আপনি শুনতে পারছেন? মানে আমি তো দেখতে চাই যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বিশেষ করে গ্রামীণ জাতীয় অর্থনীতির ভিতরে অবদান রাখে তাদেরটা যেন থাকে। এবং যে সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা নিয়ে অনেকদিন ধরে আছে, তাদেরটা উঠে যায়। সেগুলো তো আমরা দেখলাম না। ওইযে উনি বললেন, অর্থমন্ত্রী মহোদয় বললেন, সঠিকভাবে বললেন যে ওএমএস বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা বাড়ানোর কথা চিন্তা করছি। তো ওইটার জন্য আর্থিক বরাদ্দ কোথায়? ওইটার জন্য তো বরাদ্দ লাগবে। তো ওই বরাদ্দটা তো আমি চোখের সামনে দেখছি না। সেহেতু, এই যে বললাম না, বাজার কী ইঙ্গিত পায়? কথা তো কথা না। রাষ্ট্র যখন কথা বলে তখন শক্তিমত্তা নিয়ে কথা বলে। শক্তিমত্তাটা হলো সেই যে সে কর আহরণ করতে পারে, সে খরচ করার ক্ষমতা রাখে, সে নতুন আইন করতে পারে। তো ওই জায়গাগুলোই যদি না থাকে তাহলে এইটার কার্যকারিতা থাকে না। এইটাই আমি সাহস পাচ্ছি না।

ইকবাল আহসান: উনি তারপরেও সাহসী একটা লক্ষ্যমাত্রা তো ধরেছেন। মূল্যস্ফীতিকে উনি সাড়ে ছয়ে নিয়ে আসবেন এবং সমান তালে তিনি প্রবৃদ্ধিও পৌনে সাত শতাংশে নিয়ে যাবেন। আপনি বলেছিলেন যে এইটা প্রবৃদ্ধির বাজেট না। তারপরেও সেইটার একটা টার্গেট উনি সেট করেছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নে তো রসগোল্লাও খেতে পারি। তাই না? আপনার সাথে এক বছর পর আমি আলাপ করবো প্রবৃদ্ধির ধারা কী হয়েছে এবং আপনার মূল্যস্ফীতি কী হয়েছে। এই যে এত উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং এত নিম্ন মূল্যস্ফীতি, অর্থনীতির কোনো পাঠ্যপুস্তকে এটা মিলাতে পারবে না। সেহেতু আমি বাস্তব জীবনে কীভাবে মিলাবো? আপনি ভালো করে বাজেট না, আপনাকে পরামর্শ দিবো আপনি মধ্যমেয়াদী বাজেট যেটা আছে, তিন বছর মেয়াদি আপনি সেটা দেখেন। ওখানে কী আছে আপনি জানেন? ওখানে বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে, গত বছর ছিল তেইশ শতাংশ, এবার হবে সাতাশ শতাংশ। পাগল?

ইকবাল আহসান: সব মিলিয়ে চৌত্রিশ শতাংশ সেট করেছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা কি লিখে দিলেই হলো? এবং তারপরে আপনি নিচে লিখছেন কী? ব্যক্তিখাতে আপনার ঋণ সঞ্চালন বাড়বে হলো দশ শতাংশ। আর আপনার রেমিটেন্স করবে তিন শতাংশ। কোত্থেকে? শোনেন, যেইটা হচ্ছে আরকী সেটা হলো পেশাদারিত্বভাবে একটা

জিনিসকে দেখা এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় এইটার প্রতি নীতিনিষ্ঠ থাকা। দুটোই দরকার করে। রাজনৈতিক চেতনা, কারণ মূল্যবোধ লাগবে। এখানে আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছে। আর অপরদিকে হলো পেশাদারিত্বের সাথে একটা কাঠামো, একটা জিনিস তৈরি হবে। দুঃখের বিষয় যে বাজেট তৈরির প্রস্তুতি এবং এইটার ভিতরে সেই পেশাদারিত্ব আমরা যারা পেশাদারী অর্থনীতিবিদ, এপ্লাইড পলিসি নিয়ে কাজ করি, তারা কেউই দেখছে বলে আমি দেখি নাই।

ইকবাল আহসান: আচ্ছা কী হতে পারতো আসলে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আরে! কী হতে পারতো মানে? আপনার যে সমস্ত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে আপনার তিনটে জিনিস করার ছিল। তিনটে। আমি বলছি। এক নম্বর ছিল আপনার এখানে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে। স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আপনার সুদের হার, বিনিময় হার এবং আপনার শুল্ক ইত্যাদিকে সমন্বয় করে আপনাকে এইটার একটা বাজারভিত্তিকে যাওয়াটা খুবই প্রয়োজন। এই জায়গাটা আমরা আইএমএফের সাথে একমত। দ্বিতীয়ত আপনার দরকার ছিল একটা সুরক্ষা দরকার ছিল। অর্থাৎ সেইটা ওইযে ওএমএস বলছেন বা আপনি সুরক্ষার জন্য আমরা বিভিন্ন গরীব মানুষকে যে ভাতা দেই ইত্যাদির কথা আছে। মধ্যবিত্তকে আপনি সুরক্ষা দেয়ার জন্য আপনার করযোগ্য আয়ের সীমা কিছুটা বাড়াতে পারতেন। ইত্যাদি করে আপনি ওইটার জন্য কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা স্বচ্ছভাবে করতেন। এটা হলো দুইরকম। স্থিতিশীলতা আর সুরক্ষা। আর তিন নম্বর হলো বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির, এই যে বলছে যে বিশ্ব পরিস্থিতি। অভিজ্ঞতা বলে, এইটা তো সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। দেখেন করোনা যখন আক্রমণ হয়েছিল, যাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন রোগ-শোক ছিল তারা বেশি আক্রান্ত হয়েছে না? তারা মারা গেছে বেশি না? তো আপনি যদি সংস্কার না করেন, তাহলে এই সমস্ত বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক চাপ আপনার উপরে বেশি চাপ হিসেবে আসবে। সেহেতু সংস্কারটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি ব্যাংক সংস্কার করবেন না, আপনি ভর্তুকী দিবেন তার আশি শতাংশ দিবেন ক্যাপাসিটি চার্জ, পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট আপনি স্থাপন করে বসে আছেন ব্যবহার করতে পারেন না বারো হাজার। এইটার আরো আরেকটা দ্বিতীয় রূপপুর বানাবো। তো এইগুলো তো কোনো কাজের কথা হলো না। আপনি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করবেন না। স্থানীয়ভাবে অর্থ যোগাড় করার আমরা চেষ্টা করবো না। আমার গরীব মানুষগুলো, প্রবাসীরা যেতে পারলো না এইযে মালয়েশিয়াতে, সেইটার কোনো সঠিক ব্যবস্থা করবেন না। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার খরচ সর্বোচ্চ এখন। নেপালের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তো এই সংস্কারগুলো করবেন না। তো আপনি স্থিতিশীলতা দিবেন, সুরক্ষা দিবেন, সংস্কার করবেন। আমি তো একটাও দেখিনি।

ইকবাল আহসান: সংস্কারের বিষয়ে আপনি ব্যাংকের কথা বলছিলেন। উনারা যে লাস্ট একটা দুইটা লাইন "মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে সুইস ব্যাংকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অর্থ বা সম্পদ উদ্ধারের কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার আইন কাঠামো ও কৌশলগত প্রক্রিয়ার গাইডলাইন অনুমোদিত হয়েছে"। তো আছেই তো কথা উনার বাজেট বক্তৃতায়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো? কী হলো তাতে?

ইকবাল আহসান: আপনি বলছেন যে সংস্কারের উদ্যোগ নাই। আমরা তো দেখছি যে উনি বলার চেষ্টা করেছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি মনে করেন যে আইনের দিক থেকে আমাদের বাংলাদেশে ঘাটতি আছে? এইয়ে অনেকে বলে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন সংস্কার দরকার, তাদের স্বায়ত্বশাসন দেয়ার দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান শ্রীলঙ্কা থেকে আমাদের এখানে আসছিলে। উনাকে এই সংকটের পর নিয়ে আসছিলাম। উনি দু'টো বড় বড় বক্তব্য দিয়ে গেছেন। একটা দিয়েছিলেন যে শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষা নিবেন। ঋণ করে ঋণ শোধ করবেন না কোনো সময়। যেটা আমরা এখন করছি। এই মুহূর্তে আমরা ঋণ করে ঋণ শোধ করছি। এটা আরো করতে হবে। যে পরিস্থিতি সংস্কার না করলে তাই হবে। আর দ্বিতীয় একটা কথা বলেছিলেন। স্বায়ত্বশাসনটা আইনের ব্যাপার না। এইটা মনোভঙ্গীর ব্যাপার। যে মানুষরা চেয়ারে বসে সে নিজেকে কতখানি স্বাধীন মনে করে, সে স্বাধীনভাবে আচরণ করে কি না সেইটার ব্যাপার। সেহেতু আপনি এই সমস্ত আইনের কথা বলছেন, আর ঐ আইন যাদের উপর প্রয়োগ করবেন তাদের পনেরো শতাংশ কর দিয়ে আপনি বিনা প্রশ্নে তাদের ইনডেমনিটি দিয়ে ব্যবস্থা করে দিবেন। কোন দেশে আপনি বসবাস করেন?

ইকবাল আহসান: আমরা সেই সংক্রান্ত একটা সাউন্ড বাইট শুনে আসতে চাই, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, তিনি আজ সম্ভবত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে, কালো টাকা সাদা করার বিষয়ে একটা প্রশ্ন ছিল সেইটার ব্যাপারে কথা বলেছেন। আমরা রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের যে শটটা রয়েছে সেটা একটু শুনে আসতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বলেন।

ইকবাল আহসান: উনি কী বলার চেষ্টা করেছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি পুরো কথাটা বুঝি নাই।

ইকবাল আহসান: উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে কালো টাকা তো আসলে যারা আয় করেন তারা তো সরকারকে দেখোনোর জন্য আয় করেন না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো?

ইকবাল আহসান: ভোগ বিলাসে ব্যয় করেন বা দেশের বাইরে নিয়ে যান। তো সেইটা যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি এইজন্য এই সুযোগটা দেয়া হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো উনি তো এইটা বললেন না যে কালো টাকার উৎস বন্ধ করতে হবে। একটা সরকার, আপনি যদি বলেন যে মানুষ মেরে ফেললে পরে আমি তার বিচার করবো। আর আপনি বলছেন যে মানুষ মারাতে কোনো সুরক্ষা দিবো না। এটা কি কাজের কথা হলো কোনো? আপনি কালো টাকা শব্দটা ব্যবহার করছেন। জিনিসটা তো কালো। তো আপনি কালোকে কালো বলে জিনিসটাকে বন্ধ করেন। ইস্যুটা হচ্ছে এই জায়গাতে যে আপনি কালো স্বীকার করছেন, লোকটা খুন করেছে স্বীকার করছেন। তারপরে এইটা তো সেরকম হলো যে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন খুনীদেরকে যেরকমভাবে মাফ মুক্তি দিয়ে দেয় না? ইদানিংকালে তো আমরা সেগুলোও দেখেছি, শুনেছি। সেরকম আরকী ঘটনা। ইস্যুটা খুবই পরিষ্কার। ইস্যুটা পরিষ্কার হলো যে আপনি আমাকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝান। যে উনি নতুন আইন করেছেন। যে আইনে বিশ লক্ষ টাকার উপরে আয় থাকলে পরে এখন পঁচিশ শতাংশ না, তিরিশ শতাংশ কর দিবো। আমি সৎ, ঘোষিত করদাতা। আর ওই লোকটা চোরাচালান করে, আপনার বন্দুক এনে, গরু এনে, সোনা এনে, মানুষ পাচার করে অথবা অতি মূল্যায়ত সরকারি প্রকল্প করে টাকা জোগাড় করেছে। সেই টাকাকে সে পনেরো শতাংশে ট্যাক্স দিবে। এইটা কোনো দেশে হয়? আর আপনাকে আমি সাধারণভাবে বলি। ওইখানে যে সুরক্ষাটা দেয়া হয়েছে না? ওরকম সুরক্ষা কোনো সময় আইনের দৃষ্টিতে টেকে নাই। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের যেমন সুরক্ষা টেকে নাই। এবং পরবর্তীতে আপনার এই যে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে জ্বালানি খাতে, এইটা যেমন কোনোদিন আপনার আইনিভাবে টেকানো মুশকিল হবে কোনোদিন। কারণ এইগুলো হলো মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। এটা কোনো সময় হয় না। একটা মানুষকে হত্যা করে যেমন তার বিচার পাওয়াটা একটা নৈতিক এবং মৌলিক অধিকার সংবিধানের, ঠিক একইরকমভাবে কেউ যদি কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করে, আইন ভেঙে অর্থ করে থাকে, তাকে কোনো সরকার সুরক্ষা দিবে এইটা কোনো সরকারের কাজ হতে পারে না। আপনি সুপ্রিম কোর্টে একটা রিট পিটিশন করলে পরে, আজকে তো অনেকেই ভালো ভালো পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করে জনস্বার্থে। এইটে করলে পরেই টিকবে না বলে আমার ধারণা, যেটুকু আমি বুঝি আরকী। সেহেতু উনিও যেই কথাটা বলছেন ওটা উনি আদিষ্ট হয়ে বলছেন কি না তাও আমি ভালো করে জানিনা।

ইকবাল আহসান: এই যে উৎস বন্ধ করা, এইটার ব্যাপারে কি কোনো কোনো উদ্যোগ আমরা কখনো নিতে পেরেছি বলে আপনার মনে হয়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উৎস বন্ধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো, একদিকে তো হলো প্রয়োজনীয় আইন। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি সেটা হলো এগুলোর প্রয়োগ। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এখানে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা রাজনৈতিক অভিপ্রকাশটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেহেতু এই যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তারা আছেন, তাদের চেয়ে তো অনেক অনেক ক্ষমতাশালী বিভিন্ন গোষ্ঠী, ব্যক্তি আছে। যারা মধ্যরাত্রে আপনার ব্যাংক কিনে নিতে পারে। তো সেহেতু সেইটা যদি থাকে তাহলে তারাও কিন্তু প্রশাসনের লোকগুলো সৎ, যোগ্য হওয়ার পরেও তারা তাদের

দায়িত্বপালন করতে পারে না। এখানে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার একটা বড় বিষয় রয়ে গেছে। যে আসলে সরকারের, জনপ্রতিনিধিরা সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়ে, জনগণের পক্ষ হয়ে সংসদে কথা বলতে পারছে কি না দেখেন। এই যে দেখেন না সংসদীয় কমিটিগুলোর একটাও কি একটাও ঠিকমতো কাজ করেছে এই বাজেট প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে? অর্থবিষয়ক স্থায়ী কমিটি কখন বসেছে? কখন দেখেছে? অনুমিতি কমিটি কখন দেখেছে? কখন বসেছে? পরিকল্পনা কি এডিপি একবারও দেখার সুযোগ পেয়েছে? আমার তো সরকারকে পরিচালনা করার জন্য একটি আধুনিক রাষ্ট্রে আমার বিভিন্ন অংশ প্রকাশ আছে। সেগুলো যদি আমি কার্যকর করতে না পারি তাহলে?

ইকবাল আহসান: আপনি এর আগের একটি ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে অর্থনীতিতে ডায়বেটিস হয়েছে। আমরা এই বাজেটের মধ্যে সেই ডায়াবেটিস নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বা অন্যান্য যে উপকরণ দরকার হয়, সেটা সাপ্লাই করার ইঙ্গিত দিয়েছে কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনার সাথে এক আলোচনায় সপ্তাহ দুয়েক আগে, বাজেটের আগে বলেছিলাম যে এই অর্থনীতির ভিতরে এখন যে পরিস্থিতি তাতে মনে হয় এইটা ডায়াবেটিসের সাথে তুলনীয়। কারণ কী এমন একটা রোগ, যে রোগটাকে আপনি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করলে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যগুলো কিন্তু আক্রান্ত হতে পারে। এইজন্যেই তিনটে জিনিস আমি যে বলেছি স্থিতিশীলতা লাগতো, সুরক্ষা লাগতো, সংস্কার লাগতো। এই সংস্কারটা হলো আপনার ওইযে অন্যান্য নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে না চললে পরে খাদ্য গ্রহণ, ওষুধ সেটা ইনস্যুলিন হোক বা অন্যকিছু, তাহলে আপনার অন্যান্য অঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এইটেই প্রকারন্তরে ঘটনা। দেখুন আপনি এই পুরো আলোচনার ভিতরে বাজেট বক্তৃতাই বলেন বা কৌশল, মানে আসলে যেটা হয়েছে, বাজেট বাস্তবায়নের বা বাজেট প্রস্তুতকরণের কৌশলটাই আপনি এক জায়গাতেও বলেন নাই। অনেক পৃষ্ঠা আছে। কিন্তু আপনাকে যদি চেপে ধরে কেউ যে আসলে আমরা প্রথম আপনার উৎস বিন্দুটা কী? উৎস বিন্দুটা হলো বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এইটা আপনার উৎসবিন্দু। কারণ ওখানে যা যা বলেছেন সেইটা ধরে ধরে আপনি করছেন কি না এইটা হলো বিষয়। এবং এইটা হলো এক নম্বর। সেইটাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আপনি কী কৌশল অবলম্বন করছেন বর্তমান আর্থিক বাস্তবতায়। এইটা হলো দুইটা। এবং তৃতীয়ত যেটা হলো এইটা যে বাস্তবায়ন হবে সেইটার নিশ্চয়তার জন্য আপনি কী কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। এইতো তিনটা জিনিস। তো বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি উনারা তো বিস্মৃত হয়ে গেছেন বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছিল সুশাসনের কথা এবং সেটার ভিত্তিতে আপনার দেশের ভিতরে অজ্ঞাত উৎস থেকে আয়কে আপনি চরমভাবে, নির্দয়ভাবে দমন করবেন এই কথা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন আপনি প্রশ্ন ব্যতিরেকে পনেরো শতাংশ দিয়ে এটাকে জায়েয করছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আপনি দেখেন তার ভিতর খুব পরিষ্কারভাবে আছে যে আইপিপি যেগুলো আছে ব্যক্তিখাতের, এগুলোকে পর্যায়ক্রমে রিটায়ার করা হবে। আপনি একবারও শুনেছেন যে এই এতগুলো আমরা আগামী এক বছরে রিটায়ার করায়ে দিবো? তিন বছর পরে এইগুলোকে আমরা ফেজ আউট করবো?

ইকবাল আহসান: হতে পারে আমাদের চাহিদা তো বাড়ছে তাই এখনই আমরা ওটা পারবো কি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের চাহিদা বাড়লে তো পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট আছেই। যার বারো হাজার আমরা ব্যবহার করতে পারি না কারণ সেগুলো চালানোর জন্য যেই জ্বালানি আনতে হয় সেটা আনার জন্য আমার ডলার নাই। এবং যেই ডলার দিয়ে কিনেছি আগেরগুলো সেগুলো পাঁচ বিলিয়ন ডলার আমি এখনো দিতে পারছি না। এইটেই হলো বাস্তবতা। তিন নম্বর- আপনার ওখানে যুব সমাজ সম্বন্ধে বলা আছে, তাদের কর্মসংস্থান সম্বন্ধে কী কী করবেন। আপনি একবারও শুনেছেন এই বক্তৃতার ভিতরে যে এই যে সমস্যা চলছে, এই সমস্যার ভিতর আমি যুব সমাজকে এই ধরনের সুরক্ষা দিবো। বা যুব সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য এইবার নতুনভাবে আমি এইটা চিন্তা করলাম। আমরা বলেছিলাম যুব ক্রেডিট কার্ড চালু করেন। সারাজীবনে তাকে দুই লাখ কি তিন লাখ কি পাঁচ লাখ টাকা দেন। সে ওই টাকা দিয়ে পড়াশোনা করুক অথবা বিনিয়োগ করুক। মনে করুন এটা বিনিয়োগ। বিভিন্ন দেশে এরকম সুরক্ষা কর্মসূচি যুবকদের জন্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে যদি আমরা ভাতা দিতে না পারি, এইটা করতে পারি। তো আপনি ওইগুলো তো কিছু করলেন না। ওইযে দেখুন আমি আপনাকে সাধারণ বলি। বাংলাদেশের আওয়ামীলীগের এইবারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যেকটা এলাকাতে, স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা, মিড ডে মিলের কথা বলেছেন। আপনি শুনেছেন যে মিড ডে মিল চালু করার জন্য এতগুলো স্কুলকে এইবার নির্দিষ্ট করেছি এবং এদের পুরোটা টাকা আমরা এখান থেকে দিবো। আপনি শিক্ষা স্বাস্থ্যখাতে তো বাড়াতে পারেননি। আমি বলতে চাচ্ছি, প্রথম ব্যত্যয় উনার হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছে খুবই ভালো। আমি ওটাকে খুবই সমর্থন করি। সেগুলোকে আপনি এখানে পরিপালন করেননি। মৌখিকভাবে করেছেন। দ্বিতীয়ত, আপনি এটাকে কৌশল দিয়ে কীভাবে করবেন, এইটাও করেননি। আর শেষ যেটা বিষয়, আপনি দুই টাকা দেন কি দুইশ' টাকা দেন ওটা তো ঠিকমতো খরচ হলো কি না সেটা তো নিশ্চয়তা দিবেন। সেইটা কী কাঠামো আপনার এই মুহূর্তে আছে? আমি তো সেইটা এখনো পর্যন্ত দেখলাম না। আপনি বলেন দশ টাকা খরচ করলে দুইশ' টাকার ভিতরে, তার মানে আপনার পাঁচ শতাংশ হয়ে গেছে। ওইটা গরীব মানুষ পেল কি পেল না সেইটা তো আপনি বিচার করেন না।

ইকবাল আহসান: একটা বিষয় অত্যন্ত আলোচিত দীর্ঘদিন ধরেই। আমাদের যে অর্থায়নের প্রক্রিয়াটা বা ঘাটতি অর্থায়নের প্রক্রিয়াটা সেটা ব্যাংক ঋণ এবং বিদেশি উৎস থেকে ঋণ। সেটা নিয়ে নানারকম আলোচনা সমালোচনা আপনারা করছেন। এই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন অর্থমন্ত্রীকে করা হয়েছিল। উনি কী বলবার চেষ্টা করেছেন আমরা একটু শুনে আসতে চাই। আমাদের যে সুদের দায় সেটা সম্ভবত এক লাখ তেরো হাজার কোটির মধ্যে প্রায় নব্বই হাজার কোটি আমাদের অভ্যন্তরীণ সুদের দায়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মন্ত্রী মহোদয়ের কথার উত্তর দেই আরকী। মানে আমাদের সমস্যাটা কী হয়ে গেছে যে মাঝেমধ্যেই তো আমরা এখন বলি সাদা মানুষরা কী করে? আমরা কেন করবো

না? ইদানিংকালে তো সাদা মানুষের বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা এগুলোর কথা শুনি। এখন জিনিসটা হয়েছে এই যে বললেন উনি অন্য দেশে অন্যরাও এভাবে করে। ইস্যুটা তো এইখানে না। ইস্যুটা হলো আপনার শোধ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না। যার শোধ দেয়ার ক্ষমতা যত বেশি সে তত ঋণ করতে পারে। এইটেই হলো বিষয়। এখন কথা হলো বাংলাদেশের ঋণ করে, সরকার যে ঋণ করে সেটা কি ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীল আছে? কমছে না বাড়ছে? আমরা ত বাড়ছে দেখতে পাচ্ছি। এবং সেই ঋণটা আপনি কোথা থেকে কীভাবে করেন? দুই বিলিয়ন ডলার আপনি এই বছরে বিদেশি ঋণ শোধ করছেন।

ইকবাল আহসান: দুই দশমিক আট বিলিয়ন গেছে দশ মাসে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দশ মাসে গেছে। আগামী বছর এটা তিন বিলিয়নের উপর সাড়ে তিন বিলিয়ন হবে। রূপপুর যখন দিতে আসবেন ওটা পাঁচ বিলিয়নের উপর উঠে যাবে হয়তো। এইটাই তো ভয়টা লাগে। তো মনে হয় যেন এইগুলো কিছু না। মানে অনেক সময় আমরা পুরো জিনিসটার ভিতরে উপলব্ধি করি না। হয় আমার উপলব্ধির ঘাটতি আছে। এইযে আমি বলেছি। চেতনায় এসছে, উপলব্ধিতে আসে নাই। অথবা আমি শুধুমাত্র কথার কথা শুধু এখানে বলি। এটার কোনো সেই অর্থে মনে করেন আমার কিছু করার নাই। এইযে তারপরে যেটা বললেন আরকী যে আমরা তো পাঁচ শতাংশের নিচে রেখেছি। দেখুন আপনি, আমি সাধারণভাবে বলি। আপনি সবসময় বলেন, বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আমি ষাট শতাংশ নিবো। চল্লিশ শতাংশ নিবো অভ্যন্তরীণ। শেষে দেখা যায় আবার ষাট শতাংশ অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ যে আপনি নিবেন সীমিত তারল্য যদি থাকে, আপনি যদি এত নিয়ে যান তাহলে ঐ দশ শতাংশ যে প্রবৃদ্ধি ধরেছেন ঋণ সঞ্চালন, ব্যক্তিখাতে যারা সাতাশ শতাংশের উপরে জিডিপি'র বিনিয়োগ করবে। এগুলো কোত্থেকে আসবে টাকা? ছাপিয়ে দিবেন? একটা কথা হলো, আপনারা সাংবাদিকরা আমি বুঝি না। আমি কিবরিয়া সাহেব, শামসুর রহমান সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে। এবং আপনাকে গল্প হিসেবে আমি বলি কীভাবে ব্যাংকের খাতটা। কিবরিয়া সাহেব যখন ১৯৯৬ সালে বাজেট দিলেন, আমিও তার পরামর্শকদের ভিতর একজন ছিলাম। তো তারপরে সমালোচনা হলো যে ঘাটতি হয়েছে এবং এটাকে সরকার ঋণ নিয়েছে। আমার সাথে কিবরিয়া সাহেব একদিন সকালবেলা ফোন করলেন। দেবপ্রিয় এটা কী হচ্ছে? আমি উনাকে বললাম যে আপনি মন্ত্রী মহোদয় একটা কাজ করেন। আগামী বাজেটে এটাকে প্ল্যান করেন, প্রোগ্রামের ভিতরে অংশ করে দেন। যে আমি ধার নিবো। আগে এই ধার ছিল না। দেখেন আপনি ৯৬–৯৭ এর আগে কোনো সময় ধারের এই ব্যবস্থা ছিল না। অর্থায়নের কাঠামোর ভিতরে ব্যাংক ঋণটাকে ঢোকান। কিবরিয়া সাহেব এইটা ঢুকিয়ে ছিলেন। এবং তারপর থেকে এটা এসেছে। এইযে এইটা সবাই ন্যায় বলতেছেন এইটারও ইতিহাস আছে। তো এইটা তো এমন না যে আমরা ইতিহাস ব্যতিরেকে বাংলাদেশে এসেছি। বা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগো কখনো সরকার চালায়নি এমন তো না। আমি যেটা মনে করি হয় উপলব্ধির ঘাটতি আছে নাহলে এইটা আপনাদের উত্তর দেয়ার জন্য দেয়া।

ইকবাল আহসান: আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা ঘাটতি অর্থায়নের যে ধারাটা যেটা পাঁচ শতাংশ হোক, সাড়ে চার শতাংশ হোক, এই যে দুই-তিনটা উৎস এর বাইরে কি কোনো বেটার উৎস আছে বলে আপনার মনে হয়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইবার তো সরকার কী করছে? এইবার তো সরকারের সবচেয়ে বড় উৎস হলো ব্যাংক বহির্ভূত খাতে, এইযে ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করছে। ট্রেজারি বন্ড এইভাবে কোনোদিন বিক্রি হয়নি। ট্রেজারি বন্ডের যেই পরিমাণ এখন হয়েছে, এইটার যে সুদের হার তা আপনার অন্যান্য সুদকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে এত উচ্চ মাত্রায়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে, সরকার নিজে শোধ করতে পারছে না তখন বিপিসিকে বন্ড দিয়ে দিচ্ছে। সেই বন্ডের ভিত্তিতেই চলছে। এগুলোই তো নতুন অর্থায়ন। এইটা সেকেন্ডারি মার্কেট তৈরি হয়েছে এইটার একটা। এইটা তো বোঝা যায় যে যখন আপনার ঘাটতি হয় বাংলাদেশ সরকারের সাড়ে চার শতাংশ ঘাটতি এটা বড় ব্যাপার না। কীভাবে অর্থায়ন করে সেইটাও খুব বড় ব্যাপার না। ব্যাপারটা হলো এই অর্থায়নটা সে শোধ করতে পারে কি না। টেকসই কি না। দেখা যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে এইটা অটেকসই হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটাতে, এই সংস্কারের বিষয়ে। এই সংস্কারটা তো করলাম না। এর কারণ হলো যে সমস্ত জায়গাতে খরচ হচ্ছে ওগুলোকে সমন্বয় করা, সীমিত করার সুযোগ ছিল। এই সুযোগটা তো ব্যবহার করা হচ্ছে না। দেখুন আপনি কী করছেন। আপনার কাছে যদি টাকা ধার নেয় কেউ, আপনি প্রথমে ধার করেন, এরপর আপনি বন্দক রাখেন। এরপরে সংসারের সোনাদানা বিক্রি করেন। এই ঘটনা ঘটছে। এইযে ক'দিন পরে যখন শেয়ার বাজারে সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার ছাড়বেন, ওই হলো সংসারের সোনা গয়না বিক্রি শুরু হবে তখন। বুঝেছেন? অর্থ করার জন্য তখন এই ঘটনা। বিভিন্ন দেশেই এটা হয়। সরকার যখন আর্থিক কষ্টে পড়ে তখন প্রথমে ধার করে, তারপরে সে বন্দক রাখে বিভিন্ন জিনিস, তারপরে সে সংসারের সোনা গয়না বিক্রি করে।

ইকবাল আহসান: ড মশিউর রহমান আজকে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কোনো একটা বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেটা প্রথমে শুনে আসতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কী বিষয় এইটা?

ইকবাল আহসান: খুবই ছোট একটা মন্তব্য। আমরা যেটা জানি যে বেনজীর আহমেদ যিনি সবশেষ পুলিশের আইজি ছিলেন তার ব্যাপারে দুদক তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধান করছে। যদি তিনি আইনের বরখেলাপ করে থাকেন, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই যে আইনের বরখেলাপ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার যে ইঙ্গিত বা আকাঙ্ক্ষা, এইটা আপনাকে আশান্বিত করে কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বরখেলাপ করলে মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার আছে এবং সমান সুরক্ষা পাওয়ার দেওয়ার দায়িত্ব আছে। সেহেতু যদি সেটা হয় তাহলে তো

হবে। তো বাংলাদেশের ঘরপোড়া গরু তো শুধু মুখের কথায় আজকাল আর আস্থা আসে না, বুঝেছেন না। সেহেতু আপনি যতক্ষণ না আপনি ফলনং পরিচয়তে, আপনি ফলের মাধ্যমে পরিচয় না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। এইটুকুই দেখার বিষয়। এটা তো কারণ এইটা তো প্রথম ঘটনা না। এইটাও শেষ ঘটনা না। সেইজন্য বাংলাদেশের মানুষ অভিজ্ঞতা আছে, বাংলাদেশের মানুষ বুদ্ধিমান। যাতে আমরা সবদিকে খেয়াল রাখি। সেহেতু এই মুহূর্তে আপনাকে যারা দেখছে, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর তারা নিজেরা ভালো করে জানে। সেহেতু, আমার বলার কোনো দরকার নাই।

ইকবাল আহসান: আমি তাহলে আবারও একটু বাজেট প্রসঙ্গে আসি। একটু ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে আমরা দেখলাম যে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ এবার কমেছে। সামাজিক নিরাপত্তায় যে ইস্যুগুলো আমরা এড্রেস করার কথাবার্তা বলছিলাম দীর্ঘ সময় ধরে। যেহেতু চড়া মূল্যস্ফীতি, আলাদাভাবে কীভাবে মানুষকে সহায়তা করা যায়। সেই বিচার বিশ্লেষণগুলো করলে অর্থমন্ত্রীর হাতে কি এমন কোনো ম্যাজিক ছিল তিনি যেটা প্রয়োগ করতে পারতেন ওইসব জায়গায়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শোনেন অর্থনীতির ম্যাজিক আজকে বললাম কালকে হয়ে গেল এরকম হয় না। ইস্যুটা হলো যে আপনি এমন কোনো প্রতিষেধক নিয়েছেন কি না যেটা আপনি তথ্য এবং উপাত্ত, আবার আমি ওই ডায়াবেটিসের ওইটা। আপনার যদি খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস আমি ঠিক করতে পারি, যদি আমি এটার সাথে জীবন আচরণকে বদলাতে পারি, এবং এটার সাথে যদি আমি ওষুধ পথ্য নেই তাহলে আজ হোক কাল হোক ক্রমান্বয়ে আমি এইটার একটা জায়গাতে গিয়ে দাঁড়াবো। সেই ওষুধ পথ্য, জীবনাচরণ এবং খাদ্যাভ্যাস এগুলোকে আমরা পেলাম কি না। সেইগুলোকে আমরা পাইনি। সেইটা নিয়েই সমস্যা। দেখুন আমি আপনাকে উদাহরণ হিসেবে বলি। শিক্ষা-স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এখন যেটা হচ্ছে। শেষ করি, শেষ অংশ তো। এই যে পরিস্থিতিটা হয়েছে এই পরিস্থিতিটাতো একদিনে হয়নি। এই পরিস্থিতিটা বর্তমান সরকার দেড় দশক ধরে আছে বিভিন্ন পর্যায়ে। এবং তারা ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের যে কাঠামোটা নিয়েছে, যেই চরিত্রটা নিয়েছে এইটার ফলাফল সুফলও আছে, এইটার কিছু অসুবিধাও আছে। এই অসুবিধাগুলো এখন কিন্তু ফলাফলের উপরে আক্রমণ করছে। সুফলটা কী আছে? যে অবকাঠামো আছে পদ্মাব্রিজ থেকে আরম্ভ করে আমার ফ্লাইওভার থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য জিনিস বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমরা করেছি। এটা সুফলের দিক। কিন্তু ওটা যেভাবে করেছি এইটার সমস্যাগুলো এখন আমার এইটার কাছে আসছে। দেখুন কী হয়েছে। আপনার এক নম্বর হয়েছে গত পনেরো বছরে আপনি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বাড়াতে পারেননি। ২২–২৩ শতাংশ জিডিপি'র আটকে রয়েছে। এখন বলছেন আবার ২৭। এটা তো বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু না। তো এক নম্বর আপনার নাই। আপনি এই সময়কালে ১০ শতাংশের নিচে আপনার কর আহরণ রয়ে গেছে। আবারও বলছেন করের কথা। তথাকথিত এই চোর-বাটপারদের থেকে ১৫ শতাংশ দিয়ে আপনি নিতে চাচ্ছেন। আরেকটা বাগাড়ম্বর। তারা কেউ আপনার কথায় বিশ্বাস করে না। তারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না। আরে টাকা বিদেশে নিয়ে গেছে। ওরা তো

বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না। এই যাদের কথা আপনি বলছেন। এর আগেও এইটা হয়েছে। তিন নম্বর আপনি দেখেন, আপনি শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে কোনো টাকা দেন নাই। সামাজিক সুরক্ষা, ওইটার মধ্যে তো পেনশন স্কিমের পুরা সরকারি টাকা ঢুকায়ে রেখে আপনি বসে আছেন। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের যে হিসাব দেন তার মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের হিসাব আছে। তো এটা তো একেবারে তথ্য বিভ্রাট, নৈরাজ্য এইটার ভিতরে রয়েছে। সেহেতু শিক্ষা-স্বাস্থ্য আপনি ঠিকমতো দিলেন না ওইটার ভিতরে। আর সামাজিক সুরক্ষার জন্য আপনি যেইগুলো করার কথা সেগুলোর ক্ষেত্রেও। দেশের ভিতরে এই সময়কালে যেভাবে আপনার অসাম্য, বৈষম্য বেড়েছে এটা তো বলার মতো না। তার চেয়ে বড় জিনিস যেই মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে এই সরকারের আমলে, আমি বলি এটা হলো এই মেট্রোরেলের প্রজন্ম। যারা মেট্রোরেলে চড়ার ক্ষমতা রাখে। তাদের আপনি কী সুরক্ষা দিবেন? এইটেই তো বিষয়। এরাই তো আপনার ভোটার ছিল। এদের জন্যই তো আপনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দাঁড় করিয়েছেন। এত অদ্ভুত একটা ভালো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দলিল করেছেন। সেগুলোর সাথে তো বাস্তবতা এখন মিলছে না। এই জায়গাটাকেই আমি আপনার কাছে নিয়ে আসছি। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বর্তমান সরকার এত বছরে যেই বলিষ্ঠতা নিয়ে বের হয়ে আসার কথা ছিল সেই বলিষ্ঠতাটা দেখলাম না। এইটেই দুঃখ আরকী।

ইকবাল আহসান: আমার ছোট আরো দুইটা প্রশ্ন আছে। এনবিআরকে যে টার্গেটটা আমরা দিয়েছি, মোটামুটি একটা গাণিতিক প্রবৃদ্ধির হার ধরে তাকে আমি লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছি। যদিও এই প্রথম নয়-দশ মাসের আয়ের যেই প্রবণতা সেটা এচিভ করাটা কঠিন হবে সে বোঝাই যাচ্ছে। সংস্কারের কথাটা বলে আসছিলেন। কোন সংস্কারটা করলে আসলে প্রত্যাশিত আয়টা করতে পারতো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলে কি তিনটা জিনিস খুব বড় জিনিস এখানে। পৃথিবীর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এক নম্বর হলো এখন আপনার এইটার যান্ত্রিকীকরণ বা ডিজিটাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আপনি এইটার ভিতরে মানুষের সাথে করদাতাদের সাথে কর সংগ্রহকারীদের সম্পর্ক কমিয়ে দিতে হবে। এইটার দ্বিতীয় অংশ হলো, এনবিআরের এখন স্বেচ্ছাধীন যে সমস্ত ক্ষমতা আছে যা অনেক সময় অপব্যবহার করা হয় এবং দুর্নীতি করা হয়, এইটা দিয়ে কর দাতার কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হয় এবং যেটাতে সরকারও টাকা পায় না, কর দাতাও সেই অর্থে সুরাহা পায় না, সেইটা স্বেচ্ছাধীন কমাতে হবে। আর তৃতীয়, আমি যখন টাকা দিবো আমি যখন কর দিবো আমি নিশ্চিত হতে চাই এই টাকা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সমস্ত দেশে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে টাকা ব্যবহার হয়, দূর্নীতি হয় না, সেই সমস্ত দেশে কর আহরণ অনেক সহজ হয়। তারা প্রণোদিত হয়। আপনি এই তিনটা কাজ করেন। ডিজিটালাইজেশন করেন, স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কমিয়ে দেন এবং একই সাথে টাকার ব্যবহারকে স্বচ্ছ এবং সঠিক করেন। বাস্তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষাতে টাকা দেন। মানুষ দেখবেন অনেক বেশি প্রণোদিত হবে।

ইকবাল আহসান: আজকে সংবাদ সম্মেলনে একটা অভিনব ঘটনা ঘটেছে। অভিনবই বলবো কারণ আমি যত বার গিয়েছি বা আপনিও হয়তো দেখে থাকবেন এরকম ঘটনা ঘটেনি। সাংবাদিকরা প্রথমেই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে গিয়ে অনুরোধ করেছেন যদি গভর্নর কোনো জবাব দেন তাহলে সাংবাদিকরা বের হয়ে যাবেন। এর আগে ইআরএফের একটি অনুষ্ঠানে আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশাধিকার নিয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আপনি বলেছেন। এইটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? এইটা আসলে হওয়ার কথা ছিল কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি এইটা একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি। এইটা সবার জন্যই বিব্রতকর। এটা সাংবাদিকদের জন্য বিব্রতকর। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য বিব্রতকর। আমরা যারা এগুলোর সাথে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের জন্যও এইটা বিব্রতকর। একটি গণতান্ত্রিক সরকার যদি থাকে তাহলে সেই গণতান্ত্রিকতা প্রকাশ পায় প্রশাসনে যারা থাকেন তাদের জবাবদিহিতার ভিতর দিয়ে। যেই প্রশাসনে যেই ব্যক্তি যদি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে অস্বস্তিবোধ করেন তাহলে, এই শব্দটা আমি ব্যবহার করেছিলাম সেই দিন, আবার বলি, ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলেই আমরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধাবোধ করি। যে এই জন্যই সেই সমস্যাটা তো হয়। আমি মনে করি এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির নিরসন হবে। রাজনীতিবিদরা বুঝবেন। প্রশাসনের অনেক আচরণ অনেক সময় রাজনীতিবিদদেরই শেষ বিচারে ক্ষতি করে। দেশে রাজনীতি সমুন্নত থাকুক। গণতান্ত্রিকতা অব্যহত থাকুক। জবাবদিহিতা আমরা আরো বেশি যাতে পাই। সেই চিন্তাই আমরা করবো। এই বিব্রতকর পরিস্থিতি কেটে যাবে আশা করি।

ইকবাল আহসান: আমরা আজকের মতো এই আলোচনাটা এখানেই শেষ করতে চাই। নিশ্চয় পরবর্তী সময়ে আরো গভীর বিচার বিশ্লেষণের কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আসবো আপনার কাছে। ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য।

চ্যানেল টুয়েন্টিফোর
৭ জুন ২০২৪

নতুন অর্থমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রণব সাহা: নতুন অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট পেয়ে গেছি আমরা। বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাব, ঋণদাতা আইএমএফের নানান পরামর্শ, জিনিসপত্রের দাম কমানোর সাধারণ মানুষের দাবির মুখে যে বাজেট তার বিশ্লেষণ নিয়ে আজকের এই আয়োজন। আমি প্রণব সাহা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর এই অনুষ্ঠান নিবেদন করছেন জেডএসআরএম। অর্থনীতির চ্যালেঞ্জে নতুন অর্থমন্ত্রী। সেই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা। তবে, যে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের উপর সরকারই বলছে অর্থমন্ত্রী তা নামানোর জন্য টার্গেট ঠিক করেছেন ৬.৫। তা কি পারবেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী? বেশি খরচ প্রশাসনে আর সুদ পরিশোধে। আমরা যদি বলি যে সেটাও কি সম্ভব হবে কিনা? প্রশ্ন করাই যায়, এত বড় উন্নয়ন কর্মসূচি কি আরো কাটছাট করা যেত না? আমরা সেটা শুনবো। আর যে প্রস্তাবে উনি বললেন তাতে কি মানুষ সন্তুষ্ট হলো? যে বাজেট প্রস্তাব উনি দিলেন? যে দাবি ছিল জিনিসপত্রের দাম কমানোর? আমরা শুনতে চাই। আমাদের সঙ্গে আছেন জেডএসআরএম নিবেদিত ‘নতুন অর্থমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ’ এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি, আওয়ামীলীগের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য। আমাদের সঙ্গে আরো আছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আপনাদের দুজনকে স্বাগতম। দর্শক আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই, তবে তার আগে কতটুকু তথ্য যেটা বাজেটে আমাদের মূল উপস্থাপন করেছেন, আমাদের এই প্রথমবারের মতোন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। আমরা দেখছি যে জাতীয় বাজেটের এবারের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখছি-

জনপ্রশাসন খাতেই ১ লাখ ৭৬ হাজার ১৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা বাজেটের ২২.১ শতাংশ। সুদ পরিশোধে খরচ হবে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা, ১৪.২ শতাংশ বাজেটের। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত ১ লাখ ১১ হাজার ৫৮০ কোটি টাকার বরাদ্দ পেয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগে আছে ৮২ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা এবং সেটি ১০ শতাংশ। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে

খরচ করবো আমরা ৪৭ হাজার ৮২০ কোটি টাকা, যা বাজেটের ৬ শতাংশ। আমাদের কাছে আরো আছে। কৃষি খাতে ৪৭ হাজার ২৩ কোটি টাকা। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ৪৩ হাজার ৩৮ কোটি। প্রতিরক্ষা খাতেও ৪২ হাজার। আমরা দেখছি সামাজিক নিরাপত্তায় যত টাকা খরচ হবে, প্রতিরক্ষা খাতেও তার কাছাকাছি টাকা খরচ করার লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ৪১ হাজার কোটি টাকা। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ৩০ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা। এবার আসি যে, যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি, ট্যাক্স বাড়ানো হলো এবং ট্যাক্সের উপরে আমাদের যে আয়করের লক্ষ্য সেইটা কতটুক হবে। রাজস্ব খাতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবার ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। বিদায়ী অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের ১৩ শতাংশ বেশি।

অর্থমন্ত্রী সকালবেলা বলেছেন যে আমি বাজেট ছোট করেছি। কোথায় ছোট করেছে সেটা জানবো আমরা কিন্তু এগুলোতে কোথাও আমরা খুব বেশি কম দেখলাম না কোথাও। এনবিআরের কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে ১৭ শতাংশের বেশি। কর আদায়ের লক্ষ্য ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা এবং পরিচালন ব্যয় ৫ লাখ ৬ হাজার ৯৭১ কোটি। যার বেশিরভাগই প্রশাসনের খরচ এবং সরকার পরিচালনার ব্যয়। তার মধ্যে হয়তো সরকারি কর্মকর্তাদের পেনশনও কিছু আছে। বিদেশি অনুদানের আশা করছেন ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা এবং বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৬.৫। যেটা আমি বলছিলাম। এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭৫।

আমি শুরু করতে চাই ড রাজ্জাক আপনাকে দিয়ে। বাজেটের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের যে নির্বাচনী ইস্তিহার ছিল আওয়ামীলীগের, তার একটা প্রতিফলন করছেন উনি। কারণ ইস্তিহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মূল্যস্ফীতি এবং দুর্নীতি কমানোসহ মোট ১১টি বিষয়। আপনি কি মনে করেন তার যথাযথ প্রতিফলন হয়েছে এবং আমরা সত্যি সত্যি এর থেকে সুফল পাব এই বাজেটে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আসলে আমাদের জন্য তো এই বাজেটটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। দেশের অর্থনীতি এখন যে পর্যায়ে রয়েছে, একটি হলো যে আমাদের রপ্তানি কম। যদিও রেমিটেন্সের ইনকাম এসেছে। ডলারের দাম আমরাও এর সাথে বাড়িয়েছি। বাড়ানোর পরে এখন ১১৭-১২০। টাকা আশা করছি যে রেমিটেন্স প্রবাস থেকে আরো বাড়বে বা আরো বেশি আসবে। এটি আর বিশ্ব ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিতটাকে নিয়ে বাজেটে বারবার বলা হয়েছে। আমি যেটা করে দেখেছি যে মধ্য-মেয়াদে গিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থাও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। যেমন, সুদের হার, এটি কমছে। ফুয়েলের দাম, আশা করছি যে, জ্বালানির দাম কমবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্য। যেমন, একটা আমি সামান্য বলি। যে আমাদের দেশে এখন সয়াবিন, তেল হিসেবেও আমরা আনি এবং প্রোটিন হিসেবে পোল্টি ফার্ম এবং পশুখাদ্য হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয় আমিষের সোর্স হিসেবে। এটার দাম আপনার ২৫/২৬/৩০ টাকা ছিল পার কেজি। এটা এখন প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টাকা, ডাবল। এটা তো থাকার কথা না। রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে, সকল কৃষি পণ্যের দামই, খাদ্যশস্য, গম, ভুট্টা, চাল,

সবকিছুর দামই বেশি। চাল এখন ৬০০—৭০০ কোটি টাকা পার টন। এই যে সব পণ্যের, খাদ্যশস্যের দাম এগুলোর সাথে সবই সম্পৃক্ত। দাম এই মুহূর্তে অতটা কমবে না এবং সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। এবং এটা সংকুচিত অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে। এই সুদের হার পশ্চিমা বিশ্বও কিন্তু, আমেরিকার মতো দেশ, একের নিচে যে সুদ ছিল সেটা এখন বাড়িয়ে প্রায় ৫ এর কাছাকাছি বা ৫ এর উপরেও কোনো কোনো ব্যাংক দিচ্ছে। তো এই পরিস্থিতিতে তারা কিন্তু এখন কমিয়ে নিয়ে আসছে সুদের এইটা। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তেই জিনিসপত্রের দাম ওইভাবে কমবে না কিন্তু আস্তে আস্তে আশা করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেগুলো সরকার নিয়েছে এবং যে সংকুচিত অর্থনীতিতে যাচ্ছে তাতে করে আমার বিশ্বাস যে আস্তে আস্তে এটা কমে আসবে।

প্রণব সাহা: মানে আপনি আশাবাদী যে ৬.৫ এ নামাতে পারবে মূল্যস্ফীতি?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: যেমন, খাদ্যশস্যে এটা ১০ এরও বেশি। প্রায় ১১ এর কাছাকাছি। খাদ্য উৎপাদনে বোরোর উৎপাদন খুব ভালো হয়েছে। চালের দাম খুব একটা বাড়বে বলে আমি মনে করি না। চালই হলো মূল খাবার। অন্যান্য শাক-সবজি, ফল-মূল এগুলোর দাম দুই বছর খুব অস্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল। আলুর দাম বেশি ছিল। আলু মানুষ একসময় ছিল বিক্রিই করতে পারতো না। পাঁচ টাকা ছয় টাকায় ব্রিক্রি হতো। এগুলো সার্বিক সমন্বিত পরিকল্পনা লাগবে। আপনার একই জমি, জমি কমছে। আর্বানাইজেশন, বাড়ি-ঘর, হোমস্টেড, মানুষ মেইন রাস্তার পাশ দিয়ে ঘর করছে, বাড়ি-ঘর করছে, দোকান-পাট করছে। চাষের জমি কমে যাচ্ছে। এই দেশে ভুট্টা, এটা কোনো ফসলই ছিল না। আমরা যখন নেই তখন ৬ লাখ টন হতো। এবার ৭০ লক্ষ টন ভুট্টা হয়েছে। তারপরও ভুট্টার দাম বেশি এবং আরো বাড়ছে। তার মানে আমাদের পোল্ট্রি ফার্ম এটা যেভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়েছে, এটা বাড়তেছে। তারপরে গরুর ডেইরি ফার্ম, অন্যান্য ফার্ম, এইগুলো হওয়াতে এই খাদ্যের দাম বাড়ছে। আপনাকে তো এই একই জমি থেকে ৭০ লক্ষ টন ভুট্টা করতে হচ্ছে। এবং ভুট্টাচাষী মনে করছে লাভজনক, সে ধান বাদ দিয়ে ভুট্টা করতে চাচ্ছে। আপনার চালকুমড়া চালে হতো, জাংলাতে হতো। সেটা এখন মানুষ মাঠে করছে। এইটা ফিল্ডক্রপ।

প্রণব সাহা: কিন্তু ধান উৎপাদনের জমি কমে ধান উৎপাদন তো আর কমে নাই। আমরা তো এই বছরই আপনার মনে হয় চাল আমদানি করতে হলো না আমাদের।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না। ধানের উৎপাদন কমে নাই কেন? জমি কমে গেছে। আগের এমন জাত ছিল, ২১ মণ—২২ মণ হতো। এখন এমন জাত, যেমন বিনা-২৫ একটা জাত নতুন উদ্ভাবন হয়েছে। সেটা প্রতি শতকে, ডেসিমালে ১ মণ করে ধান হচ্ছে। বিআর-৮৯ ও ৯২ এগুলো প্রায় এক মনের কাছাকাছি হচ্ছে। সরকার গবেষণায় অনেক দিয়েছে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য। তার ফলে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। এবং এইটা যদি খুব দ্রুত করা যায়, সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় যদি সেটি করতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে

শাকসবজি ফলমূল, বিশেষ করে মূল খাদ্য, এই খাদ্যের দামটাকে কমিয়ে আনা যাবে। তবে আমিষ জাতীয় খাদ্যের দাম এত বেশি কেন? এখনো ভুট্টা ১০ লাখ টন– ১২ লাখ টন আমদানি করতে হয়। তো এইগুলো করার কারণে আপনার এই বিভিন্ন খাদ্যের দাম অনেক বেশি।

প্রণব সাহা: আপনি আশাবাদী যে এই বাজেট বাস্তবায়ন করতে পারলে মাঝামাঝি গিয়ে মূল্যস্ফীতি কমবে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: যে পলিসিগুলো নিয়েছে, যে পলিসিগুলো করা হয়েছে, কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল। যেমন সুদের ব্যাপারটা। এখন তো মার্কেটের উপরে।

প্রণব সাহা: ছয় নয় থেকে এখন তো আমরা তেরো পার্সেন্ট চলে গেলাম।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: সেটা এখন মার্কেটের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যে মার্কেট নির্ধারণ করবে, ব্যাংক নির্ধারণ করবে। ক্লাইন্ট ও ব্যাংক ডিসাইড করবে সুদের হার কী হবে। তো এই জিনিসগুলো, আমার মনে হয় যে হেল্প করবে আমাদের।

প্রণব সাহা: ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ড রাজ্জাক যেমনটা বললেন, আপনি কি মনে করেন যে কিছুদিন মধ্যে এটা কমবে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আমি কিন্তু মধ্য সময়ের কথা বলেছি। আপনাকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এবং আমাদের অর্থমন্ত্রীও বারবার এইটা বলেছেন উনি।

প্রণব সাহা: জ্বী। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রণব, প্রথম কথা আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য। যদিও আজকে খুবই জটিল একটা দিন সেই হিসেবে। এবং আপনি ডক্টর রাজ্জাকের সাথে আমাকে দেখেছেন। রাজ্জাক ভাই আমার নেতা।

প্রণব সাহা: দুইজনে একই জেলার লোক।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের, আপনারা, দর্শকরা জানেন কি না, আপনি তো জানেন যে আমরা একই টাঙ্গাইলের মানুষ। আর দ্বিতীয় যেটা হলো যে আপনি শুরু করেছিলেন তো নির্বাচনী ইস্তিহার দিয়ে। ড. রাজ্জাক নির্বাচনী ইস্তিহার প্রস্তুতের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করেছেন এবং আমি মনে করি যে এটা, গতবারের টাও, ২০১৮ এবং এবারেরটাও খুবই সুগ্রথিত এবং সুচিন্তিত একটি দলিল হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এবং এটা একটি রাজনৈতিক প্রেরণামূলক বা দিক নির্দেশনামূলক ব্যবস্থা রাখার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করি। যে ১১টি বিষয়কে আনা হয়েছে এবং তার ভিতরে যে মূল্যস্ফীতির বিষয়টিকে এক নম্বরে

অগ্রাধিকার দিয়ে আনা হয়েছে। এইটা আমার মনে হয় বিবেচনার এবং প্রশংসার দাবি রাখে। তো এখন কথা হলো যে এইবারের বাজেট কতখানি ওই রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন করতে পারলো সেইটেই হলো বিবেচ্য বিষয়। এবং সেটা যদি প্রতিফলন করে, এইটার ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে কি না এইটে হলো দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়। এবং রাজ্জাক ভাই যেটা এনেছেন যে সেটা হলো একটা টাইম ডাইমেনশন। এইটার সাথে সময়ের একটা বিষয় আছে, আন্তর্জাতিক বিষয়। তো আমি আপনাকে যে জায়গাটায় নিয়ে আসি সেটা হলো, যদি ধরুন, মূল্যস্ফীতির কথাই ধরুন। মূল্যস্ফীতির জন্য আমরা বলছি যে এই মুহূর্তে বেশ কিছু সংস্কারের দরকার। সংস্কার, সেইটার একটা অন্যতম হলো মুদ্রানীতি এবং আপনার আর্থিক খাতের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকিং খাতের ক্ষেত্রে সুশাসন এবং সেখানে কিছু নিয়মানুবর্তিতা এবং একইসাথে নমনীয়তা। অর্থাৎ বাজার ভিত্তিক করা। কারণ যে সময় আমরা টাকা ধরে রেখেছিলাম ৮৬ টাকা ডলারে, এইটা অনুচিত ছিল সেই সময়। আমরা আমাদের রপ্তানির লবির চাপে সেই সময় আমরা সেটা করেছি। কিন্তু এখন এইটার ভিতরে। এখন যদি সুদের হার বাড়ে, যদি টাকার বিনিময়ে হারে পতন ঘটে তাহলে, একদিকে আসবে আপনার আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি কারণ আমদানিকৃত পণ্যের সাথে। আবার অন্যদিকে সুদের হার বাড়লে পরে আপনার ওইখানে বিনিয়োগ কমবে এবং তার ফলে আপনার কর্মসংস্থান কম হবে, আয় কম হবে। তাহলেই তখন চাহিদার ক্ষেত্রেও সমস্যা। দুইদিকেই সমস্যা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কী ধরনের সমাধান করা হয়? এই ধরনের ক্ষেত্রে একটা আছে আইএমএফ সম্পর্কিত সমাধান। যেটা হলো, প্রথম যেটা বললাম, এইটা সেই অংশটা। অর্থাৎ তারা সুদের হার এবং বিনিময় হার দিয়ে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এবং এটাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে যাতে চাহিদাটা কমে যায়। কিন্তু আরেক গ্রুপের অর্থনীতিবিদরা আছে, কিছুটা আমি সেইখানে আছি। সেটা হলো তারা বলে, এইটা ঠিক আছে কিন্তু এইটা যথেষ্ট না। এইটার সাথে সাথে আপনার অন্তত আরো দুটো কাজ করতে হবে। প্রথম কাজটা যেটা করতে হবে সেটা হলো, অভ্যন্তরীণ বাজারমুখি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে আপনার সমর্থন দিতে হবে এবং কৃষিকে আপনার জোরদার রাখতে হবে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য। এখন দেখেন এই মুহূর্তে, সঠিকভাবে বলেছেন রাজ্জাক ভাই, যে কৃষির অবস্থা কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো। খাদ্য নিরাপত্তার জায়গাটাতে আমরা একটু ভালো আছে। এইটা শক্তির জায়গা। কিন্তু একই সাথে আপনি যখন বিভিন্ন ধরনের কর রেয়াতকে দিচ্ছেন, তখন আপনি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে সুদের হারের ক্ষেত্রে, তার আমদানির ক্ষেত্রে, আপনি তাকে সেই সুযোগগুলো রাখছেন কিনা? এখন পর্যন্ত যেই বাজেটটি প্রস্তাবিত হয়েছে সেই স্বচ্ছতাটা সেখানে নাই। কারণ হলো আইএমএফের কথা অনুযায়ী কোনো কোনো রেয়াত আপনি তুলে দিলেন এটা আমি বলতে পারি না। মন্ত্রীরাও বলতে পারবে কি না আমার সন্দেহ আছে।

প্রণব সাহা: কিন্তু তাদের একটা বড় চাপ ছিল যে রেয়াত অব্যাহতি, কর অব্যাহতি কমাতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রেয়াত অব্যাহতি হোক। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক রেয়াত আছে যেটা খাতকে না কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া আছে, বড় বড় গ্রুপকে দেওয়া আছে। তারা

খুবই ক্ষমতাশালী এবং তারা এগুলোকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ওইতো তথাকথিত সিন্ডিকেট বলেন না, তারই অংশ তারা। এইটে হলো একটা। আর দ্বিতীয় যে কাজটা করতে হয়, সেটা হলো, যে আপনার সামাজিক সুরক্ষাকে বড় করতে হয়। এইযে আপনি অনেকগুলো তথ্য এখানে দিলেন না? আমার তো নিশপিশ করছিল আপনার তথ্যগুলোকে কিছু কিছু এটার উপরে মন্তব্য করতে। যেমন আপনি দেখালেন শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের একটা বড় অংশ। আরে ওটার ভিতরে তো রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র আছে। সেই কারণে ওটা বড় দেখা যায়। আপনি দেখালেন ওখানে সামাজিক সুরক্ষায় বিরাট কিছু একটা। বললেন প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা। ওটার ভিতরে তো আপনার সরকারের পেনশন ফান্ড আছে। এখানে তো ফাঁক আছে। আমরা এগুলো তো জানি। সেহেতু আপনার সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমান করা দরকার ছিল। দেখুন লক্ষ্যটা কোথায় এই জায়গার। সরকার সঠিকভাবে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা চিন্তা করেছে। এক কোটি করে। এই তালিকা আপনি দেখেছেন কোথাও? এই তালিকা কোথায় আছে আপনি বের করে আমাকে দেখান তো। আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। স্থানীয় এমপিদের জিজ্ঞেস করেছি আপনারা বলেন তো দেখি। না না। উনারা জানে, উনারা জানে, উনারা জানে। কিন্তু কেন? ডিজিটাল বাংলাদেশে স্বচ্ছভাবে টিপলে পরে আমি এটা কেন পাবো না? এবং ওই লোকটার নাম ওই পরিবারের লোকগুলো শুধু কি মাদবরের পরিবারের লোক হলো অন্যরা কিনা এবং সেই এখন যে ভাতা দিবেন সে ভাতার ভিতরে তারা আছে কিনা?

প্রণব সাহা: দুইরকম সুবিধা পায় কি না এক লোকই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এক্স্যাক্টলি। সেহেতু আপনার দক্ষতার একটা বড় ব্যাপার আছে। এখন এই দক্ষতাগুলোকে যদি আপনার রক্ষা করতে হয় তাহলে সেই বিচারে আপনার এক ধরনের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা লাগে। সেটা স্থানীয় সরকার বলেন, এমপি সাহেবরা বলেন এবং ইত্যাদি এবং আমলাদের উপরেও এটা আপনার নজরদারির দরকার করে। সেই জায়গাটা হলো আপনার বাজেটকে বাস্তবায়নের ব্যাপার। তো আমি যেটা আপনাকে বলে শেষ করতে চাচ্ছি। অর্থমন্ত্রী অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু কোনো একটা সুচিন্তিত, সুগ্রথিত, সুদূরপ্রসারী একটা কৌশল কিন্তু উনি কোথাও উপস্থাপন করেন নাই। এবং এটাও করেন নাই। গত বাজেটের বাস্তবায়নের পরিস্থিতিটা কী হলো? এবং যেখানে যেখানে ঘাটতি হলো সেখানে কী হলো? দেখুন আপনারা সাংবাদিকরা কী করেন? গত বাজেট কী হয়েছে একটা কথাও তো আপনিও বললেন না। আপনি তো আগামী বাজেট নিয়ে আলোচনা করছেন। অথচ এই বাজেট তো হবে ওইটার ভিত্তিতে। ওই যে আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করের যে লক্ষ্যমাত্রা দিলেন, ওটা তো গত বাজেটের ভিত্তিতে। ওর তো ৮০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয় নাই। তো তাহলে তো ওই টাকাটা কি এটার সাথে যুক্ত হবে? তাহলে তো একটা অলৌকিক অসম্ভব একটা জিনিস জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য দিবে। আর আমি শেষ কথা বলি যেটা। বলা হয় সংকোচন, আসলে অত সংকোচন হয় নাই। আপনি যদি বিনিয়োগ কমায়ে দিবেন কিন্তু প্রবৃদ্ধি আবার ৬.৭ শতাংশ হবে, কীভাবে এটা সম্ভব? আপনি দেখেন আমদানি গতবছর ছিল নেট...

ড. আব্দুর রাজ্জাক: ফিফটিন পার্সেন্ট কম হয়েছে আমদানি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: টেন পার্সেন্ট এখন শেষ প্রজেকশন যেটা, বেড়েটেড়ে এটা দাঁড়ালো।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: বাজেটে এখন পর্যন্ত দেখিয়েছে ফিফটিন পার্সেন্ট।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা নির্ভর করে কোন মাসে দেখছি। তারপরে আপনি বলছেন যে রেমিটেন্স কমবে ৩ পারসেন্ট। আমি মিডিয়াম ম্যাক্রো ইকোনোমিক ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বলছি। আপনার প্রাইভেট সেক্টরে ক্রেডিট গ্রোথ হবে ১০ পারসেন্ট। তো ১০ পারসেন্ট দিয়ে আপনি ২৭ পারসেন্ট বিনিয়োগ করবে কেমন করে জিডিপি'র অংশ হিসেবে? কোথাও তো সামঞ্জস্য নাই। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, শেষ কথা আর কি। যে কোন বাজেটের জন্য একটা নীতি নেতৃত্ব লাগে। ওই নীতি নেতৃত্ব জায়গাটা, যে সমন্বয় করে। সে এটাকে সমন্বয় সাধন করে কোথাও কোথাও ছাড় দেয়, কোথাও একে সামনে নেয়। ঐ ছাড় এবং সামনে নেয়ার জায়গাটার ক্ষেত্রে আমি অত বেশি আলোকিতভাবে দেখতে পাচ্ছি না আরকী। এইটা আমার দুঃখ।

প্রণব সাহা: সেইটাই আমার প্রশ্ন যে যেই চ্যালেঞ্জটার কথা উনি বললেন। মূল্যস্ফীতি প্রধান চ্যালেঞ্জ নির্বাচনী ইস্তিহার থেকে আমরা শুনে আসছি। তা কী করলে ৬.৫ পারসেন্ট হবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যেমন আপনাকে আমি বলতেছি যে আইএমএফের কথা অনুযায়ী আপনার একটা পার্ট। কিন্তু তারপরে আমার আরো দুটো পার্ট আছে। একটা হলো আমার উৎপাদনের চাহিদাকে, সাপ্লাই চেইনকে আমার ঠিক রাখতে হবে। এবং সেটাতে কৃষিটা হয়েছে, অন্যটাতে আমার চালু রাখতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান চালু রাখতে হবে। আর কিছু মানুষকে সুরক্ষা দিতে হবে, এটা যত বেশি সম্ভব দেয়া যায়। উনারা এবার কী করলেন? দিলেন মাত্র, যে বাড়ালেন ঠিকই কিন্তু মানুষের মাথাপিছু টাকার পরিমাণ আপনি বাড়ালেন না। ওই টাকা দিয়ে আজকালকার এই বাজারে কি কিছু হয়?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না আমি একটা বলি যে, একদম যারা গরীব, আপনার এইটা বলেছেন যে বেনিফিশিয়ারির যে লিস্টটা, তাদের লিস্ট পাওয়া যায় না।

প্রণব সাহা: ফ্যামিলি কার্ডের যেটা। এক কোটি পরিবার আমরা বলছি।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আপনি এক কোটি কার্ড বা পঞ্চাশ লক্ষ কার্ড আছে যে পাঁচ মাস আপনার ৩০ কেজি করে চাল দেয়া হয়। আগে দশ টাকা ছিল এইটা, এখন পনেরো টাকায়। পনেরো টাকা কিন্তু একটা ভালো সহযোগিতা।

প্রণব সাহা: কিন্তু দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যেটা বললেন। আপনি সংসদ সদস্য হিসেবে জানেন আপনার এলাকায় কে পায়?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: অবশ্যই আমি জানি। কেন জানবো না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওই তালিকা কেউ চাইলে দেখতে পারবে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না। কিছুটা প্রবলেম হয়েছে। এটাকে এখন অনেক উন্নত করা হয়েছে। কিভাবে করা হয়েছে? কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে এই চালটা কিন্তু খুব কম দামে এলাকায় যাচ্ছে। এমনও আমরা দেখেছি বিজিএফের আমরা চাল দিয়েছি। বিজিএফের চাল নেয় নাই। বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। এখন এই পরিস্থিতিটা নাই।

প্রণব সাহা: এমন লোককে দিয়েছেন তার দরকার নাই হয়তো।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: নো। নো। **১৮—১৯** সালে। একদম রিক্সাওয়ালা বা গরীব মানুষ। সে বলে যে আমি এই মোটা চাল খাই না। আমি নিজে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছি যে চাল বিক্রি করছো কেন। বলে যে মোটা চাল আমরা খাই না। এটা বিক্রি করে দিয়ে সে চিকন চাল খাবে। তো মোটা চাল খাবে কে? পাইকারকে জিজ্ঞেস করলাম, যে কিনছে। সে বলে এগুলো কোস্টাল এরিয়াতে, নোয়াখালী, ভোলা, এই সমস্ত এলাকার মানুষ, তারা মোটা চাল খায়।

প্রণব সাহা: তারা আরও দরিদ্র্য মানুষ, না কি?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আমাদের টাঙ্গাইলের মানুষ তারা মোটা চাল খায় না।

প্রণব সাহা: এলাকাভিত্তিক এটা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ফ্যামিলি কার্ডের এই প্রক্রিয়াটা তো ঠিক হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে যে কথাটা হচ্ছে...

ড. আব্দুর রাজ্জাক: ফ্যামিলি কার্ডের এইটার আপনার যথেষ্ট বেনিফিট আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, এইটা কোনো সন্দেহ নাই।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: এই যে বিজিএফ দিবে, ঈদের আগে। তিন হাজার-চার হাজার ফ্যামিলিকে একেকতা ইউনিয়িনে। যে চালটা দিবে, চাল খুবই ভালো, মান ভালো। এবং এইগুলো যারা নেয় গরীব মানুষই নেয়। সবাই তো আপনার আমাদের সামনে থেকে, যে লোকগুলো জমা হয়, দুই হাজার- আড়াই হাজার লোক একসাথে। বেনিফিশিয়ারির এখন ওইরকম সমস্যা আগের মতো নাই। সবার ঘরেই খাবার আছে তো, খাবার নিয়ে হাহাকার নাই।

প্রণব সাহা: তা আমাদের জিনিসপত্রের দাম কমাতে, মানুষের কষ্ট কমাতে কতটুকু সহায়তা হয়?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: উনি যেটা বলেছেন যে, সার্বিক অর্থনীতির এই সমন্বয়, যে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি, তারপরে আপনার ব্যাংকিং সেক্টরের মিস ম্যানেজমেন্ট, যেগুলো হয়েছে এগুলোকে

সব বিবেচনায় নিয়ে কিভাবে সার্বিক অর্থনীতিটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। একটা জিনিস আপনার করতে হবে, উনি আমার সাথে একমত হবেন, বলেছেনও, যে বাংলাদেশে এখন কৃষির অবদান জিডিপিতে ১২—১৩ পারসেন্ট। এটা কম। কিন্তু এখনো ৬০-৭০ ভাগ মানুষ, কোনো না কোনোভাবে কৃষির সাথে জড়িত। এবং এইজন্য কিন্তু বাংলাদেশে ডলারের দাম এত বেড়েছে, এত ডলার লন্ডারিং হয়েছে, এই দেশ থেকে চলে গেছে, তারপরও ইকোনোমিটা যে আছে সফলতা আছে, এই কৃষি কিন্তু একটা বাফার হিসেবে কাজ করছে। এইযে ৬০—৭০ ভাগ মানুষের টেনশন নাই। তার খাওয়ার টেনশনটা নাই। এখানে এই সরকারের সফলতা আছে। এখানে আইএমএফও ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে না। ওই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা যাই বলেন, ইন্টারন্যাশনাল, মাল্টিল্যাটেরাল অর্গানাইজেশনগুলো। তারা পারছে না এইজন্যই যে কৃষিতে যে আমরা ভর্তুকিটা দেই বা ইনসেনটিভটা দেই সেটা কিন্তু কমাইতে পারে নাই। সারের দাম কমাইতে পারে নাই। এই যে এখন আমরা আমনের বীজ দিবো। উন্নত জাতগুলো যেগুলো বেড়েছে, রিসেন্টলি এসছে, এবং যেটার উৎপাদনশীলতা আছে আগে বললাম। এগুলো আমরা বিনা পয়সায় চাষীদের দিয়ে দিবো। তবে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে সমস্যা হচ্ছে, যে এই যে আমদানি কম হচ্ছে, কাঁচামাল আসছে না, উৎপাদনের সমস্যা হচ্ছে। আর বিনিয়োগের সমস্যা তো রয়ে গেছেই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না আমি ফিরে আসি। যেহেতু রাজ্জাক ভাই আছেন এবং আপনি এইটা দিয়ে শুরু করেছিলেন। আমি আবার ফিরে আসি নির্বাচনী ইস্তিহারে। আমি ওটা পছন্দ করি। সেইজন্য আরো বেশি বলছি। সেইটা হলো যে দেখুন নির্বাচনী ইস্তিহারে জিনিস কি ঠিক গেছে কি না? আমি মনে করি যায় নাই অনেক জায়গাতে। নির্বাচনী ইস্তিহারের সাথে যতখনি একমত হয়, আমি এই সরকারের বাজেটিয় নীতির সাথে অতখানি আমি একমত না। এইটিই হলো পরিষ্কার। কোথায় দেখেন। এবং এইটা এই বছরের না, এটা গত কয়েক বছরের ব্যাপার। উনাদের আগের নির্বাচনের ইস্তেহারে, এইবারের নির্বাচনের ইস্তেহারে, এমনকি অষ্টম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যেটাকে আমরা ভুলে গেছি। এইটাই শেষ বছর, কারণ ওইটার লক্ষ্যমাত্রাগুলো কিছুই আমরা অর্জন করতে পারি নাই দেখে খুব সুকৌশলে ভুলে গেছি। মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার ভিতরে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। এইটার উল্লেখই নাই। কীরকম আমরা বিস্মৃত জাতি আরকি। তো আমরা উল্লেখ করায়ে দেই। দেখুন এই দুই জায়গাতেই আছে যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে কত পরিমাণে জোর দিতে হবে এবং সেখানেই আমি হিসাব করে আপনাদের দেখাতে পারবো যে বাজেটে যেই টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ইশতেহারে যে টাকার কথা বলা হয়েছিল, এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে, তার অর্ধেকও না। আর ঠিক ওপর দিকে ভৌত অবকাঠামো, পরিবহন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, সেইটার চেয়ে দেড়গুণ বেশি দেওয়া হয়েছে ওইখানে। পুরা খাতওয়ারি একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যে এই ঋণের ঝুঁকি, এই ঋণের ঝুঁকি আসলো কোথা থেকে? কারণ আপনি অনেক অবকাঠামোতে দিয়েছেন যেটা থেকে আপনার অর্থনৈতিক রিটার্ন আসার সময় আরেকটু দীর্ঘমেয়াদে হবে। ওই যে মধ্যমেয়াদে।

প্রণব সাহা: কিন্তু তাহলে তো অভিযোগ হবে যে আপনারা উন্নয়নটা পছন্দ করেন না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পৃথিবীব্যাপী দৃশ্যমান উন্নয়ন তারই লাগে যখন দৃশ্যমান গণতন্ত্র কম থাকে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: দশ বছর আগে বা পনেরো-বিশ বছর আগে সবার মুখেই একটা আলোচনা ছিল যে ইনভেস্টমেন্ট কেন হচ্ছে না। ইনফাসট্রাকচার বা অবকাঠামো নাই। অবকাঠামো কী? রাস্তা-ঘাট, বন্দর, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, এগুলো নাই বলেই আমাদের দেশে বিনিয়োগ হচ্ছে না। আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি এই সরকার যে প্রথমে এসেই ইনফ্রাসট্রাকচারটা, অবকাঠামোটা, একটা ভিত্তি তৈরি করা উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এর মধ্যেই আঘাতটা আমাদের এসেছে। করোনার মহামারি এবং আপনার এই ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ।

প্রণব সাহা: জিনিসপত্রের দাম যদি না কমানো যায়, আপনি বলছেন যে কিছুদিন সময় লাগবে। তো তার থেকেও বড় কথা হলো আমরা তো কোনো প্রজেকশান দেখছি না যে বাজেটে এমন কোনো কিছু নাই যে এইটা কমবে। অনেক কিছুর দাম বাড়বে সেরকম সম্ভবনা দেখছি।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আন্তর্জাতিক বাজারে যদি না কমে, আপনার ডলারের যে দাম, সেই হিসেবে তো ইচ্ছা করলেই কমানো যাবে না। সেই হিসেবে আমি বলছি যে আন্তর্জাতিক বাজারে ট্রেন্ডটা কমের দিকে। মধ্য সময়ে গিয়ে এটা কমবে। এবং কৃষি ক্ষেত্রে এই বছর শীতটা বেশি ছিল। যখন শীতটা কমে গেল, বেগুন হয়ে গেল আপনার দশ টাকা কেজি-পনেরো টাকা কেজি। তো এখন তো বেগুনের সিজন না। এখন আবার আস্তে আস্তে বেগুনের দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে। এই রোজার সময় কিন্তু দশ টাকা কেজি বেগুন হয়েছিল। এবং সব সবজির দাম কমে গিয়েছিল। শীতের কারণে। তো কাজেই, মূলত তো কৃষিপণ্য নিয়েই, খাদ্য মুদতাস্ফীতিটা নিয়েই বেশি কথা হচ্ছে। কিন্তু তার সাথে সাথে ধরেন, সাবান, কাপড় ধোয়ার সাবানের দাম বাড়ছে।

প্রণব সাহা: খরচ তো সব জায়গায়ই বাড়ছে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: সব জায়গায় দাম বেড়েছে। তো সেটা মানুষ সহজভাবে নিচ্ছে না।

প্রণব সাহা: তো এইরকম একটা সময়ে আমি ইনস্যুলিনের দাম কেন বাড়ানোর জন্য একটা ট্যাক্স দিলাম এই বাজেটে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: তবে মানুষের আয়টা যেটা, টাকার যে সার্কুলেশন। একজন শ্রমিক ৭০০-৮০০ টাকা করে পায়। ধান কাটার সময় বেশি পেয়েছে সেটা আমি ধরবো না। এটা

তো পনেরো দিন— এক মাসের ব্যাপার। কিন্তু নরমালি আপনি ৫০০ টাকার নিচে কোথাও কোনো শ্রমিক পাবেন না।

প্রণব সাহা: কিন্তু তা দিয়ে তো মুদ্রাস্ফীতি কমছে না গ্রামে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না। দাম বেশি কিন্তু মানুষের আয়টাও কিন্তু বেশি আছে। বাড়ছে। সেই পয়েন্টটা আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করব যে এইটাকে আপনারা কীভাবে ব্যাখ্যা করেন। আমি একটা উদাহরণ দেই। আমি গত রোজার সময় ভোলায় গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রোজার সময় ছিল, এই বছরের আগের বছর। ভোলার একদম চর এলাকা। একদম উপকূলবর্তী। পেঁয়াজ তুলছে। আমি পিঁয়াজ দেখতে গিয়েছি। মজুরি কত আপনাদের? প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন শ্রমিক কাজ করছে। বললো ৫০০ টাকা আর ৩০ টাকা হলো ইফতার দিবে, ইফতারির। বললাম এটা কেমন মনে করেন? না, ভালোই। আমরা ভোলার মানুষ মোটা চাল খাই। আমাদের ৪৩—৪৪ টাকা চাল। ৫০০ টাকায় আমরা খুশি, ভালো। আবার এসে দেখলাম মহিলারা পেঁয়াজগুলো কাটছে। গাছ গাছ তলায় বসে। তা আপনারা কত পান? ৩০০ টাকা। উনারা পায় ৫০০ টাকা, পুরুষরা।

প্রণব সাহা: নারী-পুরুষের বৈষম্য।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: বলে আমরা গাছের নিচে বসে পেঁয়াজ কাটতেসি, বাচ্চাটাও আছে, বাচ্চাটাও দেখতেসি। ৩০০ টাকা ভালোই। তার কয়দিন পরেই আমরা গেলাম নাটোর। দেখার জন্য। অ্যালোভেরার ক্ষেতে কাজ করছে। কত টাকা মজুরি? বললো সাড়ে তিনশ’ টাকা। বললাম সাড়ে তিনশ’ টাকা কেন? আমি ভোলায় দেখলাম পাঁচশ’ টাকা। বলে আমরা তো দুইটা-আড়াইটা পর্যন্ত কাজ কর। তো আর বিকেলে কী করেন? যে দুইটার পরে- আড়াইটার পরে নিজের কিছু জমি-টমি আছে, বর্গা আছে ওইগুলা চাষ করি। আর নাহলে একটু ঘুমায়ে এসে বাজারে চা-টা খাই, একটু আড্ডা দেই। এরকম। দেখেন নাটোরের মতো জায়গায় এরকম পরিস্থিতি। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মাঠ পর্যবেক্ষণ এইটা সঠিকভাবেই আছে। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে কাদের আমি কথা বলছি। আমরা বলছি অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কথা, কৃষি খাতের। এবং এইটা তো হয়তো ঢাকাতেও আপনি কোনো কোনো কাজের ভিতরে আসবে। কিন্তু প্রথম কথা হলো যে এরা হয়তো সারা বছর, ৩৬৫ দিন কাজ করে না। এটার সেহেতু আপনি গড় করলে পরে দেখবেন যে হবে না। পরিসংখ্যান ব্যুরোর যে শেষ হিসেব, মজুরির যে অনুমিতি হচ্ছে আরকী, দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ ছয় শতাংশের বেশি বাড়ে না। যেখানে আপনার ১০ শতাংশ করে আপনার মূল্যস্ফীতি রয়েছে।

প্রণব সাহা: সেটা তো সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা হলো সরকারের হিসেবে। আপনার মজুরি অতটা রেসপন্সিভ না আপনার দামের সাথে। এইটা হলো এক নম্বর। দু'নম্বর আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে, এইটা বিভিন্ন পরিবারে শেষ বিচারে যেটা দাঁড়াচ্ছে আর কি, যে মূল্যস্ফীতিটা এমন, যে এইটা তারা রাস্তায় এসে বিক্ষোভ করছে না। কিন্তু ঘরের ভিতরে তাদের খানার অর্থনীতি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। যেমন হলো, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা আসে। তিন বেলা খেতো দুবেলা করছে। তিন পদে খেত, দুই পদ করছে। শিশু খাদ্যটা রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। যেটা হচ্ছে, এরা অনেকেই এদের সঞ্চয় ভাঙছে। দেখেন ব্যাংকের ভিতরে টাকার আমানত পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তৃতীয়ত যেটা হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততাটা বাড়ছে। আমি এইটার কথা ছেড়ে দিলাম। এর ফলাফলে বাল্যবিবাহ বেড়েছে, শিশুশ্রম অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে। গড় আয়ু পতন হয়েছে, শুধু কোভিডের কারণে না। ইত্যাদি ইত্যাদি আমি এগুলো ছেড়ে দিলাম। আসল জায়গাটা কোথায়? আসল জায়গাটা হলো এই সরকারের আমলে যে মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে গত দেড় দশকে তারা কেমন আছে? উনি পর্যবেক্ষণে বললেন, আমিও পর্যবেক্ষণে বলি। একজন ডাক্তার বলছে, আগে আমি ৪০ শতাংশ করে একটা জরুরি অপারেশনের জন্য ডিসকাউন্ট দিতাম। এখন ৬০—৭০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিলেও কেউ টাকার জন্য নিয়ে আসে না। দুটো বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়াতো। এখন বলে আমি দুটোকে স্কুলে একসাথে পড়াতে পারবো না। একজনকে পড়াবো। তো আমি বললাম কী ছেলেটাকে রাখলেন, মেয়েটাকে বের করে দিলেন? বলে না না। দুটোই ছেলে, একজনকে নিয়ে আসছি। এরকম গাড়ি কিনেছে, তেল নিয়ে চালাতে পারে না। দুজনের পরিবার যদি চাকরি না করে তাহলে চলছে না। সেহেতু মধ্যবিত্ত খুব সংকটের ভিতরে আছে। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ততে চলে যাচ্ছে। এইটা কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদের দুর্বল করে দেয়। আমি এদের বলি মেট্রোরেলের জনগণ। মেট্রোরেলে চলছে কিন্তু খাদ্য ঠিকমতো হচ্ছে না। আমি যেই জায়তায় আপনাকে নিয়ে আসতে চাই, যেহেতু আমি বারবারই বাজেটের সাথে রাজনৈতিক দর্শনকে মিলাতে চাই। আমি তো বলেছি, আমি বইটাকে পছন্দ করি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন আরেক জায়গায়। উনি বলছেন বারবার বাজারের কথা। রাজ্জাক ভাই ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি বলি, এইটার সাথে, ওই যে আবার বললাম, আইএমএফের থেকে ভিন্ন যে। সেটা হলো আমরা সাপ্লাই সাইড দেখি। হেট্রোডক্স থিঙ্কিং। সেটা হলো যে কর্মসংস্থান লাগবে। যে বিনিয়োগের কথাটা আপনি বলছেন, এর ভিতরে কর্মসংস্থান দিতে হবে। এবং আগে বলছেন শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আরেকজন বলছে ৯-৬ সুদের হার। আসলে তো সবকিছু মিলেই হলো আপনার ব্যবসায় খরচটা দেখা। এখন ওই নির্বাচন ইশতেহারে যুব কর্মসংস্থানের বিশেষ কথা আছে। আপনি বলেন তো, এবার বাজেটে কী পেয়েছেন আপনি, যুব কর্মসংস্থান সম্বন্ধে। আমরা যুবকর্মসংস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি। যুবকদের যুব ক্রেডিট কার্ড দেন। সারা জীবনের জন্য তিন লক্ষ টাকা কি পাঁচ লক্ষ টাকা তাকে দিয়ে দেন। সে শিক্ষায় খরচ করুক, উদ্যোগ তৈরি করুক, বুঝেছেন?

প্রণব সাহা: সেটার জন্য তো কর্মসংস্থান ব্যাংক আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, কিন্তু আপনি ওখানে গেলেই তো দশ রকমের জামানত চাইবে। এই জামানতটা সরকার হবে। ওই যে দেখেন না, পাশের দেশে বিভিন্ন লক্ষ্মীর ভান্ডার ব্যবহার করেছে, কন্যাশ্রী স্কিম করেছে। মানে কি? আপনি টাকাটা আপনাকে দিয়েছে, যদি ফেরত পান ভালো, না পেলে পরে এইটে হলো বিনিয়োগ। এই সরকার তো অনেক কিছু করেছে এরকম। এইটাও করতে পারতো। আমি যে কোথায় যেন উদ্ভাবনী চিন্তা কম দেখি।

প্রণব সাহা: সেইটা তো আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছে। যে আমি লক্ষ্য-টার্গেটের পিছনে এত ঘুরি যে আমি কোনো উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে পারি না রাজস্ব আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো আপনি তো যেহেতু কর ব্যবস্থা তুলেছেন, তাহলে এ কথা না বলে তো ঘরে যেতে পারবো না। নির্বাচনী ইশতেহার, ৩.২, ধারাটা বলি। রাজ্জাক ভাইয়ের মনে থাকবে। 'চ' উপধারা। দুর্নীতির প্রতি জিরো টলারেন্স। এবং সেখানে বলা আছে যে জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত কোনো আয়, দুর্নীতি করে আয়, মাস্তানি করে আয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে আয়, এইগুলোর বিরুদ্ধে সর্বতভাবে আন্দোলন হবে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রণব সাহা: আপনি বললেন যেহেতু, সেহেতু উল্লেখ করতে হয়, সেইটারই কি প্রতিফলন হলো ১৫ পারসেন্ট দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটেই আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি। সেটা হলো কী করেছেন দেখেন আপনি। তিনটি জিনিস করেছেন ওখানে। আগের সরকারও যেটা করে নাই। একটাতো করেছেন আপনি যে ফ্ল্যাটটাতে যেই টাকা দেওয়া হয়, জানেন আপনার ঐতিহাসিক মূল্য এটা কার্যকর ভাবে খুবই কম, সামান্য। আমাদের হিসেবে চার শতাংশও কর হয় না। আর আপনি কী করলেন? সময়মতো ঘোষণা করলেন না বলে কোনো দণ্ডসুদও দিলেন না। আর তৃতীয় যেটা করলেন এটা তো ক্রিমিনাল। আই এম স্যরি ফর মাই ওয়ার্ড। এইটা ভায়োলেশান অফ ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইটস। আপনার কোন উৎস সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হবে না। দুদক করবে না, মানবাধিকার কমিশন করবে না, সুপ্রিম কোর্ট করবে না। এই রকম আইন হয় কোনো জায়গায়? এইটা কালকেই রিট পিটিশন করলেই বাতিল হয়ে যাবে।

প্রণব সাহা: আয়কর বিভাগও করবে না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটা কে লিখেছে? একই সাথে আপনি কী করলেন? ২০ লক্ষ টাকার উপরে যদি আপনার আয় হয়, আপনার প্রান্তিক আয়, এখন কর ৩০ শতাংশ করে দিলেন। আমি হচ্ছে সৎভাবে কর দেই ৩০ শতাংশ আর চুরি-বাটপারি করে, দৌরাত্ম্য করে বেড়ালে ১৫ শতাংশ? এইটা পুরা নির্বাচনী ইশতেহারের, জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতির ভায়োলের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি আপনাকে একটা শেষ কথা বলে নেই। এইটা কে করলো আমি

এইটা জানতে চাই? এইটে কি রাজনৈতিক নেতৃত্ব করেছে, নাকি আমলারা করেছে, নাকি দৌরাত্ম্য করে যারা, যারা দুর্নীতি করে টাকা বানিয়েছে তারা করেছে? এই সরকারের বাজেট লিখলো কে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: এইখানে দুইটা দিক আছে। একটা দিক হলো অনেক মানুষ, তারা সঠিকভাবেই আয় করেছে কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার ভয়ে তারা এই টাকা লুকায়ে রাখে। মানে প্রকাশ করে না যে কোথা থেকে এসেছে। সেটা একটা দিকে। আরেকটা হলো যে দুর্নীতি করে টাকা আয় করেছে। ধরেন একজন সরকারি কর্মকর্তা বা একজন ব্যবসায়ী অবৈধ কোন মাধ্যমে টাকা আয় করেছে। এই দুইটা দিক। একটা হলো সুযোগ দেওয়া। যারা বৈধ টাকাই কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার ভয়ে লুকিয়ে রাখছে তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া। আরেকটা হলো দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে আমাদের রেভিনিউরও প্রবলেম হচ্ছে।

প্রণব সাহা: ড. রাজ্জাক, এই সুযোগ তো ছিলই। তার কোনো সুযোগ তো পাওয়া যায়নি।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: তারপরও তো টাকা আসে নাই। বাস্তবতার নিরিখে এই সময় দেশ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বলতে পারেন যে হ্যাঁ কিছুটা ক্রিমিনাল বা অপরাধ, অনৈতিক। অনৈতিক শব্দটাই ব্যবহার করি। যে এইটা অনৈতিক। কিন্তু এই অনৈতিকও আপনাকে মেনে নিতে হচ্ছে বাস্তবতার কারণে। আমি আবারো বলছি যে আড়াইশো টাকার আপনি পটাশিয়াম কিনেছেন এক হাজার ডলারে। এই যে আপনি কিনেছেন ১২০ ডলারে আপনি তেল কিনছেন। এই যে পরিস্থিতি এটা কিন্তু আপনার মোকাবেলা করতে হবে। আমি তো ১৮–১৯ সালে আমি চিন্তা করছি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়েছে। এখন ইনভেস্টমেন্ট আসবে। ডোমেস্টিক ইনভেস্টমেন্টও তো আপনার অনেক হওয়ার সুযোগ ছিল। এবং সেই পরিস্থিতি ছিল। সেটা আজকে থমকে গেছে।

প্রণব সাহা: আজকে বাজেটে ইনভেস্টমেন্টের কোনো সম্ভাবনা দেখেন না?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: যুব সমাজের চাকরি হইতো কোথায়? ইনভেস্টমেন্ট হলে যুব সমাজের চাকরি হতো। তারপরেও আমি বলবো, আপনি গ্রামে যান। দেখেন। উনি বলেছেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। গ্রামের যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কোনো প্রাইমারি স্কুলে, গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে ছাত্র নাই। আমার নিজে, আমি যে স্কুলে পড়েছি গ্রামের স্কুলে। সামনে মাঠ ছিল। প্রাইমারি স্কুল। দুইটা আম গাছ, সেই আম গাছের নিচে বসে আমরা নামতা পড়তাম। তারপরে নদী। সেইগুলাতে মানুষ দোকান-পাট তুলেছে। সেই স্কুলে ছাত্র নাই। আমি বললাম ছাত্র কোথায় যায়? বলে যে কিন্ডারগার্টেনে পড়ে। দুইটা কিন্ডারগার্টেন চলে।

প্রণব সাহা: সেইখানে তো খরচ আরো বেশি।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: তো সেইখানে কেন পড়ে? ওখানে কারা পড়ে? রিক্সাওয়ালার ছেলেরাও পড়ে। প্রাইমারি স্কুলে যায় না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের যদি মান ভালো না হয় তাহলে কী করবে?

ড. আব্দুর রাজ্জাক: ১৬ বছর আমরা দেশ চালিয়েছি। আমরা কিন্তু অনেক রিসোর্স মোবিলাইজ করেছি টু দ্যা রুরাল এরিয়া। এটা কিন্তু এই সরকারের একটা অনেক সফলতা। এই যে মানুষকে যাদের ঘর নাই ঘর দেওয়া। আমরা ছোটকালে দেখেছি খড় দিয়ে ঘর করে, ঘরের ভিতর থেকে বৃষ্টির জল তো পড়েই আবার জোৎস্নার আলোও দেখা যায়। আবার কোনো কোনো ঘর দিয়ে পোকা পড়তো। সেই অবস্থাটা কিন্তু দেশে নাই। উনি সামাজিক সুরক্ষার কথাও বলেছেন। সেই উত্তরটাও আমি দিচ্ছি। যে সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের কতগুলো যে কর্মসূচি। এই যে ৫০ লক্ষ পরিবার, এক কোটি পরিবারকে ৫ মাস ৩০ কেজি চাল দেওয়া। এই যে মানুষকে ঘর করে দেওয়া। এত মানুষকে আমরা ঘর করে দিয়েছি। তারপরে আপনার এই বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দেওয়া, বিধবা ভাতা, এই সমস্ত। তুলনামূলকভাবে যদি আপনি আগে চিন্তা করেন যে রিসোর্সকে মবিলাইজ করার জন্য রুরাল এরিয়াতে এই সরকার অনেক কর্মসূচি নিয়েছে।

প্রণব সাহা: কিন্তু তাতে না কর্মসংস্থান বাড়লো। না মানুষের আয় বাড়লো।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: বাড়লো না কেন? আপনার কৃষির উৎপাদন বাড়লো কেমনে? ৯০ টাকার সার আপনি ২৫ টাকা করেছেন। আমি যখন কৃষিমন্ত্রী হলাম ১৯ সালে, ২৫ টাকার সার আমি ১৬ টাকা প্রস্তাব করলাম। ডিএপি সার, এইটার গুণ বেশি। সময় নাই। আমি এইটুকু বলছি। যে গুণাবলি বেশি, এইটার বেশি ব্যবহার হওয়া দরকার। তাহলে আরো কমাতে হবে। আমি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কথা বললাম। উনি বলল যে এত কমাতে পারবা? আচ্ছা সামারি দাও। আমি ১৬ টাকায় সামারি দিয়েছি, উনি সই করে দিয়েছেন। ৯০ টাকা ছিল সেই সার বিএনপির আমলে। সেই সার আমরা ১৬ টাকায় দিয়েছি। আপনি মনে করেন তার ইনপ্যাক্ট আছে না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনি বলছেন এই কথাগুলো সত্য।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: রিগার্ডলেস অফ দ্যা সাইজ অফ দ্যা ফার্ম। আমি নেত্রীকে এইটাও বলেছি যে যখন পটাশিয়ামের দাম ১২০০ টাকা, টিএসপির দাম ৮০০ টাকা আমি বললাম যে আপনি কোথা থেকে এই টাকা দিবেন? আপনি কি চুরি করবেন? আপনি কি কোনো গুপ্তধন আছে সেইখান থেকে এনে দিবেন? বললো তোমার এইটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হবে না। যেভাবে হোক, আম সারের দাম বাড়াবো না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমান সরকারের ১৫ বছরে উন্নতি হয় নাই, এটা একমাত্র অন্ধ ছাড়া এবং বেকুব ছাড়া কেউ বলবেন না। এইটা নিয়ে কেউ, এইটা তর্কের বিষয় না। কিন্তু

পৃথিবীতে যখন আমরা বসবাস করি তখন তো আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও গরীব মানুষ আছে। অর্থাৎ সমাজের ভিতরে বহুবিধ সত্যতা থাকে। আমরা এটাকে বলি মাল্টিপল রিয়ালিটি। এবং এটাকে আমরা বলি যে সমান্তরাল বাস্তবতা।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আমেরিকাতে কী রকম গরিব মানুষ কালোরা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটাও ঠিক, ওইটাও ঠিক। আপনি যদি বলেন এইটেই একমাত্র ঠিক, এইটে ঠিক না তাহলে আমার সমস্যা আছে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না। এইটা আমি বলছি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন দেখার বিষয় হলো, আমার একটাই আছে, আজকের সন্ধ্যার বিষয় ছিল সাধারণভাবে। সেটা হলো নির্বাচনী ইশতেশারের সাথে মিলিয়ে এইটা করেছে কি না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, যারা লিখেছেন তারা কি এই রাজ্জাক ভাইয়ে নেতৃত্বের কমিটির নির্বাচনী ইশতেহার এবং নেত্রী যেটাকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটাকে লঞ্চ করলেন সেটা পড়ে দেখেছে কি না।

প্রণব সাহা: অর্থমন্ত্রী তো বললেন আজকে, যে সেটার আলোকেই করা হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটা তো মুখের কথা।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: এই বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টারেই...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: লিখতে হয় উনি লিখেছেন। আদও উনি লিখেছেন কি না সেইটাও আমার প্রশ্ন বোধহয়। এটা হলো আপনার ফলং পরিচয়তে। আপনি ফল দিয়ে পরিচয় দিবেন।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আইসিটি যেমন, আইসিটি সেক্টরটা। এই যে আপনার অপরচুনিটি তো অনেক ক্রিয়েট হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এগুলো তো কেউ না করছে না, রাজ্জাক ভাই। ইস্যুটা হলো আমাদের এই প্যারালাল রিয়েলিটি, সমান্তরাল বাস্তবতার ভিতরে। এবং আমি আরেকটা সময় বলি সেটা হলো প্রতারণামূলক বাস্তবতা। আপনি এমন বাস্তবতা দেখছেন যে আপনি প্রতারিত হয়ে যান না। কারণ হলো এটার পিছনে আরো সত্য আছে। যেমন আপনি তথ্যগুলো বলছিলে, এর পিছনে অন্য সত্য আছে। তো এখন বর্তমান সরকারকে ওই আগাতে হলে যে সামাজিক ভিত্তিটাকে রক্ষা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গড়ে উঠেছিল, যেটার ভিত্তিতে আপনি যদি দেখেন পেশাজীবীরা, ক্ষুদ্র কৃষকরা, আপনার সেই অর্থে ছোট যারা ব্যবসায়ী, ইত্যাদি, এইটাই ছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ একটা শক্তি। সেই শক্তির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এনেছেন। এইটার ভিত্তিতেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে। উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তারপরে এইটার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনের ভিতর দিয়ে গেছি।

প্রণব সাহা: আপনি বলছেন যে সেই রাজনৈতিক আদর্শটা এই বাজেটে নাই?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ যেটা করছে এই বাজেটের ভিতর দিয়ে। বিশেষ করে এই ১৫ পার্সেন্ট টাকা দিয়ে এই চুরি বাটপারি কে হালাল করছে। এইটা আওয়ামী লীগের শোভা পায় না। এইটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের শোভা পায় না। এই আওয়ামী লীগ অন্য কারোর আওয়ামীলীগ হয়ে গেছে। এইটার উপরে নিয়ন্ত্রণ করে নিঃসন্দেহে এমন কিছু গোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, যেটা আমাদের, উনার এই ইচ্ছাটার অভিলাষটাকে ব্যক্ত করে দিতে পারবে না।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আমি তো বলেছি যে জিনিসটা আমরা তো গোপনে করি নাই। আগের সরকারও করেছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না। না। কোন সরকার কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ করবে, এইটা কেউ বলেনি।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: না। সেটা না। প্রশ্ন ব্যতিরেকে, এই প্রশ্ন আপনারা আগেও তুলেছেন। গত বছর এটা ছিল না। এই প্রশ্ন উঠবে এইটাই স্বাভাবিক। এটা জেনেই আমরা করেছি। আমরা এর কিছু পজিটিভ, বেনিফিট, আমরা ইতিবাচক কিছু পাবো বলে আমরা আশা করছি।

প্রণব সাহা: আপনাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আমরা সেটা আশা করি। এবং পার্লামেন্টে এটা নিয়ে আলোচনা হবে নিশ্চয়। সংসদে, আমরা যেটা চাই সংসদ সদস্যরা যেটা বললেন যে সেই রাজনীতিটা, আওয়ামীলীগের সেই রাজনীতিটা আমরা দেখতে চাই। বাজেটের সেই সমস্ত জিনিসগুলো যেন সংশোধন করে আবার আমাদের সামনে উপস্থাপন করে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আওয়ামীলীগ কখনোই মূল রাজনীতি থেকে কোনোদিনই ডেভিয়েট করে নাই।

প্রণব সাহা: পাশ করার আগে যেন এই বিষয়গুলো আলোচনা হয়।

ড. আব্দুর রাজ্জাক: আমি এক মিনিট একটু বলবো। ধর্মনিরপেক্ষতা, তারপরে এই যে সামাজিক নিরাপত্তা। এইগুলো থেকে আমরা কোনোদিন ডেভিয়েট করিনি।

প্রণব সাহা: আমরা আজকে শেষ করি। ধন্যবাদ আপনাদের দু'জনকে। ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও। আজকের মতো শেষ করছি জেডএসআরএম নিবেদিত আজকের এই বিশেষ আয়োজন।

ডিবিসি নিউজ
৭ জুন ২০২৪

বাজেট ও ধূসর টাকা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলি, আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। স্বাগত জানাচ্ছি দাদা আপনাকে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ মতি ভাই।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ আপনাকে। সমকালের শিরোনাম হচ্ছে 'ডিসেম্বরের মধ্যে কমে আসবে মূল্যস্ফীতি'; 'অবৈধ টাকা ব্যাংকে আনতে কালো টাকা সাদা সুযোগ: প্রধানমন্ত্রী'। মানবজমিন– 'আরো ছয় মাস সময় চাইলেন অর্থমন্ত্রী'; 'সৎ কর দাতারা তিরস্কৃত'। যায় যায় দিন– 'বছর শেষে কমবে মূল্যস্ফীতি'; 'বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু আজ থেকে'। আজকের পত্রিকার– 'সংকট উত্তরনে দিশা নেই বাড়বে ভোক্তার চাপ'; 'মূল্যস্ফীতি বছর শেষে কমে আসবেঃ অর্থমন্ত্রী'। দেশ রূপান্তর– প্রতিশ্রুতি আছে, পথ জানা নেই'; 'ফাঁকিতে পুরস্কার, উসুলে তিরস্কার'। সময়ের আলো– 'বাজারের গরম কতটা কমবে?'; 'মূল্যস্ফীতি কমার জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে'। মানব কণ্ঠ– 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচন নীতিতে আগ্রহ সরকারের'; বাজেটে মানুষের মৌলিক অধিকারে নজর দেয়া হয়েছে'। ইনকলাব– 'উচ্চাভিলাষী ও অবাস্তব বাজেট'; সংকোচন নীতিতে কমবে মূল স্ফীতি,। প্রতিদিনের বাংলাদেশ– মূল্যস্ফীতি ছয় মাসের মধ্যে কমার আশ্বাস'; 'বাজেটের অনেক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে নাঃ সিপিডি'। খবরের কাগজ– 'মূল্যস্ফীতি মনে আসবে ডিসেম্বরের মধ্যে'; 'অর্থনীতির ক্ষত নিরাময়ে প্রতিষেধক নেই'। করতোয়া– 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আরও অপেক্ষা'; 'উত্তরাঞ্চলে বজ্রপাতে নিহত ১০'। দৈনিক বাংলা– 'বাজেট মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করবে'; 'দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিশোধের মঞ্চ প্রস্তুত'। আলোকিত বাংলাদেশ- 'বিশ্ব পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমাদের চলতে হবে'; মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জে সরকার'। The Business Standard- 'Inflation likely to subside by December: Finance Minister. বাজেট নিয়ে যত কথা। আপনার কথা কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মতি ভাই আপনি জানেন যে প্রায় তিন দশক ধরে বাজেট নিয়ে কাজ করি। মূল্যায়নের ভিতরে এবং বিভিন্ন অর্থমন্ত্রীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, বিভিন্ন সরকারের। কাজ সেহেতু সবসময় বাজেটের সময় আসলে পরে আমার মনের ভিতর একটি আজ সকলের মতো একটা উত্তেজনা থাকে। যে এবারের বাজেটে কীভাবে চলমান পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করবে। এবং তার ফলে বাংলাদেশ আরো সামনে দিনে কিভাবে আগাবে এবং জনমানুষের জীবনযাত্রার সুরাহাগুলো কীভাবে আসবে। তো এইবার একটু অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে একটু কেমন যেন বেতাল লাগছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কারণটা হলো যে একটা হলো খুব জটিল পরিস্থিতি একটা আছে। দেশে-বিদেশ মিলিয়ে, আঞ্চলিক মিলিয়ে। শুধু অর্থনীতি না, সামাজিক না, আবহাওয়াগত ব্যাপারও আছে এটার সাথে। পরদিকে যেটা আছে সেটা হলো না যে বৈশ্বিক পরিস্থিতির ভিতরে একটা টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলোকে সবগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা দিয়ে যে ব্যবস্থাটা দরকার সেটাই কোথায় যেন আমরা একটুখানি অসুবিধা লাগছে, অস্বস্তি লাগছে। এবং আপনি গত ২৪ ঘণ্টায় যদি আপনি প্রতিক্রিয়াগুলো দেখেন, সাধারণত সরকারের এই সমস্ত বাজেট প্রতিক্রিয়ার ভিতরে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা উদ্যোক্তা গোষ্ঠীরা যেগুলোয় সমর্থন সাধারণত এসে থাকে সেগুলোও খুবই ম্রিয়মান মনে হয়েছে এবার সেই অর্থে। আর আপনারা সাংবাদিক গোষ্ঠীতো খুবই মারমুখী হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হয়েছে আজকে যেই অর্থমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে। যেরকম ভাবে তারা বয়কটের ঘোষণা দিল একটি। ইত্যাদি মিলিয়ে। এবং পরে মন্ত্রী মহোদয়ের বিভিন্ন সময় বিরক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঘটনাবলি ঘটলো। তো এই সমস্ত মিলিয়ে, সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়াটা এবং এটা বাজারের উপরে, জনগণের আস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং তার সাথে এই অবৈধ টাকাকে বৈধ করার, মানে বিশেষ করে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকাকে বৈধ করার চেষ্টা। এগুলো আরো অনেক বেশি জটিল করে ফেলেছে বলে আমার কাছে মনে হয়। সেহেতু, একটা নতুন অর্থবছরের বাজেটকে যেই ধরনের ত্বরণ, যেইরকম শক্তিমত্তা নিয়ে আসার কথা, সেটা বোধহয় গত ২৪ ঘণ্টায় এখনো আমি দেখে উঠতে পারি নাই।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কালো টাকা সাদা করার যে কথাটা আপনি বললেন, সেটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে, এটাকে যাদের হাতে টাকা আছে, মানে অবৈধ টাকা, ঐ টাকাটাকে নিয়ে আসার জন্যই এই সুযোগটা দেয়া হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার প্রধান যেটা বলেছেন, আমি এই যুক্তিটা বিভিন্ন সময় শুনি। এবং যুক্তিটার পিছনে সত্যতা কিছুটা আছে। যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলি, আপনার দর্শকরাও এইটা জানে। যে আপনি হয়তো ১০০ টাকায় একটা জমি বিক্রি করলেন কিন্তু কাগজের দলিলে আপনার হলো চল্লিশ টাকা এটা। তাহলে ৬০ টাকা তাহলে কী হলো?

আমি এই টাকাকে কিন্তু কালো টাকা বলি না। আমি এটাকে ধূসর টাকা বলি। It's not black money, it's grey money. অর্থাৎ আপনার ওটা বৈধ টাকা কিন্তু এখনো ঘোষিত হয়নি। সেহেতু অঘোষিত বৈধ টাকা আর অঘোষিত আপনি অবৈধ টাকা অর্থাৎ আপনি চোরাচালান করলেন, এমনকি মানুষের বাড়িতে খুন করে আপনি সে টাকা নিয়ে গেলেন, সেটা হলো অবৈধ টাকা। সেহেতু অবৈধভাবে উপার্জিত টাকা আর বৈধভাবে উপার্জিত টাকা যেটা অঘোষিত, সেটার মধ্যে ফারাক করতে হবে। এখন সরকার প্রধান যে জিনিসটি বলেছেন, সেটার সমাধান তো সরকারের হাতে। সেটা সরকারের হাতে কীভাবে? ঐ যেটাকে ৪০ টাকায় আপনি নিলেন, ১০০ টাকারটা। আপনি ১০০ টাকাই দাম নির্ধারণ করে দেন জমি রেজিস্টার করার সময়, নিবন্ধন করার সময়। আর আপনি করের হারটা কমিয়ে দেন। যাতে করে সে এটা লুকানোর প্রয়োজন বোধ না করে। সেটা তো আপনার হাতেই আছে। করের মাত্রা যদি আপনি কমিয়ে দেন, আর যদি মূল্যটা বাজার মূল্য রাখেন, তাহলে কিন্তু ভোক্তা বা গ্রহিতার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হওয়ার কথা না। আর দ্বিতীয়ত হলো, বিদেশ থেকে টাকা আনার জন্য এই সরকারি তো এর আগের অর্থমন্ত্রী সুযোগ দিয়েছিলেন। বিদেশে তো যারা টাকা নেয় তারা তো বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না। সেজন্য বিশ্বাস করে না দেখেই টাকাটা নিয়ে গেছে। তারা কী কারণে দেশের ভিতরে আবার সেই টাকা নিয়ে আসবে? এবং ওই টাকায় তারা অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করে। এইটে হলো দুই নম্বর। আর তিন নম্বর, যে অবৈধভাবে উপার্জন করলো, তো আপনি আমাকে বলেন, ১৫ বছর এই সরকার আছে। অবৈধভাবে উপার্জন করলো কে? যারা কর দিলো না। এটাতো আপনার জানার কথা। আপনার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জানার কথা এইটা। যারা আপনার নজরদারি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের জানার কথা। তারা যদি অবৈধভাবে উপার্জন করে থাকে, তাহলে আপনি মনে করেন, যে তারা শাস্তি পাবে আপনার এই ঘোষণার ভিতর দিয়ে এবং তারা দিবে? এবং আপনি কিভাবে দেন? আপনি চিন্তা করে দেখেন যে কী জিনিসটা দাঁড়িয়েছে। প্রকটভাবে একটা উদ্ভট জিনিস করেছে। যারা বৈধভাবে কর দেন তাদের প্রান্তিক হাত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ করেছেন। আর যারা অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করেছেন তাদের আপনি ১৫ শতাংশ বলছেন। এটা তো আইন হতে পারে না। রাষ্ট্রের চোখে সকলে যে সমান, এইভাবে কর দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে সমান হতে হবে। এবং সে যদি ওই টাকাটা কোনো অবৈধভাবে উপার্জন করে থাকে এবং একটি বড় ঘটনা তো এই মুহূর্তে সকলের কাছে আলোচিত হচ্ছে। এবং সেইটার কোনো সঠিক উত্তর কিন্তু আজকের সেই প্রেস ব্রিফিংয়ে দিতে পারেননি মন্ত্রী মহোদয়রা বা উপদেষ্টা মহোদয়। সেইখানে আপনার, কেমন করে সম্ভব আপনি বলবেন যে সেই অর্থগুলোকে ১৫ টাকা দিয়ে আমি ১০০ টাকাকে বৈধ করে দিবো? যেটা লোকটা অন্যায়ভাবে, চুরি করে, কাউকে বঞ্চিত করে, হয়তো আপনাকে খুন করে সেই টাকাটা উপার্জন করেছে। এটা তো সম্ভব না। রাষ্ট্র কোনো সময় নাগরিকদের এইভাবে বৈষম্য করতে পারে না। এই বিষয়টিকে এবং এটাতে যে সুরক্ষাটা দেওয়া হয়েছে দেখুন। সরকার প্রধান কিন্তু যেই জিনিসটা উল্লেখ করেননি, সেটা হলো, সবচেয়ে বড় যেটা। যেটা কোনোদিন হয়নি। সেটা হলো কোনো ধরনের প্রশ্ন ব্যতিরেকে নিবো। অর্থাৎ আদালতে এটা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবে না, দুদক এটা নিয়ে প্রশ্ন করবে না, মানবাধিকার কমিশন এইটা নিয়ে প্রশ্ন করবে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: দায়মুক্তি আর কী।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দায়মুক্ত। তো দায়মুক্তি তো যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এইটা ভালো না। বাংলাদেশে দায়মুক্তির থেকে আমরা, মানে ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করেছে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এর চেয়ে বড় অন্যায় তো আর কিছু ছিল না সেই সময় সাংবিধানিকভাবে। সেইটা যে অন্যায় ছিল এটা তো আমরা নিয়েছি। সেই দায়মুক্তি তো এইরকম দায়মুক্তিতো কোনো সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। এখন যেমন দায়মুক্তি আছে ক্যাপাসিটি চার্জ আপনি যাদের দিচ্ছেন, ওইটাও আইনিভাবে কোনোদিন কিন্তু আপনার বিচারের কাঠগড়ায় গেলে টিকবে না। এইটাও টিকবে না বলে আমার কাছে মনে হয়। এইটা রাজনৈতিকভাবে অবিবেচনা প্রসূত, অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর, এটা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী এবং সর্বোপরি এটি নৈতিকভাবে পরাজয়ের একটা লক্ষণ। এইটা আমার এই সরকারের কাছে আমরা প্রত্যাশা করিনি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটা শোভা পায় না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি কি এই কারণেই বাজেটকে বলেছেন বেনজীর?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজেট তো আসলেই বে-নজীর হয়েছে। অর্থাৎ এইটা একটা অনন্য ঘটনা হয়েছে। এবং আমি যেটুকু না মনে করে বলেছি, আজকের সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্ন-উত্তরের ভিতর দিয়ে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যেই সমস্ত মানুষের এই অকল্পনীয় বৈভব-বিত্ত উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাদের আপনি কীভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসবেন? এখন এই পুরো জিনিসটা তো, এই প্রশ্নটাতো সকলের সামনে এখন পরিষ্কারভাবে এসেছে। এবং বে-নজীরের নজীরহীনতার আরো নজীর যে আসবে না, এইটে কি আপনি বলতে পারেন? আরো তো নজীর আছে, সেই নজীরগুলোই যদি ঘটনাক্রমে আসে, তাদের জন্য এই আইন আপনি কিভাবে প্রয়োগ করবেন, সেটা আপনি বলেন? এবং এই সময়কালে যদি তারা তৎপরতা দিয়ে আগামী জুলাই-আগস্ট মাসে এগুলো সমাধান করে ফেলে, তাহলে তো তারা পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসবে। এইটা তো কেমন করে সম্ভব? এইটা একটা আধুনিক সমাজে সম্ভব না। আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে স্মরণ করাই মতি ভাই। বাংলাদেশ সরকার কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন চুক্তিতে সই করেছে। এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেও বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আনার ক্ষেত্রেও তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি আছে। এই আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন যে প্রতিশ্রুতি আছে বাংলাদেশের, এই রকম একটি আইন সোজাসুজি সেটার বরখেলাপ হবে বলে মনে হয়। এটা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বের চোখে উন্নতিতে নিবে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ। ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন। সিপিডি বা আপনারা বা আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যদি আসে এটা তো সুখের কথা, এটা তো খুশির কথাই যদি আসে। আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নির্বাচনের প্রাক্কালে অক্টোবর বা সেপ্টেম্বর মাসে

অনেকে বলেছিলেন নির্বাচনের পরে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল হয়ে যাবে, সুদের হার কমে আসবে, আমাদের অর্থের কোন অসুবিধা হবে না, ইত্যাদি কথা বলেছিলেন না?

মতিউর রহমান চৌধুরী: হ্যাঁ। বলেছিলেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেই কথাগুলো কি আপনারা স্মরণ করেছেন এখন? যে ওই কথাগুলো যারা বলেছিলেন তারা কী বিবেচনায় কথাগুলো বলেছেন। এবং বাস্তবতা কেন ওদের সঠিক হলো না। আপনাদের এইটা মনে রাখতে হবে যে এই মূল্যস্ফীতি হওয়ার কারণ কী এবং কমার কী সম্ভবনা। দেখুন একটা মূল্যস্ফীতির বড় জায়গা হলো যে আপনার আমদানীকৃত মূল্যস্ফীতি। হয় পণ্যমূল্য বাড়ে, যেটার কথা উনারা বারবার বলছেন। কিন্তু আরেকটা মূল্যস্ফীতির বড় কারণ হলো, টাকার মূল্যমান যদি পড়ে যায় তাহলে তখন আপনার দশ টাকার জিনিস বিশ টাকা হয়ে যায়। ডলারের সাথে যদি আপনার বিনিময় হারের পতন ঘটে। তাহলে এই ছয় মাসের ভিতরে মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে সবচেয়ে বড় কাজ একটা, যেটা হলো টাকাকে স্থিতিশীল করতে হবে। টাকাকে স্থিতিশীল করতে হলে, আপনার যে রপ্তানি আয়, সেটাকে বাড়াতে হবে। আপনি মধ্যমেয়াদি যে কর্মপরিকল্পনা উনারা দিয়েছেন, রপ্তানি আয় বাড়বে হলো আট শতাংশ। যেটা গত বছরও একই রকম ছিল। তাহলে রেমিটেন্স আয় বাড়বে কী? রেমিটেন্স আয়ের যে প্রক্রিয়া দিয়েছেন, উনারা ৩ শতাংশ কমে যাবে বলে বলেছেন। এবং এটার মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও বাড়বে না। একমাত্র হলো আরো বেশি করে বিদেশ থেকে টাকা ধার করা। এইটেই হলো উনাদের একমাত্র এইটাকে স্থিতিশীল করার একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু এইটার তো ঝুঁকিটা অন্যদিকে। আপনি ছয় মাসে স্থিতিশীল করবেন কিন্তু ছয় বছরের ঝামেলাতে আপনি পড়ে যাবেন। সেহেতু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা একটা জটিল বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। আর সরকারের যে বাজেটটা হয়েছে এটা তো সেই অর্থে সংকোচনমূলকভাবে উনারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন কি না, মানে নীতিগতভাবে, এটা প্রশ্ন রয়েছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এইক্ষেত্রে আপনি কী আশঙ্কা করছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না আশঙ্কাটাতো হলো যে এখন যেইটা উনারা বলছেন সংকোচনমূলক, এইটা পরিস্থিতির কারণে। কারণ হলো আসলেই তো টাকা নাই। ডলারও নাই। সেই জন্যই সমস্যাটা। উনারা সংকোচন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু আপনি এটাকে কর্মসংস্থান চালু রাখা, প্রবৃদ্ধিকে চালু রাখা, এটার জন্য আপনার আবার যেটাকে সাপ্লাই সাইডের কথা বলা হয়, যোগানের দিকে আপনার করতে হবে। দেখুন এই যে, যেহেতু বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বাজেটের বিভিন্ন রেয়াত আপনার তুলে দেয়ার কথা হচ্ছে। আপনার সুদের হার এখানে বাড়ছে। তাহলে বাংলাদেশে আপনি কর্মসংস্থানের জন্য, বিনিয়োগের জন্য, এই সময়কালে আপনি কী দিবেন? উনার মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় আছে ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৭ শতাংশ জিডিপি'র ব্যক্তি খাদে বিনিয়োগ হবে। এ বিনিয়োগ কোথা থেকে আসবে? এই বিনিয়োগ তো, উনার তো আর্থিক কাঠামো দিয়ে এটাকে সমর্থন দিতে হবে। ব্যাংকের থেকে যে ঘাটতি

হয়েছে, ঘাটতির ৬০ শতাংশ উনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিবেন। এখন অবশ্য ট্রেজারি বন্ড আরো বড়ভাবে, আরো বেশি দামে ঋণ নিচ্ছে। সরকারের ঋণের বোঝা আরো বাড়ছে কিন্তু।

মতিউর রহমান চৌধুরী: বাড়ছে। রাইট।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেরকরম সমাধান সেইভাবে দেখি নাই। সেহেতু একটা বাজেট দিয়ে আপনি বাজারকে আস্বস্ত করবেন, বা নাগরিকদের মনে যে আপনি এক ধরনের প্রশান্তি দিবেন, বা শাসকরাও যে এক ধরনের শক্তি নিয়ে বের হবে বা আস্থা নিয়ে বের হবে, কোনোটাই আমি খুব বেশি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না। এইটা দুঃখের ব্যাপার।

মতিউর রহমান চৌধুরী: বাজেট ছাড়া এই মুহূর্তে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজেট ছাড়া এখন অর্থনীতির এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জগুলো হলো, একদিকে তো হলো যে আমার ঘাটতি যে অর্থায়নের, আমার যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পুরোটাতেই একটুও আমার রাজস্ব উদ্বৃত্ত নাই। পুরোটাই ঋণ করে। এটা আশির দশকে আমাদের এক সময় ছিল। যখন আমরা পুরোটা ঋণ করে চলতাম এবং অনেক সময় ঋণের টাকা বিলি করে আমরা আবার রাজস্বও ব্যয় করতাম। এরশাদ সাহেবের আমলে এরকম অবস্থা আমাদের ছিল। এখন সেইটা থেকে তো আমরা বের হয়ে আসছিলাম। আমরা আবার ঐ পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি কি না। এইটা হলো একটা বড় বিষয়। কিন্তু আবার অন্য বিষয় হলো আমার বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্য। টাকার উপর চাপ অব্যাহত রয়েছে। আমার অপরিশোধিত দেনা দিনে দিনে বাড়ছে। এটা শুধু ব্যক্তি, মানে কেনাবেচা না, আপনার যাদের মুনাফা নিতে পারছে না এটা তো প্রকাশ্য হয়ে গেছে এখন। এবং আগামী দিনের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে অর্থায়ন করার জন্য আমি এলসি খুলতে পারছি না। এইগুলো যদি সমাধান না হয় তাহলে তো আপনার মূল্যস্ফীতি কমার খুব কারণ নেই। মূল্যস্ফীতি কমার একমাত্র ইতিবাচক এই মুহূর্তে হলো বিশ্বে পণ্যমূল্য কমছে। উন্নত বিশ্বে পণ্যমূল্য কমছে। সেই হিসেবে তেলের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। জ্বালানি তেলের। এইটা একটা ইতিবাচক দিক এখন এই মুহূর্তে রয়েছে। সরকার বলছে যে বিদেশের কথা মনে রাখতে হবে। তো বিদেশ তো উন্নতি হচ্ছে। তো বাংলাদেশে কেন মূল্যস্ফীতির হার এখন শ্রীলঙ্কার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। যে শ্রীলঙ্কা গত বছরও এই সময় আমাদের চেয়ে অনেক নিচে ছিল। সেহেতু প্রথমে আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি আজকে সন্ধ্যায় সেটা হলো অর্থনীতি সংকটে আছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। আগে চাপ বলতাম, পরে সমস্যা বলেছি, এখন সংকট বলছি। কিন্তু এই সংকট যতখানি না পরিস্থিতির কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি হলো, অনেকটাই হলো ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে। যে নীতি নেতৃত্ব দরকার, সে নীতি নেতৃত্ব আমরা দেখি না। যে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ দরকার, সেই অংশগ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা দেখি না। এই যে পুরো বাজেটটা প্রক্রিয়াটা হয়েছে, খুবই আমলানির্ভর প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়েছে। এর

ভিতরে রাজনৈতিক দিক দর্শনের কথা, ওই কথার কথা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারের কথা বলা হয়েছে। যারা লিখেছেন, তারাই পড়ে দেখেছেন কি না এইটেই আমার সন্দেহ আছে। তাহলে তো আপনি প্রত্যেকটা নির্বাচনী ইশতিহারের একেকটা প্রতিশ্রুতির সাথে মিলিয়ে, আপনি আর্থিক বরাদ্দ এবং কর ব্যবস্থাকে মিলিয়ে আপনি বলতেন। আমি আপনাদের বলেছি, অন্যদেরও বলেছি। দেখেন সবচেয়ে বড় বিষয় কী ছিল আপনার সেই হিসেবে? মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য আপনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন, তো সুরক্ষায় তো আপনি টাকা দিতে পারেন নাই। আপনি কিছু পরিমাণ বাড়িয়েছেন কিন্তু আপনি মানুষের মাথাপিছুও বাড়াতে পারেন নাই। কার্যকরভাবেও করেন নাই। ওইটার ভেতরে পেনশনের টাকা রয়েছে। আপনার সুরক্ষার বড় একটা জায়গা ছিল যে আপনি জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমাবেন। এটা আপনার প্রতিশ্রুতির ভিতরে ছিল। এবং ছিল যে বছর বছর আপনি এগুলোকে বের করে দিবেন যে সমস্ত বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছেন। আপনি তো বললেন না কাকে আপনি বের করে দিলেন এইটার ভিতর দিয়ে। আপনি শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আছে, সেটার জন্য বাচ্চাদের আপনি মিড ডে মিলের ভিতরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এটাতে খুবই উপকারী হয়, ওদের পুষ্টি হয় এবং মেধা বাড়ে, ইত্যাদি। সেটা তো আপনি করলেন না। যুব সমাজের জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য নতুন কী ব্যবস্থার কথা সেইটাও আপনি বললেন না। আমরা যে কমিউনিটি ক্লিনিক এই সরকারের একটা গর্বের জায়গা বলে আমরা সবাই স্বীকার করি সেই কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যকরভাবে ওষুধ এবং অন্যান্য উপস্থিতি, ইত্যাদির ব্যাপারে আর নতুন প্রক্রিয়া কি হবে, সবই কিন্তু কথার কথা হিসেবে একটা উপরে ভাষা জিনিস হয়েছে। এটাকে যে নির্দিষ্টভাবে নিয়ে যাওয়া হবে এটার জন্য কোনো রাজনৈতিক মানে এক্সারসাইজ, অনুশীলন, একটা রাজনৈতিক অনুশীলন, এইটা এইটার সাথে যুক্ত হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় না। এইটাই পরিতাপের জায়গা যে আপনি যে প্রতিশ্রুতিগুলো আছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সেগুলো খুব ভালো এবং যৌক্তিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার সাথে এই বাজেটের মুখের কথা ছাড়া কাজের কোনো মিল নাই।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা ছিলাম। শ্রীলঙ্কার উদাহরণটা আমরা পেয়েছি আপনি বললেন। কিন্তু শ্রীলনঙ্কা পারলো কীভাবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শ্রীলঙ্কা পেরেছে একটা বড় কারণ হলো যে তারা জাতীয় ঐক্যের ভিতর দিয়ে গেছে। এবং জাতীয় ঐক্যের ভিতরে তারা পেশাগত অর্থনৈতিক নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে। শ্রীলঙ্কার গভর্নর যখন এসেছিলেন আমাদের এখানে, আমরাই সিপিডি থেকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম কয়েক মাস আগে। এবং উনি দুটো বড় কথা বলে গেছেন। আমি এটা আপনাকে আরেকবার বলি, স্মরণ করাই। একটা কথা বলেছেন যে, ঋণ করে ঋণ শোধ করো না। বাংলাদেশ এখন তাই করছে। ঋণ করে ঋণ শোধ করছে। যত জায়গা থেকে আমরা পারছি ঋণ নিচ্ছি এবং মনে করছি এইভাবে আমার সময়টা বোধহয় পার হয়ে যাবে। এবং যারা আমলা তারা তো দেখে তাদের অবসরের সময়টুকু তারা পার করে দিতে পারে কি না। কিন্তু বাংলার মানুষ তো থাকবে, দেশও থাকবে। এইটা একটা। আরেকটা কথা উনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা। আমরা অনেক সময় বলি না কেন্দ্রীয় ব্যাংকে

স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে? উনি বলেছিলেন স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টা অনেক বেশি মনোভঙ্গীর ব্যাপার। যে মানুষটা এটাকে কার্যকর করে সে যদি মনের দিক থেকে স্বাধীন না হয়, সে যদি অন্য কোনো গোষ্ঠী শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে থাকে, তার আনুগত্য যদি অন্য জায়গায় থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো সময় তার ভূমিকা রাখতে পারে না। এই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আপনার রয়েছে। আপনারা তো ঢুকতেই পারেন না কেন্দ্রীয় ব্যাংকে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: না। বন্ধ হয়ে গেছে। তো স্বস্তির জায়গাটা কোথায়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্বস্তির জায়গা হলো বাংলাদেশের কৃষি। স্বস্তির জায়গা হলো খাদ্য নিরাপত্তা। এবার ফসল খুবই ভালো হয়েছে। এত কিছুর পরে বাংলার কৃষক আমাদের দিয়েছেন। এবং সরকার কৃষি উন্নয়নে যে সমর্থনটা দেয় সার, বিদ্যুৎ এবং সেচের জন্য এইটা কার্যকর হয়েছে। ফলন বাড়ছে। উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। এবং কামলা মজুরি আছে ভালো। সেহেতু খাদ্য নিরাপত্তার জায়গাটা আছে। কিন্তু আবার একই সাথে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, এই মুহূর্তে মূল্যস্ফীতি কিন্তু শহরেরে চেয়ে গ্রামে বেশি। এবং সবচেয়ে বেশি হলো আপনার হলো খাদ্য মূল্যস্ফীতি। কারণ হলো শেষ বিচারে যেয়ে আমাদের ঘাটতি কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশি। উদ্বৃত্ত কৃষকের চেয়ে ঘাটতি কৃষক অনেক বেশি। এবং ওখানে যে বিকাশমান মধ্যবিত্ত, যারা গ্রামে চলে আসছে, যারা নতুন করে যাদের আয় বেড়েছে এই সময়কালে, এই সরকারের আমলে, তারা কিন্তু অনেক চাহিদার ভিতরে আছে। সেটার ভিতরে। আর যেটা স্বস্তির জায়গা হতে পারে, সেটা হলো আমার রেমিটেন্স আয়। কারণ গত বছর যেই পরিমাণ মানুষ বিদেশে গেছে। মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ গেছে। এক লক্ষ মানুষ এককে মাসে গেছে। যদিও মালেয়শিয়াতে যে বিশ হাজারের মতো মানুষ যেতে পারলো না তাদের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদবে। তো রেমিটেন্স আয় যদি ঠিকমতো আসা শুরু করে এবং যদি আমার বিনিময়হার ঠিক থাকে তাহলে এটা একটা বড়। আর তৃতীয়ত যেটা, সরকার যে এক কোটি মানুষকে কার্ড দিতে চাচ্ছে এবং এটাকে আগামীতে মধ্যবিত্তের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা, এগুলো যদি সত্যিই চালু করতে পারে, তাহলে হয়তো আরেকটা শক্তির জায়গা এইখানে এই সময় দেখতে পারি। আমি কৃষি দেখি, আমি রেমিটেন্স আয়ের দিক থেকে দেখি, এবং আমি দেখি যে সামাজিক সুরক্ষাকে যদি আরো কার্যকর করতে পারি। কিন্তু এই যে এক কোটি মানুষকে দেখছেন আপনি কি এই তালিকা কোথাও দেখেছেন? মন্ত্রীরা কি বলতে পারবেন বা এমপিরা তাদের এলাকার ঐ তালিকায় কে আছে। ঐ তালিকার ভিতরে শুধু মুরুব্বিদের পরিবারের লোকেরাই আছে নাকি প্রকৃত মানুষরা আছে। সেটা আছে কি না। বলার জন্য আপনাকে বলি যে সেটা হলো, যতখানি না আপনার এখানে সংকট মোকাবেলা কৌশল একটা ঘাটতি, তার চেয়ে বেশি হলো ব্যবস্থাপনার ঘাটতি, জবাবদিহিতার ঘাটতি। যে দুই টাকা, যে পাঁচ টাকা, যে দুইশ টাকা যে দিবেন, সেটা যে ঠিকমতো খরচ হবে এই নিশ্চয়তা আপনি কিভাবে দিবেন। কারন ওইটার ভিতর থেকে অনেকেই তো কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার তাদের ঐ টাকা আপনি আবার জায়েয করার জন্য পনেরো শতাংশে আপনি কর সুবিধা দিতে চান। এইটা অন্যায্য।

মতিউর রহমান চৌধুরী: দক্ষ নেতৃত্ব বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দক্ষ নেতৃত্ব বলতে আমি এইটা বুঝি যে, প্রথম কথা হলো যে রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে এ সরকার এসেছে, নির্বাচন যেইভাবেই হোক না কেন, সেই মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠ থাকা। সে জন্য আমি বারবার বলবো যে তার নির্বাচনী ইশতেহারের কাছে তার ফিরে যেতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান তো তার উপরে আছে। আরেকটা আমিও মনে করি যে তথ্য-উপাত্তের প্রতি তার নিষ্ঠা থাকতে হবে। আমি যেটা বিশ্বাস করতে চাই, সেইটেই যেন আমি বিশ্বাস না করে বারবার ওইটে আমি না বলি। আমি ঐ বয়ান তৈরি না করি। এটা শেষ বিচারে আমার বিরুদ্ধে যায়। কারণ সত্য যদি সত্যই এবং এইটা একসময় আমাকে আঘাত করে। তো আমি দক্ষ নেতৃত্বের বড় গুণ হলো যে আপনি সত্যের উপরে নির্ভর করে আপনি আপনার পরিচালনার ক্ষেত্রে করেন। আর তৃতীয় যেটা থাকে, সেটা হলো জবাবদিহি কাঠামো। সেই জবাবদিহি কাঠামোর ভিতরে জনমানুষের কণ্ঠস্বরকে স্বীকার করতে হবে। জনমানুষের কণ্ঠস্বরকে আপনার বন্ধু হিসেবে দেখতে হবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কিন্তু আমলানির্ভর একটা বাজেটে এই দক্ষ নেতৃত্বটা আপনি কোথায় পাবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তো দেখি না। আমি তো বলছি দেখি না। দেখি না এই কারণে দেখি না কারণ এইটা শুধুমাত্র এখন কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপার না, এটা একটা সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাপার। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতির যে মূল জায়গাটা, সেটা হলো জনমানুষের মনোভাবের প্রকাশ দিয়ে, তার একটা নির্বাচনের ভিতর দিয়ে বা অন্য কোন চয়নের ভিতর দিয়ে আপনি যদি গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে যদি বৈধতা আপনি যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনি বিভিন্ন জায়গাতে এটাতে জিম্মি হয়ে যান। ঐ কালো টাকাওয়ালাদের কাছে জিম্মি হয়ে যান। তখন আর মানুষের কাছে জিম্মি হন না। আপনি মুখে বলেন মানুষের কথা, কাজ করেন আপনি কালো টাকাদের জন্য। এই জায়গাটাতে সমস্যা। মৌলিক সমস্যা। কিন্তু আজ রাতে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: তাহলে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ছয় মাস তো আপনাকে সময় দিয়েছে, তাই না? এক বছরের বাজেট আপনার ছয় মাসে জন্য আপনি পরিবীক্ষণ করবেন। শুধু এইটুক খেয়াল রাখেন, তথ্য -উপাত্ত নিয়ে যেন নয়-ছয় না হয়।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এটার সম্ভাবনা কতটুকু?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটার সম্ভবনা থাকে। আগের চেয়ে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ত্রৈমাসিক হিসাব এখন আসাতে প্রবৃদ্ধির হিসাব নিয়ে বেশি গণ্ডগোল করার সমস্যা হয়েছে

এবং একটা বড় জায়গা তো হলো আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব। তো সেখানে তো আপনারা ঢুকতে পারেন না আজকাল। এখন যেটা পাওয়ার কথা সেটাকে আপনি তিন মাস পরে যেয়ে পেতে পারেন। তিন মাস পরেরটা আপনি তিন বছর পরে যেয়ে পেতে পারেন। তখন আমাদের মতো লোকেরা বিশ্লেষণ করতে পারে না। তখন আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করতে হয়। সেহেতু তথ্য-উপাত্তের দিকে মনোযোগ আমি আগেই বলেছি। দক্ষ নেতৃত্বের এইখানে একটা অভিন্ন স্বার্থ আছে নাগরিকের এবং প্রশাসনের।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কিন্তু দাদা, সুশাসন যেখানে নেই, সেখানে আপনি শেষ কথাটা যেটা বললেন, এই বেনিফিটটা আপনি কীভাবে পাবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি আলোকিত নেতৃত্ব অনেক সময় আপনার সুশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন এখন আপনার যে সংসদটা এখান আছে, আপনি বললেন এতগুলো নতুন সংসদ সদস্য এসেছে, আপনার স্থায়ী কমিটিগুলো কেন কার্যকর হলো না? আপনার আর্থিক বিবৃতি দিয়ে আপনি দেখবেন বাজেট নিয়ে যে আলোচনাটা হবে আবার সেই প্রশংসায় এবং তার এলাকার দুই একটি কথা ছাড়া উনারাতো বড় কাঠামোতে কোনো আলোচনা করবে না। এই জায়গাগুলো তো করলে পরে যদি সংসদের সক্ষমতা বাড়তো। আর এর সাথে আমি আপনাকে উল্লেখ করি, এই সুশাসন আনার হয়তোবা আরো কিছু জনগণের পক্ষে আনার সুযোগ ছিল যদি আমাদের কোনো এই মানে যোগ্যতাসম্পন্ন বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি থাকতো। এই দেখুন যেহেতু আপনি সময় দিলেন, এই আটচল্লিশ ঘণ্টা যাছে। ঐ গালভরা কথা ছাড়া বিরোধী শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি তো একটা কোনো কার্যকর, পেশাভিত্তিক আলোচনা করতে পারলো না। তারা চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে একটা কোনো বিশ্লেষণ করতে পারলো না। যে বিশ্লেষণগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে যোগাড় করেও যে একটা কথা বলবে সেটা। তো আমি যখন হতাশা প্রকাশ করি, যে এই দক্ষ নেতৃত্বের কথা, ওই দক্ষ নেতৃত্বের হতশাটা আমার বিরোধীপক্ষের জন্য কম আছে এটা মনে করেন না। উনারা একটা অকার্যকর, অদক্ষ, একটা বিদেশী রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ হিসেবে অবস্থান করছেন, একইমাত্র গালভরা কথার ভিতর দিয়ে। এইটেই বাংলাদেশের সেই অর্থে দুঃখ। শেষ বিচারে আপনার বলতে হচ্ছে, মিডিয়াকে। আর হয়তো আমাদের মতো নাগরিকদের বলতে হচ্ছে। এইটা একটা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশি দিন শুধু এইরকম ভাবে চলতে পারে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: শেষ করি এখানে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনিও ভালো থাকবেন। নাগরিকরাও যাতে ভালো থাকে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ।

চ্যানেল আই
৮ জুন ২০২৪

ব্যতিক্রমী সময়ে গতানুগতিকতার বাজেট

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে, বলা বাহুল্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ের বাজেট। তবে এটি ব্যতিক্রমী সময়ের বাজেট হিসেবে গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারেনি। বাংলাদেশ একটি শক্তিমত্তার জায়গায় ছিল। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, নিম্ন মূল্যস্ফীতি এবং উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি— এই তিনটি ক্ষেত্র বর্তমান সময়ে একই সঙ্গে বিগত দুই বছরে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের একটা অবনমন হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে মূল্যস্ফীতি হ্রাস করা, সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে আরও শক্তিশালী করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। আমরা দেখেছি যে, বাজেটে বেশকিছু প্রস্তাব করা হয়েছে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য। এবারের বাজেটে কর কাঠামোর কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যাতে মধ্যবিত্তদের ওপর করের চাপ কিছুটা কমে। উচ্চবিত্তের ওপর করের হার ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। কিছু কিছু আমদানি করা পণ্যের শুল্ক ও ভ্যাট কমানোর প্রস্তাবও করা হয়েছে। তার পরও আমাদের মনে হয়েছে, যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। বিশেষত দুই বছর ধরে সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে আছে। এ রকম একটা অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে আমরা মনে করেছিলাম বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতিকে যদি আমরা বিবেচনায় নিই, তবে প্রকৃত অর্থে সেই বৃদ্ধি খুব একটা বিবেচ্য নয়। আমরা আশা করেছিলাম, সামাজিক সুরক্ষার প্রাপ্তি ও স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, সামাজিক সুরক্ষা খাতে যে হিসাব সেখানে কৃষিখাতের ভর্তুকিও আছে, সঞ্চয়পত্রের সুদের প্রিমিয়ামও আছে। সরকারি কর্মকর্তাদের পেনশন খাতের স্কিম ইত্যাদিও সেখানে ঢোকানো হয়েছে। এগুলো বাজেটের ১৭ শতাংশের মতো হয় অথবা জিডিপি ১.৩ শতাংশের মতো হয়। এটা খুব বেশি বাড়ানো হয়নি। আমাদের প্রস্তাব ছিল, শহরাঞ্চলে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরনের সার্ভে যেমন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বিশ্বব্যাংক অথবা আমাদের বিবিএসের সার্ভে করা। দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যনিরাপত্তা, পুষ্টিনিরাপত্তায় ভুগছে মানুষ। এমনকি দারিদ্র্যসীমার ওপরে যারা আছে তারা এবং বিশেষত শিশুরা; যাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতা তুলনামূলকভাবে বেশি। সে ক্ষেত্রে

আমরা মনে করেছিলাম স্কুল ফিডিংয়ের মতো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে, কিন্তু তা দেখিনি। বাজেটে যে ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বৃদ্ধি তেমন একটা হয়নি। অন্যদিক থেকে অনেক পণ্যের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে। যদিও আইএমএফের কথা উল্লেখ নেই। তবে ২০১২ সালের ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারি যেটা করা হয়েছিল, অর্থাৎ গড়ে ১৫ শতাংশ সাপ্লিমেন্টারি; সেক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বেশকিছু পণ্য ও মোবাইল টক টাইম থেকে শুরু করে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাত আছে, যেখানে এই ভ্যাট বৃদ্ধির ফলে অথবা ভ্যাট প্রত্যাহারের যে সুযোগ ছিল সেগুলো বাতিল হওয়ার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়বে।

আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমাদের রাজস্ব জিডিপি'র হার যেহেতু কম, আমরা ক্রমান্বয়ে ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছি। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যেটা ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার মতো আছে, সেটা পুরোটাই হয় অভ্যন্তরীণ ঋণ, নয়তো বৈদেশিক ঋণ। এই ঋণনির্ভরতা বাজেটেও দেখেছি। সুদের ব্যয় দুই নম্বরে চলে আসছে। প্রথমত, জনপ্রশাসন ব্যয়, তারপর সুদের ব্যয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি অশনিসংকেত। ক্রমান্বয়ে সুদ ও আসলের পেছনে একটি বড় অংশ চলে যায়। তাহলে অন্যান্য খাতে ব্যয়ের যে সুযোগ সেগুলো থাকবে না। চেষ্টা করতে হবে, যেভাবেই হোক রাজস্ব যেন বাড়াতে পারি। রাজস্ব টার্গেট ধরা হয়েছে ৯.৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এটা ছিল ৮.৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেখানে ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে। এ রকম অবস্থায় যদি ৯.৭ শতাংশ রাজস্ব আদায় করতে হয়, তাহলে ২৫ শতাংশের মতো রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে যে ধরনের বিনিয়োগ দরকার সেটা বাজেটে দেখিনি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী করা দরকার। ডিজিটালাইজেশনকে শক্তিশালী করা দরকার। করখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সে ধরনের উদ্যোগ এবারের বাজেটে দেখা যায়নি বরং আমরা দেখেছি যারা কর দেননি এবং যাদের কাছে অপ্রদর্শিত টাকা রয়েছে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে সেটাকে বৈধ করার। এখানে আমরা দেখেছি ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিলে আর কোনো ধরনের প্রশ্ন করা হবে না। অর্থাৎ যারা অবৈধভাবে টাকা আয় করেছে তাদেরও এক ধরনের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটি অন্যায় এবং একটি অযৌক্তিক পদক্ষেপ এবং এটা প্রত্যাহার করা উচিত। এটা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কর না দিয়ে পরবর্তী সময়ে ১৫ শতাংশ দিয়ে এ অপ্রদর্শিত টাকাকে বৈধ করে নেওয়া হলো। আমরা মনে করি সেটাও ঠিক নয়। এটা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

রাজনৈতিকভাবেও মানুষ এটাকে ভালোভাবে নিতে পারে না। নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক- কোনোভাবেই এটা গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রাজস্ব ব্যয়, যেটা সরকারের রাজস্ব আয় এবং ঘাটতি অর্থায়ন ৪.৬ শতাংশ ধরা হয়েছে। এটা মিলে মোট সরকারি ব্যয় ১৪ শতাংশের মতো। রাজস্ব আদায় বাড়িয়ে বিভিন্ন খাতে ব্যয় সক্ষমতাকে বাড়াতে হবে এবং ঋণনির্ভরতা কমাতে হবে। একই সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে সরকারের ব্যয় যদি ১৪ শতাংশ হয় জাতীয় আয়ের, তাহলে বাকি অংশ বেসরকারি খাতে। বিনিয়োগবান্ধব ও ব্যবসার পরিবেশ যাতে ভালো হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। সেটা শুধু

রাজস্বনীতি দিয়ে হবে না। সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটা সংকোচনমূলক নীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বাজেটও কিছুটা সংকোচিত করা হচ্ছে। এ রকম একটা অবস্থায় বিনিয়োগ পরিস্থিতির যদি মান এবং দক্ষতা না বাড়ানো যায়, তাহলে আমরা যে প্রাক্কলন করছি, প্রবৃদ্ধি ৬.৭৫ শতাংশে নিয়ে আসব বা মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নিয়ে আসব সেটা সম্ভব হবে না।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু বাজেট দিয়ে হবে না। সেই ব্যবস্থাপনা ও এর গুণগত মান ভালোভাবে রাখতে হলে সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তার সেবা দেওয়ার দক্ষতাও সক্ষমতার দিকে নজর দিতে হবে। তাহলে বিভিন্ন বিনিয়োগ এবং আয় বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কাজগুলো করতে পারব। সুতরাং বলা যায়, একটা চ্যালেঞ্জিং টাইমের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। যেখানে একদিকে মূলস্ফীতি কমাতে হবে, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও বিনিয়োগ উৎকর্ষ বাড়িয়ে কর্মস্থান সৃষ্টি করে আয় বাড়াতে হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জিং সময়। অর্থনীতি যদি আগের জায়গায় নিয়ে যেতে হলে উচ্চ প্রযুক্তি, নিম্ন মূল্যস্ফীতি, সামষ্টিক স্থিতিশীলতার দিকটি বিবেচনায় রাখতে হবে। বাজেট কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। বিশেষত, বাজেটের ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এটা যাতে সাশ্রয়ীভাবে ও সময়মতো করতে পারি, সুশাসনের সঙ্গে করতে পারি, সেদিকটায় বেশি নজর দিতে হবে। এবারের বাজেট বাস্তবায়নের উৎকর্ষ ও মানসম্মত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তার কারণ হলো যে, অর্থায়ন কিছুটা সংকুচিতভাবে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাজেটের আকারও খুব একটা বাড়েনি। গতবারের থেকে ৪-৫ শতাংশ মতো হয়তো বেড়েছে। এই কম টাকা দিয়েই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে। সুতরাং সুশাসনের পাশাপাশি সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি প্রয়োগ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এই বাজেটে উচ্চ মূল্যস্ফীতির সংকট কাটবে না। এটার জন্য আরও সময়ও লাগবে।

পরপর দুবার মূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যস্তর অনেক ওপরে রয়েছে। সেটা কমাতে গেলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের যে অবনমন হয়েছে, সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে ফ্যামিলি কার্ড অথবা দুস্থ ভাতা প্রকল্প বলি, সেক্ষেত্রে যে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে সেটা আরও বৃদ্ধি করা উচিত। একই সঙ্গে যেসব খাতে বরাদ্দ আছে সে কাজগুলো যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। টাকা সাদা করার মতো এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। দায়মুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে বরঞ্চ যারা এগুলো করছে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বলে মনে হয়। সামগ্রিকভাবে যদি বলি, একটা ব্যতিক্রম সময়ে বাজেট দেওয়া হয়েছে, এই বাজেট গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারেনি।

খবরের কাগজ
১০ জুন ২০২৪

জনসাধারণের স্বস্তির দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল

ড. ফাহমিদা খাতুন

আমাদের নতুন অর্থমন্ত্রী ২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট এমন সময়ে পেশ করেছেন, যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে। অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জিং সময়ে বাজেট প্রণয়নের কাজটি করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কৃতিত্বের দাবিদার হতেই পারে। তবে এ কথা বলতেই হবে, প্রস্তাবিত বাজেট চলমান অর্থনৈতিক সমস্যার গভীরতা মূল্যায়ন করতে পারেনি। তাই বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা তৈরি এবং সমস্যাবলি দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দিন পর্যন্ত একটি অবস্থায় ছিল। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, নিম্ন মূল্যস্ফীতি, অধিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি–এসব ক্ষেত্রে গত দুই বছরে নেতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও সাধারণ মানুষের স্বস্তির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমী সময়ের বাজেট হওয়ার বদলে প্রস্তাবিত বাজেট হয়েছে গতানুগতিক।

বাজেটের আকার ও ঘাটতি

২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের ১৪.২ শতাংশের সমান। এ বাজেটের পরিমাণ ২০২৩–২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৪.৬ শতাংশ বেশি।

চলমান অর্থবছর ২০২৪-এ বাজেট ঘাটতি ৫.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এখন জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশে সংশোধিত। ২০২৫ অর্থবছরে এটি ৪.৬ শতাংশ নির্ধারণ করা

হয়েছে। গত দুই বছরের উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ এবং দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেট ঘাটতি আরও কম রাখা উচিত ছিল। এ ঘাটতি মেটাতে সরকারকে বরাবরের মতো দেশি ও বিদেশি উভয় উৎসের ওপর নির্ভর করতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের একটি বড় অঙ্ক সরকারের ব্যাংক ঋণ থেকে আসবে। ব্যাংকিং সেক্টরের ওপর সরকারের ক্রমাগত নির্ভরতা এক পর্যায়ে বেসরকারি খাতের জন্য ক্রাউড আউট ইফেক্ট তৈরি করবে। ব্যাংকগুলোতে ইতোমধ্যে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক থেকে ঋণের সুদের হার আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া ব্যাংক ঋণের বিপরীতে সরকারের সুদ বাবদ দায় বাড়তেই থাকবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, ২০২৪ সালের জুলাই-জানুয়ারি মেয়াদে মোট রাজস্ব সংগ্রহ ১৩.৩ শতাংশ বেড়েছে। এটি ২০২৩-এর অনুরূপ চিত্র থেকে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি। এই উন্নতি সত্ত্বেও ২০২৪-এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২০২৪ অর্থবছরের বাকি সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি এখনও ওই শতাংশের মতো উচ্চ হতে হবে। এটি অপ্রমাণীয় বলে মনে হচ্ছে। অতএব, ব্যয় পরিকল্পনার জন্য একটি বাস্তব এবং অর্জনযোগ্য লক্ষ্য অপরিহার্য।

কিছু মূল অর্থনৈতিক সূচকের অনুমানও বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫-এর বাজেটে ২০২৫-এর জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৭৫ শতাংশ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক চাপের সময়ে এই অভিক্ষেপ উচ্চ। ২০২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছিল ৭.৫ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অস্থায়ী প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, ২০২৪-এ প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮২ শতাংশ হতে পারে।

একইভাবে জিডিপি'র একটি অংশ হিসাবে মোট বিনিয়োগ ২০২৫ অর্থবছরে ৩৩.৪১ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। অথচ গত কয়েক বছরে জিডিপি'র একটি অংশ হিসাবে মোট বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। ২০২০–২৪ এর মধ্যে গ্রস ইনভেস্টমেন্ট-জিডিপি অনুপাতের পতন হয়েছে ০.৩৩ শতাংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাতও ২০২৪ অর্থবছরে ২৩.৫১ শতাংশে নেমে এসেছে। সুতরাং কীভাবে ২০২৫ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৭.৩৪ শতাংশ অর্জিত হবে, তা বোধগম্য নয়।

কতখানি মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে সহায়ক

বর্তমান অর্থনৈতিক চাপের সময় সরকারকে নিম্নস্তরের ভারসাম্য, অর্থাৎ নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির জন্য মীমাংসা করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অপারেশন ব্যয়, অনুৎপাদনশীল প্রকল্প এবং কিছু বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যয় কমানো আবশ্যক। সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের গোষ্ঠীর জন্য উচ্চ বরাদ্দ রাখতে হবে।

সাধারণ মানুষকে অবকাশ দেওয়ার আরেকটি ক্ষেত্র হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বেসরকারি বিনিয়োগের অভাবে কর্মসংস্থান সীমিত। যুক্তিসংগত জিডিপি বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থনীতির সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

দরিদ্রদের জন্য সহায়তার একটি উৎস হলো সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (এসএসএন) কর্মসূচি। মোট বাজেটের শতাংশ হিসাবে সামগ্রিক এসএসএন বাজেট সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে—২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের ১৭ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ১৭.১ শতাংশে। জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে এসএসএন বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের ২.৪০ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ২.৪৩ শতাংশে।

কিন্তু এখানে আগের মতোই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ সহায়তা এবং কৃষিতে ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে এসএসএনের জন্য বরাদ্দ বেশি দেখা যায়। এসব বরাদ্দ, যা সরাসরি দরিদ্রদের সাহায্য করে না, তা বাদ দিলে এসএসএনের জন্য প্রকৃত বরাদ্দ অনেক কম। নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর জন্য কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়িয়ে ৫ লাখে উন্নীত করা উচিত ছিল। কারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় নিম্ন আয়ের পরিবারের বেশির ভাগ উপার্জনকে খেয়ে ফেলে। সরকারের উচিত কর ফাঁকিবাজদের কাছ থেকে এবং নতুন উৎস থেকে কর আদায় জোরদার করা। করদাতাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা। এতে কর ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে।

সরকার ২০২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৬.৫ শতাংশ। দুর্ভাগ্যবশত এটি একটি অবাস্তব লক্ষ্য। আগামী ১২ মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নীতিনির্ধারকদের বেশ কিছু বাস্তবসম্মত, সাহসী এবং অজনপ্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

এবারের বাজেটে কর কাঠামোর কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে মধ্যবিত্তদের ওপর করের চাপ কিছুটা কমে। উচ্চবিত্তের ওপর করের হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। কিছু আমদানি করা পণ্যের শুল্ক ও ভ্যাট কমানোর প্রস্তাবও করা হয়েছে। তারপরও যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি।

বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৃদ্ধি তেমন একটা হয়নি। অন্যদিকে জনপ্রশাসন ব্যয়, সুদের ব্যয় বেড়েছে। আমরা ক্রমান্বয়ে ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছি। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, যা ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার মতো আছে, এর পুরোটাই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ। এর সুদ ও আসলের পেছনে দেশের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায়।

১০ বছর ধরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। আগামী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করা কঠিন হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে যেভাবে সংস্কার করা দরকার, তার কিছুই বাজেটে নেই। করখেলাপিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেই। বরং তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে অবৈধ টাকা বৈধ করার।

মেগা প্রকল্প, কালক্ষেপণ, খাতওয়ারি বরাদ্দের ব্যবহার– ব্যয়ের উৎকর্ষ, অপচয় বন্ধ, সময়মতো কাজ শুরু ও শেষ, ব্যাংক সংস্কার নিয়েও কোনো উল্লেখ নেই।

সমকাল
১৫ জুন ২০২৪

শর্তগুলো যেন আমাদের অনুকূলে থাকে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গত কয়েক বছরে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তবে সেটিকে আরো কার্যকরভাবে উইন-উইন সিচুয়েশনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। ভারতের সঙ্গে আমাদের

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গত কয়েক বছরে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তবে সেটিকে আরো কার্যকরভাবে উইন-উইন সিচুয়েশনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। ভারতের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেশ গভীর। আমাদের যে তিনটি লাইন অব ক্রেডিট হয়েছে, সেগুলো কীভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারি, সেদিকে মনোযোগ থাকবে। চতুর্থ কোনো লাইন অব ক্রেডিটও হতে পারে। আমাদের অবকাঠামোগত কিংবা দ্বিপক্ষীয় অনেক কানেক্টিভিটির দরকার আছে, সে রকমও চিন্তা করা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে অর্থছাড় কিংবা শর্তগুলো যাতে আমাদের অনুকূলে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের পানি বণ্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনার আশা করছি। ফারাক্কা পানি বণ্টন চুক্তি ২০২৬ সালে শেষ হচ্ছে। সেটারও আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার হয়তো কিছুটা ইঙ্গিত পাব। তিস্তার পানি নিয়ে ভারতের কাছে আমাদের কিছু প্রত্যাশা আছে, আশা করি সে ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হবে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে। এলডিসি স্কিম আরো কিছুদিন প্রলম্বিত করার জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছে, সে প্রসঙ্গও হয়তো বাংলাদেশ তুলতে পারে। সেটির প্রস্তুতি হিসেবে দ্বিপক্ষীয় কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপের আলোচনা হতে পারে। মাল্টি মোডাল কানেক্টিভিটিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আরো বিনিয়োগ আনা যায়, সে ব্যাপারেও আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় কীভাবে

ভারতের বাজার সুবিধা নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আকর্ষণ করা যায়, সে ব্যাপারেও হয়তো কিছু দিকনির্দেশনা থাকতে পারে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বণিক বার্তা
২১ জুন ২০২৪

নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিহীন বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার অন্তরায়

ড. ফাহমিদা খাতুন

মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন, ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক সংকট বিরাজ করছে এর ফলে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ভঙ্গুর হয়ে গেছে। অথচ বহু বছর ধরে আমরা ভালো অবস্থানে ছিলাম। আমাদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন মূল্যস্ফীতি ছিল। বহির্খাত খুব শক্তিশালী ছিল। সেই অবস্থান থেকে আজকের এ ভঙ্গুর অবস্থানে কীভাবে

মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন, ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক সংকট বিরাজ করছে এর ফলে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ভঙ্গুর হয়ে গেছে। অথচ বহু বছর ধরে আমরা ভালো অবস্থানে ছিলাম। আমাদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন মূল্যস্ফীতি ছিল। বহির্খাত খুব শক্তিশালী ছিল। সেই অবস্থান থেকে আজকের এ ভঙ্গুর অবস্থানে কীভাবে এলাম? এর উত্তরে তিনটি বিষয় বলতে চাই। প্রথমত, সমস্যা কী তা স্বীকার করতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে আসে সমাধান। এরপর সমাধান করতে গেলে নীতির বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে নীতিমালাগুলো দেখেছি, মোটাদাগে সেগুলো তিন ধরনের— নীতির ভ্রান্তি ও দুর্বলতা, নীতি গ্রহণে দ্বিধা এবং এ দুটোর মেলবন্ধনে হয়েছে নীতির অসারতা। অর্থাৎ নীতি অকার্যকর হয়ে গেছে। দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভ পতনে দুরবস্থা চলছে। এক্ষেত্রে আমরা কী নীতি গ্রহণ করলাম? সংকটের সময় কোনো উদ্ভাবনী নীতির দরকার পড়ে না, প্রথাগত নীতি আঁকড়ে ধরতে হয়। মূল্যস্ফীতি কমানোর মৌলিক নীতি হলো বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কমানো ও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়া। সারাবিশ্ব এ নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু আমরা এ পথে অগ্রসর হইনি। কভিডকালে সুদহারের নয়-ছয় নীতি করেছিলাম। কাদের সঙ্গে আলাপ করে এটি করা হয়েছিল সেটিও আমরা জেনেছি। কিন্তু এর ফলে কি বিনিয়োগ এসেছে, ব্যক্তি খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে? এমন কিছুই ঘটেনি। একদিকে আমরা বাজারভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলছি, অন্যদিকে চরম

নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা বজায় রেখেছি। যার ফলে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা যায়নি। উল্টো ২৪ মাস ধরে এটি বেড়েই চলেছে; ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে ৯ শতাংশের ওপরে রয়েছে—১০ শতাংশ ছুঁইছুঁই করছে। অথচ 'তারা' বলেছিলেন সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি উন্নত দেশের জন্য কার্যকরী সমাধান, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। আমরা ব্যতিক্রমী বা উদ্ভাবনী কিছু চিন্তা করব। কিন্তু সময়টা আলাদা কিছু চিন্তা করার সময় না। এমন সংকটের সময়ে মৌলিক নীতিই অনুসরণ করতে হয়।

আমাদের কাছের দেশ শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতি প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছিল। দেশটির অর্থনীতি খাদে পড়েছিল। আর আমরা সেই খাদের কিনারায় দাঁড়ানো। শ্রীলংকা কীভাবে খাদ থেকে উত্তরণে সফল হলো? এর পেছনে রয়েছে সঠিক সময়ে সঠিক নীতি গ্রহণ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধা। আমাদের দেশে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিই বলে দিচ্ছে আমরা যথাসময়ে সঠিক নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছি।

নীতি অকার্যকর হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন। রিজার্ভ ক্রমে নিম্নমুখী। এ পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই। আমরা ডলার বিনিময় হারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ধরে রাখতে চেয়েছি যেন জিডিপিতে মাথাপিছু আয় বেশি দেখানো যায়। আমাদের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এটি এক ধরনের ধারণাগত ভুল। যেখানে ভারত, চীন, ভিয়েতনামসহ অন্য দেশ ডলারের বিপরীতে মুদ্রার মান অবমূল্যায়ন করল, সেখানে আমাদের দেশে দীর্ঘ সময় টাকা শক্তিশালী করে রাখা হয়। এরপর হঠাৎ করেই টাকার মানের অবমূল্যায়ন করা হলে সেই চাপ গিয়ে পড়ে আমদানিতে। রিজার্ভ ক্ষয় বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে এ পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে (বাজারভিত্তিক সুদহার ও ক্রলিং পেগ) সেগুলোও সময়মতো গ্রহণ করা হয়নি। দেরিতে গ্রহণ করা হয়েছে, সেটিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে। অথচ দেশের অর্থনীতিবিদরা এসব সুপারিশ অনেক আগে থেকেই করে আসছেন যা গ্রহণে আমাদের এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অবশ্য অনেক সুপারিশ এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার মুদ্রানীতি এককভাবে কাজ করে না। আর্থিক নীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে আর্থিক কাঠামো সংস্কারের কোনো প্রাক্কলন নেই।

বাজেটে কী আছে, কীভাবে আছে ও কী নেই—এ তিন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করি—বাজেটে মধ্যমেয়াদি প্রাক্কলনগুলো গতানুগতিক চিত্র ভেবেই স্থির করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আইএমএফের কথা শুনে যোগ-বিয়োগ করে নতুন বাজেট করা হয়েছে। বাজেটে দুটি সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া যেত—মূল্যস্ফীতি কমানো ও সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেয়া।

প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ও পরিচালন ব্যয় সমন্বয় করা হয়নি। অথচ সংকটের সময়ে কৃচ্ছ্রসাধন দরকার। কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য অনেক পরিচালন ব্যয় কাটছাঁট করা সম্ভব যেটি আমরা কভিডের সময় দেখেছি। পাশাপাশি উন্নয়ন বাজেটও কমানো যেত। বড় বড় মেগা প্রকল্প নেয়া

হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে চারটি এ বছর আর ছয়টি ২০২৫ সালে শেষ হওয়ার কথা। প্রতি বছর স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পগুলোকে চলমান রাখার তো কোনো দরকার নেই। বরং যেগুলো শেষের পথে কেবল সেগুলোর জন্য বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করা যেত। পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট সমন্বয়ের অভাবে আসন্ন অর্থবছরেও বাজেট ঘাটতি রাখা হয়েছে জিডিপি'র ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। গত বছর এটি ছিল জিডিপি'র ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। তাহলে মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা কীভাবে করা হলো? আর মানুষকে স্বস্তি দেয়া যেত সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের মাধ্যমে। কিন্তু এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বিষয়টি যদি জিডিপি'র শেয়ারে বা মোট বাজেটের আকারে দেখি—সামান্য একটু পরিবর্তন হয়েছে। বাজেটের হিসাবে দেখলে গত বছর যেটা ১৭ শতাংশ, এ বছর সেটা ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। জিডিপি'র আকারে দেখলে সেক্ষেত্রেও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতে ২ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। এ খাতের বরাদ্দ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। বিস্তারিত দেখলে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারদের পেনশনের টাকা, সঞ্চয়পত্রের সুদের অর্থ, কৃষি খাতে ভর্তুকি, মুক্তিযোদ্ধাদের যে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ খাতে। এগুলো করার ফলে এ খাতের বরাদ্দে একটা বড় অ্যামাউন্ট দেখা যায়। কিন্তু সেগুলো যদি বাদ দেয়া যায় তাহলে কিন্তু খুব একটা বাড়েনি, বরং কমেছে। তবে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য সরকার বেশকিছু পণ্যের ওপর কর ছাড়ের প্রস্তাবও করেছে। এটি একটি ভালো প্রস্তাব। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে। দেখা যায় কর কমানোর পর বাজারে পণ্যের দাম সেই অনুপাতে কমে না, এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। করের দোহাই দিয়েই মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়, বাজার মনিটরিং করা হয় না।

বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতি বছরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দেয়া লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যদিও রাজস্ব বোর্ডের ওপর দেয়া লক্ষ্যমাত্রা গত ১০ বছরে কোনোভাবেই পরিপালন করা সম্ভব হয়নি। চলতি বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছিল সেটার তুলনায় আগামী অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। অথচ চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঘাটতি রয়ে গেছে। তাই লক্ষ্যমাত্রাটা বাস্তবসম্মতভাবে করা উচিত। রাজস্ব আহরণের জন্য অনেক প্রচেষ্টা দেখছি। দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন জুসের ওপর, মোবাইল ফোনের টকটাইমের ওপর, পার্কে প্রবেশ ফির ওপরে দেয়া হচ্ছে। এগুলো তো ভোক্তাদের ওপরে গিয়ে পড়ে। বিদ্যমান কাঠামো দিয়ে বেশি রাজস্ব আহরণ সম্ভব নয়। এছাড়া করনীতি ও কর প্রশাসন এখনো আলাদা নয়। আবার অনেকে কর দিতেও চান, ভাবেন সৎভাবে বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তা নেয়ার সক্ষমতা নেই সরকারের। তাই কর কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন। কর কাঠামোর সঙ্গে প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে এ ব্যবস্থার সরলীকরণ আবশ্যক। আরেকটি সংস্কারের কথা অর্থনীতিবিদরা সর্বদাই বলে আসছেন তা হলো ব্যাংক খাতের সংস্কার। ব্যাংক খাতকে অর্থনীতির 'প্রাণকেন্দ্র' বলা হয়। বিভিন্ন খাতকে চলমান রাখার জন্য দরকার ভালো ব্যাংক খাত। অথচ খাতটি ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতর হয়ে গেছে। এ খাতে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু নেই, আস্থাও নেই। কিছু

ব্যাংক আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করে। ব্যাংক খাত গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করে চলছে। এ খাতে চালু হয়েছে ঋণ পুনঃতফসিল করার সংস্কৃতি এবং নতুন নতুন কায়দায় তা করা হচ্ছে। ২ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে বারবার পুনঃতফসিল করার সুযোগ দেয়া হয়েছে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া। এতে মানুষের আস্থার জায়গাটা ভেঙে গেছে। জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে তা ফিরিয়ে আনবেন, সেটাও এ বাজেটের একটা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা কেবল প্রবৃদ্ধির কথা বলছি। কিন্তু এ প্রবৃদ্ধি আমাদের কী দিল? আয়বৈষম্য তো বাড়ছেই। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতা কমে গেছে অর্থনীতির। বলা হচ্ছে, বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। এ হিসাব কীভাবে করা হয়, তা তো আমরা জানি। সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করলেও তা যুক্ত হচ্ছে। বাস্তবে বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় এসেছে, চাকরির জন্য এসএসসি পাস দরকার, অথচ আবেদন বেশি এসেছে মাস্টার্স পাস প্রার্থীদের কাছ থেকে। এর পরও যে চাকরিগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো অনানুষ্ঠানিক খাতে। যতটুকু প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তার বেশির ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আসা। শিল্পখাতে ৯০ শতাংশের বেশি এবং সেবা খাতে ৬৭ শতাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান। অথচ অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের আয় কম ও কাজের নিশ্চয়তা নেই। তবু বাজেটে শ্রমবাজার সংস্কারের কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই।

আরেকটি সংস্কারের কথা না বললেই নয়—প্রশাসনিক সংস্কার। আগেও একবার বলেছি বড় বড় মেগা প্রকল্প সময়মতো শেষ হয় না। অথচ অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, ব্যয় হচ্ছে। এ খাতে জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সরকারি সেবা দেব, কিন্তু জবাবদিহির বাইরে থাকব, তা ঠিক নয়। নিজেরা জবাবদিহির বাইরে থাকলে অন্যদের কীভাবে এর মধ্যে আনবেন?

ক্ষমতাসীন ও দুর্নীতিবাজদের সুবিধা দেব, অন্যদেরও ছিটেফোঁটা এদিক-সেদিক দেব—এমন অনুমিতি ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই বাজেট করা হয়েছে। অন্যরা তা গ্রহণ করলে করুক, চিৎকার করলে করুক, তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই সরকারের। এসব পদক্ষেপের নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অবজ্ঞা করে বৈষম্যমূলক সমাজ সৃষ্টির কাজ করা হচ্ছে।

বাজেট বক্তব্যের শুরুর দিকে ভালো ভালো কথা থাকে। তা কাজে লাগানো হয় না। বরং সুবিধাবাদীদের স্বার্থ রক্ষায় করের প্রস্তাব দেয়া হয়। এ ধরনের নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিহীন দর্শন যে বাজেটে থাকে, তাতে সংবিধানে উল্লিখিত বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আর প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখিনি।

ড. ফাহমিদা খাতুন: নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

[*নিউজপেপার ওনারস' অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ও সম্পাদক পরিষদ আয়োজিত অর্থনীতির চালচিত্র ও প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৪-২৫ শীর্ষক অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায়*]

শ্রুতলিখন: সাবরিনা স্বর্ণা
বণিক বার্তা
২৯ জুন ২০২৪

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির গল্পে মানুষের মুখ নেই

ড. ফাহমিদা খাতুন

চলমান গণ-আন্দোলন, যা ছাত্রদের কোটা সংস্কারের দাবি হিসেবে গত ১ জুলাই শুরু হয়েছিল, তা অনেক বড় সমস্যার বহিঃপ্রকাশ, যা নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘদিন উপেক্ষা করে এসেছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের পেছনে রয়েছে চাপা ক্ষোভ ও বঞ্চনা বিভিন্ন আকারে যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সমস্যার প্রকৃতি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। কোটা সংস্কারের দাবির মাধ্যমে উন্মোচিত এ বৃহত্তর সমস্যার সমাধান ছাড়া চলমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

বর্তমান সরকার গত দেড় দশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করলেও দেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নেই। বেসরকারি বিনিয়োগ কম এবং স্থবির হওয়ার কারণে বেসরকারি খাত চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। সরকারি খাতই তরুণদের কর্মসংস্থানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। বেতন, সুযোগ-সুবিধা, চাকরির নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা ইত্যাদির কারণে সরকারি চাকরি সবচেয়ে লোভনীয় চাকরি হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী গড় বেকারত্বের হার মাত্র ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ হলেও যুব বেকারত্ব ৮ শতাংশ। তদুপরি ১৫–২৪ বছর বয়সী যুবকদের যারা কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নেই তাদের হার ৪০ দশমিক ৬৭ শতাংশ। একটি সংকুচিত শ্রমবাজারে, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ কারণে ৮৪ দশমিক ৯ শতাংশ চাকরি হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে আয় ও চাকরির নিরাপত্তা কম। স্পষ্টতই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। ১ শতাংশ জিডিপি বাড়লে কর্মসংস্থান সেই হারে বাড়ছে না, বরং এ বাড়ার হার কমছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, ব্যাপক দুর্নীতি, ক্রোনিজম, বিশাল পরিমাণের ব্যাংক ঋণ খেলাপি এবং সুশাসনের অভাবের ফলে সমাজের সব স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্পদের বণ্টন সমানভাবে হয়নি, ফলে বৈষম্য বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০২২ সালে জনসংখ্যার ওপরের ৫ শতাংশের হাতে জাতীয় আয়ের ৩০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ছিল, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২২ সালে নিচের ৫ শতাংশের হাতে ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র দশমিক ৩৭ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে দশমিক ২৩ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির চাপে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। গত দুই বছরে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার কারণে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে।

এক দশক ধরে বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় নির্বাচন ছাড়াই বাংলাদেশ এখন একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ফলে সরকারি পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব দেখা দিয়েছে। তাই বৈষম্য হ্রাস করা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে তরুণ এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, উপযুক্ত বেতনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার বিষয়গুলো এখন শুধু মুখের কথার মধ্যেই কিংবা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ এখনো 'পূর্ণ, উৎপাদনশীল এবং অবাধে নির্বাচিত কর্মসংস্থান' অনুসরণ করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসংস্থান নীতি কনভেনশন, ১৯৬৪ (নং ১২২) অনুমোদন করেনি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১৯৯৮ সালে এবং শ্রীলংকা ২০১৬ সালে অনুমোদন করেছে।

গত দেড় দশকে শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। তা হলো অত্যধিক আমলাতান্ত্রিকতা এবং অর্থনীতিতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দক্ষতা হারানো। এ রকম একটি ব্যবস্থা জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চাকরি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন দুর্নীতি, এর মাধ্যমে বিপুল সম্পদ আহরণ এবং সরকারি সম্পদের অপব্যবহার বাড়িয়েছে। উপরন্তু, এটি ধনী ও সুবিধাভোগীদের পক্ষ নিয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ও যুবকদের সুযোগগুলোকে শ্বাসরোধ করেছে।

যদিও কিছু সরকারি পদক্ষেপের ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গড় সামাজিক সূচকগুলো কিছুটা উন্নত হয়েছে। তবে এ ধরনের অগ্রগতির গুণমান এবং বিতরণের সমস্যাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ। সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার সুযোগ সমান নয়। এছাড়া সামাজিক খাতে জনসম্পদ বরাদ্দ খুবই কম এবং স্থবির যদিও অর্থনীতির আকার এবং জাতীয় বাজেট উভয়ই প্রসারিত হয়েছে। চলতি ২০২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপি'র দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং শিক্ষা খাতে জিডিপি'র মাত্র ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। তেমনি ২০২৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির জন্য প্রকৃত সরকারি বরাদ্দ জিডিপি'র মাত্র ১ দশমিক ৩২ শতাংশ যা খুবই কম, যদিও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী

কর্মসূচির বরাদ্দের হিসাবের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ এবং কৃষি ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ যোগ করে সরকার এটাকে বেশি দেখায়।

বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চলমান প্রবৃদ্ধির মডেল বিভিন্ন সময়ে আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে সুবিধাভোগী শ্রেণীর লাভের জন্য কাজ করছে। তাদের মধ্যে সরকারি কন্ট্রাক্ট, লাইসেন্স এবং সুবিধা বণ্টনের সংস্কৃতি বেশ কয়েক বছর ধরেই বিদ্যমান। কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়ার জন্য অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণীত এবং পরিবর্তিত হয়। এগুলো নীতিনির্ধারণের বিকৃতি, পৃষ্ঠপোষকতা এবং মক্কেলবাদের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। ব্যাংক, বিদ্যুৎ ও তৈরি পোশাক খাত কয়েকটি উদাহরণ যেখানে জাতীয় স্বার্থ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে তাদের জন্য অনেক নীতি ও নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারি পরিষেবাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণকে প্রায়ই কর্মকর্তাদের ঘুস ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় ক্যাডারদের সঙ্গে যোগাযোগ ও চাঁদা দেয়ার খবর প্রায়ই সামনে আসে। উদাহরণস্বরূপ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির সুবিধাভোগী তালিকা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত দরিদ্র লোকদের বাদ দিয়ে এবং সাহায্য প্রয়োজন নয় এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ ক্ষমতাসীন দলের লোকরা দরিদ্রদের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারায় ফাটল বেশ কিছুদিন ধরেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অপর্যাপ্ত ও ভুল নীতি, অকার্যকর বাস্তবায়ন, শাসন ব্যবস্থার ঘাটতি এবং সংস্কার পদক্ষেপের অভাবের কারণে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ভেঙে গেছে। কারণ গত দুই বছরে অর্থনীতির সব মূল সূচকের অবনতি হয়েছে। নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত, ঋণের দায়দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি, কম রফতানি ও রেমিট্যান্সের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, ভঙ্গুর আর্থিক খাত, নিম্ন বিনিয়োগ এবং জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চ মূল্যের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমছে, চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না।

দুঃখজনকভাবে নীতিনির্ধারকরা সুশাসন প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসাহ দেখায়নি, বরং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করা হয়েছে। অথচ এগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত। বছরের পর বছর ধরে প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার কারণে অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত

এমন হয়ে উঠেছে, যেখানে রাজনৈতিক ধনিক গোষ্ঠী, আমলা এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অল্পকিছু মানুষ দেশের বাকি জনসংখ্যাকে শোষণ করে। এগুলো কেবল একটি শিকারি রাষ্ট্রে দেখা যায়। বাংলাদেশের সরকার গত দেড় দশকে মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তরুণদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে জনগণের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করেছে।

তাই শিক্ষার্থীরা এখন তাদের বিক্ষোভকে ন্যায়বিচারের আন্দোলন বলে অভিহিত করেছে। সারা দেশে শিক্ষার্থীদের দাবি বিভিন্ন পেশার লাখ লাখ মানুষকে ছুঁয়েছে। যে কারণে তারাও রাস্তায় নেমে এসেছে। সরকার যেভাবে ন্যায্য কারণের জন্য শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে রক্তস্নাত করেছে তাতে সরকারের নির্মম চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনের চেয়ে ভৌত অবকাঠামো ধ্বংসের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদর্শন বস্তুত নিহত ও আহত ছাত্র ও সাধারণ মানুষের প্রতি অসংবেদনশীলতার নিষ্ঠুর প্রকাশ। রাস্তাঘাট, স্থাপনা ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো তৈরি করা যায় এবং তা মানুষের করের টাকাতেই হবে। কিন্তু মানুষের জীবন কি ফিরে পাওয়া যাবে? জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র মানবতা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। তাই তারা সাফল্য দেখে শুধু বড় বড় স্থাপনার মাঝে। দুঃখজনকভাবে সে কারণেই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির গল্পে ন্যায়বিচার ও মানবতা নেই।

তাই ছাত্র আন্দোলন এখন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছে যেখান থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতাময় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই হতে পারে না এবং ন্যায় ও মানবিকও হতে পারে না।

ড. ফাহমিদা খাতুন: নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বণিক বার্তা
৫ আগস্ট ২০২৪

অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারের তাগিদ

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

নতুন অন্তর্বর্তী সরকারকে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে আরও জোরদারের তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি মনে করেন, গেল দু'বছরের নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদলে দেশের বর্তমানে অর্থনীতি বেশ সংকটে রয়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণে এ সরকারকে তাদের কূটনীতিকে মুখ্যত অর্থনৈতিক কূটনীতি হিসেবে বিবেচনা করে সেইভাবেই নীতিকৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

বার্তা২৪.কম-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ এসব কথা বলেন।

নাতিদীর্ঘ আলাপচারিতায় তিনি কথা বলেছেন দেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সংকট এবং উত্তরণের উপায়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, রেমিটেন্স, জনশক্তি রপ্তানি, বৈদেশিক ঋণসহ নানা প্রসঙ্গে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছেন পরিকল্পনা সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

বার্তা২৪.কম: বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেই বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতার পালাবদলে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার এল। সন্দেহ নেই যে বর্তমানে দেশের অর্থনীতি আরও সংকটের আবর্তে। এ থেকে উত্তরণে কি করণীয়?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: অর্থনীতি তো গত দুই বছর ধরেই বিভিন্ন চাপের মধ্যে আছে। সুতরাং এটা নতুন কিছু না। বলা যায়, একটা ধারাবাহিক চাপের মধ্যেই আছে দেশের অর্থনীতি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভের উপরে চাপ, বাজারব্যবস্থা থেকে শুরু করে

বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ক্রমান্বয়ে পূঞ্জীভূত হচ্ছিল। অবশ্যই গত কয়েক সপ্তাহে ছাত্র-গণআন্দোলন চলছিল, সেটা নিঃসন্দেহে অর্থনীতির উপরেও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন খাতে আমাদের যে সমস্যা পূঞ্জীভূত হয়ে আছে, তারমধ্যে ব্যাংকিং সেক্টর, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহরণ, বাজারব্যবস্থাপনা; সামগ্রিকভাবে আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা-ব্যত্যয়, বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা এবং এসব ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবিকে অবহেলা- সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে এগুলোই মোকাবেলা করে যেতে হবে।

আমি মনে করি যে, চলমান এই সংকটে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর যে বড় ভূমিকা রাখবে সেখানে সংস্কার দরকার, যাতে করে আমরা এই সেক্টরে যে ধরনের অব্যবস্থাপনা দেখেছি, খেলাপী ঋণ-কুঋণ যেভাবে বেড়েছে; যেভাবে সুনির্দিষ্ট গ্রুপগুলোকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। এসব জায়গাগুলোতে আমাদের সংস্কার আনতেই হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। সেখানে কেবল মুদ্রানীতিই নয়, রাজস্ব নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, বাজার ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা, মধ্যসত্ত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা এবং তথ্য-উপাত্তের বিভ্রান্তি কাটিয়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা-যাতে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়-এসব দিকগুলোতে আমাদের জরুরি নজর দিতে হবে। কতটুকু আমদানি, কতটুকু উৎপাদন ও সরবরাহ, চাহিদা কতটুকু-তার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থাপনা, আমদানি এবং স্টক থেকে রিলিজ করা-এগুলোর দিকেও আমাদের নজর দিয়ে গেল দু'বছরের অর্থনৈতিক সংকটকে সামাল দিতে হবে। সরবরাহ চেইনে যেসব বিচ্যুতি ছিল-সেগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। বিভিন্ন ধরনের চাঁদাবাজি এবং যেসব নেতিবাচক প্রবণতা ছিল সেগুলোকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এসবই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের মধ্যে পড়েব।

বার্তা২৪.কম: মধ্যমেয়াদি কি কি পদক্ষেপ থাকতে পারে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: সামনের দিনগুলোতে ঋণ উপস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যাতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোন ঋণ ফাঁদে না পড়ি। আমাদের রূপকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যেন আমরা সাশ্রয়ীভাবে সুশাসনের সঙ্গে সময়মতো প্রকল্পগুলো শেষ করতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে তাৎক্ষণিক ও মধ্যমেয়াদী বিষয়ও আছে।

বার্তা২৪.কম: বিগত সরকারের সময়ে বিশেষ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গেই বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে আমাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্ব আছে অনেক বিশেষ সংস্থার সঙ্গেও। সরকার পরিবর্তনে সেইসব প্রকল্প বা বিনিয়োগে কি পরিণতি হতে পারে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয়, আমাদের যেসব দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক

সম্পর্ক আছে-যেগুলোর ভিত্তিতে আমরা ঋণ নিয়েছি। অনেক দেশের অর্থায়নেই আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। চীন, ভারত, জাপানসহ অনেক দেশ এবং বিশ্বব্যাংক, এডিবির অর্থায়ন আছে। আমার মনে হয়-সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গেলে এগুলো আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কোনো জায়গায় যদি আমাদের নতুন করে বিচার-বিবেচনার দরকার হয়, যেমন-ঋণ কি শর্তে নিয়েছি, শর্তগুলো কি-এগুলো পর্যালোচনা করা দরকার। সেখানে যদি কোনোটি আবার রিনেগোশিয়েট করার সুযোগ থাকে, সেটাও আমাদের করতে হবে। কিন্তু আমাদের বৈশ্বিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, আমাদের অর্থনীতির অগ্রাধিকারগুলোকে বিবেচনায় রেখে এই সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। এটি-ই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত।

বার্তা২৪.কম: চলমান প্রকল্পগুলো শেষ করে আনতে কিংবা ঋণের অর্থ ছাড়ে কোন ঝুঁকি দেখছেন কী?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: যেসব চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, সেসব চুক্তির অধীনে যে অর্থায়ন হওয়ার কথা-মনে হয় না সেগুলো ঝুঁকিতে থাকবে। তবে সামনে আমরা যা নেগোশিয়েট করব বা যেগুলো পাইপলাইনে আছে সেটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ করা, কোনটা আমাদের অর্থনীতির জন্য কাজে লাগবে-সামনের দিনে সেগুলো অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা দরকার। কারণ সব ঋণই আমাদের পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধের দায়ভার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সেকারণে পুনর্বিবেচনা জরুরি। কিন্তু চলমান যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলোতে বড় ধরনের কোন ঝুঁকি দেখছি না। আবারও বলছি, সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকারগুলো আমাদেরই পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। আমাদেরই ঠিক করতে হবে কোনটা নেব, কোনটা নেব না। কোনটা আমরা কখন নেব, কোন শর্তে নেব-সেগুলো।

বার্তা২৪.কম: অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয়, অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থটা অগ্রাধিকার দিতে হবে। কূটনৈতিক দিক থেকে যদি বলি, আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক, সেবা খাতে রেমিটেন্সের সম্পর্ক-সেইসব দিকে থেকে বৈদেশিক সহায়তার দিকগুলো তো আছেই...আমাদের অর্থনীতির জন্য যেসব প্রকল্পগুলো ভালো সেটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের ঋণসহ অন্যান্য বিষয়গুলো রিনেগোশিয়েট করতে হবে। আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন সামনে আসছে। যেসব দেশে আমরা শুল্কমুক্ত প্রবেশাদিকার আরও সম্প্রসারিতভাবে পেতে পারি, সেসব দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউকে তো আগেই বলেছে, তারা ২০২৯ সাল পর্যন্ত দেবে। জাপান, কানাডা, চীন, ভারতসহ আরও যেসব দেশ রয়েছে সেখানেও আরও কিছু সময় আমরা কিভাবে শুল্কমুক্ত

প্রবেশাধিকার পেতে পারি তা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের যে ট্রাডিশনাল ভালো সম্পর্ক-সেখানে যাতে আমরা জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে পারি; সেইসঙ্গে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলো থেকে আমাদের শ্রমিক ভাইদের পাঠানোর ক্ষেত্রে যাতে আরও এগ্রেসিভলি নেগোশিয়েট করতে পারি, শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত থাকে সেজন্য দেশগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। রেমিটেন্সটা যাতে দেশে আসে, হুন্ডির মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাতে চলে না যায়, এসব ব্যাপারগুলোতে আমরা সেসব দেশের সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা করে নিশ্চিত করতে পারি। মনে রাখতে হবে, কূটনীতিটা এখন অর্থনৈতিক কূটনীতি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমাদের নীতিমালা বা নীতিকৌশল বিবেচনায় নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বার্তা২৪.কম
১৩ আগস্ট ২০২৪

সামষ্টিক অর্থনীতির দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন দরকার

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং অন্যান্য ব্যাপার জড়িত। নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভক্ষয় বড় সমস্যা। বাজেটে প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। নতুন সরকারের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। এসব নিয়ে কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলী হাবিব

কালের কণ্ঠ: দেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। ক্রান্তিকালে নতুন সরকারের সামনে তো অনেক চ্যালেঞ্জ। কিভাবে দেখছেন?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই অর্থনীতি বিভিন্ন রকমের ঝুঁকির মধ্যে ছিল। বিগত দু-তিন মাস সময়ের ভেতর যে ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা গেছে, সে সময়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, মানুষ মারা গেছে, সম্পদের হানি হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হয়েছে।

ফলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় রকমের ব্যত্যয় হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যবসায়িক আত্মবিশ্বাস, সেটিও অনেকাংশে কমে গেছে। আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই সারাদেশ নিরাপত্তার ঝুঁকিতে ছিল। ফলে সরকারের সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা, যাতে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কাজকর্ম চালাতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যাপারে দেশে এবং দেশের বাইরে আস্থা তৈরি করা, যেন রপ্তানিমুখী খাতে বিদেশিরা অর্ডার

দেয়। তারা যেন অর্ডার দিতে স্বস্তি বোধ করে, প্রবাসীরা যেন সরকারের স্বাভাবিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বস্তিবোধ করেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেন দুশ্চিন্তা থেকে ফিরে এসে এ দেশে বিনিয়োগ করেন; সে পরিবেশ নিশ্চিত করা।

মধ্যবর্তী চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রতিককালে সরকারের রাজস্ব আদায়ের গতি বেশ শ্লথ।

সব সময় আমরা দেখি, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একটি উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, কিন্তু বছর শেষে সেটি আদায় করা যায় না। এখন সেই চ্যালেঞ্জটি আরো বেশি। সুতরাং সীমিত রাজস্ব দিয়ে কতটুকু বাজেট বাস্তবায়ন করা যাবে, সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ সরকারের জন্য। আমার মনে হয়, সরকারের এটিও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার হবে, সরকার বাজেট রিভিশন করবে কি না। রাজস্ব, বৈদেশিক ঋণপ্রাপ্তি, বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তি, রিজার্ভের যে পরিস্থিতি এবং আন্দোলনে ক্ষয়ক্ষতির ফলে সরকারের হাতে নতুন যে বাড়তি ব্যয় দাঁড়াবে, সেই বাড়তি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আবার আমদানি করতে হবে—সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে।

এই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করাও এখন বড় একটি চাপ।

তৃতীয়ত, মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্র সংস্কার। সংস্কারের বিষয়গুলো বেশ বড়। এগুলো ধীরগতির হয়। আমি মনে করি না যে এ ধরনের সংস্কারে হাত দেওয়ার মতো অবস্থা সরকারের রয়েছে। সরকার যদি সত্যি দীর্ঘ মেয়াদে একটি কাঠামোগত সংস্কার করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুণগত পরিবর্তন আনতে চায়, যাতে অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক একটি বাজারব্যবস্থা হয়। ফলে সবাই সেখান থেকে সুবিধা নিতে পারে, গুটিকয়েক গোষ্ঠী যেন বাজারের দখল নিতে না পারে—এমনটি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এমনটি করতে হলে ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার, পাবলিক সেক্টর, রাজস্ব, পাবলিক প্রকিউরমেন্টের মতো অনেক খাতে সংস্কারের প্রয়োজন পড়বে। সেটি নির্ভর করবে সরকার প্রাধিকারগুলো কিভাবে সাজাচ্ছে। সরকার তার সময়কাল কিভাবে নির্ধারণ করছে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সরকার দেশ ও দেশের বাইরে থেকে কতটুকু সমর্থন পাচ্ছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলো কী পরিমাণ সময় দেবে এই সরকারকে। স্থিতিশীলভাবে কাজ করার জন্য এ ব্যাপারগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

কালের কণ্ঠ: বাজেট দেওয়া হয়েছে। নতুন মুদ্রানীতিও ঘোষণা করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি একটি বড় সমস্যা। রিজার্ভক্ষয় বড় সমস্যা। জ্বালানি সমস্যা তো আছেই। ব্যাংকিং খাতে সমস্যা আছে। রেমিট্যান্সে নিম্নগতি। এসব সমস্যার সমাধান কি খুব দ্রুত করা সম্ভব?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এই সমস্যাগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার আগে থেকেই ছিল। তবে এই সরকার আসার ঠিক আগে আরো কিছু নতুন সমস্যা যোগ হয়েছে।

যেমন—আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুর্বলতা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। নতুন সরকারের ওপর মানুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এরপর অর্থনীতির বিষয়গুলোর মোকাবেলা করতে হবে। বর্তমানে দ্রুততার সঙ্গে মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক একটি আশু মূল্যায়ন দরকার। আন্দোলনের ফলে কোন মন্ত্রণালয়ের কেমন ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতিপূরণে কত টাকা প্রয়োজন, উপজেলা থেকে শুরু করে ঢাকা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির তালিকা করা, যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য সামাজিক সহযোগিতায় কত টাকা প্রয়োজন—এসব ব্যয়ের একটি হিসাব দ্রুত দরকার। এগুলোর জন্য বাজেটকে আবার পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এডিপির ক্ষেত্রে যে প্রাধিকার রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও সরকার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। কিছু প্রকল্প শ্লথগতিতে আনা, কিছু প্রকল্প এখন না আনা।

আমার মনে হয়, প্রাক্কলিত হিসাবের ভিত্তিতে সরকার আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কাছে বাজেট সাপোর্ট চাইতে পারে। বিশেষ করে আইএমএফের সঙ্গে সরকারের এই মুহূর্তে একটি ঋণ সহযোগিতা চলছে, সেটির আলোকে সরকার জরুরি বাজেট সাপোর্ট চাইতে পারে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য। কেননা নতুন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সংশ্লেষ রয়েছে।

মুদ্রানীতি ঘোষিত হয়েছে। সরকারের এখন ভাবার বিষয় বাজেট পুনর্বিবেচনা করবে কি না। নতুন করে রিভাইস বাজেট এখন ঘোষণা করতে চায় কি না। যদি তা চায়, তাহলে এর সঙ্গে অনুবর্তী হয়ে মুদ্রানীতিও নতুন করে ঘোষণার বিষয়টি আসতে পারে। একইভাবে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাজারে পণ্য সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা। কারণ সাপ্লাই চেইনগুলো অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে আমদানিও যেন বাধাগ্রস্ত না হয়—এটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই সময়ে যদি কিছুটা উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকেও সেটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাজারে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা। যথেষ্ট মাত্রায় বাজারে পণ্য পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বাজারে নানা রকম সিন্ডিকেট কাজ করে। সেসব চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। সাপ্লাই চেইনগুলো পুনর্বিন্যাস করে ডিজিটাল সাপ্লাই সিস্টেম করা প্রয়োজন। রেজিস্টার্ড এজেন্ট ছাড়া অন্য কারো পণ্য বেচা নিষিদ্ধ করা দরকার। তাদের লেনদেন ডিজিটাইজড করা, ট্রানজেকশনগুলো ডকুমেন্টেড হওয়া দরকার। এগুলো এখনই করার কাজ নয়, করতে সময় লাগবে। কিন্তু শুরু করার দরকার আছে।

এখন আমাদের রিজার্ভ খুব কম। রেমিট্যান্সও শ্লথ। অনেক প্রবাসী হুন্ডিতে টাকা পাঠানোর কারণে সেটি ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে না। বাজার অস্থিতিশীল হলে কিছু মানুষ বাজার থেকে ডলার কিনে জমিয়ে রাখে। তারা বাজার থেকে স্বল্প সময়ে একটি মুনাফা করতে চায়। আবার কেউ আছে, সোনা কিনে রাখে। ফলে রিজার্ভের স্বাভাবিক যে ফ্লো, সেখানে সংকট তৈরি করে। এগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো কত দ্রুত আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারছি, যেন ব্যবসার ওপর আস্থা আসে। মার্কেট মনিটরিং হয়। মুদ্রা পাচার না হওয়া যেন নিশ্চিত হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা যত দ্রুত যেতে পারব, তত রিজার্ভক্ষয় আমরা রুখে দিতে পারব।

আমাদের রিজার্ভ বর্তমানে খুব ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। সরকারের উচিত হবে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সঙ্গে দেনদরবার করা, যাতে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বড় আকারের বাজেট সাপোর্ট নিয়ে আসতে পারে। কিংবা প্রকল্পভিত্তিক ঋণ সহায়তা দ্রুত নিয়ে আসা দরকার, যাতে রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়, যেন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল হয়। সবাই যেন টাকা জমিয়ে না রেখে বাজারব্যবস্থায় ফিরে আসে।

ব্যাংকিং খাতের সমস্যাগুলো সবার জানা। সমস্যার মূল কারণটি দাঁড়িয়ে গেছে যে ব্যাংকিং খাত এখন আর সর্বজনের প্রতিষ্ঠান না হয়ে কিছু ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সবার টাকা লেনদেনের জায়গা না হয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখার ব্যাপার হয়ে গেছে। ফলে ব্যাংকিং খাত বড় রকমের ভঙ্গুরতার ভেতরে রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানটা সময়সাপেক্ষ। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যর্থতা রয়েছে। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং অপারেশনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দক্ষতা দেখতে চাচ্ছি। এই তিনটি একই সঙ্গে করা দরকার।

আমার ধারণা, রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে যে নিম্নগতি, সেটি সাময়িক। আস্থা ফিরে এলে সবাই ব্যাংকিং চ্যানেল দিয়েই হয়তো অর্থ প্রেরণে উৎসাহী হবে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো টাকার মূল্যায়ন স্থিতিশীল রাখা এবং অবমূল্যায়ন ঠেকানো।

কালের কণ্ঠ: বাজেটে প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে। এটি কি সম্ভব হবে? মূল্যস্ফীতি কমার কোনো সুযোগ কি আপাতত আছে?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাজেট ঘোষণার পরপরই মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন ছিল। সেখানে আমরা বলেছি মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা (ওই সময় মনে হয়ে প্রায় ৮.৫ শতাংশের মতো ছিল) কষ্টকর। আমরা বলেছিলাম, মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। কারণ বাজেটে এমন কিছু উদ্যোগ ঘোষণা হয়েছিল, যেটি খাদ্যবহির্ভূত মূল্য বাড়িয়ে দেবে—এটি আমরা আশঙ্কা করেছিলাম। এর ভেতরে ছিল সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়াবে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে খাদ্যেও এর প্রভাব পড়বে। এর মধ্যে গত দুই মাসে যে ধরনের পরিস্থিতি গেল সেটি বাজারব্যবস্থার জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজারে মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সব কিছু মিলে আমাদের কাছে মনে হয় না যে মূল্যস্ফীতি রোধের যে টার্গেট, এটি এখন বাস্তবায়নযোগ্য। একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধির যে টার্গেট, সেটিও আর এখন বাস্তবায়নযোগ্য নেই বলে মনে হয়। এ জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন দরকার।

কালের কণ্ঠ: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আপনি কোন কোন দিকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার বলে মনে করেন?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিগত সময়ে আমরা যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখে এসেছি, তাতে এক ধরনের গোষ্ঠীতান্ত্রিক বাজার কাঠামো তৈরি হয়েছে। ফলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে এসএমই খাত রয়েছে, মাইক্রো এন্টারপ্রেনার রয়েছে। নতুনভাবে ইমার্জিং ই-কমার্স, এফ-কমার্সে যারা জড়িত, তারা রয়েছে। এই উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের জায়গাগুলো সেভাবে বিকশিত হয়নি। ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন হয়েছে, এটিও এক ধরনের বঞ্চনার জায়গা থেকে হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এমন একটি কাঠামোতে যেতে হবে, যেন সবার অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। সেজন্য বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। পাবলিক কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি এবং প্রতিযোগিতার বিষয়টি দেখতে হবে। ঘুষ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পাবলিক কন্ট্রাক্ট দেওয়া যাবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ধরনের মনোপলি বা অলিগোপলিস্টিক যে স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে, এতে ক্রমেই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ যেমন সীমিত হয় ব্যবসায়—আরেকটি হচ্ছে এটি কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তার যে সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জীবনযাত্রার মান তখন অবনমন হয়। আমরা বাজারে সবার অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারিনি বলে এটি হয়েছে। এটি করতে হলে কিছু আইনগত পরিবর্তন আনতে হবে। এমন কিছু সংস্কার দরকার, যাতে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা থাকবে যে এর চেয়ে বেশি কেউ বিনিয়োগ করতে পারবে না। তখন অন্যরাও বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। একইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলও এককভাবে কেউ করতে পারবে না। কেউ যেন এককভাবে গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম করতে না পারে, সেটি মনিটর করতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ হবে, বাজার প্রতিযোগিতামূলক হবে, কাজের সুযোগ তৈরি হবে, ভোক্তা হিসেবেও মানুষ উপযুক্ত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে পাবে এবং সেটি সবার জন্য স্বস্তিদায়ক হবে।

কালের কণ্ঠ: আমাদের প্রধান সমস্যা মূল্যস্ফীতি। খাদ্য মূল্যস্ফীতি তো ১০ শতাংশের বেশি। এটি প্রায় ছয়-সাত মাস ধরেই চলছে। সাধারণ মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টে আছে। এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে এই সময়ের করণীয় কী?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আগেই বলেছি, এই মুহূর্তে পণ্য সরবরাহটা গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও গরিব মানুষের জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেন অব্যাহত থাকে। আগের সরকার করেছে বলেই সেগুলো খারাপ, সেভাবে না দেখে আগের সরকারের কল্যাণকর কাজগুলো অব্যাহত রাখা দরকার। বিশেষত খাদ্য বিরতণ কর্মসূচি, ট্রাক সেল, টিসিবির মাধ্যমে যে সেল, সেগুলো ইতিবাচক। তবে ফ্যামিলি কার্ড যেটি বিতরণ করার কথা, সেগুলো উপযুক্তভাবে বিতরণ হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ব্যক্তি, গোষ্ঠীর কাছে বিতরণ হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ডের ব্যাপারে সরকারের উচিত হবে নতুন করে পুনর্বিবেচনা করা। সঠিক ব্যক্তির কাছে কার্ডটি বিতরণ করা।

কালের কণ্ঠ: আমাদের সরকারি ঋণ দিন দিন বাড়ছে। বিদেশি ঋণ মোট জিডিপি'র ১৬ শতাংশ, দেশি ঋণ প্রায় ২১ শতাংশ। আমাদের বিদেশি ঋণ পরিশোধের গড় মেয়াদ হলো

১০–১১ বছর বা একটু বেশি। এখন এর মধ্যে কয়েকটি বিদেশি ঋণ ম্যাচিউর হয়ে গেছে। এটিও তো একটি বড় সমস্যা। আপনি কিভাবে দেখছেন?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিদেশি ঋণ আমাদের জন্য নেতিবাচক—এটি ভাবার প্রয়োজন নেই। একটি উদীয়মান অর্থনীতিতে সব সময় সম্পদের চাহিদা থাকে এবং সেখানে বিনিয়োগের চাহিদা থাকে। প্রশ্ন হলো, আপনি সেই ঋণ নিয়ে কোন ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করছেন? সেই প্রকল্পগুলো থেকে আপনি সময়মতো রিটার্ন পাচ্ছেন কি না? দুর্ভাগ্যবশত এই জায়গায় আমরা বড় চ্যালেঞ্জ দেখেছি। অবকাঠামো খাতের অনেক প্রকল্প ইতিবাচক ফল দিলেও প্রকল্পের সময়কাল দীর্ঘায়িত হয়েছে। এতে এর ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে, রিটার্ন সময়মতো আসেনি। এই যে বিপুল বিনিয়োগ সেখানে করা হলো, এটি পরিশোধ করতে গিয়ে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে বা হবে। সুতরাং ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণের যৌক্তিকতা দেখা, কতটা উপযুক্ত সেটি দেখা, ঋণের শর্তগুলো দেখা এবং সে অনুযায়ী ঋণ করে কার্যক্রম নিতে হয়। বিগত দশকে আমাদের এমন কিছু ঋণ হয়েছে, যার সব কটিই যে ইতিবাচক হয়েছে, তা বলব না।

কালের কণ্ঠ: আর্থিক খাতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। বাজেটে ঘাটতি আছে। ঘাটতি পূরণে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে দেখছেন?

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আর্থিক খাত খুবই সুবিন্যস্ত একটি খাত। আন্তর্জাতিকভাবে যদি আমি বিবেচনা করি, যেখানে উন্নত দেশগুলো তাদের নীতি সুদ হার দিয়েও বাজারে মানি ফ্লো কমিয়ে দিতে পারে, বাজারের ব্যাপারে শক্ত বার্তা দিতে পারে যে আগামী দিনে কী আসতে যাচ্ছে, সে রকম আর্থিক খাতের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দেওয়া কিন্তু সম্ভব। দুর্ভাগ্য হলো বাংলাদেশে আর্থিক খাত এমনভাবে পরিচালিত হয়, আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা কখনোই কার্যকর দেখি না। যেমন বলা হয়ে থাকে, মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস করা হবে, সরকার সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মানে হচ্ছে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে যখন কমিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যটি নেওয়া হয়, সেটি প্রাইভেট সেক্টর কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। বেসরকারি খাতের ঋণকে টেনে ধরা হয়। সরকারের উচিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার চাহিদাটা কমিয়ে রাখা। কিন্তু সরকার প্রায়ই সেটি করে না। তখন বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে দেওয়াটা ইতিবাচক থাকে না। বরং বাজারে মুদ্রাস্ফীতির কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিক কাজ না করতে পারার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর যেভাবে তার ঋণ সরবরাহ করা দরকার, তার যে ডিউটিলিজেন্সগুলো মানা দরকার অথবা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে যেভাবে তার ঋণ দেওয়া দরকার—২০১৯ সাল থেকে ব্যাসেল-৩ একটি মানদণ্ড মানার কথা, সেটির কাছাকাছি আমরা নেই। ব্যাংকগুলোর লোন ইকুইটির রেশিও ব্যালান্স করে ঋণ দেওয়ার কথা, সেটিও সে মানছে না। যাকে ঋণ দিচ্ছে, তার যে কমার্শিয়াল ডাটা দেখা দরকার, সেটিও দেখছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এগুলো মনিটর করছে না। নিয়ন্ত্রণ করছে না। খেলাপি ঋণ এখন সম্ভবত এক লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা। সরকারের যে লোনগুলো

অবলোপন করে দিয়েছে ব্যাংকগুলো, যে লোনগুলো বিভিন্ন কারণে আটকে আছে, এগুলো যদি সব বিবেচনায় নিই, তাহলে কিন্তু অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ চার লাখ কোটি টাকার ওপরে। উপরন্তু ব্যাংক কোম্পানি আইন যখন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতামত হয়তো বিবেচনা করা হচ্ছে না। সেখানেও রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ব্যাংকের পরিচালকের সংখ্যা, তার মেয়াদকাল পারিবারিকভাবে থাকার সময়কাল বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো কম্প্যারেটিভ স্ট্রাকচারের পরিপন্থী; যেটি হওয়ার কথা নয়। ব্যাংকিং খাতের চেয়েও বেশি দুর্বল নীতি পুঁজিবাজারে। পুঁজিবাজারের করুণ দশা। একই রকম অবস্থা বীমা খাতে।

কালের কণ্ঠ: আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আপনাকেও ধন্যবাদ।

অনুলিখন: রায়হান রাশেদ

কালের কণ্ঠ
১৯ আগস্ট ২০২৪

চতুর্মুখী প্রত্যাশা পূরণই হবে মূল চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক বহুমাত্রিক চাপের সম্মুখীন হয়, যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভের পতন, বিনিময় হারের অবনমনসহ অর্থনীতির বিরাজমান সমস্যাগুলো নিকট অতীতে ক্রমান্বয়ে আরো গভীরতর হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন জরুরি করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি, পুজিবাজারে অস্থিরতা, রাজস্ব আদায়ে দুর্বলতা, অর্থনীতি পরিচালনায় ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ও গদিনসীন রাজনৈতিক শক্তির প্রভাব-প্রসূত আযাচিত হস্তক্ষেপ এবং সামগ্রিকভাবে সুশাসনের অভাব সামষ্টিক অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করেছে, আয়, সম্পদ ও ভোগ বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং এসবের প্রতিকারের নিমিত্তে সংস্কারের দাবীকে এখন সামনে নিয়ে এসেছে। বিগত এক মাসে ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা, রপ্তানিমুখি কার্যক্রম, যোগাযোগ সংযোগসহ বিভিন্ন খাত নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে, সরবরাহ চেইন অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে যার পুনর্জীবনে কাজ করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে বিভিন্ন সংস্কারমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী উঠেছে, এবং তা একটা অভূতপূর্ব প্রত্যাশার চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এ চতুর্মুখী চাপ সামাল দিতে হবে, এসব চ্যালেঞ্জের নিরীখে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, এবং ছাত্র-জনতার ত্যাগকে মর্যাদা দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন এক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যখন জুলাই মাস মূল্যস্ফীতির হার (মাস বনাম মাস এর তুলনায়) আরো বেড়েছে– বিশেষত খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ২০২৩–২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতি ছিল সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে শ্লথ, লক্ষ্যের মাত্র ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। রিজার্ভের অবনমন

অব্যাহত রয়েছে, আমদানি নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা সত্তেও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নাজুক, ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিকভাবে লেনদেন ও এল.সি খোলার ক্ষেত্রে নানামুখি সমস্যার সম্মুখীন, ফিচ্ সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং নামিয়ে এনেছে। ব্যাংকের খেলাপি ঋণের অর্থের পরিমাণ বেড়ে ১ লক্ষ ৮২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাসেল -৩ অনুসরণ করলে তা প্রথামাফিক হিসাব মতে ১০ শতাংশ থেকে প্রকৃত বিচারে তার দ্বিগুণেরও বেশি হবে বলে অনুমান করা যায়। জানা কথা, আমাদের রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত তুলনীয় দেশের নিরিখে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। চলমান ২০২৪–২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ সপ্তাহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে সে প্রেক্ষিতে অর্থবছরের জন্য যেসব লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে সেগুলো পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ উভয়ই ক্রমাণ্বয়ে বেড়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে ঋণ পরিষেবার দায়ভারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একুশ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। রিজার্ভের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বছরে চার বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায়ভার অর্থনীতির ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করবে। সবকিছু মিলিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর যে নানামুখী চাপ সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে সেগুলোর মোকাবেলা সহজ হবে না। এজন্য সক্রিয় উদ্যোগের সাথে সাথে প্রয়োজন হবে সময়েরও।

আমাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেদিকটা দেখতে হবে। সরবরাহ চেইনের মধ্যবর্তী যেসব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী আছে তাদেরকে নিয়ম-নীতির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। সিন্ডিকেশন, তা আমদানি পর্যায়ে হোক বা স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে হোক, ভেঙ্গে দিতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কথা অনেকদিন থেকেই বলা হচ্ছে। উৎপাদক স্তর থেকে ভোক্তাস্তর এবং আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তর অবধি সরবরাহ শৃঙ্খলে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং বাধা অপসারণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরবরাহ-চাহিদার নিরীখে সময়মতো আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মজুদ প্রয়োজনমাফিক রাখতে হবে। বাজার মূল্যকে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে পণ্য মজুতকে কৌশলীভাবে ব্যবহার করতে হবে। তা হলে অন্তত নির্দিষ্ট কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা কমানো সম্ভব হবে, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে। বাজার ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করতে হবে, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলো স্বল্প-মেয়াদের; কিছু আছে মধ্য মেয়াদের। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা সে মাফিক সাজাতে হবে।

আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা ও বিনিয়োগকারী স্বার্থ রক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করতে হবে। বিনিয়োগের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সঠিকভাবে সেবা দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণের সাথে সরবরাহের নিশ্চয়তা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক মুদ্রার মজুত, সবকিছুই জড়িত। প্রযুক্তি, প্রণোদনা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের

কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে স্থবিরতা দেখেছি সেক্ষেত্রে আস্থা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার জন্য ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আনতে হলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে প্রকৃত অর্থে কার্যকর করতে হবে। তা করতে গেলে বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

ব্যাংকিংখাতের সংস্কার অবশ্যই অগ্রাধিকারের দাবিদার। এর দু'টো দিক আছে। অতীতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে পরিবর্তনমুখী ও সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ। এসব করা সম্ভব হলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা তার ইতিবাচক অভিঘাত দেখতে পাবো। কর্মসংস্থান বাড়াতে হলেও এ কাজগুলো করা দরকার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যে কর্ম পরিকল্পনার কথা ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার অনেক বেশি। শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষায় নাই, প্রশিক্ষণে নাই, কর্মসংস্থানে নেই। এর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিত যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ, দক্ষতার ভিত্তিতে পদায়ন ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। যুব শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে নিয়ে গভীরভাবে ভাবার দরকার আছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে পুঞ্জীভূত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিরাজনীতিকরণ করতে হবে। ছাত্রদের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের প্রশ্নে, মেধার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, এটা মনে রাখতে হবে। তাকে সম্মান দিতে হবে। কোটা বিরোধী আন্দোলন পরবর্তী সময়ে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে উন্নিত হয়েছিল। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য ছাত্র-যুবাদের, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। সেই বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হবে তাদের জন্য উন্নত জীবন ও কর্ম সহায়ক শিক্ষা, ইতিবাচক কর্ম পরিবেশ ও বৃহত্তর কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে, দেশে ও দেশের বাইরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের জন্য তাদের প্রস্তুত করার মাধ্যমে। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তরুণদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা ঋণ নিয়ে যে অর্থ ব্যয় করছি তা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে প্রয়োজনমাফিক তার পুনর্বিবেচনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নতুন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক ও নির্বাচিত হতে হবে। চলমান ও সমাপ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ক্ষেত্রে যেসব বিচ্যুতি-দুর্নীতি হয়েছে তার কার্যকরণ উদ্ঘাটন করে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতিকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঋণ খেলাপী, কর খেলাপী ও টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে শূন্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

মূল্যস্ফীতির কারণে ক্রয়ক্ষমতার যে অবনমন হয়েছে তা স্থির আয় ও নিম্ন আয়ের মানুষের সাথে সাথে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তকেও বিপর্যস্ত করেছে। তাদের জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে গেছে। তাদেরকে কিভাবে স্বস্তি দেয়া যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভিত্তি, প্রাপ্তি, স্থায়িত্ব বাড়াতে হবে।

মূল্যস্ফীতি হ্রাসের মতো চ্যালেঞ্জ এক দিনে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আর মূল্যস্ফীতি আগামীতে কিছুটা হ্রাস পেলেও মূল্যস্তর কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক উপরেই স্থিত থাকবে। সুতরাং, প্রকৃত বিচারে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সেজন্য এখনই কাজ শুরু করতে হবে। উদ্যোক্তাদের লভ্যতা নিশ্চিত করে কিভাবে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে এবং একই সাথে শ্রমিকদের জন্য শোভন মজুরী ও শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য-উপাত্তের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিগত সময়ে অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়টিও নীতিনির্ধারকদের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবী রাখে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের ওপরে অযাচিত প্রভাব বিস্তার করে যথাযথ তথ্য উপাত্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস, এনবিআরসহ বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ও প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক তথ্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত, এটা স্বীকার করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করতে হবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবং করণীয়সমূহকে শনাক্ত করে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ সরকার পুঞ্জীভূত চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে পারবেন, সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করবেন, বিনিয়োগ পরিবেশকে উন্নত করবেন, মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনবেন— জনমনে এসব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা দুই-ই আছে। ছাত্র-জনতা, যাঁরা এত বড় আন্দোলন করেছেন, আত্মহুতি দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রত্যাশার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

এ প্রত্যাশা পূরণ অন্তর্বর্তী সরকারেরও অংগীকার বটে। কৌশলীভাবে, সঠিক তথ্য ও গবেষণা ভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, যৌক্তিক পদক্ষেপ ও সংবেদনশীলতার সমন্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যাপক জনগণের সমর্থন ও আস্থাকে শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করে নতুন সরকার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চতুর্মুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমর্থ্য হবে, প্রত্যাশার চাপ সামাল দিতে পারবে, এ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

খবরের কাগজ
২০ আগস্ট ২০২৪

অধ্যায় ২

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও মূল্যস্ফীতি

নতুন বছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যা জরুরি

ড. ফাহমিদা খাতুন

নতুন বছরের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ভর করছে আগের বছর অর্থনীতি কেমন ছিল তার ওপর। ফেলে আসা ২০২৩ সালটি কেমন ছিল তা যদি দেখি তাহলে খুব ভালো কিছু আমরা দেখতে পাইনি। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে যে সংকটগুলো শুরু হয়েছিল তা ২০২৩ জুড়েই আমাদের ভুগিয়েছে। কোনো কোনো সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন বছরের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ভর করছে আগের বছর অর্থনীতি কেমন ছিল তার ওপর। ফেলে আসা ২০২৩ সালটি কেমন ছিল তা যদি দেখি তাহলে খুব ভালো কিছু আমরা দেখতে পাইনি। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে যে সংকটগুলো শুরু হয়েছিল তা ২০২৩ জুড়েই আমাদের ভুগিয়েছে। কোনো কোনো সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখা গেছে। ২০২৪ সালে আমরা পা দিয়েছি ২০২৩ সালের সমস্যা নিয়েই। এখন যদি বলেন কোন কোন সমস্যা। তাহলে প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের মূল্যস্ফীতি সমস্যার কথা। আমাদের ২০২৩ সাল জুড়েই কিন্তু মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে ছিল। সেটা ২০২৪ সালেও কিছুদিন পর্যন্ত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমানোর প্রচেষ্টাটা আমাদের আগেই করা উচিত ছিল; তাতে দেরি করেছি। সুদের হার বাড়িয়ে অন্যান্য দেশ মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা করেছে। আমাদের এখানে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পর সুদহার বাড়ানো হয়েছে। ২০২২–২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য যে মুদ্রানীতি দরকার ছিল তার প্রয়োগ আমরা দেখিনি। ২০২৩–২৪ অর্থবছরের শুরুতে এসে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। সেটাও আবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পালনের অংশ হিসেবে নেয়া হয়েছে। আইএমএফ থেকে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের শর্তের মধ্যে ছিল সুদহার, টাকা-ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ বাড়াতে হবে। আইএমএফের পরামর্শে সুদহার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো কিন্তু একটা পলিসি কার্যকর হতে তো

কিছুটা সময় লাগে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে কোনো পলিসি এককভাবে সব পরিবর্তন আনতে পারবে না, সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরি। যেমন মূল্যস্ফীতির কথাই ধরা যাক, যদি রাজস্ব নীতি সংকোচনমূলক না হয় তাহলে স্রেফ সুদহার বাড়িয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। সরকার যদি দেদার খরচ করে যায় তাহলে তো মুদ্রানীতিটা ঠিকভাবে কাজ করবে না। বাজারে অর্থের সরবরাহ কমাতে চাইলে কিন্তু সরকারের পরিচালন ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয় এগুলো কমানো দরকার। অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে ব্যয় কমিয়ে প্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে কিছু প্রকল্প স্থগিত বা বাতিল করতে হতে পারে। মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে।

আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতির পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক ও রেগুলেটরি ব্যর্থতা রয়েছে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাপনায় একটা ত্রুটি দেখা যায়। বাজারে অনেক ধরনের খেলোয়াড় থাকে যারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পণ্য আমদানিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মনোপলি দেখা যায়। এতে বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে তাদের ক্ষমতা থাকে। হয়তো কখনো তারা অজুহাত দেয়, আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি দাম থাকায় তাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এ কারণে তাদের বেশি দামে বাজারে ছাড়তে হচ্ছে। কিন্তু এখন তো আর সেই অজুহাতটা দেয়া সম্ভব না। দেখা গেছে, কম দামে আমদানি করলেও আগের বর্ধিত দাম রেখে দিচ্ছে। এতে দ্রব্যমূল্য কমছে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমদানি পণ্যের দামের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপাদিত পণ্যের দামও বেড়ে যায়। এটা ব্যবসায়ীদের একটা কারসাজি। আমাদের দেশে এত শাকসবজি বা কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন হচ্ছে তাতে তো সংকট হওয়ার কথা নয়। সাধারণত, বাজারে দাম নির্ধারিত হয় সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে। বাজারে সরবরাহের ঘাটতি নেই, তাহলে হঠাৎ করে দাম উল্লম্ফন করার কথা ছিল না। অথচ কয়েকদিন পরপর আমরা এমন দৃশ্যই দেখছি। কখনো কাঁচামরিচ, কখনো-বা আলু, ডিম, পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। বাজারে যে কারসাজি হচ্ছে তা এ বাজার ব্যবস্থাপনারই দুর্বলতা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মুক্তবাজারে আবার ব্যবস্থাপনাটা কীসের? মুক্তবাজারে তো অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ হয়। আমাদের এখানে সিন্ডিকেশন কাজ করছে যা অবৈধ। এ ব্যাপারে তো পদক্ষেপ নিতেই হবে। কিন্তু আমাদের এখানে সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ দেখছি না। তারা আইনের ঊর্ধ্বে থেকে যাচ্ছে এবং যখন ইচ্ছা বাজারকে ম্যানিপুলেট করছে। অন্যদিকে, বাজারে তদারকির কথা বলে আমরা দেখি ছোট কোনো দোকানদারকে জরিমানা করা হচ্ছে। কিন্তু ওই ছোট দোকানি তো বেশি দামে কিনছে অন্য একটা জায়গা থেকে। সেইভাবে ব্যবস্থাপনা আমরা বলছি না। দোকানে দোকানে হানা দিয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ চমকপ্রদ হলেও বাজার নিয়ন্ত্রণে তা যথেষ্ট নয়। বাজারে যারা মূল খেলোয়াড় তাদেরকে নিয়ম-কানুনের আওতায় আনতে হবে এবং একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাজার কারসাজির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলে তা উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে।

দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন করাও কিন্তু নীতিনির্ধারকদের কাজ। এই যে ঢাকায় একটি মাংসের দোকানে ৫৯৫ টাকায় গরুর মাংস পাওয়া যাচ্ছে। এতে কিন্তু অন্যরা দাম কমাতে বাধ্য হয়েছে। অনেকেই এখন প্রতিযোগিতামূলক দামে মাংস কিনতে পারছে। বাজারে এ রকম যারা উদ্যোগ নিচ্ছে সেগুলোকে উৎসাহিত করা উচিত। কোনো একটি মাংসের দোকান যদি কম দামে বিক্রি করতে পারে অন্যরা কেন পারছে না? এখানেই আসে হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি। ভোক্তা অধিকার ও কম্পিটিশন কমিশনকে আরো বেশি যুক্ত ও আরো প্রো-অ্যাকটিভ হওয়া উচিত। আলোচিত একটি মাংসের দোকানের মতো ছোট ছোট উদাহরণ আসলে প্রমাণ করে যে বাজার কীভাবে পরিচালিত হয়। এখানে যারা বড় খেলোয়াড় তারা অনেক প্রভাবশালী। এ জিনিসটা শুধু যে বাজারে তা নয়, অর্থনীতির অন্যান্য জায়গাতেও এ রকম প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য আছে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে বাজারে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

দেখা গেছে, প্রধান খাদ্যশস্য যেমন চাল, গম, তেল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি আমদানি করতে হয়। যদিও সরকার থেকে দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের যে হিসাবটা করা হচ্ছে তা পুনরায় হিসাব করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের চাহিদা কত, আমাদের উৎপাদন কত এবং আমাদের কতটুকু আমদানি করতে হবে—এখানে একটা ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। এখানে অংকের হিসাবটা মিলছে না। আমাদের কৃষকরা কেমন উৎপাদন করছেন, বিক্রি করছেন তার সঠিক তথ্য থাকা চাই। আমাদের বাজারে মোট চাহিদা কত এবং ঘাটতি কত তাও জানা চাই। তারপর আসে কতটুকু আমদানি করব সে সিদ্ধান্ত। শুধু কৃষিতে বাম্পার ফলনের একটা সংখ্যা দিয়ে বাহবা কুড়ালাম তাতে কিন্তু সমস্যা কাটছে না। আমাদের হাতে উৎপাদন ও চাহিদার প্রকৃত তথ্য থাকলে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, বাজারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়লেও আমাদের কৃষকরা কিন্তু তার সুবিধা পাচ্ছেন না। তারা অনেক ব্যয় করে ফসল উৎপাদন করে বাজারে তোলার পর দেখা যায় দাম নেই। উৎপাদন খরচ তুলতে কষ্ট হয়, লাভ তো দূরের কথা। আমরা তো দেখেছি ক্ষুব্ধ কৃষক রাস্তায় আলু, টমেটো ফেলে দিচ্ছেন, দুধ ফেলে দিচ্ছেন। আমরা কেবল দাম বাড়লেই হাহাকার করে থাকি। কৃষকরা যে মুনাফা পাচ্ছেন না, মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেট সুবিধা নিয়ে নিচ্ছে তা এড়িয়ে যাই। এখানেই আসে বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি। আমরা সব সময় বলি, ধান উৎপাদনের পর কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য দামে সরকার সরাসরি কিনে নেবে। এতে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন তেমনি বাজারেও শৃঙ্খলা থাকত। তাতে করে ভোক্তারাও একটু স্বস্তি পেত।

বণিকবার্তা
৭ জানুয়ারি ২০২৪

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কি ভুল পথে নামছি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যে বললেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) মার্কিন ডলারের সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছিল, তা ঠিক নয়। আমরা বলেছিলাম, ডলারের বাজারদরকে অর্থনীতির অন্য সব চলকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। যত দূর মনে পড়ে, অবমূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছিল মূলত তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। তারা এ দাবি সব সময়ই করে থাকে। অর্থমন্ত্রী হঠাৎ পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কেন সিপিডিকে মিলিয়ে এ প্রসঙ্গ তুললেন, তা জানি না। এর ওপর মন্তব্য করা কঠিন।

তবে টাকার মূল্যমান যে চাহিদা ও জোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত, তা আমরা বলি। এটা করতে গেলে মুদ্রানীতির সঙ্গে আর্থিক নীতির সমন্বয় থাকা যে জরুরি, তা-ও আমরা বলে থাকি। তা না হলে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার টাকার মূল্য অবনমনের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে, তা মোকাবিলা করতে হয় আর্থিক নীতির মাধ্যমে। আর্থিক নীতির সঙ্গে সংযোগ থাকতে হয় মুদ্রানীতির। আর্থিক নীতি প্রণয়ন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মূল কাজের মধ্যে পড়ে। মুদ্রানীতি প্রণয়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ; মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

সম্প্রতি আমরা ডলারের একাধিক হার দেখতে পেয়েছি। এর খারাপ প্রভাবও দেখা গেছে। চার মাসেই টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ২০ শতাংশ। গড়ে উঠেছে ডলারের কালোবাজার, যেখানে ডলারের দাম আনুষ্ঠানিক দরের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত টাকা বেশি থাকে, এমনকি আরও বেশি। এটা অনেকটা বাজারের সমান্তরাল বাজার। আধুনিক অর্থনীতির লক্ষণ এটা নয়। বিষয়টি হলো, অর্থনীতির সঙ্গে যোগসূত্র আছে, দেশে এমন সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নীতিগত সমন্বয়হীনতা আছে। তা আছে বলেই আমাদের আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে যেতে হয়েছে।

গণমাধ্যমে দেখলাম, মূল্যস্ফীতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, 'অর্থনীতির জন্য মূল্যস্ফীতি জরুরি। যাঁরা অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করেন না, তাঁরা মূল্যস্ফীতি না চাইতে পারেন'। আমরা দেখেছি, ২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষকে কতটা ভুগিয়েছে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি বাদ দিলে দেশে টানা ৯ মাস মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ শতাংশের ওপর; বলা যায়, ১০ শতাংশের কাছাকাছি, তা-ও আবার সরকারি পরিসংখ্যানে।

অর্থমন্ত্রী কীভাবে এত উচ্চ মূল্যস্ফীতির পক্ষে অবস্থান নিলেন, তা জানি না। তবে এটা ঠিক, অর্থনীতিতে ন্যূনতম মূল্যস্ফীতি থাকতে হয়, সেটা বড়জোর ৪ থেকে ৫ শতাংশ। দেশে এক বছর ধরে যে মূল্যস্ফীতি চলছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং অন্যায্য। ৮ থেকে ৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কারণ হয়। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে লেনদেনের ভারসাম্য বজায় থাকে না এবং ব্যবসায়ীদের ঋণপত্র (এলসি) খুলতেও সমস্যা হয়। রপ্তানিকারকদের রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যায়।

তথ্য-উপাত্তের বিভ্রান্তি তৈরিসহ অর্থমন্ত্রী এখনো যেসব কথা বলছেন, সেসব কথা ও এমন মনোভাব আমরা ভয় পাই। মনে হয়, বিরাজমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আবারও কি ভুল পথে নামতে যাচ্ছি আমরা?

প্রথম আলো
৯ জানুয়ারি ২০২৪

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটাতে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা’ দেখাতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

নতুন একটি বছর শুরু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার আগে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনমানের অবনমন ঘটেছে, যা কাটিয়ে ওঠা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমাতে নীতি সুদহার বাড়ানো হয়েছে; যা চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সহায়তা করবে। তবে সরবরাহ নিশ্চিতের বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজন হলে সময়মতো আমদানি করে মজুত বাড়ানো উচিত। বাজারে সিন্ডিকেট ও মধ্যস্থতাকারীদের অন্যায্য হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ডলার সংকটের কারণে মূলধনী যন্ত্রপাতিসহ বেশকিছু ক্ষেত্রে আমদানিতে এলসি খুলতে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে হবে। এ জন্য ডলার সংকট দূর করতে হবে। ব্যাংকিং খাত ও রাজস্ব খাতে সক্ষমতা বাড়িয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ব্যাংকিং সিস্টেমের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে ঋণখেলাপি কমাতে হবে।

বর্তমানে সব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা’ নীতি প্রয়োগ করতে হবে। খেলাপি ঋণ, কর ফাঁকি, অর্থ পাচার, হুন্ডি-হাওলা, সিন্ডিকেশন ইত্যাদি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায়োগিক দিকে আরও নজর দিতে হবে।

সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার পাশাপাশি সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। পরিষেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এসব ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব বড় ধরনের সংস্কার কার্যক্রম নিতে হবে। কিন্তু সংস্কার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী এ ধরনের সংস্কার কাজ নিতে দেয় না। অনেক সময় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা প্রয়োগে এসব গোষ্ঠীই বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে নতুন সরকারকে দেশের স্বার্থে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফেরাতে দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বর্তমানে সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। এসব সংস্কার বাস্তবায়নে তাদের পক্ষ থেকেও জোর তাগিদ রয়েছে। কিন্তু শুধু আইএমএফের শর্ত পূরণের কারণেই সংস্কার করব– এটি ভাবলে ফল পাওয়া যাবে না। নিজেদের অর্থনীতির ভালো ব্যবস্থাপনার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। তাই এসব ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী শ্রম ইস্যু আলোচিত হচ্ছে। সারাবিশ্বে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র নতুন নতুন শ্রম অধিকার স্মারক গ্রহণ করেছে। এসব কারণেই আমাদের দেশেও শ্রমিকদের শোভন কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং শোভন মজুরিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ জন্য উদ্যোক্তাদের দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। অনেক দেশের সরকার শ্রমিকদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়। বাংলাদেশ সরকারও এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে। একই সঙ্গে ক্রেতাদেরও পণ্যের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে।

সমকাল
৯ জানুয়ারি ২০২৪

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের সামনে অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো নিয়েই নতুন সরকারকে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। বিগত সময়ে অর্থনীতির ওপরে আমরা যে চাপ দেখেছি, সে চাপগুলো এখনো রয়ে গেছে। অন্যদিকে নির্বাচিত সরকার নতুন করে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। তাদের সামনে একদিকে মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈদেশিক রিজার্ভের নিম্নগতি, রাজস্ব জিডিপির নিম্নহার ইত্যাদি রয়েছে। অন্যদিকে খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, টাকার অবমূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই ২০২৩ সাল শেষ হয়েছে। কাজেই বর্তমান সরকারকে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেই অগ্রসর হতে হবে। সেখানে মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসহ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো মোকাবেলা করতে হবে। সুশাসনের সঙ্গে সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে নজরদারি বাড়াতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রথম যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা হলো, মূল্যস্ফীতি রোধ করা। এটা নিম্ন আয়ের মানুষকে বড় ধরনের একটা চাপের মুখে ফেলে দিয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ব্যক্তি খাতে ঋণ গ্রহণের ওপরেও এর একটা প্রভাব পড়বে। তা ছাড়া সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কীভাবে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি উন্নত করতে পারি, সে দিকটা নজরে রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আমরা কতটা সাশ্রয়ীভাবে সুযোগ করে দিতে পারি, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা শক্তিশালী করতে হবে। প্রান্তিক আয়ের মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যস্ফীতি রোধ বিবেচনা করে বাজার ব্যবস্থাপনার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তর বা উৎপাদক স্তর থেকে ভোক্তা স্তরে মধ্যস্বত্বভোগী যারা আছেন তারা বাজারে এক ধরনের সিন্ডিকেট করার চেষ্টা করছেন। সেগুলো নজরদারির আওতায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে দেশে যারা ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত, তাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার যে আইন প্রণয়ন করা আছে, সেটা কার্যকর করতে হবে। আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমান মুদ্রানীতিতে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং সেক্টরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবীভাবে করতে হবে। যারা স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি হিসেবে গণ্য হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। দেশের বহিঃখাত একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং রাজস্ব আয়ের বড় একটি অংশ ঋণের পরিষেবায় চলে যাচ্ছে। সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা বৈদেশিক ঋণ থেকে বিনিয়োগ করেছে, সেক্ষেত্রে যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকে, সেদিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং লক্ষ রাখতে হবে তা যেন সাশ্রয়ীভাবে করা সম্ভব হয়। তাহলে বিনিয়োগ থেকে আমরা যে রিটার্ন আশা করছি সেটা পাব।

আমাদের যে অবকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে তা অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে। একটি হলো যেকোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ব্যয় হয় সেদিকটা আমলে নেওয়া উচিত। নিজস্ব দায়ভার ও পরিষেবাদানের ক্ষেত্রে এক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটাও কিন্তু একটি বড় সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কাজেই কিছুটা জায়গায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি সাবধান হওয়ার দরকার আছে। আমরা জানি যে, রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া বিনিময় হারের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ অবনমন নীতির ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে সেটাই বলা হয়েছে।

বাজারের সঙ্গে আমাদের সমন্বয় রক্ষা করা জরুরি। এখানে অনেক ধরনের দুর্বলতা দেখেছি। বিশেষ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা যায়। এসব বিষয়ে সব সময় নজর দিতে হবে। অর্থনৈতিক একটা টিম তৈরি করতে হবে। সেটি যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেদিকে আমাদের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অনেক সময় দেখেছি, অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করেও সমাধান পাওয়া যায় না। এবার সময় এসেছে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা দক্ষভাবে বাস্তবায়নের দিকে নজর দেওয়ার।

তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি মধ্যমেয়াদি চ্যালেঞ্জ যেগুলো আছে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সেবাদানের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; অন্যদিকে আমরা যেন রাজস্ব আহরণ বাড়াতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে। ডিজিটালাইজেশনের দিকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা অনেক অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করেছি। যোগাযোগব্যবস্থাসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। একই সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আঞ্চলিক বাজারে আমরা যেন রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারি, সেদিকটা অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। দেশের যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিশ্ববাজারে ঢোকার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গেলে প্রযুক্তি ও শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। সেগুলো মোকাবেলা করার ঝুঁকিও নতুন সরকারের সামনে আসছে। এ বিষয়গুলো ইনক্লুসিভভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে ভবিষ্যতের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে। নিজস্ব আর্থ-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপরে আস্থা রাখতে হবে। একই সঙ্গে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ ও মানোন্নয়নে আরও মনোযোগী হতে হবে। আমরা যেন ঘাটতির জায়গাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারি সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। তা না হলে এই সংকট মোকাবেলা করা কঠিন হবে।

খবরের কাগজ
২৫ জানুয়ারি ২০২৪

মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মোকাবেলায় এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

ডলারের মূল্য ও সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে মূল্যস্ফীতিতে নেতিবাচক অভিঘাত থাকবে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা আরো জোরদার করতে হবে। সামষ্টিক অর্থনীতির উৎকর্ষে আরো বেশি নজর দিতে হবে।

বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণে ঋণের সুদ আপাতত আরো বেড়ে যাবে। ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে ডলারের দাম বাড়ানো হয়েছে—এটা ঠিক। যদিও আগে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ডলারের দর ১১০ টাকা ছিল, তখন ব্যাংকগুলো থেকে ১১৭–১১৮ টাকায় কিনতে হয়েছে।

এই দর সমন্বয় করতে ডলারের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। এখন নতুন সিদ্ধান্তের পর তাৎক্ষণিকভাবে খোলাবাজারে ডলারের দাম ১২৪–১২৫ টাকা উঠলেও তা আবার নেমে আসবে।

এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে এটা ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না। দেশের প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

তবে এই সিদ্ধান্ত অনেক আগে নেওয়ার জন্য আমরা বলে আসছি। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে আমানতের সুদ ৬ শতাংশ এবং ঋণের সুদ সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে বেঁধে রেখে ছিল। ডলারের দাম দীর্ঘদিন আটকে রাখায় সমন্বয় হয়নি। যার বিরূপ প্রভাব এখন পড়ছে। এই সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া হলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনেক নিচে থাকত।

মূল্যস্ফীতির বিরূপ প্রভাব এতটা পড়ত না। কম আয়ের মানুষের ওপর চাপ কম হতো।

এখন ডলারের মূল্যবৃদ্ধিতে আমদানি পণ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বাড়াবে, যা ভোক্তাদের আরো চাপে ফেলবে। তবে যারা আগে থেকে ১১৭-১১৮ টাকা দরে আমদানি করেছে, সেখানে এখন মূল্যস্ফীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা নয়। সরকার ১১০ টাকা ডলারে যেসব পণ্য এত দিন আমদানি করেছে, সেখানে সাত টাকা বেড়ে যাওয়ার চাপ থাকবে, এটা সত্যি। তবে নতুন করে ডলারের দামে অস্থিরতা তৈরি না হয় সেদিকে এখন নজর দিতে হবে। ডলারের নেতিবাচক প্রভাবে মূল্যস্ফীতির অভিঘাতে আমাদের পড়তে হবে। এক্ষেত্রে বাজার মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এখন থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। এ ছাড়া সুশাসন নিশ্চিত করে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনতে সরকারের বড় ভূমিকা নেওয়ার এখনই সময়।

মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি কমাতে উৎপাদন বাড়াতে এবং বাজারে পণ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত নিশ্চিত করতে আরো জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক সহযোগিতা দিতে হবে। পণ্যের জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য এনে মনিটরিং জোরদার করলে বাজার সহনীয় পর্যায়ে আসবে।

সুদহার বেড়ে যাওয়ায় বেসরকারি খাতে ব্যয় বৃদ্ধির চাপ তৈরি হবে। এতে যেমন বিনিয়োগ কমবে। পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাবে। ফলে কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এজন্য ব্যবসার পরিচালন ব্যয় কমানো ও ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতা লাগবে। এটি করতে পারলে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী হলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা প্রশমিত করা যাবে।

সরকারের এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে কিছুটা সুবিধা মিলবে। যারা সঞ্চয় করবে তারা প্রণোদনা বেশি পাবে। রপ্তানিকারকরা বেশি মুনাফা পাবেন। রেমিট্যান্সে প্রণোদনা হবে, যা বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াতে সহায়ক হবে। তবে আমদানি পণ্যে নেতিবাচক প্রভাব থাকবে।

কালের কণ্ঠ
১০ মে ২০২৪

মূল্যস্ফীতি ও করের চাপে পড়বে মানুষ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত ১৫ বছরে উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনীতিতে বেশকিছু সমস্যা ছিল। এসব সমস্যা হলো কর আদায় কম, বিনিয়োগ সংকট এবং বৈষম্য বৃদ্ধি অন্যতম। এসব মৌলিক বিষয়ের প্রতি খুব যত্ন আসছে বলে মনে হয় না। তবে সরকার কিছুটা হলেও সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাজেটের পদক্ষেপ দেখে মনে হয়, পুরোটা উপলব্ধি করেনি। কারণ বাজেটের মূল লক্ষ্য সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। আর মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার জন্য সংকোচনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে। প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। কিন্তু এ বছর এখন পর্যন্ত ৫ দশমিক ৮ শতাংশের কথা বলা হচ্ছে। তার মানে হলো প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা চলতি বছরের অর্জনের চেয়ে কম নয়, বেশিই ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে বলা হচ্ছে বিনিয়োগও বাড়বে। মোট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিনিয়োগ কমছে না। ফলে বাজেটের এই পদক্ষেপকে খুব বেশি সংকোচনমূলক বলা যাবে না। এর ফলে মূল্যস্ফীতি কমবে এটা বলা কঠিন। সবকিছু মিলে বলা যায়, এই সংখ্যাগুলোর বাস্তবতা নেই। আর বাস্তবতা যদি থাকে, তাহলে এর সঙ্গে মূল্যস্ফীতির সম্পর্ক কম থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো উন্নয়ন ব্যয়। এই ব্যয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচি ধরা হয়েছে জিডিপির ৫ শতাংশ। চলতি বছরে যা ছিল ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। এর মানে হলো উন্নয়নে ব্যয় কমলেও পরিচালন ব্যয় বাড়বে। অন্যদিকে সরকার যে উন্নয়ন ব্যয় করবে, তার পুরোটাই হবে ঋণের মাধ্যমে। এই ঋণের দুই-তৃতীয়াংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হবে বিদেশি উৎস

থেকে। আবার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের ৫৫ শতাংশই ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেওয়া হবে। এর মানে দাঁড়াল কী? ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এই পরিমাণ ঋণ নেওয়া হলে বেসরকারি খাতে জিডিপির ২৪ শতাংশ কীভাবে হবে, তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

তৃতীয় বিষয় হলো বৈদেশিক খাত। এই বৈদেশিক খাতের জন্য মধ্যমেয়াদি যে বাজেটীয় কাঠামো দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রপ্তানি আগের মতোই ৮ শতাংশ থাকবে। রেমিট্যান্স থাকবে ১০ শতাংশে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে বৈদেশিক খাতের চলতি হিসাব খুব বেশি ইতিবাচক নয়। তারপরও বলা হচ্ছে ৩শ কোটি ডলারের বেশি মজুত বাড়বে। এটি অর্জন করা কঠিন।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বড় জায়গা হলো প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বিনিয়োগ, বিনিয়োগের সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন এবং এর সঙ্গে বৈদেশিক খাত। অর্থাৎ একটার সঙ্গে আরেকটি সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে খাতগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা আগামীতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসছে। বলা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

কিন্তু আবার কর বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরোক্ষ কর বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ নতুন যে কর আসবে, তার দুই-তৃতীয়াংশ পরোক্ষ কর। তার মানে হলো আয় বাড়ানোর চাপ মানুষের ওপর পড়বে। একদিকে মূল্যস্ফীতি, অন্যদিকে আয়ের সম্প্রসারণ। এর চাপে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পড়বে। দরিদ্র পরিবারে সহায়তা কার্ড এবং খোলা পণ্য বাজারে বিক্রি কতখানি স্বস্তি দিতে পারবে এটি বলা কষ্টকর। একইভাবে যেসব সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে, সেখানে টাকার অঙ্ক না বাড়ালে জীবনমানের ওপর কতটা কার্যকর প্রভাব রাখবে, তা বলা কষ্টকর। অন্যদিকে সাধারণভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বাড়েনি।

যুগান্তর
৭ জুন ২০২৪

মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে এটা অবাস্তব

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। জাতীয় সংসদে বাজেট নিয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রস্তাবিত বাজেটটি কেমন হলো— এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং অংশীজনের মতামত জানতে চেয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা।

নানান অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে কেমন হলো এবারের প্রস্তাবিত বাজেট? এ নিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা হয় ভয়েস অফ আমেরিকার।

ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মলয় বিকাশ দেবনাথ।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সবচেয়ে ইতিবাচক দুটি দিক কোনগুলো? কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সংকট যাচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে সেটার স্বীকৃতি আছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক। অপরটি হলো, সরকার কম করে হলেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে সঞ্চয়ী বা সংযমী হওয়ার চেষ্টা করেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: সরকারের নেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ এবারের বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশ।

এর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বে? এ খাতে খরচ কমিয়ে আনার জন্য সরকারের কী ধরনের পদক্ষেপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঋণ নেওয়া হলে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এখানে ঋণ পরিশোধের জন্য যে বাজেট রাখা হয়েছে, তা থেকে কমানোর সুযোগ কম। কেননা, এটা নির্দিষ্ট করা আছে কোন সময়ে কত পরিশোধ করতে হবে। তবে যেটা শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, আগামী দিনে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা সংযমী হবো। পাশাপাশি কোন উৎস থেকে ঋণ নেবো, কোন প্রকল্পে ব্যবহার করব— এ বিষয়ে আরও বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। এবং একটি টেকসই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যাওয়া। যেন ঋণ ক্রমান্বয়ে ঝুঁকিতে পরিণত না হয় যা ইতোমধ্যে হয়েছে। কেননা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ঋণের ওপর করতে হচ্ছে এবং ঋণ করে ঋণ শোধ করছি। অর্থাৎ ঋণ ব্যবস্থাপনাটা একটা উন্নয়ন কৌশলের বড় বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকার সেদিকে মনোযোগ দেবে, এটাই প্রত্যাশা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এবারের বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা নেওয়া হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। ঘাটতি মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ খাত থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করা হবে তার ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকাই ব্যাংকিং খাত থেকে সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার নিজেই যদি এত বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেয়, তাহলে কী ধরনের প্রভাব দেশে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের ওপর পড়বে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঘাটতিটা আসলে খুব বড় বিষয় নয়। কেননা, এটা ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে আছে। এটা নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বিষয় হলো, ঘাটতিটা কীভাবে অর্থায়ন করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬০ শতাংশ; যার বেশির ভাগ ব্যাংকিং খাত থেকে যাবে বলে আলোচনা আছে। যদিও ঘাটতি কমানোর সুযোগ ছিল। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে সমস্ত প্রকল্প এখন না করলে হয়, সেগুলো স্থগিত করা। একইভাবে পরিচালন ব্যয়ের ভেতরে যেমন দামি গাড়ি কেনা, বড় বড় স্থাপনা— যা হয়তো এখন স্থগিত করা যেত। অর্থাৎ সাশ্রয়ী হবার সুযোগ ছিল। কিন্তু অর্থায়নের একটা বড় অংশ হলো, এখন ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করা হচ্ছে এবং খুব উচ্চ সুদে। এটা আরেকটা নতুন উৎস হচ্ছে করের বোঝা বাড়ার। আমরা একদিকে সঞ্চয়পত্র থেকে বের হচ্ছি, অন্যদিকে ট্রেজারি বন্ডের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছি। এটা আগামী দিনে আবার কষ্ট দেবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এবারের বাজেট বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বড় বিষয় হলো, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাচ্ছে। এর মানে বিনিয়োগ কমবে, কর্মসংস্থান কমবে। বিনিয়োগ কম হবার জন্য প্রবৃদ্ধি কমবে। বিনিয়োগ করার জন্য

এখন পরিবেশ খুবই প্রতিকূল। একদিকে কর আহরণের জন্য বিস্তৃতি বাড়াচ্ছে, ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া যাচ্ছে না, অপরদিকে আমদানির জন্য বিদেশি মুদ্রা দেওয়া যাচ্ছে না। এসব কারণে কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব আসবে অবধারিত। আমার কাছে মূল চিন্তার বিষয় যুব বেকারত্ব এ সময় বাড়বে। একমাত্র বড় কর্মসংস্থানের খাত হলো বিদেশে শ্রমিক পাঠানো। কিন্তু সেটা সমাজের একটা অংশমাত্র। কিন্তু শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য আগামীতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান।

ভয়েস অফ আমেরিকা: কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। অনেকে এ নিয়ে সমালোচনা করে বলছেন, বৈধ আয়ের ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ আয়কর ৩০ শতাংশ, সেখানে কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট ১৫ শতাংশ। ফলে এতে কর ফাঁকিকে উৎসাহিত করবে। নৈতিকতার প্রশ্নটি বাদ রেখেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কালো টাকা সাদা করার এ সুযোগ কতটা ইতিবাচক ফল দেবে বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এর মূলত চারটি সমস্যা। যে কারণে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছে, এটা কোনো যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। জমির মৌজামূল্য বাড়িয়ে অর্থাৎ বাজারদর অনুযায়ী করলে সেখানে করের হার কমিয়ে দিলে ক্রেতা-গ্রহীতার ওপর চাপ পড়বে না। দ্বিতীয়টি হলো, সাধারণ জনগণের জন্য ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা অদৃশ্য উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছে, তাদের জন্য ১৫ শতাংশ— এটা নৈতিকতা বিরোধী। আইন ভঙ্গ করে উপার্জন করলেও সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না— এটা মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থি। আরেকটি হলো, বাংলাদেশ সরকার দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক আলোচনায় অনেক দেশকে কথা দিয়েছে– তারা দুর্নীতিবিরোধী আচরণে থাকবে। শেষেরটি হলো, রাজনৈতিক যে অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এ দল নির্বাচনে গিয়েছিল, এখানে তারও লঙ্ঘন হয়েছে। কথায় আছে– 'জাতও গেল, পেটও ভরল না'।

ভয়েস অফ আমেরিকা: মূল্যস্ফীতি গত দু'বছর ধরে ৯ শতাংশের ওপর। এবারের বাজেটে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এটি কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব? এ জন্য বাজেট ঘাটতি কমানো ও কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর মন্ত্রী জোর দিয়েছেন? এগুলো বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা সরকারের কতটা রয়েছে? মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে, এটা অবাস্তব। সব থেকে বড় কথা হলো, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো সুগঠিত, সুচিন্তিত, বাস্তবসম্মত কৌশল বাজেটে নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: জনপ্রশাসন খাতে খরচ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিপুল পরিমাণ টাকা; যা শীর্ষ পাঁচ ব্যয় বরাদ্দ খাতের একটি। অথচ আমরা প্রতিবছরই দেখি বাজেট বাস্তবায়ন

ঠিকমতো করা যাচ্ছে না। যার জন্য জনপ্রশাসনের অদক্ষতাকে সমালোচকরা একটি প্রধান কারণ বলে মনে করে থাকেন। বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি না করে জনপ্রশাসন খাতে এ বিপুল বরাদ্দ কতটা যৌক্তিক? বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখানে বড় সংকট হচ্ছে জনপ্রশাসনের কোনো জবাবদিহিতা নেই। আর এটি না থাকলে বা এখানে সংস্কার না করা হলে দক্ষতা বাড়বে না, অপচয় কমবে না, সর্বোপরি দুর্নীতিও কমবে না। বাজেটে এ ধরনের উদ্যোগের কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। এতে অন্য যে নীতিগুলোর উল্লেখ আছে, তারও কার্যকারিতা থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: করের আওতা না বাড়িয়ে যারা কর দেয়, তাদের ওপরই করের বোঝা বাড়ানো হয়েছে এবারের বাজেটে, বলে সমালোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখানে দুটো সমস্যা হয়েছে। এক হলো, যারা প্রত্যক্ষ কর দেয় তাদের আওতা না বাড়িয়ে যারা কর দেয়, তাদের প্রান্তিক হার বাড়িয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যে কর আসবে তার দুই-তৃতীয়াংশ আসবে পরোক্ষ কর থেকে অর্থাৎ যাদের কর দেবার সামর্থ্য কম তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য সব ক্ষেত্রেই অভিন্ন ভ্যাট হার নির্ধারণ করাটা কতটা কার্যকর হবে? এবারেই কি এটি করা উচিত ছিল? কতদিনের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জনের টার্গেট নেওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সামগ্রিকভাবে সময় নিয়ে হলেও একটা অভিন্ন ভ্যাট আসতে হবে। তবে পৃথিবীর সব দেশেই এক ধরনের একক ভ্যাট চালু থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক খাতে রেয়াদ দেওয়া হয়; যেমন– শিশুখাদ্যে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আলাদাভাবে জেন্ডার বাজেট করার দাবি অনেকে করছেন। আপনি কি একমত? জেন্ডার বাজেট হলে কী ধরনের সুবিধা হবে? জেন্ডার বাজেটে কোন কোন দিকে প্রায়োরিটি দিতে হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জেন্ডার বাজেট আগের চেয়ে ভিন্ন হয়েছে। এটা ভালো। কিন্তু সমস্যা হলো বাজেট দিলাম, মূল্যায়ন করলাম না— সেটা হবে না। আগামী দিনে বাজেটের ভেতর জেন্ডার বাজেটের বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারি বিভাজিতভাবে মূল্যায়ন রাখতে হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না। কেন? এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? এর তিনটি ইতিবাচক দিক বলবেন? প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দর ক্ষেত্রে কোন কোন দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যা এবারের বাজেটে সেভাবে দেওয়া হয়নি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যবহার করতে হয় শান্তিরক্ষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। এবং এটা এখন জাতীয় না, আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিরা প্রতিরক্ষা বাজেটের পরিবীক্ষণ করেন। আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তা দেখভাল করে কিনা, আমার জানা নেই। কেননা, এটা দৃশ্যমান নয়। তবে এটা থাকা প্রয়োজন।

VOA বাংলা
১৯ জুন ২০২৪

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জোর দিতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আগের মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতায় নতুন মুদ্রানীতিও সংকোচনমূলক করা হয়েছে। এতে নীতি সুদহার বাড়ানো হয়নি। তবে নীতি সুদহার বাড়ানো হতে পারে, এমন আভাস দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ ১০ শতাংশ ও সরকারি খাতে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সরকার কীভাবে ঋণ নেবে, তা গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ ঠিক রাখতে সরকারের উচিত হবে ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে থেকে ঋণ নেওয়া। এদিকে ডলার বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে নগদ টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। এতে তারল্যসংকট হতে পারে।

বাস্তবতা হলো, সরকার আগের অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, তা পূরণ হয়নি। এবার মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকারের লক্ষ্য থাকবে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তা ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা। কিন্তু এবারও যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারে, তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বিনষ্ট হবে।

সমস্যা হলো, বাংলাদেশের মতো দেশে কেবল মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এর সঙ্গে সমন্বিতভাবে অন্যান্য ব্যবস্থা না নেওয়া হলে মুদ্রানীতির প্রভাব সীমিত হতে বাধ্য। খেলাপি ঋণ সমস্যার সমাধান না হলে ব্যাংক খাতে সংকট থাকবেই। সরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ কমবে; এর প্রভাব পড়বে বিনিয়োগে, কমে যাবে সরবরাহ। এতে মূল্যস্তর বেড়ে মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়তে পারে।

এবারের মুদ্রানীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্য স্বীকার করেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় প্রভাব পড়ছে। এই স্বীকারোক্তি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রাজস্ব নীতি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে যেতে হবে। কিন্তু মুদ্রানীতি ছাড়া অন্যান্য বিষয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে নেই। ফলে বিষয়টি শেষমেশ নির্ভর করবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর।

প্রথম আলো
১৯ জুন ২০২৪

উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি কেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এখানে দীর্ঘদিন ধরে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এখানে দীর্ঘদিন ধরে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (মাসিক অর্থনৈতিক প্রবণতা, বাংলাদেশ ব্যাংক)। যার ফলে অতিমাত্রায় মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ।

এ অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতির জন্য প্রধানত দায়ী বিগত সরকার। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির মতো মৌলিক পদক্ষেপ না নেয়া এবং কার্যকর নীতি গ্রহণে কালক্ষেপণ করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ক্রমে স্ফীত হয়েছে। এদিকে বর্তমানে বাজারদর কমার কোনো লক্ষণ না থাকায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছেই। এরই মধ্যে আবার বাজারে মুদ্রা সরবরাহের লাগাম টেনে ধরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক আরেক দফা নীতি সুদহার বাড়িয়েছে।

আমাদের দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কেননা যেখানে দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেখানে মুদ্রানীতি আশানুরূপভাবে প্রভাব রাখতে পারে না। এখানে অলিগোপলি আচরণ এবং বাজার কারসাজির মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের

মধ্যে স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটানো হয়, যা বাজারদর অস্থিতিশীল করে তোলে। যে কারণে আমরা দেখেছি যে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে বাড়তি দাম গুণতে হয়। অতিরিক্ত মুনাফা লাভে সরবরাহ শৃঙ্খলে এভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরির জন্য সিন্ডিকেটকে দায়ী করা হয়। এ অবস্থায় মুদ্রানীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে অসাধু, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও অলিগোপলি বাজার ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা জরুরি, যেমনটা প্রয়োজন বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়ানো।

বিগত সরকারের আমলে স্থানীয় দলীয় ক্যাডারসহ সংগঠিত দলগুলোর চাঁদাবাজির ঘটনা এক ধরনের স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপরন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনির সদস্যদের বিভিন্ন জেলা থেকে বাজার অভিমুখী পণ্যবাহী যানবাহন থেকে চাঁদাবাজি করার ঘটনাও প্রচলিত ছিল। এর সঙ্গে ছিল বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য, যা সরবরাহ শৃঙ্খলে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করত। দুর্ভাগ্যবশত এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ না হওয়ায় এখনো বাজারদর চড়া। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে ভয়াবহ বন্যার বিরূপ প্রভাব পড়েছে উৎপাদনে। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলো ব্যাপকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এতে সরবরাহ শৃঙ্খলে তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো চাপের মুখে ফেলেছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও ক্রমাগত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া থেকে সাধারণ জনগণকে বাঁচাতে ও কিছুটা স্বস্তি দিতে হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করতে নীতিনির্ধারকদের নিম্নোক্ত ১২টি বিষয় বিবেচনা করা উচিত মনে করি।

১. প্রকৃত প্রস্তাবে মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। বিগত অর্থবছরে দীর্ঘ সময় ধরে মুদ্রানীতি ছিল সম্প্রসারণমূলক। পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ও ছিল বেশি। এছাড়া ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণ (এনপিএল) ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, যার একটি অংশ বাজারে প্রবেশ করে থাকতে পারে। উপরন্তু বিগত সরকার ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষ করে ২০২৩ সালের বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকারের বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা লক্ষণীয় ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঋণদাতা হয়ে পড়ায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারেনি। অতএব মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নেয়া পর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যস্ফীতির ওপর এর প্রভাব দেখতে হলে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
২. আমদানিকৃত পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ককর কমানো বা প্রত্যাহার করা উচিত। কেননা এটি ভোক্তা পর্যায়ে দাম বাড়ায়। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার চালসহ কয়েকটি পণ্য থেকে এ ধরনের আমদানি কর কমিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন আমদানি শুল্ক হ্রাসের সুবিধাভোগী হতে পারে ভোক্তারা। বাংলাদেশে কর-জিডিপি

অনুপাত কম থাকায় কর বিভাগ তার আমদানি কর ছাড়তে চায় না। কিন্তু কর আদায় বাড়ানোর এটি কোনো টেকসই সমাধান নয়। বরং কর প্রবৃদ্ধির জন্য কর ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। এতে সরকারের রাজস্ব বাড়তে পারে এবং রাজস্ব নীতি আরো টেকসই হবে বলে আশা করা যায়।

৩. সরকারের ব্যয়ের মান উন্নত করতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় করার দিকে মনোযোগী হতে হবে। জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রদান একই সঙ্গে আর্থিক এবং জলবায়ু উভয় খাতের জন্য ক্ষতিকারক। বরং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনে আরো অর্থ ব্যয় করতে হবে, যেহেতু দরিদ্র পরিবারগুলোয় ব্যয়ের একটি বড় অংশ যায় খাদ্যের জোগানে। তাছাড়া উচ্চ মূল্যস্ফীতি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। এটি একদিকে অনেককে দরিদ্র করে তুলেছে এবং অন্যদিকে অনেককে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে। তাই ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি থেকে দরিদ্রদের সুরক্ষা দিতে ভর্তুকি ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টন আবশ্যক। আর এ ধরনের সহায়তা যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে প্রকৃত অভাবীদের কাছে যাতে পৌঁছে, তাই অবশ্যই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. টাকার মান স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে দক্ষতার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। ইউএস ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন আমদানি ব্যয় বাড়িয়েছে, যা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশি রফতানিকারকরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে বেশি করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতে পারে, যা টাকার মান ধরে রাখতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া টাকার মান স্থিতিশীল করতে এবং আমদানি ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি কমাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে মূলধন পাচার রোধ।

৫. উন্মুক্ত বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় (ওএমএস) এবং খাদ্যবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম উন্নত করতে হবে। একই সঙ্গে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ অর্থ সহায়তা বাড়ানো উচিত।

৬. যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা বাড়ানোর ওপর মনোযোগ দেয়া দরকার। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের (বিসিসি) একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরি করা উচিত, যেখানে সারা দেশে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাজার পর্যন্ত পণ্যের দাম কত তা উল্লেখ থাকবে। বিসিসিকে অবশ্যই নিয়মিত বাজারে প্রভাব বিস্তারকারীদের ওপর নজর রাখতে হবে এবং বাজার কারসাজির ঘটনা তদন্তসাপেক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিশনের উচিত সক্রিয়ভাবে বাজার প্রতিযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করে এমন কর্মকাণ্ড, যেমন কারসাজি, একচেটিয়া ও অলিগোপলি অবস্থা প্রতিহত করা।

৭. যেহেতু সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে, তাই উৎপাদন ও খাদ্যপণ্য সরবরাহ বাড়াতে আধুনিক কৌশল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে হবে। পাশাপাশি গ্রামীণ অবকাঠামো, যেমন রাস্তা ও মজুদ সুবিধা উন্নত করতে হবে যাতে ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় এবং দক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। কারণ এগুলো খাদ্যের দাম স্থিতিশীল

রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া বাড়তি দামের সঙ্গে যেন কৃষকরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন সেজন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা উচিত।

৮. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরবরাহ শৃঙ্খল নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বাড়ানোসহ লজিস্টিক এবং পরিবহন পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার।

৯. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সরকারের উচিত তার বাণিজ্য অংশীদারদের সংখ্যা বাড়ানো। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যথাসময়ে আমদানি করলে তা সহসা সৃষ্ট সংকট মোকাবেলা করতে পারে, যা দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১০. সরকারের উচিত কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে পর্যাপ্ত ক্রয় নিশ্চিত করা। এটি দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা, বাজারদরে স্থিতিশীলতা এবং কৃষকদের ন্যায্য মুনাফা লাভের নিশ্চয়তা দিয়ে মূল্যস্ফীতি সহায়ক হবে।

১১. উৎপাদক ও বাজারের মধ্যে সংযোগ উন্নত করতে হবে। যখন কৃষকরা সরাসরি বাজারের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, তখন মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিহত করা সম্ভব হবে। এতে কৃষকরা বাজারদরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মুনাফা পাবেন। এতে ভোক্তা পর্যায়েও দাম কমবে।

১২. ডিজিটাল প্লাটফর্ম, যেমন ই-কমার্স ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে সক্ষম করে তুলতে হবে। এতে কৃষকদের ক্ষমতায়ন হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে, যা পক্ষান্তরে বাজারদরের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। অবশ্যই এর জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা ও ইন্টারনেট সংযোগের মতো নানা পদক্ষেপ নিতে হবে।

মোটকথা বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন যা বিভিন্ন নীতির সমন্বয়ে গঠন হবে। এ বহুমাত্রিক পদ্ধতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, বেসরকারি খাত, কৃষক এবং অন্যান্য অংশীজনের সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

বণিকবার্তা
৩ নভেম্বর ২০২৪

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলাই বড় চ্যালেঞ্জ

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বর্তমানে অর্থনীতিতে নানামুখী চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে নতুন করে ইউক্রেন–রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব ২০২২–২৩ অর্থবছর এবং এই অব্যাহত পরিস্থিতি ২০২৩–২৪ অর্থবছরের শেষ ছয় মাসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সামষ্টিক অর্থনীতি একধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে। জুলাই–নভেম্বর সময়ে অর্থনীতিতে একধরনের শ্লথ গতির প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে- যা উৎপাদন, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চমূল্য, দুর্বল বিনিময় হার, ডলারের বিপরীতে টাকার অব্যাহত মূল্যহ্রাস, এমনকি সুদের হারের ক্ষেত্রেও এ পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও এর একটি প্রভাব পড়ছে। ফলে সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ১১ বছরে এডিপি বাস্তবায়ন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণে সরকারি উৎসগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একধরনের ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণ এবং দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার যে ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে সেখানেও একধরনের নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অর্থনীতির সব পরিস্থিতিতেই নানা ধরনের দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

দেশে বৈদেশিক ঋণের যে ঘাটতি সেটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যে পরিমাণ রিজার্ভ ছিল তাও কমে গেছে। অন্যদিকে রিজার্ভের পরিমাণ তুলনামূলক বৃদ্ধি না হওয়ায় আগের ৪৮ বিলিয়ন ডলার কমে এখন ২৪ বিলিয়নে পৌঁছেছে। ব্যবহারযোগ্য ডলারের পরিমাণ মাত্র ১৯ বিলিয়ন। ফলে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই একধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর বিপরীতে যেমন টাকা অবমূল্যায়িত হয়েছে, অন্যদিকে টাকার বিপরীতে আমদানিতে ঘাটতির কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানি নির্ভর কাঁচা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতিতে এর এক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ ধরনের শ্লথ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনী সময়ে

বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা দেখা যায়। আবার নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দ্রুত শেষ করা, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুদ্রা সরবরাহ, কোনো কোনো সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বাজার ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে দুর্বলতা, বেসরকারি খাতে অব্যাহতভাবে অতি নির্ভরশীলতা এবং দেশের ভেতরে যারা বড় ব্যবসায়ী তাদের বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব বিস্তার। পণ্য সরবরাহে তাদের একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও মূল্যস্ফীতির বড় কারণ। অব্যাহত মূল্যস্ফীতিতে প্রকৃত আয় যেমন কমেছে, একই সঙ্গে তার খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক ছাড় দিতে হয়েছে। বিশেষত, সীমিত অথবা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে সঞ্চয় সাধারণত নিম্ন আয়ের মানুষ দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য রাখে, সেটা তাকে ভাঙতে হচ্ছে। ফলে ব্যাংকে যে পরিমাণ সঞ্চয় থাকে সেগুলো ক্রমাগত কমছে। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সব সময়ই আমরা দেখে এসেছি। এ বছরও আমরা সেই অস্থিরতা দেখছি। মোটামুটিভাবে আমরা সব সময় দেখে এসেছি ব্যবসায়ীরা এই সময়কে উপলক্ষ করে বিনিয়োগ কমিয়ে দেন। দেশের বাইরে থেকে যারা পণ্য আমদানি করেন, তারাও এ সময়ে পণ্য আমদানিতে সাবধান থাকেন। নির্বাচন-পরবর্তীকালীন এ ধরনের অস্থিরতা কেটে যাবে, তা মনে হয় না। অন্যান্য সময় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা কেটে গেলেও এবার তা প্রলম্বিত হতে পারে।

বিভিন্ন সহযোগী দেশ যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জড়িত, তাদের সঙ্গে নির্বাচনকেন্দ্রিক অবস্থানের কারণে যদি সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, সেটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে না। এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনের সময়গুলো অর্থনীতির জন্য খুব একটা মসৃণ হবে না। আগামীর সময়গুলো আমাদের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পার করতে হবে। ছয় মাস পর্যন্ত অর্থনীতিতে যথেষ্ট ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। সংকট মোকাবেলার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক লেনদেনে এখন যে চাপ রয়েছে, তা কতটা কমিয়ে আনা যায় সেটা ভাবতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন পড়বে। বিদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডলার নিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তাতে সরকারি নজরদারি রাখা দরকার। যেহেতু দেশে রিজার্ভ সংকট রয়েছে, অন্যদিকে টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সে ক্ষেত্রে এটিকে কমিয়ে আনা দরকার। রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত করার জন্য বাজারভিত্তিক রেমিট্যান্স মূল্য থাকা দরকার।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যে শর্তাবলি রয়েছে সেগুলো যদি সহজ করা যায়, সময় যদি বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক হবে বলে মনে হয়।

এক কোটি কার্ডের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষকে খাদ্য বিতরণের যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এরা যেন রাজনৈতিক মহলের প্রভাব বিস্তারের বলিদান

না হয়, সেদিকটাও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে ব্যাপারটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন জরুরি।

অর্থনীতির এই চ্যালেঞ্জগুলো দূর করা সম্ভব না হলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হবে। বিদেশি অনুদান অথবা বিদেশি ঋণের ওপর ভিত্তি না করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা দরকার। যারা কর এড়িয়ে যাচ্ছেন তাদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, কীভাবে ডিজিটালাইজড সিস্টেম করে সবাইকে অনলাইনভিত্তিক সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা যায়, সেই আধুনিকায়ন ব্যবস্থার দিকে জোর দিতে হবে। আগামী সময়গুলোয় দ্রুত অর্থনীতিকে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নিয়ে আসা কঠিন হবে। চেষ্টা থাকতে হবে এটি যেন দীর্ঘায়িত না হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে নিয়মিত মনিটরিং ও সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে স্থির অবস্থানে ফিরে আসবে।

খবরের কাগজ
১১ ডিসেম্বর ২০২৪

অধ্যায় ৩

ব্যাংকিং খাত

ব্যাংকিং খাত সংস্কারে চাই রাজনৈতিক অঙ্গীকার

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, বাজেটে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক এবং কাঠামোগত সংস্কার-এ দুই খাতেই বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকিগুলো হলো-অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি, দেশি-বিদেশি ঋণ, টাকার মূল্যহ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি ও কম রাজস্ব আয়। অন্যদিকে কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ খাত ও রাজস্ব খাতে সংস্কারকে বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন। ব্যাংকিং খাত সংস্কারে বাজেটে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা দরকার বলেও ফোনে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন এই অর্থনীতিবিদ ও জননীতি-বিশ্লেষক। দেবপ্রিয় বলেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সঙ্গে সরকারের অন্য নীতিগুলোর সমন্বয় নিশ্চিত করা। এবারের বাজেটে এখন পর্যন্ত এ সমন্বয়ের বিষয়টি চোখে পড়েনি। দেবপ্রিয় বলেন, কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় সরকারের ব্যয়ের সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। রাজস্ব বাড়াতে এনবিআরকে ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি কর আহরণেও বড় ধরনের সংস্কার আনতে হবে। আয়ের নতুন খাত চিহ্নিত করতে হবে। যাদের আয় বাড়ছে আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে যৌক্তিক কর আদায় করতে হবে। এজন্য রাজস্ব বোর্ডকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতে হবে, যাতে প্রভাবশালীরা কর ফাঁকি না দিতে পারে। পাশাপাশি সৎ করদাতাদের করের টাকা দুর্নীতিমুক্ত খাতে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারির অভাব এবং ব্যাংক একীভূতকরণের ব্যর্থতাও ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ একটি বড় সমস্যা। ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। সুদের হারেও কোনো সামঞ্জস্য নেই। তিনি মনে করেন, ব্যাংকিং খাত সংস্কারে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরি।

ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারির অভাবকে বড় কারণ হিসেবে তুলে ধরে সিপিডির এই সম্মাননীয় ফেলো বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজে-কলমে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও এটি পরিচালনায় নেতৃত্বগত দুর্বলতা রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির তথ্য-উপাত্ত প্রকাশেও দুর্বলতা চোখে পড়ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি বাজেটে কাঠামোগত সংস্কারের এ চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। অর্থনৈতিক খাতে স্থিতিশীলতার জন্য বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারকে বাজেটের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দের একটি বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে শৃঙ্খলাহীনভাবে। প্রায় ২৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেওয়া হয়েছে। এসব থেকে উৎপাদন আসছে ১২ থেকে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করেও সুফল মিলছে কম। বিদ্যুতে ভর্তুকি ব্যাপক। এটি সরকারের বাজেট-শৃঙ্খলায় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। আমরা দেখছি, ডলার সংকটের কারণে বিদ্যুৎ খাতের ঋণের অর্থ পরিশোধ করা যাচ্ছে না। কিস্তি দিতে না পারায় লোডশেডিং বেড়েছে। বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ বকেয়া রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এটি আসন্ন বাজেটে চাপ তৈরি করবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২ জুন ২০২৪

ব্যাংক খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংকিং কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে

ড. ফাহমিদা খাতুন

ব্যাংক খাতের সংস্কারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি ব্যাংকিং কমিশন করছে এটা খুবই ভালো খবর। উচ্চ খেলাপি ঋণ ও সুশাসনের অভাবের কারণে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে যে অস্থিরতা চলছিল তা মোকাবেলায় দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এ দাবি উঠিয়ে আসছিলাম। দেরিতে হলেও ব্যাংকিং কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত।

ব্যাংক খাতের সংস্কারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি ব্যাংকিং কমিশন করছে এটা খুবই ভালো খবর। উচ্চ খেলাপি ঋণ ও সুশাসনের অভাবের কারণে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে যে অস্থিরতা চলছিল তা মোকাবেলায় দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এ দাবি উঠিয়ে আসছিলাম। দেরিতে হলেও ব্যাংকিং কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ হারের খেলাপি ঋণ এবং বিভিন্ন আর্থিক সূচকে অধোগতি। বিদ্যমান নাজুক অবস্থায় ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ খাতের দুর্বলতা সার্বিক অর্থনীতিকেও ঝুঁকিতে ফেলে স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে।

দুঃখজনক যে বিভিন্ন নীতি আলোচনা ও কৌশলগত পরিকল্পনায় বারবার বলা হলেও পূর্ববর্তী সরকার ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে যথাযথ পদক্ষেপের ঘাটতিতে খাতটি আরো বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি সুকার্যকর ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি কমাতে ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করা কেবল প্রয়োজনই নয়, বরং একটি কৌশলগত বাধ্যবাধকতা।

ব্যাংক খাতের সমস্যাগুলো নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ব্যাংক পরিচালক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ প্রদান, খারাপ পরিশোধের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও ঋণ পুনঃতফসিল, করের বোঝা কমানো এবং ব্যাংকের ব্যালান্স শিট পরিষ্কার করার জন্য ঋণ মওকুফ করা, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অপর্যাপ্ত কমপ্লায়েন্স এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কিছু ব্যাংকের আন্তর্জাতিক মান পূরণে ব্যর্থতা। এছাড়া নিয়ন্ত্রকদের দুর্বলতাও এ খাতের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার অভাব, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের (এফআইডি) নিয়ন্ত্রণ, খেলাপিদের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নমনীয়তা, ক্ষমতাসীনদের কাছের লোকদের খেয়ালখুশিমতো ব্যাংক লাইসেন্স প্রদান, সরকারের হাত ধরে ব্যাংকের পুনর্মূলধন সংগ্রহ ও কয়েকটি ব্যাংকে অলিগার্কের অনেকটা একচেটিয়া ক্ষমতা উপভোগ।

ব্যাংক খাতের দুর্বলতার সবচেয়ে আশঙ্কাজনক নির্দেশক হলো, গত ১৫ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খেলাপি ঋণ (এনপিএল)। এ পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে পূর্ববর্তী সরকারের নীতিনির্ধারকদের সরাসরি ও পরোক্ষ সমর্থনের কারণে। ২০০৯ সালে ব্যাংকগুলোর মোট খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা, যা বেড়ে মার্চ ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সংখ্যাটি আসলে আরো অনেক বেশি হতে পারে। কারণ এতে বিলম্বিত সম্পদ, শ্রেণিবদ্ধ ঋণ, আদালতের নিষেধাজ্ঞাপত্রাধীন ঋণ এবং পুনঃতফসীলকৃত ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা ব্যাহত করে, ফলে তারা ঋণ প্রসারে বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং সুদের আয় থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে তহবিলের খরচ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্যাংকগুলোকে তাদের ঘাটতি মেটাতে বিকল্প খুঁজতে হয়। এতে তাদের সম্পদ, শেয়ার মূলধন এবং পুঁজির ওপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে।

প্রায়ই ঋণগুলো সঠিক বাণিজ্যিক বিবেচনা ছাড়াই অনুমোদিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী শাসনামলে খেলাপির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, তখন ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ ব্যাংক তার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা হারানোর কারণে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের শাস্তি দিতে পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বার বার ব্যাংকিং কোম্পানি আইন সুবিধাবাদীদের অনুকূলে পরিবর্তন করে ঋণখেলাপিদের সুবিধা দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক খাতের ক্রমশ খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে আমরা ক্রমাগত একটি অস্থায়ী ব্যাংকিং কমিশন গঠনের কথা বলেছি, যা জরুরিভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধান করবে। ২০১২ সালের হলমার্ক কেলেংকারীর পর থেকে এ রকম একটি অস্থায়ী ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রস্তাব

ক্রমে জোরালো হতে থাকে, যদিও তৎকালীন সরকার এজন্য আমাদের সমালোচনা করত এবং খোঁড়া যুক্তি দিত। কিন্তু আমরা বলে এসেছি যে, এই কমিশনের উদ্দেশ্য হবে ব্যাংক খাতের সমস্যাগুলোর বিস্তারিত তদন্ত করা এবং সমাধানের প্রস্তাব দেয়া। কমিশনকে কার্যকর করার জন্য এর কার্যপরিধি (টিওআর) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রথমত, ব্যাংকিং কমিশনের উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে হওয়া উচিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: (১) খাতের সামগ্রিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন; (২) খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্তি ও তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; (৩) বর্তমান সমস্যা এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা; (৪) খাতের সংকটের জন্য কোন কোন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান দায়ী তা নির্ধারণ করা এবং (৫) প্রশাসনিক, নিয়ন্ত্রক, আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা।

দ্বিতীয়ত, কমিশনের সময়সূচি সংক্ষিপ্ত এবং সময়বদ্ধ হওয়া উচিত, তিন-চার মাসের বেশি না, যাতে সরকার দ্রুত বাস্তবায়ন শুরু করতে পারে।

তৃতীয়ত, কমিশনকে তার প্রতিবেদন প্রণয়নে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। এ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: (১) বিদ্যমান তথ্য এবং তথ্য ব্যবহার করে ডেস্ক গবেষণা পরিচালনা করা; (২) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একক সভা করা; (৩) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা; (৪) জনসম্মেলন এবং শুনানি আয়োজন করা; এবং (৫) নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা, ব্যাংক গ্রাহক, ছোট সঞ্চয়কারী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ, ব্যাংক কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকিং সম্পর্কিত সংস্থার প্রতিনিধি, নারী, যুবক, স্থানীয় সংগঠন এবং মিডিয়াসহ বিস্তৃত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।

চতুর্থত, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনকে তার অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণকে নিয়মিতভাবে আপডেট করতে হবে। নাগরিকদের জন্য অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উপলব্ধ করা উচিত এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনের একটি খসড়া অনলাইনে পোস্ট করা উচিত।

পঞ্চমত, কমিশন সদস্যরা অত্যন্ত যোগ্য, অভিজ্ঞ, সৎ এবং নিরপেক্ষ হতে হবে এবং তাদের দায়িত্বগুলো সর্বোচ্চ পেশাদারত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে।

ষষ্ঠত, কমিশনকে কোনো বহিঃপ্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়া উচিত।

সপ্তমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কমিশনের সুপারিশগুলো কখন এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তা উল্লেখ করে একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা উচিত। সরকারকে এ

সুপারিশগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক খাতে এর প্রভাব সম্পর্কে পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রদান করতে হবে।

ব্যাংক খাত অবশ্যই অর্থনীতিতে বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ করা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। এ সংস্কার প্রক্রিয়া ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকজুড়ে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নির্দেশনা অনুযায়ী চালু থাকে।

এ সংস্কারগুলোর পাশাপাশি ১৯৮৪ সালে ন্যাশনাল কমিশন অন মানি, ব্যাংকিং অ্যান্ড ক্রেডিট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠন করা হয়, এরপর ২০০২ সালে একটি ব্যাংকিং সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে ব্যাংক খাতের জন্য একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানের কাঠামো তৈরির জন্য 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট' শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বায়ত্তশাসন প্রদানকারী বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধনী বিল ২০০৩ পাস হয়। তবে এ নির্দেশনা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক অবশেষে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে।

এই ব্যাংকিং কমিশনের সফলতা ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে। কমিশনের সুপারিশগুলো কেবল তখনই ব্যাংক খাতকে উন্নত করতে পারে যখন এটিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার মেয়াদকালে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাস্তবায়নে নিবেদিত, তবে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে এ সংস্কারগুলো যাতে তার মেয়াদকালের পরও বজায় থাকে।

বণিকবার্তা
১৯ আগস্ট ২০২৪

ব্যাংক খাতে জঞ্জাল তৈরি হয়েছে, চার ধরনের সমস্যা দূর করতে হবে

ড. ফাহমিদা খাতুন

প্রথম আলো আয়োজিত 'ব্যাংক খাতকে কোথায় দেখতে চাই' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এই খাতের নীতিনির্ধারক, ব্যাংকের পরিচালক, ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীরা। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যাংক খাত সম্পর্কে তাঁর মতামত দেন।

ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির প্রাণ। দেশের আর্থিক খাত খুব একটা বড় নয়, পুঁজিবাজার দুর্বল, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতও শক্তিশালী নয়; সে কারণে অর্থের ৯০ শতাংশই ব্যাংক খাত থেকে আসে। স্বাধীনতার পর দেশের উদ্যোক্তাশ্রেণি তৈরি করেছে এই ব্যাংক খাত। কিন্তু এই খাত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একসময় অর্থনীতিবিদ হিসেবে যেসব কথা বলেছেন, এখন সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। সুদহারের কথা বলা হয়, এটা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কিন্তু সুদহারের সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তেমন একটা দেখা যায় না। গবেষণায় আমরা তা–ই পেয়েছি। দেশি–বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে অনেক ধরনের উদার নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি; বরং একধরনের দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। আমরা দুর্বৃত্তায়নমুক্ত, সচল ও টেকসই ব্যাংকিং খাত দেখতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো এই খাতে দীর্ঘদিন ধরে যে জঞ্জাল তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংককে এখন তা দূর করতে হচ্ছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ দরকার। স্বল্প মেয়াদে বা তাৎক্ষণিকভাবে অনেকটা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যথাযথভাবেই তা নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুর্বল ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাংকিং খাতকে অর্থনীতির মূল নিয়ামক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে টেকসই ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প নেই। সে জন্য কাঠামোগত দুর্বলতা আমলে নিতে হবে।

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের সমস্যা আছে। *প্রথমত,* প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। সেটা হলো ব্যাংকিং খাতের যেসব নীতিমালা আছে, সেগুলো যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় না। ক্যামেলস রেটিং অনুসারে ব্যাংকের স্বাস্থ্য পরিমাপের যেসব সূচক, যেমন মূলধন পর্যাপ্ততা, তারল্য, খেলাপি ঋণ, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা—এসব ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিপালিত হয় না। যদিও আমাদের আলোচনা কেবল খেলাপি ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০০৮ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা; ২০২৪ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকায়। মূলধনের পর্যাপ্ততা আরেকটি বড় সমস্যা। আন্তর্জাতিক নীতিমালা বা ব্যাসেল অনুযায়ী যে পরিমাণ মূলধন থাকার কথা, তা কিন্তু সবাই মানতে পারে না। বিশেষ করে ১০-১২টি ব্যাংকের এই মূলধন অপর্যাপ্ততা আছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা। আইনে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবে তা অতটা পরিপালিত হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়। গভর্নর নীতিপরায়ণ হলে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সম্ভব, তিনি ততটুকু করতে পারেন। কিন্তু সেটা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন টাস্কফোর্স করেছে, তারা এ লক্ষ্যে কাজ করবে বলে আশা করি।

এ ছাড়া গত মে মাসে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করাসহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি দুই ধরনের হয়—এক ধরনের কোম্পানি দুর্বল ব্যাংকগুলোর সম্পদ অধিগ্রহণ করে এবং দুর্বল ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটি হলো দুর্বল ব্যাংকের সম্পদ কিনে পরবর্তীকালে ফেরত দেওয়া হয়। তখন শঙ্কা থেকে যায়, আবারও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সে জন্য এই কাজে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নেওয়া যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় আইনগত। অর্থঋণ আদালতে অনেক মামলা পড়ে আছে। প্রয়োজনীয় বিচারক নেই বলে মামলার কার্যক্রম চলে না। আদালতের বাইরে যে এই সমস্যার সমাধান করা হবে, তার উদ্যোগও নেই।

তৃতীয়ত, তথ্য প্রকাশ। ব্যাংকগুলো তথ্য প্রকাশ করে না; আগে এ বিষয়ে নজরদারিও করা হতো না। মামলা ও বিশেষ হিসাবে যে অর্থ আটকে আছে, সেগুলো বিবেচনায় নেওয়া হলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ চার লাখ কোটি টাকা হতে পারে। যথাযথ তথ্য না থাকলে যথাযথ নীতি প্রণয়ন করা যাবে না।

সামগ্রিকভাবে গড়পড়তা তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। যেসব তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক, ব্যাংকগুলো তা দেয় না। সেই সঙ্গে ঋণ শ্রেণিকরণ, পুনঃতফসিল, অবলোপন—এসব নিয়মকানুন বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২২ সালে এসব

নিয়মকানুন শিথিল করা হয়েছে। এতে কী ফল হয়েছে, তা আমরা জানি না; কিন্তু যা হয়েছে, তা হলো সমস্যার স্তূপ তৈরি হওয়া।

এসব খাতে আমাদের সংস্কার দরকার। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি।

প্রথম আলো
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

অধ্যায় ৪

বাজার ব্যবস্থাপনা

চালের দাম নিয়ন্ত্রণে হাত দিতে হবে যেখানে

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

দীর্ঘদিন ধরে চালের বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা চলছে। দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য চাল। চালের দাম বাড়লে গণমানুষের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়। গত বছর যেখানে মোটা চালের দাম ছিল ৪৬–৫২ টাকা, তা মাসখানেক পার হতে না হতেই ৫০–৫২ টাকায় পৌঁছেছে। এক বছরের মধ্যে দাম বেড়েছে ৪ শতাংশ। চালের ঊর্ধ্বগতির এই প্রবণতা বাংলাদেশের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত, বিশেষ করে যখন আমন ধান চলে এসেছে। এ সময় দাম কিছুটা কম হওয়ার কথা। সেই বিচারে এখনও তা উচ্চমূল্য। ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে দেখা যায়, সরকারি খাদ্য মজুত ছিল প্রায় ১৬ লাখ টন। তার মধ্যে চালের পরিমাণ প্রায় ১৩ লাখ টন। এই মজুতকে সন্তোষজনক বলে মনে করা যায়।

এ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে আমদানি করা চালের পরিমাণ সাড়ে ৫ লাখ টন এবং গমের পরিমাণ প্রায় ৭ লাখ টন। সব মিলিয়ে ১৪ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমন মৌসুমে প্রায় ৩ হাজার ৯৭২ টন চাল এবং ১০ টন ধান আমদানি হয়েছে। চালের আকারে তা দাঁড়াবে ৩ হাজার ৯৭৮ টনের মতো। বলা হচ্ছে, বেসরকারি উদ্যোগে আনা আরও ৯১ হাজার ৩১০ টন চাল বন্দরে অপেক্ষমাণ। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম প্রতি টন সিদ্ধ ৩৭৫ থেকে ৪৩৪ ডলারের মধ্যে সীমিত। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানের বিচারে এভাবে দাম নির্ধারিত। এ অবস্থায় বর্তমান মজুত ও আমদানি সম্ভাবনা এবং মার্চ নাগাদ বোরো আসার বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে চালের দাম কিছুটা কম হওয়া যৌক্তিক ছিল।

এটিও ঠিক যে, বৈশ্বিক দিক থেকে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। চাল ও গম আমদানি করার ক্ষেত্রে সে প্রভাব কিছুটা আছে। যাই হোক, শীতকালের এই মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য আরেকটু কম থাকার কথা। কিছুদিন আগ পর্যন্তও চালের ঊর্ধ্বগতির কারণের পেছনে একটা

যৌক্তিকতা ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে গমের উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশের চালের বাজারে তার প্রভাব পড়েছিল।

গম বা আটার উচ্চমূল্যের সঙ্গে চালের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, দুটিকে নিকট বিকল্প ভাবা হয়। একটা পণ্যের দাম বাড়লে অন্যটি ভোগের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই গমের দাম বাড়লে চালেরও দাম বাড়ে। সাধারণত আরেকটি বিষয়ও হয়ে থাকে। অন্যান্য দ্রব্য বা খাবারের দাম বেড়ে গেলে (যেমন মাছ-মাংসের মতো আমিষ জাতীয় খাবার) তখন সবজি জাতীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ আমিষ জাতীয় দ্রব্যের দাম বাড়লে আমরা শর্করা দিয়ে উদরপূর্তি করতে চাই। এভাবেও চালের দাম বেড়ে যায়। এর মানে হলো, চালের উচ্চমূল্য শুধু চাল ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে না। বরং অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেলে মানুষ নিরুপায় হয়ে শুধু চালের সঙ্গে ন্যূনতম কিছু একটা দিয়ে ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করে, বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষ। সেটির কারণেও বাজারে মোটা চালের চাহিদা এক মাসের ভেতরে ৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছ-মাংসসহ প্রায় সব পণ্যের দাম বেড়েছে। রুই মাছের দাম ৪ শতাংশ কমলেও ইলিশের দাম ১০ শতাংশ, গরুর মাংসের দাম ২ শতাংশ, খাসির দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ, মুরগির দাম ২ দশমিক ৭ শতাংশ, দেশি মুরগির দাম দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। এক মাসের বিবেচনায় এসব পণ্যের দামও বেড়েছে। এ ধরনের পণ্যের দাম বাড়লেও মানুষ শর্করার দিকে ঝোঁকে। ক্ষুধা মেটানোর জন্য ভোক্তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায়ও পণ্যের দাম বাড়তে পারে।

এসবের বাইরে বাজারবহির্ভূত কারণও রয়েছে। চালের প্রক্রিয়াজাতকরণে বড় বড় চালকল মালিক রয়েছে। বাজারে চালের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ তারা সরবরাহ করে থাকে। গবেষণায় উঠে এসেছে, চালকল মালিকরা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ চাল নিয়ন্ত্রণ করে।

চাল আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় ১৫–২০ শতাংশও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। চালের বিকল্পও তেমন কিছু নেই। সুতরাং বাজারে অল্প পরিমাণেও চাল কমে গেলে কিংবা চালকলের মালিকদের হাতে ১৫–২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, তার মাধ্যমে পণ্যমূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে মজুত ও সরবরাহ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে তাদের প্রভাব থাকতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ ধরনের সরবরাহ চক্র নিয়ম-কানুনের মধ্যে পরিচালিত হওয়া দরকার। পুরো সরবরাহ চক্রে যারা যুক্ত তারা প্রত্যেকেই জবাবদিহির মুখোমুখি হবে। তাদের অধিকাংশই রেজিস্টার্ড হতে পারে। চলমান রেজিস্ট্রেশনগুলো এখন পর্যন্ত কেবল ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার মতোই রেজিস্টার্ড। কিন্তু আমরা মনে করি, সাপ্লাই চেইনের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশনের বিধান করা দরকার। অর্থাৎ যে চাল-সংক্রান্ত ব্যবসা করবে; উৎপাদক পর্যায় থেকে বাজারে বিক্রি পর্যন্ত পাইকার, আড়তদার, চালকল মালিক, ব্যাপারী, ডিলার বা মজুতদার প্রত্যেকের চাল-সংক্রান্ত আলাদা লাইসেন্স থাকতে হবে। এই লাইসেন্সধারী ছাড়া কেউ চালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে

পারবে না; সেটি পাইকারি হোক, মজুত হোক কিংবা বিপণন। লাইসেন্সধারী এসব ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সবার তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত সংরক্ষণ করা জরুরি, যাতে এগুলোর যথাযথ তদারকি করা যায়।

ইতোপূর্বে সরকার কিছু উদ্যোগের ফলও পেয়েছে। যেমন ২০১৪ সালের আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মতিয়া চৌধুরী যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, তখন সার ডিলারদের ক্ষেত্রে তিনি বেশ কড়া নজরদারি অবস্থা নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন। এ সময় তিনি সরাসরি কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব কারণে বাজারে ডিলার ও মজুতকারীরা খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারেনি এবং দ্রব্যমূল্য অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। উদ্যোগটি কার্যকর করতে গিয়ে জেলা পর্যায়ের প্রতিটি ডিসি অফিসকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। জেলা পর্যায়ে যারা চাল ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের প্রত্যেকের তথ্য-উপাত্ত জেলা পর্যায়ে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যবসায়ীরা চালের মজুতের পরিমাণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুত, বিক্রি, চালের মূল্য-সংক্রান্ত প্রতিদিনের তথ্য-উপাত্ত সপ্তাহ ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে পাঠাবে। এ কাজটি তিনি সারের ক্ষেত্রে করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল, মজুত করে রাখা কিংবা পরে বিক্রি করা এবং বেনামে রাখা— এ ধরনের হিসাব করতে গিয়ে অনেকে ধরা পড়েছিল। এতে মজুতের প্রবণতা কমে আসছিল।

আমরা মনে করি, জেলা পর্যায়ে এ ধরনের মনিটরিং প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমরা ভোক্তা অধিকারের কিছু খুচরা উদ্যোগ দেখতে পাই। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ দিয়ে পুরো সরবরাহ চক্রে সুশাসন আনা কষ্টকর। আমার মনে হয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যদি জেলা পর্যায়ে যৌথভাবে ডিসি অফিসের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে কিংবা এককভাবে কোথাও কাজ পরিচালনা করে (তদারকি, নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো, গুদামগুলোর হিসাব সঠিক আছে কিনা, যাচাইয়ের সুযোগ রয়েছে) তাহলে সমস্যাগুলো নিরসন করা সম্ভব। বেনামে কিংবা রেজিস্টার্ড না হয়ে পণ্য মজুত করলেও তা এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। এভাবে নজরদারি করলে সুশাসন আনা এবং বাজারে অযাচিত ঘটনাগুলোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব।

মোদ্দা কথা, চালের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়, উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিপণনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এই তিনটি মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে অন্যান্য সাপ্লাই চেইনের মতো ধান বা চালের পুরো সরবরাহ চেইনকে একক সাপ্লাই চেইন বিবেচনা করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সিকে রেজিস্টার্ড করা এবং তাদের নিয়মিত তথ্য-উপাত্ত জেলা পর্যায়ে পাঠানো এবং সেগুলোর ভিত্তিতে নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা চালু করা গেলে ধীরে ধীরে সাপ্লাই চেইনগুলোতে বাজারবহির্ভূত কারণগুলো (মুনাফার প্রবৃদ্ধি, পণ্য সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে বাজারে সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা) অনেকটুকু নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

সমকাল
২৫ জানুয়ারি ২০২৪

বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করাই বড় চ্যালেঞ্জ

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতেও যে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, তা থেকে বেশির ভাগ দেশ বেরিয়ে এলেও বাংলাদেশে এটি কমার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্থ পাচার এবং বাজার সিন্ডিকেট দমনে ব্যর্থতা। দেশে ডলার ও রিজার্ভ সংকট থাকলেও সরকার নিজস্ব ব্যয় কমাতে পারেনি। উল্টো টাকা ছাপানোর মতো পদক্ষেপের কারণে বাজারে অর্থ সরবরাহ থাকায় মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্ফীতি মহামারি এবং যুদ্ধের কারণে বছর দুয়েক আগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে বাংলাদেশও একটি। শুধু পাকিস্তান ছাড়া এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর মূল্যস্ফীতি কমে এলেও বাংলাদেশে কমেনি। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই তাদের মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় শ্রীলঙ্কার নাম। বছর দুয়েক আগে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়লেও সেখান থেকে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের সংকটকালে দেশটির মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৪৯ শতাংশের বেশি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এই হার এসে দাঁড়ায় ৬.৩ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে।

অর্থনীতিকে চাঙা করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে মুদ্রানীতি কঠোর করে ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়েছে, সরকার কৃচ্ছ্রসাধন করে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে, বার্ষিক ঘাটতি কমাতে ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব আয় বাড়িয়েছে, ঋণ পুনর্গঠন করেছে। শিল্প ও কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো কোনো খাতে কর বাড়ানো আবার কোনো খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো জনপ্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছে দেশটি। একই সঙ্গে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে ২০২২ সালের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ১১.১ শতাংশ। সেটি কমে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশটির মুদ্রানীতি কঠোর করার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়। নেপালের মূল্যস্ফীতির হার ২০২৪-এর জানুয়ারিতে হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এটি ৮.১৯ শতাংশ ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভুটানের মূল্যস্ফীতি ৪.২ শতাংশ হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরেও এটি ৫.০৭ শতাংশ ছিল। পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি জানুয়ারিতে ছিল ২৮.৩ শতাংশ। এটি ২০২৩ সালের মে মাসে রেকর্ড ৩৮ শতাংশ ছিল। কোভিড মহামারির শেষের দিকে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা করেছিল এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২২ সালের এপ্রিলেই মুদ্রানীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছিল দেশ দুটি। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারও বাড়িয়েছিল তারা। উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও মূল্যস্ফীতির লাগাম টানাই ছিল এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। সে সময় এশিয়ার চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় আটা ও ভোজ্যতেলের দাম বাড়তে শুরু করেছিল। এর পরই আসে এ ধরনের পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্যসূচক, সহজে বলতে গেলে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে এটি কমে ৯.৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে এটি এখনো সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। আইএমএফের ঋণের শর্তের একটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমানো। তার অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরের শেষে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি কমাতে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মুদ্রানীতিতে কঠোরতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাজারে টাকার সরবরাহ কমাতে নীতি-সুদ হার বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে আরও বেশি সুদ দিতে হবে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে। এ ছাড়া ডলারের দাম নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে করে ডলারের দাম অর্থনীতির সঙ্গে মিল রেখে ওঠানামা করবে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণ আদায়ে বেসরকারি উদ্যোগে ‘সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি’ গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের নির্ধারিত মাত্রার বিষয়টি তুলে নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। নিত্যব্যবহার্য অনেক পণ্য আমদানি নির্ভর হওয়ার কারণে কিছু পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এত সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও মূল্যস্ফীতি খুব একটা কমতে দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি না কমার পেছনে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যার মধ্যে কিছু বাজারভিত্তিক। আর কিছু রয়েছে বাজার বহির্ভূত। ডলারসংকটের কারণে এর বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রাখা যাচ্ছে না। যে পরিমাণ ডলার আয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বরং অসাধু উপায়ে ডলার পাচারের কারণে এমনটা হচ্ছে। আর এটা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না। উৎপাদক ও ভোক্তার দামের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। এর

কারণ হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে কয়েক হাতবদল এবং নানা ধরনের চাঁদাবাজি। অতিরিক্ত ব্যয়যুক্ত হওয়ার কারণে চূড়ান্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে পণ্য সরবরাহের সুযোগ কুক্ষিগত থাকায় তারাই পণ্যের দাম নির্ধারণ করছে। ফলে সরকার দাম নির্ধারণ করে দিলেও তা কাজ করছে না। সিন্ডিকেটগুলো আমাদের সরকারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় তা দমন করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এ ধরনের সিন্ডিকেটের কারণে বাজার ও দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। উল্টোভাবে দেখতে গেলে শ্রীলঙ্কা খারাপ অবস্থানে থাকার পরও সেখানে এ ধরনের অনুঘটক না থাকায় অবস্থার উন্নতি হয়েছে। যারা অর্থ পাচার করছে, যারা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যাদের রিজার্ভ কম, তাদের জ্বালানি আমদানিতে উচ্চমূল্য দিতে হয়। তাই ডলারের ঘাটতি হয় এবং এর জন্য আমদানি ব্যয় বাড়ে। আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে রয়েছে। এটা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাতেও রয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এসব দেশ কতটা কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এখানে ওই ধরনের কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। সব সময়ই এখানে একটা লুপহোল ছিল। যার কারণে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে যে আমরা আমদানি ব্যয় কমিয়ে আনব এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখব, সেটা করতে সক্ষম হইনি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের আমদানি কমিয়ে আনতে আরও কঠোর হওয়ার দরকার থাকলেও সেটি নেওয়া হয়নি।

সরকারি ব্যয়ের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। সরকারি ব্যয় যেভাবে কঠোর হাতে কমানোর দরকার ছিল, সেটিও হয়নি। উল্টো নতুন নোট ছাপিয়ে সরকারকে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ করা হয়েছে। এর ফলে বাজারে নগদ অর্থের আধিক্য থাকায় মূল্যস্ফীতিও বেড়েছে। আমদানি এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কঠোরতা দেখিয়ে শ্রীলঙ্কা মূল্যস্ফীতি কমাতে সক্ষম হলেও এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ফলে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশের কমেনি। এই একই কারণে আইএমএফের ঋণেরও সর্বোচ্চ সুবিধাজনক ব্যবহার করতে পেরেছে শ্রীলঙ্কা। বাজারে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুটিকতক কোম্পানির আধিক্য থাকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশ নেই বলে পণ্যের দাম যথেচ্ছভাবে বেড়েছে। সরকার কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমালেও সেটি আসলে শেষমেশ গিয়ে কোনো সুফল বয়ে আনে না। কারণ আমদানি করেন গুটিকয়েক ব্যবসায়ী।

ডিউটি কমানোর সুবিধাটা আমদানিকারকরা নিয়েছেন, ভোক্তারা সেটার সুবিধা পাননি। ওদিকে আবার সরকার তার রাজস্ব হারিয়েছে। একই সঙ্গে দেশ থেকে ডলার পাচার হওয়া, ডলারের সরবরাহের সংকট ইত্যাদিও বাজারবহির্ভূত কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ভর্তুকির

ক্ষেত্রে সরকার রপ্তানি, জ্বালানি ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির প্রয়োজন থাকলেও রপ্তানি ও জ্বালানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার সময় হয়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাতে হবে। তবে তার বদলে ভোক্তার ওপর মূল্য বাড়ানো যাবে না। বরং ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তা পুনর্মূল্যায়ণের মাধ্যমে এটি কমিয়ে আনতে হবে। এতে সরকারের ব্যয় অনেকাংশে কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে। যাতে করে খরচ কমিয়ে অর্থনীতিকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আনা যায়, সেদিকটা বিবেচনায় রাখতে হবে।

খবরের কাগজ
১৩ মার্চ ২০২৪

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও দাম বেঁধে দিয়ে আমাদের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, অনেক সময় তা অঞ্চলভিত্তিকও করে থাকে। তবে তারা যে দাম নির্দিষ্ট করে দেন তা নির্দেশনামূলক; নির্দেশমূলক নয়। গত ১৫ মার্চ ২৯টি পণ্যের দাম একটি পর্যায়ের মধ্যে থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন। এর মধ্যে ২৯টি পণ্যের মধ্যে নয়টি পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে, আটটির দাম কমানো হয়েছে। ১৫ মার্চ পণ্যের দাম

আমাদের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, অনেক সময় তা অঞ্চলভিত্তিকও করে থাকে। তবে তারা যে দাম নির্দিষ্ট করে দেন তা নির্দেশনামূলক; নির্দেশমূলক নয়। গত ১৫ মার্চ ২৯টি পণ্যের দাম একটি পর্যায়ের মধ্যে থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন। এর মধ্যে ২৯টি পণ্যের মধ্যে নয়টি পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে, আটটির দাম কমানো হয়েছে। ১৫ মার্চ পণ্যের দাম বাড়ানোর পর দোকান মালিকরা ক্ষিপ্ত হওয়ার বিষয়টি নজরে আসে। কারণ বাজারে সাত-আটটি পণ্যের দরদাম ওঠানামা করা সাধারণত চোখে পড়ার মতো বিষয় নয়। ২০১৮ সালের কৃষি বিপণন আইন এবং কৃষি বিপণন অধ্যাদেশ-২০২১ অনুযায়ী একটি যুক্তিসংগত দাম নির্ধারণ করা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট। তবে দাম নির্ধারণে জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হলে তা যৌক্তিকও হয় না, কার্যকরীও হয় না। বাজারে এরই মধ্যে আমরা তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখছি। কোনো একটা দাম নির্ধারণ করে দিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলছে, 'এটি যৌক্তিক দাম'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে দাম নির্ধারণের যৌক্তিকতা বোঝার জন্য কোন স্টেজে কত টাকা ধরে হিসাব করা হচ্ছে, কী প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে সেসব জানা প্রয়োজন। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে কিনা তা নিয়েও স্পষ্টতা প্রয়োজন। ১৫ মার্চ ২৯টি পণ্যের দাম বেঁধে দেয়ার বিষয়টি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ভোক্তারা এটি সাধুবাদ জানালেও বিক্রেতারা বলছেন এ দামে তাদের

পোষাবে না। অনেক মাংস ব্যবসায়ী তো দোকান বন্ধও রেখেছেন। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি খুব সহজেই এড়ানো যেত যদি মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতো এবং যে জায়গাগুলোয় ব্যত্যয় আছে তা শোধরানো যেত। আমরা জানি, অনেক জায়গায় ব্যত্যয় আছে, পাইকারি বিক্রি থেকে খুচরা বিক্রির জন্য যে দাম হওয়ার কথা তার হেরফের হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দাম বেশি হচ্ছে। এ বিচ্যুতিগুলো বোঝা প্রয়োজন ছিল।

সরকার বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তবে বাজারের কিছু নিয়ম আছে—বাজারের সরবরাহ কত, চাহিদা কত, সেখানে স্টক কত আছে, আমাদের টিসিবি প্রয়োজনমতো পণ্যছাড় করার মাধ্যমে বাজারকে প্রভাবিত করার কতটুকু শক্তি রাখে, আমদানি আগের থেকে হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আমদানি করতে গিয়ে কেউ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা এখানে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা আছে কিনা সেটা জানা দরকার। যখন সীমিতসংখ্যক আমদানিকারকরা আমদানি করেন তখন একটা অলিগোপলিস্টিক বাজার তৈরি হয়। অর্থাৎ বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে আঁতাত করে। আবার সরকার নিজেও এটা করতে পারে। তবে সরকারের উচিত ব্যবসায় প্রবেশ না করা। সরকারের টিসিবি বলে একটা সংস্থা আছে, যারা মাঝে মাঝে খোলাবাজারে বিক্রি করে ও আমদানি করে। এটাকে মূলত কৌশলে ব্যবহার করতে হবে যেন প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসায়ীরা অলিগোপলিস্টিক ব্যবহার বা আঁতাতমূলক ব্যবস্থা না করতে পারে। আমদানিটা আমরা যত প্রতিযোগিতামূলক করতে পারব, ততই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। পাশাপাশি তদারকি জোরদার করতে হবে। ভোক্তা পর্যায়ের সব বাধা মাথায় রেখে খবরদারি ও পর্যালোচনা করতে হবে এবং বাধা নিরসন করতে হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বা অন্যরা যখন হিসাব করে তখন আমদানির হিসাব করা হয় আমাদের অফিশিয়াল বিনিময় হার অনুযায়ী। কিন্তু দেখা যায়, আমদানিকারককে বাইরে থেকে বেশি দামে ডলার কিনে এলসি খুলে আমদানি করতে হয়েছে। এমন হলে তখন আমদানিকারকের মূল্য অফিশিয়াল মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। এজন্য এসব তথ্য-উপাত্তকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে, ইন্ডিকেটিভ প্রাইস বা নির্দেশক মূল্য (নির্দেশমূলক না) ঠিক করলে বাজারমূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। একই সঙ্গে আমাদের নজরদারি থাকতে হবে পাইকারি বিক্রির জায়গা থেকে পণ্য রিলিজ ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, গুদামজাত করা হচ্ছে কিনা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আগে থেকে পূর্বাভাস দেয়া আসলে সম্ভব নয়, আমরা যে দেশ থেকে পণ্য আমদানি করব সেখানে বৃষ্টি-খরা হওয়ার কারণে মূল্যের ওপর কী রকম প্রভাব পড়তে পারে, সেই প্রভাব দু-তিন মাসের আগে বোঝা সম্ভব নয়। তারপর গ্লোবাল কমোডিটি মার্কেটগুলোয় কী ধরনের প্রবণতা সেটা অনুমান করা এবং সেটার প্রভাব কী হতে পারে, আবার ব্যাংক তুলে দিলে সেটাই বা কেমন প্রভাব ফেলবে ইত্যাদি বিষয় একটি বিশ্লেষণের ব্যাপার। সেখানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, অভিযোগ অধিদপ্তর এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের ম্যান্ডেটকে তাদের যদি পালন করতে হয় তবে অবশ্যই তাদের শক্তিমত্তা, স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। মূল কথা, যেসব সংস্থা এর সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, প্রতিযোগিতা কমিশন—তাদের জনবল বৃদ্ধি করে, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাজার কোন

দিকে যেতে পারে তা দেখতে হবে। সে অনুযায়ী আমদানি নিশ্চিত করতে হবে, মজুদ পণ্য ছাড়তে হবে। আবার আমদানি করার সময় ব্যবসায়ীদের ভিন্ন সহায়তা দেয়া যেতে পারে। যেমন আমাদের বাইরে অনেক মিশন আছে যেখানে কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আছে। তারা এ খাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। কখন কত দামে কোন জিনিসটা পাওয়া যায়, তা সম্পর্কে অবগত করে আমদানির পরামর্শ দিতে পারেন তারা। ভালো কোল্ডস্টোরেজ, কুল চেইন যদি থাকে তাহলে আগাম আমদানি করলেও যেকোনো পণ্য ভালোভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকার ওয়্যারহাউজিং বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। এভাবে চাহিদার পার্থক্যের কারণে বাজার ওঠানামা কিছুটা স্তিমিত করা সম্ভব।

তবে দীর্ঘমেয়াদে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের একটা পার্মানেন্ট এগ্রিকালচার প্রাইস কমিশন করার কথা ভাবা উচিত, যেমনটা ইন্ডিয়া করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কোনদিকে যেতে পারে, বাইরে থেকে আমদানি করলে মূল্য কমার বা বাড়ার প্রবণতা কতটুকু হতে পারে বা কতটুকু অস্থিতিশীল হতে পারে, আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কতটুকু হচ্ছে, আমাদের চাহিদা কেমনভাবে বাড়ছে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। চাহিদাও একটা ডায়নামিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে এবং অনেক সময় যখন জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় তখন চালের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের চাহিদা বাড়ে। যেমন হয়তো জীবনযাত্রার মান বাড়লে প্রোটিনের চাহিদা বাড়বে। এ ডায়নামিকসকে বিবেচনায় নিয়ে ভারতে পার্মানেন্ট এগ্রিকালচারাল কমিশন তথ্য, উপাত্ত, গবেষণার ভিত্তিতে পূর্বাভাস দেয় এবং কখন আমদানি করতে হবে তা নিয়ে সরকারকে ইঙ্গিত দেয়। দেশে কতটুকু মজুদ রাখতে হবে, কতটুকু পণ্য কোল্ডস্টোরেজে রাখতে হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনার পুরোটাই আসলে একটা বিজ্ঞান। আমি মনে করি, আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তাতে করে বাংলাদেশেরও সময় এসেছে পার্মানেন্ট এগ্রিকালচারাল কমিশন করার। এখানে বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা দরকার। বাজারের যে যৌক্তিক মূল্য তা ঠিক রাখতে যা করা প্রয়োজন সে অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যেন। আমাদের দেশে এখন একটা জিনিস হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেটার রিঅ্যাকশনে চলে যাই, কিন্তু বাজার সেভাবে চলে না। তাই আমার মনে হয়, পার্মানেন্ট এগ্রিকালচারাল কমিশনকে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী কাঠামো দিতে পারলে ভবিষ্যতে দাম নির্ধারণ কিংবা নিয়ন্ত্রণে বেগ পোহাতে হবে না।

শ্রুতলিখন: নূসান্তা সামায়েল অদ্রি

বণিকবার্তা
৩১ মার্চ ২০২৪

অধ্যায় ৫

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুবাই বৈঠক
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাৎপর্য ও করণীয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

একটি উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সদ্য সম্প্রতি সময়ে সংযুক্ত আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ত্রয়োদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (২৬ ফেব্রুয়ারি—১ মার্চ ২০২৪) ছিল আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সুবিদিত যে, বাংলাদেশ নভেম্বর ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত-বহির্ভূত উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। ত্রয়োদশ বৈঠকে (এম.সি. ১৩) বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল ত্রিমাত্রিক পরিচয়কে ধারণ করে: স্বল্পোন্নত দেশ, উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে।

বাংলাদেশকে একদিকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে সংহতি রাখতে হয়েছে; একই সাথে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে, আবার অন্যদিকে নিকট ভবিষ্যতের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ইস্যু সমূহকেও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। সম্মেলনে নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এবারের এম.সি. ১৩ তে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি দলের প্রস্তুতি ছিল বেশ ভাল। এ ধরনের সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সবসময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের জেনেভাস্থ মিশন জেনেভাতে এম.সি ১২ ও এম.সি. ১৩ এর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং তার সুফল আবুধাবিতে দেখা গেছে। এম.সি. ১৩-তে মাননীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব আহসানুল ইসলাম এম.পি.'র নেতৃত্বে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারি ডেলিগেশন আবুধাবিতে গ্রিনরুম (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাভূক্ত সীমিত সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণমূলক আলোচনা) ও সাধারণ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময়ের বিভিন্ন সুযোগকেও কাজে লাগিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে,

সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ বাংলাদেশের অনুকূলে এসেছে, যা সম্মেলন শেষে এম.সি. ১৩ এর মন্ত্রীপর্যায়ের ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এবারের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ছিল বেশ কয়েকটি: ক) শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজার সুবিধার প্রসারণ; খ) স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে প্রদেয় অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রমের সময়-নির্দিষ্ট প্রসারণ, গ) মৎস্যখাতের ভর্তুকির আলোচনায় উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সময়-নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধা; ঘ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান। এর বাইরে সরকারি খাদ্য সংগ্রহে প্রদত্ত কৃষি ভর্তুকিকে কৃষিখাতে প্রদত্ত ভর্তুকির সর্বোচ্চ হিসাবের (যা কৃষি জিডিপির ১০ শতাংশের সমপরিমাণ) বাইরে রাখা, ই-কমার্সের ওপর ১৯৯৮ সাল থেকে প্রচলিত শুল্ক নিষেধাজ্ঞার সমাপ্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠনিক প্ল্যাটফর্মের বাইরে অনুষ্ঠিত বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে অবস্থান নির্ধারণ ইত্যাদি।

উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধার প্রসারণ। এ বিষয়ে অবশ্য ইতোপূর্বে, ২৩ অক্টোবর ২০২৩-এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাধারণ অধিবেশনে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যা এম.সি. ১৩-তে অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, সিদ্ধান্তটি ‘বেস্ট এনডিয়েভার’ (সেরা প্রচেষ্টা) আকারে গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ এটা মেন্ডেটরি বা বাধ্যতামূলক নয়, বরং সদস্যদের সদিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়নি, যদিও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের এ সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবে ১২ বছরের কথা বলা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ৬-৯ বছরে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তৃতীয়ত প্রস্তাবটি কেবলমাত্র সেসব দেশের জন্য প্রযোজ্য যাদের স্বল্পোন্নত দেশ-নির্দিষ্ট বাজার সুবিধা স্কিম আছে। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এধরনের কোন স্কিম নেই, সিদ্ধান্তটি সে দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

এতদসত্ত্বেও এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এম.সি. ১৩-এর সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশ ও অন্যান্য উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউরোপিয় ইউনিয়ন (এভরিথিং বাট আর্মস বা ই.বি.এ.) ও যুক্তরাজ্য (ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম বা ডি.সি.টি.এস) তাদের স্ব-স্ব এলডিসি স্কিম এর মেয়াদকাল উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য উত্তরণ-পরবর্তী আরো তিন বছর বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। অন্য দেশসমূহের সাথে বাজার সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনায় এটা একটা মানবিন্দু (রেফারেন্স পয়েন্ট) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশকে এখন দ্বিপাক্ষিকভাবে কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারতসহ অন্যান্য দেশসমূহের সাথে এম.সি. ১৩ এর সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এম.সি. ১৩-তে এ সিদ্ধান্তও হয়েছে যে, উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কারিগরি

সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সাহায্য উত্তরণ পরবর্তীতে আরো তিন বছরের জন্য প্রদান করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সিদ্ধান্ত হল-উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুরূপ ডিউ রেসট্রেইন্ট (যথাযথ সংযম) সুবিধা উত্তরণ-পরবর্তী আরও তিন বছরের জন্য ভোগ করতে পারবে। এর অর্থ হল-স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর তিন বছর পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত কোন দেশ এসব দেশের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরোধ নিষ্পত্তি বডি (ডিসপিউট সেটেলম্যান্ট বডি)-তে নালিশ করতে পারবে না।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো এর বাইরে যেসব সুবিধা ভোগ করে সেসবগুলোও যাতে উত্তরণ-পরবর্তীতে তারা বাড়তি সময়ের জন্য ভোগ করতে পারে এমন একটি প্রস্তাবও রাখা হয়েছিল উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থসমূহ বিবেচনায় রেখে। তবে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত এম.সি. ১৩-এ গৃহীত হয়নি। মেধাসত্ব অধিকার, ওষুধ ও মেধাসত্ব অধিকার, রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি ইস্যুতে বাড়তি সময় সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হলে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, উপকৃত হত। এম.সি. ১৩ এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, এ সম্বন্ধীয় আলাপ-আলাচেনা জেনেভাতে অব্যাহত থাকবে এবং এম.সি. ১৪-তে এ বিষয়ে আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করা হবে। জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন নিশ্চয়ই এম.সি. ১৩ পরবর্তী আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব (তথাকথিত এনেক্স ২ প্রস্তাব) এর প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। বিশেষত বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের বিকাশে মেধাসত্ব অধিকার বিষয়ক নমনীয়তার যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে তা সুবিদিত।

মৎস্য খাতে ভর্তুকি বিষয়ক আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি, যদিও নিয়মবহির্ভূত, অনথিভূক্ত, অপ্রতিবেদিত মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকির প্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত এম.সি. ১২-তে গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকি হ্রাস ছিল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে যাতে মৎস্য খাতে ভর্তুকী প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুরূপ সুবিধা দেয়া হয়; বাংলাদেশ সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিল, জেনেভাতে এ বিষয়ে যে টেক্সট নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মতৈক্যে পৌছান সম্ভব হয়নি (এ সংক্রান্ত টেক্সট-এ অনেক ব্র্যাকেট থেকে গিয়েছিল)। আবুধাবিতে বিশেষতঃ ভারতের সাথে উন্নত ও ধনী দেশসমূহের ভর্তুকি বিষয়ে বিরাজমান বড় পার্থক্যের নিরসন করা সম্ভব হয়নি। ভারতের যুক্তি ছিল ছোট ও আর্টিসানাল মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সীমা আরোপ করা যাবে না (অন্ততঃ ২৫ বছরের জন্য)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ ছিল ভারতের অনুরূপ, বিশেষতঃ আগামীর উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে।

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে ভর্তুকির ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রাপ্তির জন্য বিশ্ব সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের ০.৮ শতাংশ এর একটি সীমারেখা আলোচ্য টেক্সটে ছিল, যে সীমারেখাটি বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সচেষ্ট ছিল (যেহেতু ইলিশকে সামুদ্রিক মাছ হিসেবে গণ্য করলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ০.৮ শতাংশ এর সীমারেখা অতিক্রম করে)। আলোচ্য টেক্সটে বৃহৎ মৎস্যশিকারী দেশসমূহের বড় বড় সামুদ্রিক মৎস্যশিকারী কোম্পানিসমূহের জন্য প্রদত্ত ভর্তুকির বিষয়ে যেসব ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, সে বিষয়েও অনেক উন্নয়নশীল দেশের জোরাল আপত্তি ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া ও স্থিতাবস্থা বিরাজমান থাকায় বাংলাদেশের সংক্ষুব্ধ হবার তেমন কোন কারণ নেই। তবে এম. সি. ১৩ ও এম. সি. ১৪ এর অন্তবর্তীকালীন আলোচনায় বাংলাদেশকে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ-এ দ্বিবিধ স্বার্থ বিবেচনায় রেখে অংশগ্রহণ করতে হবে।

কৃষিখাত সংক্রান্ত ‘পিস ক্লজ’ এর আলোচনায় বেশ বড় ধরনের মতপার্থক্য থেকে যায় যার কারণে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের প্রদেয় কৃষি খাতের ভর্তুকি ১০ শতাংশ সীমা অতিক্রম করে যদি সরকারি খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর্তুকি এ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়; ভারতের যুক্তি ছিল এ ভর্তুকি ‘গ্রিন সাবসিডি’র অনুরূপ যেহেতু এর লক্ষ্য হলো প্রান্তিক মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা। বেশ কিছু দেশ এর বিরোধিতা করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এই খাদ্যের একটি অংশ ভারত আবার রপ্তানিও করে। ভারতের দাবি ছিল ‘পিস ক্লজ’-কে চিরস্থায়ী করা। অন্য বেশ কয়েকটি দেশের অবস্থান ছিল, এ সংক্রান্ত আলোচনা কৃষি খাত বিষয়ক বৃহত্তর পরিসরের আলোচনার অংশ হতে হবে। শেষ অবধি দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে এ বিষয়ে কোন ঐক্যমতে পৌছান সম্ভব হয়নি।

ই-কমার্সের ওপর শুল্ক আরোপে যে নিষেধাজ্ঞা ১৯৯৮ সাল থেকে বর্তমান, সে বিষয়ে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের অবস্থান ছিল, এতে ই-পণ্য ও সেবা রপ্তানিকারক উন্নত দেশগুলোই লাভবান হচ্ছে; আর আমদানিকারক উন্নয়নশীল দেশসমূহ শুল্ক আহোরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এক অর্থে এই যুক্তি প্রযোজ্য। সিপিডি-র গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার এ নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য কিছুটা মিশ্র। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রক্ষণাত্মক স্বার্থ (ডিফেন্সিভ ইন্টারেস্ট) যেমন আছে, তেমনি আছে আক্রমণাত্মক স্বার্থ (অফেন্সিভ ইন্টারেস্ট)। তার কারণ বাংলাদেশ সেবাখাতে রপ্তানিও করে থাকে এবং নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে গন্তব্য দেশসমূহে রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপিত হবে যা এসব রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আবুধাবিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদি পরবর্তী আলোচনায় অগ্রগতি না হয় তাহলে ৩১ মার্চ ২০২৬ বা এম.সি. ১৪ এ দুটোর মধ্যে যেটিই আগে আসবে সে তারিখ থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানির ওপর কোনো শুল্ক বসবে না (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য), এমন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাংলাদেশের জন্য তা ইতিবাচক হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার বিষয়ক আলোচনা জেনেভা ও পরবর্তীতে আবুধাবি এম.সি. ১৩-তে বিশেষ গুরুত্ব পায়। স্মর্তব্য যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ডি. এস. বি. বর্তমানে অনেকাংশে অকেজো হয়ে আছে কারণ সংস্কার আলোচনার পরিসমাপ্তি ব্যতিরেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডি. এস. বি.'র আপিল বডিতে কোন নিয়োগ প্রদান করতে বাধা দিচ্ছে। অথচ ডি. এস. বি.'-কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'জুয়েল ইন দি ক্রাউন' বলা হয় যা এ সংস্থাকে ব্যতিক্রমী বিশিষ্টতা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশকিছু উন্নত রাষ্ট্রের যুক্তি হচ্ছে ব্যাপক সংস্কারের অনুপস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও চলমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দুটোরই বিরোধিতা করে আসছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ঐকমতভিত্তিক সিদ্ধান্ত 'সব কিছুতে সহমত না হলে কোন কিছুতেই সিদ্ধান্ত নয়' (নাথিং ইজ এগ্রিড আনলেস এভরিথিং ইজ এগ্রিড) এবং 'একক অঙ্গীকার' (সিঙ্গল আন্ডারটেকিং) -এসব পদ্ধতিগত বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বেশ কিছু উন্নত দেশের পক্ষ থেকে। বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এসব ক্ষেত্রে অনেকটাই অনড়। এসব বিষয়ে আবুধাবিতে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবস্থান হলো সংস্কারের নামে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে যেন শক্তিশালী ও উন্নত দেশসমূহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করা হয় এবং যে কোন সংস্কার কর্মসূচির নামে এ সংস্থার 'উন্নয়ন মাত্রা' (ডেভেলপমেন্ট ডাইমেনশন) যেন দুর্বল না হয়।

আবুধাবিতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারত, বাংলাদেশের মত দেশসমূহ অংশগ্রহণ না করলেও 'বহুপাক্ষিক আলোচনা' (প্লুরিলেটারেল ডিসকাশন) ক্রমান্বয়ে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। বিনিয়োগ (ইনভেস্টমেন্ট ফেসিলেটেশন ফর ডেভেলপমেন্ট), পরিবেশ (ট্রেড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সাসটেইনেবিলিটি, স্ট্রাকচারড ডিসকাশন), ই-কমার্স (জয়েন্ট ইনিশেয়েটিভ অন ই-কমার্স) ও অন্যান্য ইস্যুর ওপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম সমূহের বাইরে অনেক সদস্য দেশ শুল্ক হার, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সংক্রান্ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য হল, ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এসব আলোচনাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূলধারাতে নিয়ে আসা। আবুধাবিতে এভাবেই সেবা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীন রেগুলেশন্সকে প্লুরিলেটারেল থেকে বহুপাক্ষিক রূপ দেওয়া হয়েছে, যা পরবর্তীতে সবার জন্য 'মোস্ট ফেবারড নেশানন্স বা এম.এফ.এন.' ভিত্তিতে প্রয়োগ হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখনো কোন প্লুরিলেটারেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি যদিও বেশ কিছু সংখ্যক স্বল্পোন্নত দেশ বেশ ক'টিতে সক্রিয় আছে যেমন-বিনিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় ২৫টি স্বল্পোন্নত দেশ অংশগ্রহণ করছে। এসব আলোচনায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করা সমীচীন হবে। তাহলে রুলস নির্ধারণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশ প্রভাব রাখতে পারবে এবং উন্নয়নশীল দেশ সমূহের স্বার্থরক্ষায় অবদান রাখতে পারবে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন আলোচনায় ধারাবাহিতভাবে উদ্যোগী ও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীতে এ ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে, একই সাথে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থও বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে, যার অধীনে সাতটি উপ-কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। 'স্মুথ গ্রেজুয়েশন' এর লক্ষ্যে এসব সাব-কমিটি অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট পরামর্শও প্রণয়ন করেছে। লক্ষ্য ও সময় নির্দিষ্টভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহকে যেসব বিশেষ ও বিভাজিত (স্পেশাল অ্যান্ড ডিফারেনসিয়াল) সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং উত্তরণশীল স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে যেসব বিদ্যমান সুবিধা আছে (যেমন টেকনোলজি ব্যাংক এবং বাণিজ্যের জন্য সহায়তা ফান্ড থেকে উত্তরণ-পরবর্তী আরো পাঁচ বছরের জন্য সহায়তা প্রাপ্তি, এল.ডি.সি. ক্লাইমেট ফান্ড, লিগ্যাল সাপোর্ট) সেগুলোরও সুযোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশের জন্যও টেকসই এল.ডি.সি. উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি মূল করণীয় হতে হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এম.সি. ১৩ পরবর্তী আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ইস্যুতে নিজস্ব অবস্থান নির্ধারণ, এসব আলোচনার অভিঘাত বিচার-বিশ্লেষণ ও তার প্রেক্ষিতে কৌশল নির্ধারণ। স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ থেকে উত্তরণের পূর্বে কেমেরুনে ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এম.সি. ১৪-ই হবে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শেষ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। এসবের প্রেক্ষিতে এম.সি. ১৩ এর পরবর্তীতে জেনেভায় পরিচালিত বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

বার্তা ২৪
১৫ এপ্রিল ২০২৪

অন্য দেশের সঙ্গে বাজারসুবিধা সম্প্রসারণে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সুফল

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ ও অন্যান্য উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বাজারসুবিধা সম্প্রসারণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (এভরিথিং বাট আর্মস বা ইবিএ) ও যুক্তরাজ্য (ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম বা ডিসিটিএস) তাদের স্ব স্ব এলডিসি স্কিমের মেয়াদকাল উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উত্তরণ-পরবর্তী আরও তিন বছর বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাজার সুবিধা-সম্পর্কিত আলোচনায় এটা একটা মানবিন্দু (রেফারেন্স পয়েন্ট) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশকে এখন দ্বিপক্ষীয়ভাবে কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারতসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে এমসি–১৩-এর সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।...

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ত্রয়োদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (২৬ ফেব্রুয়ারি—১ মার্চ ২০২৪) ছিল বাংলাদেশের জন্য আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ নভেম্বর ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নতবহির্ভূত উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। বাংলাদেশকে একদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সংহতি রাখতে হয়েছে; একই সঙ্গে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। অন্যদিকে নিকট ভবিষ্যতের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও ইস্যুগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। সম্মেলনে নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এবারের এমসি–১৩-তে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিদলের প্রস্তুতি ছিল বেশ ভালো। এ ধরনের সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সব সময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের জেনেভার মিশন জেনেভায় এমসি–১২ ও এমসি–১৩-এর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং তার সুফল আবুধাবিতে দেখা গেছে। এমসি–১৩-তে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলামের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের

সিনিয়র সচিব ও জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনপ্রধান ও অন্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারি ডেলিগেশন আবুধাবিতে গ্রিনরুম (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাভুক্ত সীমিতসংখ্যক দেশের অংশগ্রহণমূলক আলোচনা) ও সাধারণ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময়ের বিভিন্ন সুযোগকেও কাজে লাগিয়েছে। ফলে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশের অনুকূলে এসেছে, যা সম্মেলন শেষে এমসি–১৩-এর মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ছিল বেশ কয়েকটি- ক. শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজারসুবিধার প্রসারণ, খ. স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদেয় অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রমের সময়—নির্দিষ্ট প্রসারণ, গ. মৎস্য খাতের ভর্তুকির আলোচনায় উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সময়-নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধা, ঘ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কারবিষয়ক আলোচনায় বহুপক্ষীয় বাণিজ্যব্যবস্থায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান।

এর বাইরে সরকারি খাদ্য সংগ্রহে প্রদত্ত কৃষি ভর্তুকিকে কৃষি খাতে প্রদত্ত ভর্তুকির সর্বোচ্চ হিসাবের (যা কৃষি জিডিপির ১০ শতাংশের সমপরিমাণ) বাইরে রাখা, ই-কমার্সের ওপর ১৯৯৮ সাল থেকে প্রচলিত শুল্ক নিষেধাজ্ঞার সমাপ্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠনিক প্ল্যাটফর্মের বাইরে অনুষ্ঠিত বহুপক্ষীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে অবস্থান নির্ধারণ ইত্যাদি।

উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধার প্রসারণ। এ বিষয়ে অবশ্য ২৩ অক্টোবর ২০২৩-এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাধারণ অধিবেশনে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যা এমসি–১৩-তে অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য— প্রথমত, সিদ্ধান্তটি ‘বেস্ট এনডিয়েভার’ (সেরা প্রচেষ্টা) আকারে গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ এটা মেন্ডেটরি বা বাধ্যতামূলক নয়, বরং সদস্যদের সদিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়নি, যদিও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এ-সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবে ১২ বছরের কথা বলা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ৬-৯ বছরে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তৃতীয়ত, প্রস্তাবটি কেবল সেই সব দেশের জন্য প্রযোজ্য, যাদের স্বল্পোন্নত দেশ-নির্দিষ্ট বাজারসুবিধা স্কিম আছে। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের কোনো স্কিম নেই, সিদ্ধান্তটি সে দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশ ও অন্যান্য উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বাজারসুবিধা সম্প্রসারণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (এভরিথিং বাট আর্মস বা ইবিএ) ও যুক্তরাজ্য (ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম বা ডিসিটিএস) তাদের স্ব স্ব এলডিসি স্কিমের মেয়াদকাল উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উত্তরণ-পরবর্তী আরও তিন বছর বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাজারসুবিধা-সম্পর্কিত আলোচনায় এটা একটা মানবিন্দু (রেফারেন্স পয়েন্ট) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

বাংলাদেশকে এখন দ্বিপক্ষীয়ভাবে কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারতসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে এমসি–১৩-এর সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এমসি-১৩-তে এ সিদ্ধান্তও হয়েছে যে, উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে কারিগরি সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সাহায্য উত্তরণ পরবর্তী সময়ে আরও তিন বছরের জন্য প্রদান করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো এর বাইরে যেসব সুবিধা ভোগ করে সেগুলোও যাতে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে তারা বাড়তি সময়ের জন্য ভোগ করতে পারে এমন একটি প্রস্তাবও রাখা হয়েছিল উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে। এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত এমসি–১৩-এ গৃহীত হয়নি। মেধাস্বত্ব অধিকার, ওষুধ রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি ইস্যুতে বাড়তি সময় সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হলে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশ উপকৃত হতো। এমসি–১৩-এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, এ সম্বন্ধীয় আলাপ-আলাচেনা জেনেভায় অব্যাহত থাকবে এবং এমসি-১৪-তে এ বিষয়ে আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করা হবে। জেনেভায় বাংলাদেশ মিশন নিশ্চয়ই এমসি–১৩ পরবর্তী আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের (তথাকথিত এনেক্স ২ প্রস্তাব) পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

কৃষি খাতসংক্রান্ত ‘পিস ক্লজ’-এর আলোচনায় বেশ বড় ধরনের মতপার্থক্য থেকে যায়, যার কারণে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের প্রদেয় কৃষি খাতের ভর্তুকি ১০ শতাংশ সীমা অতিক্রম করে যদি সরকারি খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর্তুকি এ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়; ভারতের যুক্তি ছিল এ ভর্তুকি ‘গ্রিন সাবসিডি’র অনুরূপ, যেহেতু এর লক্ষ্য হলো প্রান্তিক মানুষের জন্য খাদ্যসহায়তা। কিছু দেশ এর বিরোধিতা করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এই খাদ্যের একটি অংশ ভারত আবার রপ্তানিও করে। ভারতের দাবি ছিল ‘পিস ক্লজ’-কে চিরস্থায়ী করা। অন্য কয়েকটি দেশের অবস্থান ছিল এ-সংক্রান্ত আলোচনা কৃষি খাতবিষয়ক বৃহত্তর পরিসরের আলোচনার অংশ হতে হবে। শেষ অবধি দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

ই-কমার্সের ওপর শুল্কারোপে যে নিষেধাজ্ঞা ১৯৯৮ সাল থেকে বর্তমান, সে বিষয়ে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়াসহ কয়েকটি দেশের অবস্থান ছিল। এতে ই-পণ্য ও সেবা রপ্তানিকারক উন্নত দেশগুলোই লাভবান হচ্ছে; আর আমদানিকারক উন্নয়নশীল দেশগুলো শুল্ক আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এক অর্থে এই যুক্তি প্রযোজ্য। সিপিডির গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার এ নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য কিছুটা মিশ্র। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রক্ষণাত্মক স্বার্থ (ডিফেন্সিভ ইন্টারেস্ট) যেমন আছে, তেমনি আছে আক্রমণাত্মক স্বার্থ (অফেন্সিভ ইন্টারেস্ট)। তার কারণ বাংলাদেশ সেবা খাতে রপ্তানিও করে থাকে এবং নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে গন্তব্য দেশগুলো রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপ করবে, যা এসব রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে

পারে। আবুধাবিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদি পরবর্তী আলোচনায় অগ্রগতি না হয় তাহলে ৩১ মার্চ ২০২৬ বা এমসি–১৪-এ দুটির মধ্যে যেটিই আগে আসবে সেই তারিখ থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানির ওপর কোনো শুল্ক বসবে না (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য), এমন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাংলাদেশের জন্য তা ইতিবাচক হবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন আলোচনায় ধারাবাহিতভাবে উদ্যোগী ও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীতে এ ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে। একই সঙ্গে উত্তরণকালীন স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থও বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে, যার অধীনে সাতটি উপকমিটি কাজ করে যাচ্ছে। 'স্মুথ গ্র্যাজুয়েশন'-এর লক্ষ্যে এসব সাবকমিটি অনেক সুনির্দিষ্ট পরামর্শও প্রণয়ন করেছে। লক্ষ্য ও সময় নির্দিষ্টভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে উন্নয়নশীল সদস্যদেশকে যেসব বিশেষ ও বিভাজিত (স্পেশাল অ্যান্ড ডিফারেনশিয়াল) সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং উত্তরণশীল স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে যেসব বিদ্যমান সুবিধা আছে (যেমন- টেকনোলজি ব্যাংক এবং বাণিজ্যের জন্য সহায়তা ফান্ড থেকে উত্তরণ-পরবর্তী আরও পাঁচ বছরের জন্য সহায়তাপ্রাপ্তি, এলডিসি ক্লাইমেট ফান্ড, লিগ্যাল সাপোর্ট) সেগুলোরও সুযোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশের জন্যও টেকসই এলডিসি উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি মূল করণীয় হতে হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এমসি–১৩-পরবর্তী আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ইস্যুতে নিজস্ব অবস্থান নির্ধারণ, এসব আলোচনার অভিঘাত বিচার-বিশ্লেষণ ও তার প্রেক্ষিতে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

খবরের কাগজ
২০ এপ্রিল ২০২৪

ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট, করিডোর

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আশিকুর রহমান অপু: দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি। দেখছেন নিটোল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা। সহযোগীতায় ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার ও হাসপাতাল। আজকের বিষয় বলার আগে আমাদের অতিথি যিনি আছে, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত জানাচ্ছি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য।

আশিকুর রহমান অপু: অনেকদিন পর আবারও দেখা হলো। অনেককিছু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে। আমরা প্রথমে রেল করিডোর দিয়ে শুরু করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরে যে এমওইউ হয়েছে তাতে ভারত আমাদের বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটা করিডোর চাচ্ছে রেলের। যদিও এমওইউ হয়ে গেছে এখন হয়তো আমরা সামনে এটার বাস্তবতা দেখবো। এটা নিয়ে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তারা বলছে যে ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট, করিডোর সব ভারত পাচ্ছে আর আমরা বাংলাদেশ কিছুই পাচ্ছি না। আসলে বাস্তবতাটা কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জনমনে যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। এবং মানুষ, সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষ মনে করছে যে এই পদক্ষেপটা খুব বেশি ন্যায্য হচ্ছে না। এবং ভারতের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে বহুবিধ বিষয়াদি আছে তার ভিতরে একটা ভারসাম্য এই মুহূর্তে নেই। এটিই মনে করছে মানুষ। এবং হয়তো এইটা মনে করার ক্ষেত্রে কিছু যৌক্তিকতাও হয়তো আছে আবার কিছু হয়তো আমাদের বোঝার ক্ষেত্রেও ঘাটতি থাকতে পারে। যেই জিনিসটা প্রথম আমার বোঝার ব্যাপার সেটা হলো একটা আধুনিক বিশ্বে যদি একটি দেশ কোনো অন্যান্য দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্রমান্বয়ে তাকে বাদবাকী অঞ্চলের সাথে যুক্ততার জন্য সংযোগ বৃদ্ধি করা

হয় বিভিন্ন ধরনের। এবং বহুবিধ পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এটা হয়। ধরুন ইউরোপের কোনো একটি দেশ যখন থাকে, সুইজারল্যান্ডের মতো কোনো একটি দেশ যদি থাকে যেটা আপনার সেই অর্থে ভূ-বেষ্টিত দেশ, তারা কীভাবে থাকে? তাদের উপর দিয়ে তো চলাচল করে। আপনারা শেনগেন ভিসার কথা জানেন। এরকমভাবে হয়। তবে জিনিসটা হলো যে এই ঘটনাবলিগুলো যখন ঘটে তখন তার ভিতরে একটি কাঠামোর মধ্যে এটি ঘটে। এটা শুধুমাত্র রেলের জন্য এটা হচ্ছে না। এটার সাথে অর্থনৈতিক সঞ্চালনের ভিতরে থাকে। একইরকমভাবে হয়তো তাদের ভিসা প্রক্রিয়া এটার সাথে যুক্ত হয়। আপনার একই সাথে এইটার আর্থিক ব্যবস্থাপনা এইটার সাথে যুক্ত হয়। তো বহুবিধ বিষয়াদি এইটার ভিতরে থাকে। বাংলাদেশে কিন্তু সেই অর্থে সেই কাঠামোটা নেই এখন পর্যন্ত। এবং এই কাঠামোটা যেটা হওয়ার সম্ভবনা সেটা হলো এই যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি চুক্তি যেটা সেপা বলি আমরা। কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট। সেটা যদি কোনো সময় হয়, সেটার আপনার আলোচনা এই মুহূর্তে চলমান। শুরু হয়েছে মাত্র। সেটার অংশ হিসেবে অন্যান্য বিষয়াদি আসবে। এখন আমি যদি এইটার থেকে শুধুমাত্র আসি, তাহলে দেখবেন যে ট্র্যানজিট, ট্র্যানশিপমেন্ট নিয়ে আমাদের অনেকেরই যেইটুকু আগ্রহ এর আগেও বা ছিল, তখনও মানুষের মনোভাব এইটার বিরুদ্ধে ছিল। এবং তারপরেও সেইটা যেটুকু ছিল, যেটা আমরা মনে করেছিলাম, এটা থেকে আমাদের যে আর্থিক লাভটা হবে, সেটা তো হয়নি। এটা তো সত্য। গত এক দশকে সেই লাভটা আমরা নিতে পারিনি। এমনকি ভারতও যে খুব বেশি ট্র্যানশিপমেন্ট, ট্র্যানজিট ব্যবহার করেছে তারও কিন্তু প্রমাণ নেই। আখাউড়া দিয়ে, অন্যান্য জায়গা দিয়ে উনারা মাত্র কয়েকটি মাত্র ট্রানজিট করেছে। তার আগে পালাটনার জন্য উনারা মানে বেঢপ সাইজের বিভিন্ন মালামাল উনারা নিয়েছেন ওখানে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য।

আশিকুর রহমান অপু: এ তো প্রায় চৌদ্দ বছর হয়ে গেল আমরা ট্রানশিপমেন্টটা দিয়েছি। ভারত ব্যভার করছে না কেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কারণ হলো উনাদের যেটা বক্তব্য সেটা হলো আমাদের ভিতরের অবকাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী না। সেটার অনেক ক্ষেত্রে সংযোগ রেলসেতুও ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তারও গুণমান হয়তো সেরকম না। আমাদের এখানেও রাস্তায় তো সেই অর্থে পরিবহন অনেক। তো সেই অর্থে অবকাঠামোর উন্নয়নটাও সেই অর্থে হয়নি। আর যেটা এটার সাথে হলো এই সময় আধুনিক বিশ্বে যখনই এই পরিবহনের যোগাযোগটা হয় তার জন্য সীমান্ত ব্যবস্থাপনাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সীমান্ত ব্যবস্থাপনার যদি আধুনিকায়ন না হয় তাহলে আপনি এইগুলোর যে মানে মালামাল পরিচালনার এইটার যে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আছে সেগুলোরও নিশ্চয়তা হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় জিনিস ছিল। আমাদের তখন ধারণা ছিল, অনেকেই আমরা, আমাদের প্রতিষ্ঠান সিপিডি থেকেও এইটার পক্ষেই বলেছেন। আমার বন্ধু প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, সহকর্মী, তিনি ওই সরকারি কমিটির ভিতরে সদস্য ছিলেন। উনাদের একটা বড় ধারণা ছিল যে সুফল ভাগাভাগি

হবে। সুফল ভাগাভাগি হওয়ার একটা বড় যুক্তি ছিল যেটা আমার সরকার সেইভাবে আগিয়ে নেয়নি ভারত সরকারের সাথে।

আশিকুর রহমান অপু: ভারতও তো এইটার সুফল খুব বেশি নিতে পারেনি, ট্রানশিপমেন্টের এখনও।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পারেনি। কিন্তু এখন আরো হবে এইটার ভিতরে। সেটা যেটা ধারণা ছিল যে উনারা যদি ১০০ ডলার সাশ্রয় করেন, অন্তত ৩০-৪০ ডলার তো আমাদের দিতে পারেন। তো সেই ৩০-৪০ ডলার দেয়ার তরিকাটা কী হবে? একটা হতে পারে শুল্ক বা বিশেষ বিভিন্ন ধরনের মাশুল আরোপ করে এগুলো করার একটা বিষয় এটার ভিতরে ছিল। তো সেইটা হয়নি। এইটা একটা আমাদের দিক থেকেই ব্যার্থতা আমি বলবো আরকী। কারণ আমাদের মনোভঙ্গির ভিতরেই এটা ঢোকে নাই। এবং হয়তো সম্পর্কের টানাপোড়েনে এটা আমরা উত্থাপন করার সাহস সঞ্চয় করি নাই।

আশিকুর রহমান অপু: ওরা যখন ট্রানশিপমেন্টটা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করবে, সুযোগটা। তখন তো আমরা এই মাশুল বা শুল্কটা বাড়াতেও পারি। এটা তো রিনিউ করা সম্ভব।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: খুবই পারি। এবং এইটাকে যে সবসময় কিলোমিটার প্রতি প্রতি টনের মাশুল হতে হবে এমন কোন কথা নেই। পৃথিবীতে অনেক জায়গায় থোক মাশুল হয়। এমনকি আমার পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই এটা চাইতে পারি। আপনার আগে মনস্থির করতে হবে। আপনার নিয়তটা পরিষ্কার করতে হবে।

আশিকুর রহমান অপু: মানে এখান থেকে ব্যবসা করার টার্গেটটা নিতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার এটা থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ নিতে হবে। কারণ হলো আপনি চিন্তা করে দেখেন ভারতের সাথে আমাদের পণ্যের যে বাণিজ্যে যে ব্যপক ঘাটতি, আমরা এই ঘাটতিকে যদি পূরণ করতে হয় তাহলে আমার সেবা খাত দিয়েই করতে হবে। হয় আমার মানুষ পাঠাতে হবে ওই বাজারে অথবা আমার এমন কিছু বিক্রি করতে হবে যার থেকে আমি আয় পাই। ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি মিটানোটা একটা বড় বিষয়। এখন দেখুন আপনি যেই, নতুন যে যোগাযোগের ব্যপারটা হচ্ছে এর অনেকগুলো হয়তো ’৬৫ ‘র যুদ্ধের আগে সচল ছিল। তো ’৬৫-এর যুদ্ধে পরে তো আমরা একটা ভিন্ন বাস্তবতার ভিতরে এখন অবস্থান করি। নতুন ভৌগলিক এবং বৈশ্বিক বাস্তবতায়। এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আপনার আমরাও তো চাচ্ছি নেপালে যেতে। আমরাও তো চাচ্ছি ভূটানে যেতে ভারতের উপর দিয়ে। ওই বাইশ কিলোমিটার নেপালকে পার হতে তো পারলাম না এখন পর্যন্ত। এবং যেটা হলো, সেটা হলো যে উনারা একবার মাত্র বোধহয় কোন কিছু নিতে, মানে মংলা থেকে কাঠমান্ড পর্যন্ত নিতে পেরেছেন। কিন্তু তাও যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আপনার রেল বদল

করার প্রশ্ন উঠছে, মালকে বগি বদল করার প্রশ্ন উঠছে। নূন্যতমভাবে আপনার চালক বদল করার প্রশ্নও ওঠে।

আশিকুর রহমান অপু: মানে ট্রানশিপমেন্টটা তো পাচ্ছে নেপাল-ভূটান পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পাচ্ছে কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হলো, আপনি যদি একটা গাড়ি নিয়ে যান তাহলে সে আবার মাল নিয়ে ফিরতে পারছে না। তাহলে খালি ট্রাক যাতায়াত করা তো হবে না। সেজন্য আমরা যেটা প্রস্তাব করেছিলাম সেটা হলো আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিকভাবে আপনি লাইসেন্স দেন কিছু পরিবহনকে। তারা এইখান থেকে ওইখানে যাবে।

আশিকুর রহমান অপু: মানে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান সব জায়গায়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সব জায়গায় তারা যাবে। মানে উপ-আঞ্চলিক একটা পরিবহন কাঠামো তৈরি করেন। রাস্তা দিয়ে তো শুধু হবে না। নাহলে তো একটি দেশের পরিবহন ব্যবস্থাই আরেকটি দেশের উপর তাহলে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে। এই যে ট্রেনটা যাবে, আমার ট্রেন কি ভারত থেকে মালপত্র নিয়ে আসতে পারবে? এইটাও তো আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাস্তা যদি থাকে তাহলে শুধু ভারতের রেলের বগি কেন আমার আসবে? আমার রেলের বগিও তো ওখানে যেতে পারতো আমাদের মালপত্র আনার জন্য এবং তারাও পৌঁছে দিতে পারতো। সেহেতু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটাকে কী প্যাকেজটা আমার দাঁড় করাই। আমি যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্য নীতি নিয়ে নিগোসিয়েশোন করেছি, সেই ডাব্লিউটিও এর অভিজ্ঞতা থেকে বলি। এইটা একটা কৌশলগত অবস্থান। যখন একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষ হয়, আপনি যখন তার সাথে কাজ করেন, মানে সবলতর মানুষের সাথে বা দেশের সাথে আপনি কাজ করেন, তখন নিয়ম হলো কোন সময় একটি বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করতে নাই। আপনি সবসময় প্যাকেজ নিয়ে যাবেন। বুঝেছেন? আপনি একটা প্যাকেজ নিয়ে যাবেন কারণ হলো আপনি এক জায়গায় ছাড় দিবেন আরেক জায়গায় জিতে আসবেন। আমার এই জায়গাটাতে আমি মনে করি আমাদের মানে নিগোসিয়েশন শব্দটা এখানে, দর কষাকষিটা ঠিক বোঝা যায় না। নিগোসিয়েশনটাতে আমাদের বড় ধরনের কৌশলগত ব্যার্থতা ছিল। এবং মানে অপর্যাপ্ততা ছিল। ঘাটতি ছিল। এটা সুচিন্তিতভাবে হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ভারতের সাথে গত পনেরো বছরে আমরা যেভাবে ব্যপকভাবে সম্পর্ক বিস্তার করেছি এই বিস্তারগুলো অনেক সময় আপনি দেখবেন অনেক বিচ্ছিন্নভাবে, এড-হক ভিত্তিতে এবং ধারাবাহিকতা ব্যতিরেকে। সেহেতু এইটাকে সামগ্রিকভাবে যে এটা থেকে সুফল নিবো, এই সুফলের কোনো সামগ্রিকতার চিন্তা আমাদের ভিতর ছিল বলে মনে হয় না। এবং আপনি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন নীতিপ্রণেতাদের ভিতরেও এই ব্যাপারে ঐক্যমত্য ছিল বলে আমাদের মনে হয়না। কেউ বলেছেন এটা থেকে আমরা সুফল নিতে পারবো, আমরা শুল্ক দিবো। কেউ বলেছে সুফল নেওয়াটা, শুল্ক দেওয়াটা এটা আমাদের জন্য অসভ্যতামি হবে। এরকম শব্দও আমরা শুনেছি। তো এইটা আমার বোঝার ব্যাপার। তো সেহেতু

আশিকুর রহমান অপু: ভারতে আমাদের যে পণ্যবাহী ট্রাক যায়, সেগুলো তো কোনো মাশুল বা শুল্ক ছাড়াই যাতায়াত করছে। যদিও সংখ্যায় কম।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এর উপরে শুল্ক আছে কিন্তু খুবই সামান্যভাবে এগুলো আছে। সেহেতু এইটার বাণিজ্যিকীকরণ সেইভাবে আমাদের হয়নি। এবং দেখেন যদি আপনি কোনোকিছু বাণিজ্যিকীকরণ না করেন এবং সেইটার থেকে যদি লাভ না হয় তাহলে আপনি বিনিয়োগও করেন না। তাহলে আপনি রাস্তা-ঘাট, উন্নয়নের আধুনিকীকরণ থেকে আরম্ভ করে এই সিগন্যাল, বাতি, ইত্যাদি, এলিভেটেড ওয়ে ইত্যাদি, এগুলো তো আপনার ব্যয় তো। এই ব্যয়টাকে তো আপনার তুলতে হবে। আপনি এই যে নতুন আমরা রাস্তা বাংলাদেশব্যাপী যে বানালাম আমাদের অবকাঠামোয় তো বড় ধরনের একটা উল্লম্ফন হয়েছে সাম্প্রতিককালে। সেইটারও তো টাকা তুলবো এদের মাধ্যমে সেটারও তো আমার একটা পরিকল্পনা লাগবে। সেহেতু আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি, আমাদের এই নিগোসিয়েশনের মধ্যে বড় ধরনের কৌশলগত ঘাটতিটা হলো যে আমরা প্যাকেজ নিয়ে যাই না। আমরা ওটার ভিতরে আমার নেপাল ঢুকাই না। আমরা ওটার ভিতরে ভূটান ঢুকাই না। উনারা নেপালকে, আচ্ছা ওটাতো হবে। নেপাল যখন আলোচনা করে শুধুমাত্র হয়তো পরিবহন আলোচনা করছে ওটার সাথে বিদ্যুৎ আলোচনা হচ্ছে না। বা বিদ্যুৎ হচ্ছে পরিবহন আলোচনা হচ্ছে না। আপনি একইরকমভাবে যখন ভূটানের সাথে হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। দ্বিপাক্ষিক হবে না ত্রৈপাক্ষিক হবে না। এটা হবে ডবল দ্বিপাক্ষিক। অর্থাৎ ভুটান দেবে ইন্ডিয়াকে, ইন্ডিয়া দেবে বাংলাদেশকে। এটা আপনার এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা তো হলো না এটা। সেহেতু আমাদের এটা ধারণাগত আরো স্বচ্ছতা দরকার।

আশিকুর রহমান অপু: টোটাল ম্যাপিংটার অভাব আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধারণাগত স্বচ্ছতা দরকার ছিল। এবং এটার একটা বড় কারণ আমার কাছে মনে হয় যারা এই কাজগুলো করবেন তারা সঠিকভাবে রাজনৈতিক নির্দেশ পান না। যদি ঠিকমতো রাজনৈতিক সংকেত না আসে তাহলে কেউ কারোর পক্ষে নিগোসিয়েশন করা সম্ভব না। রাজনৈতিক উচ্চ পর্যায়ের মানুষরা কী চিন্তা করছে এইটা যদি আপনি ঠিকমতো না বলেন তাহলে প্রতি মুহূর্তে ওখানে পৌঁছে কোনো এক জায়গাতে তখন আপনাকে পরের দিন সকালে একটা খসড়া ধরায়ে দিবে এটাও তো কালকে সই হবে।

আশিকুর রহমান অপু: টেবিল ওয়ার্কটা তখন ভালো হয় না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটাও কালকে সই হবে। তখন আপনি জানেন না।

আশিকুর রহমান অপু: এখান যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুব বড় একটা প্রভাব রাখে সমাজে সেখানে একটা তথ্যের ছড়াছড়ি। সেটা হচ্ছে যে ভারতই সব ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্ট নিচ্ছে। আমরা ভারতের উপর দিয়ে নেপাল, ভূটান যেতে পারছি না বা মাল পাঠাতে পারছি

না। আমরা তো নেপাল, ভূটানের সাথে তো সেই আশির দশক, সত্তরের দশকেও ট্রানজিট চুক্তি হয়েছিল। সেগুলোর বাস্তবতা আসলে কী? আমরা কি আমাদের পণ্য নেপালে পৌঁছাতে পারি ঠিকমতো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শোনেন, যদি মধ্যবর্তী দেশের স্বদিচ্ছা না থাকে তাহলে আপনি ওই দেশে কীভাবে যেয়ে পৌঁছাবেন? বুঝেছেন? এবং এইটা করার জন্য অনেক সময় যেটা হয় যে আমার অবকাঠামো থাকে না। যেমন আপনি বিদ্যুৎ আনতে হলে তো আপনার সঞ্চালনের লাইন লাগবে। তাই না? আপনার বিদ্যুতের সঞ্চালনের লাইনের সাথে সাথে এটার দাম কী হবে, এটার অন্যান্য আপনার কারিগরি দিক আছে সেগুলো কী হবে, এটার নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে সেটা দেখার বিষয় আছে। এইগুলো আমরা সময়মতো শেষ করে উঠতে পারিনি। আমার বক্তব্য হলো এইবার যখন রাষ্ট্র প্রধান গেলেন তখন উনি সাথে প্যাকেজ নিয়ে গেছিলেন কি না। আমার যে অসমাপ্ত জিনিসগুলো। আমি কিন্তু এখনো তিস্তার কথা ঢুকাই নাই। আমি শুধু পরিবহনের কথা বলছি। পরিবহনেরই একটা প্যাকেজ হতে পারতো। সেই পরিবহনের প্যাকেজের সাথে আমার বিদ্যুৎ আসতে পারতো। ওই পরিবহনের প্যাকেজের সাথে আমার তিস্তার পানির বিষয়টা আসতে পারতো। বুঝেছেন? এই পুরো জিনিটা কেমন যেন খাপছাড়াভাবে হচ্ছে। আমি আবার বলছি, রাজনৈতিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে এখানে ঘাটতি আছে। যে আমরা যে একটা পরিকল্পিতভাবে, ধারাবাহকভাবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে যে যাবো, সেইটার ব্যাপারে যেন কেমন হোঁচট খেয়ে খেয়ে, হেঁচকি তুলে তুলে এগুলো কাজগুলো হচ্ছে। এবং এইটার ফলে সরকার কিন্তু এইগুলোর সুফলও যেমন ঠিকমতো আদায় করতে পারছে না, জনমানুষের সমর্থনও কিন্তু সেইভাবে পাচ্ছে না। সেহেতু এইটার একটা বড় ধরনের, সেই অর্থে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে একটা সংবেদনশীল বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। অথচ ভারত এমন একটা দেশ, যেইটার এই ভারতবেষ্টিত অবস্থান থেকে আপনি ভূগোল তো বদলাতে পারছেন না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা কাঠামোর চিন্তা করতে হবে। সেই কাঠামোটা যদি সেপা হয়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার কাঠামো যদি হয়, সেটা হতে পারে। কিন্তু তার আগে বাদবাকিটা কীভাবে চলবে সেগুলো তো আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখতে হবে। এবং দেখুন আরেকটা কথা আমি বলি, এই যে রাজনৈতিক সংকেতের ক্ষেত্রে যে খুব স্বচ্ছতা নেই, ধারাবাহিকতা নেই, তার একটা প্রমাণ হলো যে প্রধানমন্ত্রী এটা করে আসার পরে এটাকে প্রধানমন্ত্রীর নিজে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। আর কোনো ব্যক্তি কিন্তু সেইভাবে, রাজনৈতিক ব্যক্তিতে এটাকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। উনারা যে একটা টুকটাক কথা বলেন সেটা সেরকমভাবে খুব বেশি দাগ কাটে না। সেহেতু এখন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকেই এই কথাটা বলতে হচ্ছে। এবং সেটাও বলার ক্ষেত্রে উনার যে কারিগরি সমর্থনটা দরকার সেটাও উনি খুব বেশি পাচ্ছেন বলে আমার কাছে মনে হয় না।

আশিকুর রহমান অপু: কারিগরি ব্যাখ্যাটা আমরা পাইনি। যে কারণে আসলে আজকে আপনাকে কষ্ট দেয়া এবং আরো নিশ্চয়ই শুনবো। বিশেষ করে ভারতের একটা অভিযোগ যে আমরা ট্রানশিপমেন্ট, ট্রানজিট চুক্তি করে ফেলছি। যদিও তারা ট্রানজিট এখনো তারা

সেইভাবে ব্যবহার করে না। ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের যে কানেক্টিভিটিগুলো তৈরি করে দেয়ার কথা সেগুলো আমরা করছি না। সেখানেও আমাদের একটা ঘাটতি। এটা কি আমাদের রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভাব? আমরা এর আগে দেখেছি যে চুক্তি হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশ যে রাস্তা করে দেয়ার কথা সেটা হচ্ছে না। ভারত এটা নিয়ে অস্বস্তি বিভিন্ন পর্যায়ে জানিয়েছে। এটা কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভাব নাকি অন্য কোনো সমস্যা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের যেই ঋণ আমরা নিয়ে রাস্তা করার কথা হচ্ছিল, ধরেন আগরতলা পর্যন্ত, ইত্যাদি। সেটা হলো যে ভারতের ঋণ কিন্তু শর্তসাপেক্ষ ঋণ। এটা হলো ভারত থেকে আপনার আমদানি করতে হবে বিভিন্ন কাঁচামাল এবং ইত্যাদি, যেটা দিয়ে আপনি রাস্তা করবেন। এবং ওইটাও ভারতীয় কন্ট্র্যাকটররা করবে। সেহেতু ওইটাকে যদি আপনার টেন্ডার অনুযায়ী যদি আপনি সময়মতো, ঠিকমতো না করেন এবং যদি সেখানে ভারতীয় কনট্র্যাক্টরা যথেষ্ট সংখ্যক এটাতে যোগ না দেয়, আগ্রহ প্রকাশ না করে তাহলে তো আপনার এটা বছরের পর বছর এটা চলতে থাকবে। যেটা ভারতের আট বিলিয়ন ডলারের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

আশিকুর রহমান অপু: আমরা যে রেলের এমওইউটা করলাম সেটা বাস্তবায়ন করতে হলেও তো একটা নতুন করে রেললাইন তৈরি করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার তো প্রথমেই করতে হবে যে আপনার একটা মূল্যায়ণ করতে হবে যে এটা দিয়ে এটা দিয়ে কত পরিমাণে রেল চলাচল করার এটার সক্ষমতা আছে। আমাদের প্রয়োজনের সাথে ওইটা কতখানি মিলে। এবং এইটার সব জায়গাতে ওই প্রয়োজনীয় রেললাইন আছে কি না। এবং আপনাকে তো এর আগেও আমি বললাম যে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে সীমান্তের যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে তার আধুনিকায়ন। ধরুন আপনার রেলটা আসলো, আসার পরে আপনি কি সবাইকে নামিয়ে এটা চেক করতে পারবেন? এটা তো আধুনিক জগতে এটা সম্ভব না। আপনি হয়তো ভিতরে ঢুকে দেখবেন বা কিছু একটা। আপনি কি পাসপোর্ট চেক করবেন? পাসপোর্টে কি সিল দিবেন? তাহলে আপনার সীমান্তর একটা বিষয় এটার ভিতরে রয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়েছে যে ওখানে তো অনেক কোচ থাকবে যেটা আপনার মালামাল নিচ্ছে। তো ওই মালামাল কি আপনি খুলবেন? ওই মালামাল কি আপনি দেখবেন? যদিও এই মালামাল বাংলাদেশের মাটিতে নামবে না এইটেই আমরা আশা করি। কিন্তু এটা দেখার জন্য কি আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন আপনার আছে? যে ওইটাকে যেখানে বলছে যে আমি ওখানে কাপড় নিয়ে যাচ্ছি, আমি ওখানে গম নিয়ে যাচ্ছি, আসলে কি অন্য কিছু, সমরাস্ত্র যাচ্ছে কি না সেটা আপনি কি দেখতে পাবেন? সেহেতু এইটা দেখাটা, এইটার আধুনিকায়নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামোর উন্নয়নের বহুমাত্রিকভাবে এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আপনি যে কতগুলো মাল যাচ্ছে, কত মানুষ যাচ্ছে, এইটার পরিসংখ্যান রক্ষা করাটাও তো একটা বড় ব্যাপার ওটার আপনার ভিতরে থাকবে।

আশিকুর রহমান অপু: মানে বাংলাদেশ তো এখনো প্রস্তুতি বাংলাদেশের নেই বলা যায় এই রেল করিডোর যে এমওইউ হলো সেটা খুব শিগগির বাস্তব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না এটা ভারতের জন্য এটা যতখানি না পরিবহনের ব্যাপার, অর্থনৈতিক ব্যাপার তার চেয়ে অনেক বেশি তার নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যাপার। কারণ এইটা যেইখান দিয়ে, কী বলে আপনার, মুরগির গলা, চিকেন নেক দিয়ে যাতায়াত করে সেইটার ক্ষেত্রে চীনের অবস্থানের কারণে তারা একটা বিকল্প রাস্তা খুলে রাখতে চাচ্ছে। কতখানি ব্যবহার করবে, ব্যবহার করতে পারবে কি না সেটা তো দ্বিতীয় ব্যাপার। কিন্তু সাধারণভাবে এটা একটা কৌশলগত নিরাপত্তার একটা অংশ হিসেবে এইটা দেখতে হবে। যতখানি না আপনার এটা পরিবহনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা দেখতে হবে।

আশিকুর রহমান অপু: আচ্ছা। আমাদের তো লক্ষ্য এই সুবিধাগুলো ভারতকে দিয়ে আমরা অনতত আমাদের রাজস্বটা উপার্জন বাড়াবো আমাদের।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলে কি তাই? এই কথা কি একবারও আপনি শুনেছেন? আমাদের যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তারা কি একবারও বলেছেন এটা আমাদের একটা খুবই অর্থকরী বিষয়? তারা যুক্তি দিয়েছেন, আগে তো ছিল, এখন কেন খুলবো না। পৃথিবী খুলছে সবাই, আমরাও খুলবো। এর বাইরে উনারা কোন এইটার কোন বাণিজ্যিক সুবিধা, অর্থনৈতিক এইটার মূল্যায়ণ করেছেন এটা তো শুনিনি। কারণ এর আগে আমরা যে অর্থনৈতিক মূল্যায়ণটা করেছিলাম ভারতের জন্য, মানে মংলা-চিটাগং পোর্ট দিয়ে যাওয়া, এমনকি আমরা তো ভারতের সাথে উপকূলীয় অঞ্চলের নৌ-পরিবহনের চুক্তিও করেছি। ভারতের সাথে তো আমরা বহুবিধ পরিবহন চুক্তি করেছি। নৌকা দিয়ে করেছি। উপকূল দিয়ে করেছি, সমুদ্র দিয়ে করেছি, ট্রেন দিয়ে করেছি, রাস্তা দিয়ে করেছি। আমরা ইংরেজিতে বলি মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। মাল্টি, বহু মোডস নিয়ে এটা হয়েছে। তো এইগুলোর থেকে যে পুরো একটা মূল্যায়ণ করার এখন সময়। আমরা প্রায় দশক পার হলাম তো, এই দশকের, আপনি যদি আমাকে বলেন পরবর্তী পদক্ষেপটা কী, পরবর্তী পদক্ষেপ হলো আপনি এই সামগ্রিক বিষয়ের একটা মূল্যায়ণ করেন, যে বাংলাদেশ এটা থেকে কীভাবে লাভবান হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে। রাজনৈতিকভাবে হয়তো লাভবান হয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে কীভাবে লাভবান হয়েছে এইটা বুঝার ব্যাপার আছে। এবং কোথায় কোথায় আমাদের এখানে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী? আমি কিছুদিন আগে আমার বন্ধুদের সাথে বাজি ধরেছি, কোনটা আগে হবে, ভারতের এ মাথা থেকে ও মাথা রেল আগে যাবে নাকি ঢাকা থেকে কাঠমুণ্ডতে রেল আগে যাবে? কোন রেলটা আগে চালু হবে? মানে এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং আপনি একটা মানে হিসাবের ব্যাপার। গেম থিওরির ব্যাপার। আমরা এটাকে গেম থিওরিতে বলি কোনটা এইটা নাড়লে ওইটা নাড়লে এইটা আগে হবে না ওইটা আগে হবে। একইরকমভাবে হয়তো নেপাল থেকে পঞ্চাশ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ আসবে আগে কিন্তুক আমার গাড়িগুলো যেতে পারবে কি না মংলা পোর্ট থেকে সোজাসুজি এবং ওখান থেকে আবার মাল নিয়ে ফেরত আসতে পারবে কি না। নেপালের সাথে নাকি ভারতের সাথে এইটা আমাদের বোঝার ব্যাপার রয়ে

গেছে। দেখুন এটা, এই এলাকাটা কেন হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ আরো হয়েছিল, যেহেতু সার্ক নাই। যেহেতু আমাদের দক্ষিন এশিয় সহযোগিতার কাঠামো বন্ধ হয়ে গেছে সেইক্ষেত্রে আমরা মনে করেছিলাম যে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান তো গেলই। আফগানিস্তান নাই। শ্রীলঙ্কা তার মতো করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যুক্ত হচ্ছে। সে বৈশ্বিক করছে এবং ভারতের সাথে তারা একটা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে নিয়ে তারা চলে গেছে। তাদের আর অন্য কোন আগ্রহ সেই অর্থে নাই। মালদ্বীপেরও সেই অর্থে নাই। তাদের মতো করে এখন নতুনভাবে সাজাচ্ছে ভারত, চীন মিলিয়ে। তাহলে বাংলাদেশ হলো একটা দেশ যেই বাংলাদেশের কিন্তু সবচেয়ে বড়, অনেক ক্ষেত্রে অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভূটানের এই এলাকাতে, দক্ষিণ এশিয়াতে স্বার্থটা অনেক বেশি তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলোর তুলনায়। এবং এইজন্যই আমরা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলেছিলাম। নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া। বিবিআইএন— বাংলাদেশ, ভূটান, ইন্ডিয়া, নেপাল। কিন্তু এই বিবিআইএন করার জন্য কিন্তু বড় জায়গা ছিল অটোমোবাইল এগ্রিমেন্ট। আমাদের পরিবহন চলাচল। সেটা তিনজন মিলে আমরা করেছি, ভূটান সই করে নাই। কিন্তু এটাকেও তো কার্যকর করতে পারি নাই।

আশিকুর রহমান অপু: মানে তিন দেশেরটা অন্তত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তিন দেশেরটাও তো কর্যকর করতে পারি নাই। রাস্তাও দিতে পারি নাই, এইটার সিগন্যালিং সিস্টেম দাঁড় করাতে পারি নাই, এইটার আমি পরিবহণের কী ধরনের অনুমতি হবে এইটাও করতে পারি নাই, ড্রাইভারদের কী ধরনের যোগ্যতা থাকবে সেইটাও বলতে পারি নাই, চালকদের। সেহেতু এইটা একটা আমাদের বড় ধরনের ব্যত্যয় যে আমরা যতখানি চিন্তা করতে পারি, অতখানি আমরা কার্যকর করতে পারছি না এবং এটাতে আমাদের ক্ষতিটাই বেশি হচ্ছে।

আশিকুর রহমান অপু: আমরা যে ভবিষ্যতে সেপা করবো, যে আলোচনা এখন টেবিলে আছে, ভবিষ্যতের জন্য। সেখানে কি আমরা এই যে ছোট ছোট, আপনি বলছেন যে অনেকটা অগোছালোভাবে অনেক কিছু সই করে ফেলেছে। সেগুলো কি আমাদের এই দর কষাকষির টুল হিসেবে কাজ করবে না তখন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশে যেটা হয় যখন এরকম মানে আপনার ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে, বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক বিভিন্ন চুক্তি-টুক্তি, স্মারক-টারক থাকে, যখন এই সামগ্রিকতার একটা ছাতা তৈরি হয় আমরা আমব্রেলা এগ্রিমেন্ট বলি ইংরেজিতে। আমব্রেলা এগ্রিমেন্ট। একটা ছাতা হয়। সেই ছাতার নিচে তখন ওগুলোকে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু নিয়ে আসতে গেলে যেটা দেখতে হয় যে কোনটা সাংঘর্ষিক হচ্ছে কি না। এখন এক জায়গায় আপনি বলেছেন যে শুল্কমুক্ত আপনি ঢুকতে দিবেন আব্র আরেক জায়গায় আপনি বলেছেন আপনার দায়িত্ব আছে কাউন্টার ভেইলিং ট্যাক্স আমি এটার দিতে পারবো। তো

এইগুলো তখন বুঝতে হবে যে এটার থেকে। ত সেই জায়গাটার নিগোসিয়েশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা হলো বাংলাদেশ যোগ্যতা, দক্ষতা নিয়ে এটার জন্য কতখানি প্রস্তুত।

আশিকুর রহমান অপু: মানে সেই দর কষাকষিটা কতটা করতে পারবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের তো যোগ্যতা, দক্ষতা এই ক্ষেত্রে অনেক আছে। তো আমরা এই ক্ষেত্রে কতখানি প্রস্তুত? এইটা করার জন্য, পাঁচ বছর পরে যেটা হবে আমরা কি সেইরকম নতুন কোন মানুষকে তৈরি করছি কি না। যাদের তৈরি করছি আবার তাদের আপনি কদ্দিন পরে হয়তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আপনি নতুন পদায়ন করে দিলেন। তাকে আপনি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পাঠিয়ে দিলেন। শিখেছিল সে বাণিজ্য নিগোসিয়েশন, পাঠিয়ে দিলেন ঐ জায়গায়।

আশিকুর রহমান অপু: মানে মাস্টার প্ল্যানটা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের কাঠামোগত সমস্যা আছে। বুঝেছেন? মানে দেশের সুশাসন, প্রশাসনকে ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতখানি চিন্তা করেন, তার সাথে সম্পূরক উনারা ব্যবস্থা নিতে পারেন না। এবং সেইটা অনেক সময় দেশের ভিতরে সামগ্রিক পরিস্থিতির সাথে হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন আপনি আমি সাধারণ উদাহরণ দেই। এই সমস্ত নিগোসিয়েশন যখন হয় পৃথিবীর কোন দেশে, এইরকম বিশেষজ্ঞ সবার দেশের ভিতরে, আমলার ভিতরে থাকে না। তারা এটা দেশের ভিতরে বিরাজমান, বিদ্যমান বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে ব্যবহার করে।

আশিকুর রহমান অপু: থিংক ট্যাঙ্কগুলো কাজে লাগে তখন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের কাঠামোকে ব্যবহার করেন তারা। ব্যক্তিখাতের বিভিন্ন উদ্যোক্তাদেরও ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে সেই রকমের আগ্রহ বা সুযোগ এই মুহূর্তে সেই পরিবেশ বিরাজ করে বলে আমার মনে হয় না।

আশিকুর রহমান অপু: আমরা আপনার গতকালকের যে সংবাদ সম্মেলন জি আই নিয়ে সেইখানেও আসলে এই আপনি যে কথাটা বললেন সেটারই একটা ধারণা গতকালকেও পেয়েছি। সেটা নিয়েও কথা বলবো। এর পাশপাশি বাংলাদেশের ঋণ বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবো। আমরা দেখছি যে আমাদের বিদেশি এবং দেশিয় খাত খেতে নেওয়া ঋণ ক্রমাগত বেড়ে চলছে এবং এখন অর্থনীতির যে অবস্থা আরো ঋণ আমরা প্রত্যাশা করছি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কিংবা বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে। ঋণের পরিমান বাড়ছে এবং সুদ দিতে হচ্ছে সরকারকে। এই চ্যালেঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বের হতে পারবে কবে নাগাদ?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: চ্যালেঞ্জ থেকে বের হতে গেলে তো আপনাকে চ্যালেঞ্জ স্বীকার করতে হবে আগে। আপনি যদি চ্যালেঞ্জই স্বীকার না করেন, সমস্যাই যদি স্বীকার না করেন, তাহলে সমাধান করবেন কেমন করে? আজ থেকে দুই বছর আগে যখন আমি বলেছিলাম যে ঋণের ধাক্কা ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে ২০২৪ এ বুঝছেন। '২৬-এ যেয়ে এটা চরম অবস্থার সৃষ্টি করবে। তখন তো সরকারে বিভিন্ন অংশ বিশেষ বলেছে এটা তো অতিরঞ্জন করা হচ্ছে, এরা সব সময়ই সমালোচনা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। এখন তো স্বীকার করতে হচ্ছে কারণ বাজারের বাস্তবতা উনাদের করেছে। কিন্তু এখনো যে পুরোটা স্বীকার করছেন না। দেখুন আপনি লক্ষ্য করে, নীতিনির্ধারকরা কী করছেন। উনারা নির্বাচনের আগে বললেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে। উনারা বললেন যে আপনার টাকার পতন না উল্টো হবে। রিজার্ভ বাড়তে থাকবে, মজুদ। কিছুই তো হয় নাই তার পরে। নির্বাচনের পরে যে শক্তি নিয়ে বের হবে সেটা তো পারিনি আমরা। এবং তার ফলে পরিস্থিতি আরো অবনমন হচ্ছে। তো এখন যদি এটাকে মোকাবিলা করার জন্য কৌশল, সমন্বিত কৌশল না নেন তাহলে তো এইটার পরিস্থিতি আরো জটিল হবে। এইটা আপনাকে আমি আজকে রাতে এখানে বসে বলে দিয়ে যেতে পারি। এটার জন্য খুব বড় অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন করে না।

আশিকুর রহমান অপু: স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই সমন্বিত পদক্ষেপটা কীরকম হতে হবে? আমাদের তো সামনে আরো ঋণ লাগবেই। নিতেই হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে যেটা বলি সেটা হলো যে বাংলাদেশ এখন একটা কাঠামোগত সমস্যার ভিতরে ঢুকেছে। এটা কোন মৌসুমী সমস্যা না। এটা যে আগামী তিন মাসে কেটে যাবে, তিন মাসের একটা ঘটনা ঘটেছে। এবং যারা এখনো বারবার মানে তোতা পাখির মতো বলতে থাকেন ইউক্রেন না হলে বোধহয় সোনার সংসারে আগুন জ্বলতো না, যদি কোভিডের ধাক্কা না হতো তাহলে বুঝি হতো না। এগুলো সত্য হওয়ার পরেও সব দেশ এই পর্যায়ে আসেনি। আফ্রিকারও এই পর্যায়ে আসেনি। আমার প্রতিবেশীরা তো না-ই। এমনকি শ্রীলঙ্কা যেটা আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল আজকে থেকে চব্বিশ মাস আগে, সে কোথায় এখন দেখেন, লক্ষ্য করে দেখেন। তার কীভাবে মজুদ বাড়ছে, তার কীভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তো এইটার একটা বড় কারণ হলো যে প্রথমে আপনার সমস্যাটার স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং এখনো আমি শুনেছি, আজ না কালকে। আপনার আইএমইডি এবং ইআরডি'র পক্ষ থেকে যেই ঋণ, দায়-দেনা পরিশোধের যে টেকসই কৌশল বলা হচ্ছে সেখানেও সেইরকমভাবে উদ্বেগ উনারা দেখাচ্ছেন না। উদ্বেগ দেখানোটাও হয়তো রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যও না। এইটাও একটা বড় বিষয় আরকী। সেজন্য পেশাদার যারা আমলা আছে তারাও সেরকমভাবে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে নিষ্ঠার সাথে একটা কৌশলের কথা বলতে পারছেন না। ফলে কী হচ্ছে দেখেন, আপনার বাস্তবতা হলো ডানদিকে আর আপনি এমন একটা বাজেট তৈরি করলেন এটা বাঁ দিকে। অর্থাৎ তার যে প্রাক্কলনগুলো, সেই প্রাক্কলনের সাথে তার যে ভিত্তি-ভূমি, বেঞ্চমার্ক যেটাকে আমরা বলি, তার কোন সমন্বয় নেই। বাস্তবতার সাথে মেলে না। সে যে প্রবৃদ্ধিটা দিল সেইটাও বাস্তবতার সাথে মেলে না। এবং প্রাক্কলিত যে সংখ্যাটা এনে অনুমিতিটা দিল সেটাও অবাস্তব, অলৌকিক। এটা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ক্ষেত্রে সত্য। ব্যক্তিখাতে যে বিনিয়োগের তথ্য সেইটার জন্য সত্য। রপ্তানির যে প্রাক্কলন সেইটার জন্য সত্য। রেমিটেন্সের জন্য সত্য। এবং কী হলো দেখেন। আপনার যে বাৎসরিক বাজেটটা আছে যে প্রাক্কলনগুলো করেছেন তার সাথে যে আপনার তিন বছর মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী কর্মসূচিটা আছে, তার সাথে কোন মিল নাই। কারণ এইটাকে ওইটার সাথে মেলানোর জন্য যে ধরনের...

আশিকুর রহমান অপু: অর্থ-স্বাস্থ্য বোঝা দরকার...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা আপনি বলেছেন আমি বলিনি।

আশিকুর রহমান অপু: আমি জানি না। এই উই-তিন মিনিটে এটা বলা সম্ভবও না। কিন্তু দেশের মানুষ একটা এই হতাশা যেটা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা কী বুঝতে চায়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটার জন্য, বের হওয়ার জন্য একটি বাস্তবসম্মত এক বছর না, অন্তত তিন বছরের একটা পরিকল্পনা দরকার। যদি না হয় পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আসছে। এই বাজেটটাকে ওইটার অংশ হিসাবে একটা মধ্য মেয়াদী উত্তরণ ব্যবস্থার ভিতরে নিতে হতো। যেটাতে আপনি লক্ষ্যতে বলতেন যে আমি তিন বছরে আমার দায়-দেনা পরিস্থিতিকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো এবং এইটার জন্য আমি এই ধরনের ঋণ নিবো, এই ধরনের ঋণ নিবো না। যে নিয়মগুলো ইতোমধ্যে আছে কিন্তু আমি কার্যকর করি নাই। আমি সাশ্রয়ী ঋণ পাচ্ছি না, আমি উচ্চমূল্যে ঋণ নিয়ে এসে আমি ওই ঋণকে শোধ করছি।

আশিকুর রহমান অপু: মহা পরিকল্পনা একটা দরকার।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইবারের যে বাজেট হয়েছে, এই বাজেটে বাস্তব হলো এই। যে গত বছরও তাই, এই বছরও তাই। গত তিন বছর ধরে। এবং আপনার একটা পয়সা আপনার রাজস্ব উদ্বৃত্ত দিয়ে আপনি উন্নয়ন করেন নাই। পুরো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হলো আপনার ঋণের টাকায়। হয় এটা বিদেশ থেকে নিয়েছেন, নয় ব্যাংকের থেকে নিয়েছেন। নাহলে এখন নতুন তরিকা হয়েছে ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করে নিচ্ছেন। আগে জাতীয় সঞ্চয় পত্র ছিল তার জায়গায় এখন ট্রেজারি বন্ড নিচ্ছেন। এবং অত্যন্ত উচ্চমূল্যে আপনি এই টাকাটা নিচ্ছেন। এই টাকা পরিশোধ করার জন্য যে সক্ষমতা দরকার সে সক্ষমতা নেই। এবং তার সাথে কী যুক্ত হয়েছে? বেস কিছু আপনি বিদেশি উৎস থেকে টাকা নিবেন এখন। তো আপনি যেগুলো নিবেন অনেকগুলোই হলো বাজেটিয় সমর্থন যদি পান, বিশ্বব্যাংকের থেকে অথবা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের থেকে, এমনকী জাপানের থেকে তাহলে এগুলো আপনি কিছু ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু ওটার সাথে উনারা কিছু সংস্কার কর্মসূচি দিবে। আপনি

সংস্কারটা করবেন না, টাকাটা নেবেন। এই এখন যেটা আইএমএফের সাথেও হচ্ছে, আপনি প্রত্যেকবার একটা কিস্তি চালানোর জন্য করজোড়ে নতজানু হয়ে আপনাকে বলতে হয় আমার এইটাকে নামিয়ে দাও। আমার লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে কমিয়ে দাও। আমি করে উঠতে পারলাম না। এইটেই হলো সবচয়ে সমস্যা। শ্রীলঙ্কাতে এটা হয়নি। শ্রীলঙ্কা এক অঙ্গ-মন হয়ে পুরা সংস্কার করেছে, পুরা দেশ-জাতি তার সাথে দাঁড়িয়েছে। এবং তার সাথে এটাতে কোন সমস্যা হয়নি। শ্রীলঙ্কার গভর্নরকে নিয়ে এসেছিলাম যে আমরা ঢাকাতে, সিপিডির পক্ষ থেকে, দক্ষিণ এশিয়ার আলোচনায়। উনি একটা কথা বলেছিলেন আমাকে। সেটা হলো যে যখন আপনি, আমি বলেছিলাম যে আমাদের বোধহয় আরো স্বায়ত্তশাসন দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আর স্বাধীন করা দরকার। উনি বলেছিলেন, আপনি যতই লিখে দেন না কেন স্বাধীন এবং স্বায়ত্তস্বাসন, লোকটা যদি মনের দিক থেকে স্বাধীন না হয়, তার যদি নিজের স্বায়ত্তশাসন না থাকে, সে কোনদিনই স্বায়ত্তশাসন আপনাকে দিতে পারবে না। দেখুন, আমার অর্থনৈতিক পরিচালনায় যারা আছেন, একদিকে তাদের সক্ষমতার প্রশ্ন আপনি বলেছেন, আর আরেকদিকে আমি বলি তাদের স্বায়ত্ত্বশাসন মানসিক তাদের সেই অর্থে নাই। এবং সবচেয়ে খারাপটা কী জানেন? সেটা হলো উনাদের সেটা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত্বশাসনের বা মনের স্বাধীনতার অভাবটা এইটার কারনে না যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উনাদের পরিচালনা করছেন। ওইটাও ঠিক না। অর্থাৎ এইটাকে পুরা পরিস্থিতিটা অরাজক একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমি বারবার যেটা বলি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যত না খারাপ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবস্থাপনার অভাব তাকে খারাপ করে দিলো। সমন্বয়ের অভাব তাকে খারাপ করে দিল।

আশিকুর রহমান অপু: সময় কম ফলে থামাতেই হলো। অনেকক্ষণ ধরেই চেষ্টা করছি থামাতে। গতকাল যে আপনার সংবাদ সম্মেলন তার প্রেক্ষিতে আজকে সরকারের পক্ষ থেকে একটা বক্তব্য পেয়েছি। সেটা নিয়ে একটু শুনবো। একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যেহেতু গতকালকে আপনার সিপিডির পক্ষ থেকে যে সংবাদ সম্মেলন তাতে বলেছিলেন যে ২০১৭ সালে আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু সুন্দরবনের মধু এখনো স্বীকৃতি পায়নি। এটা নিয়ে আজকে সরকারের যারা দায়িত্বশীল তাদের কাছে এটিএন নিউজ গিয়েছিল। তারা কী বলেছেন একটু শুনে নিই প্রথমে। উনি বলছেন যে হঠাৎ করে একটা আবেদন করলে এটা হয় না। একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে শীঘ্রই এইটা পাওয়া সম্ভব।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো যে, উনি একটা উত্তর দিয়েছেন আমি সেজন্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। কারন সরকারের অনেক সময়ই আমলা-কর্মচারীরা এই সমস্ত বা কর্মকর্তারা এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। উনি কথাটা বলেছেন আমি এটার জন্য অভিনন্দন দেই উনাকে। তবে হঠাৎ করে দেওয়া যায় না, সাত বছর তো আর হঠাৎ না। ভারত এই আমাদের পরে আবেদন করে সে তার আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি নিয়েছে চার বছরের ভিতরে। এবং উনারা যে এটার জন্য কোন প্রস্তুতি আছে এইটাও খুব

পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না। আরেকটা যেটা উনি বলছেন সেটা হলো যে ভারতেও সুন্দরবন আছে। এইটাই তো। মানে অভিন্ন ভৌগলিক নির্দেশকের জন্য আমি কালকে যেটা বলেছি। এইটার জন্য আইনি কাঠামো লাগবে। আমার প্রত্যাশা ছিল যে এইবার সরকার প্রধান যখন গেলেন ভারতে, তখন এইটা এত এমওইউ হলো, এইটাও একটা এমওইউ হতে পারতো। স্মারক হতে পারতো।

আশিকুর রহমান অপু: যেহেতু আমাদের অনেক অভিন্ন কিছু আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই পর্যন্ত অন্তত আটটা পণ্য হয়েছে যে পণ্যটা তাদেরও আমাদেরও। এইটা বেনারসী শাড়ি বলেন, মসলিন বলেন, নকশি কাঁথা বলেন।

আশিকুর রহমান অপু: রসগোল্লা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রসগোল্লা বলেন, আম বলেন। এগুলো তো সবই হয়েছে। আরো হবে। এইটাই শেষ ঘটনা না। তো সেহেতু আগামী দিনে এইটাতে একটা অভিন্ন চুক্তিতে আমাদের আসতে হবে।

আশিকুর রহমান অপু: একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া লাগবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুধু রাজনৈতিক না এটা একটা আইনি বোঝাপড়ার একতা চুক্তি লাগবে কাগজে-কলমে। এবং আন্তর্জাতিকভাবেও এইটা ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন চুক্তিতে অংশ নিতে হবে। এইটা করার প্রস্তুতিটা খুবই জরুরি। আশা করি সেইটার দিকে উনারা আগাবেন।

আশিকুর রহমান অপু: অনেক ধন্যবাদ সর্বশেষ এই সংযোজনের জন্য। আলোচনা অনেক কিছু নিয়েই হলো। আবারও নিশ্চয় ভবিষ্যতে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনিও ভালো থাকবেন।

এটিএন নিউজ
২৭ জুন ২০২৪

অধ্যায় ৬

বৈদেশিক ঋণ

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় সতর্ক হতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ নিকট অতীতে আমরা যেসব ঋণ পেয়েছি, তার সদুহার আগের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতিও বাড়ছে। চলমান অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সুদাসল পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। সুদ ব্যয় বেড়েছে ১১৭ শতাংশ আর আসল ব্যয় বেড়েছে ২২ শতাংশ।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয় থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে সহজ শর্তের ঋণ প্রাপ্তির বিপরীতে তুলনামূলকভাবে কঠিন শর্তের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে আমরা যেসব ঋণ পেয়েছি, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুদহার যেমন ছিল বেশি, তেমনি গ্রেস পিরিয়ড ও মেয়াদকাল ছিল কম।

বিগত সময়ে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রকল্পের জন্য সরবরাহকারী ঋণ বা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট নিয়েছে— যে ঋণের সুদহার বেশি; অন্যান্য শর্তও কঠোর। কিছু কিছু ঋণ নেওয়া হয়েছে নমনীয় লাইবর/এসএফওআর সুদহারে। কয়েক বছর আগেরকার ১ শতাংশের জায়গায় এই সুদহার এখন দাঁড়িয়েছে ৪-৫ শতাংশে। ফলে প্রাক্কলিত সুদের হারের চেয়ে প্রকৃত হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিছু কিছু বড় প্রকল্পের জন্য যে ঋণ নেওয়া হয়েছে তার গ্রেস পিরিয়ড বর্তমানে শেষ হচ্ছে। নিয়ম হলো, গ্রেস পিরিয়ডের সময় কেবল সুদ পরিশোধ করতে হয়, তার পরবর্তী সময়ে মেয়াদকাল শুরু হলে সুদের সঙ্গে আসলও যোগ হয়। ফলে ঋণ পরিষেবার দায়ভার বৃদ্ধি পায়।

২০১৫-২০ সালের দিকে যেসব বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার অনেকগুলোর গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়েছে বা শেষের পর্যায়ে আছে। ফলে আমাদের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামী কয়েক বছর বাড়তে থাকবে। চলমান অর্থবছরে ঋণ পরিষেবার উপরোল্লিখিত চিত্র এই প্রবণতারই পূর্বাভাস মাত্র। বর্তমানের সঙ্গে যোগ হবে নতুনভাবে নেওয়া বৈদেশিক ঋণও।

বৈদেশিক ঋণের দায়ভার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ সময়ে টাকার বিনিময় হারের বড় ধরনের অবনমন হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দিক থেকে আমরা ত্রিমাত্রিক চাপে আছি। সামনে টাকার অবমূল্যায়ণ অব্যাহত থাকলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ আরও বাড়বে। বেসরকারি খাতের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা কিছুটা সহজ। কারণ বেসরকারি খাত রপ্তানি করে ডলার আয় করতে পারে এবং সেই অর্থ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু সরকার বৈদেশিক ঋণ নিয়ে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার আয় হয় মূলত স্থানীয় মুদ্রায়, টাকায়। তাই মুদ্রার বিনিময় হারের অবনমনে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সমস্যায় পড়েনি। কিন্তু বিকাশমান পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প নির্বাচনে অধিকতর সতর্কতা ও বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। অতি মূল্যায়িত প্রকল্প ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্র প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাতে ঋণের খরচ বেড়ে যায়। তাই এসব বিষয়ে এখনই দৃষ্টি দিতে হবে, সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ (রাজস্ব-জিডিপি রেশিও) উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সর্বনিম্নের কাছাকাছি। তাই রাজস্ব আদায় বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। অনুকূল শর্তে ঋণপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তুলনামূলকভাবে সহজ শর্তের ঋণের উৎস খুঁজতে হবে (যেমন জলবায়ু ফান্ড)। বৈদেশিক ঋণের আলোচনায় বিশ্লেষণ-নির্ভর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সাশ্রয়ীভাবে ও সময়মতো প্রকল্প শেষ করতে হবে। বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা, উৎকর্ষ, সাবধানতা ও সতর্কতার সময় এখনই।

প্রথম আলো
২২ এপ্রিল ২০২৪

আমাদের যেন ঋণ এনে ঋণ পরিশোধ করতে না হয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

কয়েক বছর ধরেই আমরা এ চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তবে এখন মূল্যস্ফীতি যদি নিম্নমুখীও হয় মূল্যস্তর কিন্তু ওপরে উঠে গেছে—এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সবারই ক্রয়ক্ষমতার একটা অবনমন ঘটছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপাত্ত অনুসারে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ। কিন্তু যখন খাদ্যনিরাপত্তার কথা এল তখন বিবিএসের উপাত্তে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য। সাম্প্রতিক অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম

শিগগিরই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলা হলেও প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে, এখনো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা মূল্যস্ফীতি আরো বাড়তে পারে, এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করছেন?

কয়েক বছর ধরেই আমরা এ চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তবে এখন মূল্যস্ফীতি যদি নিম্নমুখীও হয় মূল্যস্তর কিন্তু ওপরে উঠে গেছে—এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সবারই ক্রয়ক্ষমতার একটা অবনমন ঘটছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপাত্ত অনুসারে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ। কিন্তু যখন খাদ্যনিরাপত্তার কথা এল তখন বিবিএসের উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, ২২ শতাংশের

বেশি খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ পুষ্টিনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে দারিদ্র্যসীমার সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, জীবনযাত্রার মানের একটা বৈপরীত্য রয়েছে যাচ্ছে।

এমনটা কেন হচ্ছে বলে মনে করেন? এ সংকট নিরসনে কী করণীয়?

এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটা হলো, বিনিয়োগ বাড়িয়ে কীভাবে আয়বর্ধক কর্মসূচি আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখন থেকে ১৫ বছর আগে মূল্যস্তর আরো অনেক কম ছিল কিন্তু জীবনযাত্রার মান নিম্ন ছিল না। কারণ আয় ছিল ঊর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ মূল্যস্তর বা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয় বাড়লে ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হয় না। সুতরাং এটা সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত। আমাদের অর্থনীতি যে কিছুটা ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে সেটা স্পষ্ট। আমাদের অর্থনীতির যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং নিম্ন মূল্যস্ফীতির ব্যাপারটা ছিল তা এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। মূল্যস্ফীতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নতুন ভারসাম্য আনতে হবে। এজন্য প্রবৃদ্ধি কিছুটা নিচের স্তরে হলেও তা আমাদের মেনে নিতে হবে। এখানে সংকোচনমূলক যে মনিটারি পলিসি নেয়া হয়েছে সেটা আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছে। সুদহার বাড়ানো হয়েছে, স্মার্ট রেট চালু করা হয়েছে, রিভার্স রেপো চেঞ্জ করা হয়েছে, পলিসি রেটকে বাড়ানো হয়েছে যেন বাজারে মানি সাপ্লাই কমানো যায়। খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে হবে না, রাজস্বনীতির ব্যাপার আছে। শুল্ক কমানো হলে ভোক্তারা সাশ্রয়ী মূল্যে কিনতে পারে। সেখানে আমি যদি শুল্ক কমাই এবং ভোক্তারা যেন সে সুফলটা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। সাপ্লাই চেইনের যে অ্যাক্টররা (প্রভাবক) আছে তাদের ওপর তদারক করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের যে বৈদেশিক বিনিময় হার তা যদি স্থিতিশীল করতে পারি তবে তা আমদানীকৃত মূল্যস্ফীতির ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। সুতরাং অনেকগুলো ফ্যাক্টর আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ, আমাদের অর্থনীতিতে একটি নতুন ভারসাম্য নিয়ে আসার ওপর নির্ভর করবে যে আমরা মূল্যস্ফীতি কমাতে পারব কিনা। কিন্তু আমাদের বিনিয়োগ বাড়ানো, কস্ট অব ডুইং বিজনেস কমানো, উদ্যোক্তারা যাতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের দিকেও নজর দিতে হবে। কারণ মূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যস্তর অনেক বেড়ে গেছে। এখন যদি মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমেও স্তরটা ওপরের দিকেই থেকে যাবে। সুতরাং সেখানে আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে। গড় আয় যেটা বছরে বাড়ে, মূল্যস্ফীতি তার দ্বিগুণ, যেমন তৈরি পোশাক খাতের একজন কর্মীর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব, তার বেসিক স্যালারি ৫ শতাংশ করে বাড়ছে কিন্তু তার খাদ্যের মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি। ফলে আয় কিছুটা বাড়লেও তার ক্রয়ক্ষমতার কিন্তু অবনমন ঘটছে। অর্থাৎ আমাদের এসব ক্ষেত্রে যে আনুষঙ্গিক উদ্যোগগুলো রয়েছে—দক্ষতা বাড়ানো, প্রডাক্টিভিটি বাড়ানো ইত্যাদির দিকে নজর দিতে হবে।

গত আট বছরে আমাদের বৈদেশিক ঋণ দ্বিগুণ বেড়েছে মাথাপিছু প্রায় ৬৩ হাজার টাকা। এটা আমাদের অর্থনীতির জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ?

আমার মনে হয় যে বৈদেশিক ঋণের পরিষেবা নিয়ে আমাদের গুরুত্বসহকারে চিন্তা করা দরকার। কেননা এটা আরো বাড়বে। বিগত কয়েক বছরে যেসব ঋণ আমরা নিয়েছি সেগুলোর ম্যাচিউরিটি পিরিয়ড চলে এসেছে। গ্রেস পিরিয়ড, যখন আমাদের কোনো ঋণ পরিষেবার দরকার হবে না, সে পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যে ঋণগুলো নিচ্ছি সেগুলোর অনেকগুলোরই গ্রেস পিরিয়ড কম, ম্যাচুরিটি পিরিয়ড কম সুতরাং দায়ভারটা বেশি। আমরা মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্সের যেসব প্রাক্কলন পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে, ১০ বছর আগে আমাদের যদি ২ বিলিয়ন ডলারের মতো পরিষেবা হতো (সুদাসলে) বৈদেশিক ঋণের, যা এখন ৪-৫ বিলিয়ন ডলারের দিকে চলে যাচ্ছে। এমন একটা সময়ে যাচ্ছে যখন আমাদের রিজার্ভ কমের দিকে। যখন রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ছিল তখন ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিষেবা থাকলে এক কথা, কিন্তু এখন রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলার এবং ঋণ পরিষেবা করতে হচ্ছে ৪-৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন!

ভিন্নতর এ পরিস্থিতির মুখে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

এখন নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে কিছুটা রাশ টেনে ধরা। পুরনো বিনিয়োগ যেগুলো পাইপলাইনে আছে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এছাড়া ঋণ আলোচনাগুলো এমনভাবে করা যাতে করে আমরা যে শর্তে ঋণ নিচ্ছি তা যেন আমাদের অনুকূলে হয়। ২০১৫ সালে আমাদের যখন মধ্যম আয়ের দেশে গ্র্যাজুয়েশন হলো তখন কিন্তু কনসেশনাল লোন অনেক কমে গেল। আমাদের নন-কনসেশনাল লোনই এখন বেশি। আমাদের ঋণের দায়ভার আগের তুলনায় আগামীতে বাড়বে। আমাদের বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যাতে করে আমাদের পরিষেবায় কোনো সমস্যা না হয়। জিডিপির সঙ্গে তুলনা করলে বৈদেশিক ঋণ অত বেশি নয়, তুলনামূলকভাবে অনেক কম (আমাদের জিডিপির ১৮ বা ১৯ শতাংশ)। তবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের রেভিনিউ (রাজস্ব) কত হলো। কারণ এই রেভিনিউ দিয়েই ঋণ পরিষেবা করতে হবে। অথচ আমাদের রেভিনিউ-জিডিপি হার এখন ৯ শতাংশেরও কম! এর একটা বড় অংশ তো ঋণ পরিষেবাতেই তাহলে চলে যাবে। তখন যেন ঋণ এনে ঋণ পরিশোধ করা না লাগে—এমন অবস্থা এড়াতে আমাদের রেভিনিউ বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের বিনিময় হারকে স্থিতিশীল করা। যেহেতু অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে যার রিটার্ন আসবে টাকায় কিন্তু ফেরত দিতে হবে ডলারে। একসময় আমরা ৮৬ টাকায় ১ ডলার হিসাব করলেও এখন ১১০ টাকায় ১ ডলার হিসাব করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে একটা দায়ভার তুলনামূলকভাবে বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ প্রকল্পগুলো যেন সাশ্রয়ীভাবে, সময় মতো ও সুশাসনের সঙ্গে বাস্তবায়ন হয়—এর প্রয়োজনীয়তা এখন তুলনামূলকভাবে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে বেশি। এখন এটি যদি বাস্তবায়ন করতে পারি তবে আমরা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। তবে যদি তা করতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়বে। কেননা আমাদের রিজার্ভ অনেকটাই কমে এসেছে।

সাম্প্রতিক বাজেট প্রস্তাবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বলেছে, চলতি অর্থবছরে ৮৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে। এ ঘাটতি সামষ্টিক অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

আমাদের প্রথম ছয় মাসের যে তথ্য-উপাত্ত আছে, আমরা যদি এভাবেই অগ্রসর হই এবং গত বছর আমরা রাজস্বে যে প্রকৃত আয় করেছি সেসব বিবেচনায় রেখে এবারের যে রিভাইসড টার্গেট আছে সেটায় কী পার্থক্য হতে পারে—আমরা সেটা প্রাক্কলন করেছি। এ অ্যামাউন্ট থেকে কিছুটা কম হলে অবশ্যই ভালো, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে একটি বড় অ্যামাউন্ট হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের দুটো পথ আছে— অর্থবছরের বাকি সময়টাতে আমরা যদি ব্যয় কমাই তবুও ঘাটতির পার্থক্য অতটা হবে না। যতটা প্রাক্কলন করেছি সেটাই থাকবে। কিন্তু আমার আয় যদি ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকা কমে যায় আর ব্যয় যদি আগের মতোই থাকে তাহলে কিন্তু ঘাটতি দেখা দেবে। আর এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে বিভিন্ন ঋণ নিয়ে। হয় অভ্যন্তরীণ ঋণ নিয়ে (ব্যাংক খাত, নন-ব্যাংক খাত, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি বিক্রি করে) অথবা বৈদেশিক ঋণ নিয়ে (যে বৈদেশিক ঋণের পরিষেবা মূল্য তো বেড়ে যাচ্ছে যেমনটা আমি বললাম)। তবে এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়াকালীন কোনো ঋণ ফাঁদে যেন না পড়ে যায়।

বিদ্যমান সংকট নিরসনে এখন জরুরি ভিত্তিতে আমাদের কী করণীয়?

আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হতে পারে আমাদের রাজস্ব, জিডিপি রেশিও যা আমরা বাড়াতে পারি। এটা করা যাবে প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর মাধ্যমে। বাংলাদেশে আমরা কিন্তু দেখছি যে, আয়বৈষম্য বা সম্পদ বৈষম্য বাড়ছে যেটা ইতিবাচক নয়। বাংলাদেশে আমরা একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ চাই, কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়! বিবিএসের হিসাব বলছে, আয় কেন্দ্রীভূতকরণের যে সুযোগ তা ১৯৯০ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং তা শহরে ও গ্রামে বেড়ে চলেছে (৫ শতাংশ বেড়েছে)। এটা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আমরা কিন্তু ইন্টারজেনারেশনাল গ্যাপ বা আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনতে পেরেছিলাম। আমাদের পাঁচ দশক ধরে আর্থসামাজিক সূচকে যে উন্নয়ন হয়েছে (গত দুই দশকে আরো দ্রুত হারে হয়েছে), এ ইতিবাচক প্রবণতাও কিন্তু একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব কীভাবে রাজস্ব, জিডিপি প্রত্যক্ষ কর আহরণের মাধ্যমে বাড়াতে পারি। অনেকেই দুর্নীতি করে, ঋণ খেলাপি করে দেশের টাকা বাইরে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। আগে এ পাচারকৃত টাকা দেশে বিনিয়োগ করা হলেও এখন তা দেশের মধ্যে থাকছে না। এ টাকা তারা বাইরের দেশে বিনিয়োগ করছে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক সিস্টেমের মধ্যেই টাকাটা আর আসছে না। এ নেতিবাচক প্রবণতাগুলো আমাদের প্রশাসনকে শক্তিশালী করে মোকাবেলা করতে হবে। এখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের, পারচেজিং পাওয়ার হিসাব করলে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের একটা অর্থনীতি। এগুলো ম্যানেজ করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। এক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সুশাসন, জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক

সক্ষমতা, সরকারি পরিষেবা যেসব প্রতিষ্ঠান করে তাদের জবাবদিহিতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে আমাদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে। এটা করতে পারলে আমাদের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং বাস্তবতার সঙ্গে প্রাক্কলনের যে ব্যবধান দেখা যাচ্ছে সেটাও কমাতে পারব।

বণিকবার্তা
২৬ এপ্রিল ২০২৪

আমরা একটি প্রতারণামূলক বাস্তবতার মধ্যে আছি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দু'বছর আগে (৯ মে ২০২২) সিপিডিতে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলাম, ২০২৪ সাল আমাদের জন্য কঠিন বছর হবে; দায়দেনা পরিশোধের ব্যাপারে বড় ধাক্কা আসবে। ২০২৬ সালে তা আরও বাড়বে। আরও বলেছিলাম, দায়দেনার হিসাবে ফাঁকফোকর আছে; অনেক কিছুই বিবেচনায় রাখা হয়নি। বিষয়টি উল্লেখ করছি এ কারণে যে, অর্থনীতিবিদ বা গবেষকদের প্রাক্কলন সমীকরণ নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকরা যাতে শ্লেষাত্মক কথা বলার ক্ষেত্রে সংযত হন।

বাংলাদেশের দায়দেনা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পরিস্থিতি আসলেই কেমন? আমরা প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা ধারণা রাখি এবং তা কীভাবে মূল্যায়ণ করব? দ্বিতীয়ত, দেশের দায়দেনার আর্থসামাজিক ফলাফল কী? যে লক্ষ্য বা চিন্তাভাবনা থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে অর্জন কতটুকু? তৃতীয়ত, দায়দেনা পরিস্থিতি কেন এমন গুরুতর হলো? এটি কি অবধারিত ছিল?

ক. দেশের মোট ঋণ কত?

আমাদের দেশে সরকারের বৈদেশিক ঋণ নিয়ে যত আলোচনা হয়, ব্যক্তি খাতের বৈদেশিক ঋণ নিয়ে ততটা নয়। অথচ বৈদেশিক ঋণের ২০ শতাংশই ব্যক্তি খাতের। ব্যক্তি খাতের ঋণ সামগ্রিক পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করে। কেননা পরবর্তী সময়ে পরিশোধজনিত কারণে মুদ্রার বিনিময় হারে এটি প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি খাতের ঋণ নিয়ে কিছু অভিযোগও রয়েছে। কেউ কেউ বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে দেশে ব্যাংকের টাকা শোধ করেছেন। কেউ কেউ বিদেশে পাচার করেছেন অথবা আদৌ বিদেশ থেকে দেশে আনেননি। সুতরাং ব্যক্তি খাতের ঋণের হিসাব কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান বাংলাদেশে এটি পরিসংখ্যান ও গুণগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের পাশাপাশি সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেও ঋণ নিচ্ছে। বর্তমানে সরকারের ঋণের দুই-তৃতীয়াংশই অভ্যন্তরীণ ঋণ। সামগ্রিক দায়দেনা পরিস্থিতি বুঝতে হলে বৈদেশিক ঋণের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ঋণের হিসাবও মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। কেননা ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে দুই উৎস মিলেই। দুটো মিলিয়ে, আমার হিসাবে, মাথাপিছু ঋণ এখন প্রায় দেড় লাখ টাকা; যা তিন বছর আগে ছিল এক লাখ টাকা। এক লাখ টাকা হতে ৫০ বছর লাগলেও মাত্র তিন বছরেই ৫০ হাজার বেড়েছে।

মাত্র তিন বছর আগেও ঋণ পরিশোধে বছরে রাজস্ব ব্যয়ের ২৬ শতাংশ খরচ হতো; বর্তমানে এটা ৩৪ শতাংশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ২৮ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য এবং বাকি ৬ শতাংশ বৈদেশিক ঋণের জন্য। তার মানে, সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা সাম্প্রতিক তিন-চার বছরে তীব্রতর হয়েছে।

কেউ কেউ কভিড, ইউক্রেন যুদ্ধ বা গাজার সহিংসতার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন, তাদের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই। ২০১৮-১৯ সালের পর থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর কারণে ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এ পরিস্থিতিতে আমাদের কি উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে? আমি মনে করি, পরিস্থিতি অবশ্যই অধিকতর উদ্বেগজনক।

বস্তুত ঋণ পরিশোধের পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে, আমরা রাজস্ব বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি টাকাও খরচ করতে পারছি না। উপরন্তু ঋণ করে ঋণ শোধ করছি। এর মানে বর্তমান সমস্যা আগামীর সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে না।

এক অর্থে বর্তমান পরিস্থিতি একটি ‘প্রতারণামূলক বাস্তবতা’। প্রতারণামূলক বাস্তবতা হলো সেই বাহ্যিক অবস্থা, যা অন্তর্নিহিত সত্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যা বুঝতে দেয় না বর্তমানের বিষয়গুলো কীভাবে ভবিষ্যতের আশঙ্কা আবৃত করে রাখছে। মনে রাখতে হবে আমরা এখন আর ‘গ্রিন জোন’ বা নিরাপদ অবস্থানে নেই। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, মুডিস, এসঅ্যান্ডপি– সবাই আমাদের রেটিং নামাচ্ছে। সেই বিবেচনায় আমরা ‘ব্রাউন জোন’ বা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে চলে গেছি।

খ. লাভ হলো কার?

ঋণ নেওয়ার ফলাফলটা কী? একটা প্রকাশ তো আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির দুর্বল হয়ে যাওয়াতে মূল্যস্ফীতিতে টাকার বিনিময় হারের অবনমনে দৃশ্যত দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আমার মতে, মূল জায়গাটা হলো: ঋণ করে সরকার যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তার ফলে আমাদের বিনিয়োগ বেড়েছে কিনা; আমরা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা কর আহরণ বাড়াতে পারছি কিনা। তবে বিনিয়োগ বাড়লেই তো কর আহরণ বাড়বে। তাই প্রশ্ন হলো, বেসরকারি

বিনিয়োগ কেন ১০ বছর ধরে জিডিপির ২৩ থেকে ২৪ শতাংশের মধ্যে আটকে আছে? দেড় দশকের সাফল্য কেন বিনিয়োগে প্রতিফলিত হলো না? বিদেশি বিনিয়োগও কেন বাড়ল না? কেন তা জিডিপির ১ শতাংশে আটকে থাকল? আর কর জিডিপির অনুপাত তো ১০ বছরে ১০ শতাংশ পার হলো না। এটাই বড় চিন্তার জায়গা।

আরেকটি বিষয় হলো, এই ঋণ দিয়ে সরকার মানুষের জীবনমানের উন্নতি করতে চায়। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি কি হচ্ছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস প্রকাশ করেছে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দুই বছরের (২০২২–২৩) মধ্যে মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে। শিশু মৃত্যুহার বেড়ে গেছে। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শিক্ষায় অথবা প্রশিক্ষণে নেই এমন তরুণের সংখ্যা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে। আরেক জরিপে দেখা গেছে, খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিবারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ২৫ শতাংশের বেশি মানুষ এখন ঋণ করে চলে। তারা দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করতে পারে না।

এসবই সরকারি পরিসংখ্যান। তাহলে দেড় দশক ধরে যে গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কথা হলো, সেগুলো কোথায় গেল? উন্নয়নের জন্য ঋণ যদি জনমানুষের জীবনমানে ঠিকমতো প্রতিফলিত না হয়, তাহলে লাভটা হলো কার?

প্রকল্প চয়ন, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ণ— চার ক্ষেত্রেই আমরা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় যেসব প্রকল্প চয়ন করা হয়েছে, তার ৭০ শতাংশই ভৌত অবকাঠামোর জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিমূল্যায়িত। প্রকল্প চয়নের ক্ষেত্রে খাতওয়ারি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে গত ১৫ বছরে শিক্ষা খাতে জিডিপির ২ শতাংশের বেশি ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। একই রকমভাবে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ১ শতাংশের বেশি ব্যয় হয়নি। যে বাড়তি ব্যয়টুকু হয়েছে, তাও মূলত ইমারত বানানোর জন্য। এর ফলাফলই বিবিএসের বিভিন্ন জরিপে দেখা যাচ্ছে। যে কোনো রাজনৈতিক সরকারের এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কথা।

গ. এটা কি অবধারিত ছিল?

এ রকম কী হওয়ার কথা ছিল? অবশ্যই ছিল না। তাহলে কেন হলো? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বাংলাদেশের পুঁজি সঞ্চয়ের ইতিহাসে। প্রাথমিকভাবে ব্যাংক থেকে তহবিল চুরি করে বেআইনিভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে শেয়ারবাজারের অভ্যন্তরীণ অব্যস্থাপনায় এবং প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের টাকা লুটতরাজ হয়েছে। এরপর দেড় দশক ধরে মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে অর্থ তছরুপ করা হয়েছে। শুধু প্রকল্প অতিমূল্যায়িত হয়েছে তা নয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ তথা জ্বালানি খাতে।

মেগা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে তাদের সঙ্গে টাকা পাচারের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাওয়া যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। জনগণের অর্থ দিয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে যে ক্ষুদ্র 'অলিগার্চ' গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে না। ফলে এসব প্রকল্প নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা যে আর্থসামাজিক সুফল আশা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের ১৯টি এলডিসির ওপর বিশ্লেষণ করে দেখেছি, ১৫টি দেশে হয় কর্তৃত্ববাদী, নয় তা হাইব্রিড সরকারের অধীনে। তা না হলে বিকৃত গণতন্ত্রের মধ্যে আছে। এর বেশির ভাগ দেশই নিদারুণ ঋণপীড়িত অবস্থায়। মেগা প্রকল্প অতিমূল্যায়িত হওয়ার সঙ্গে গণতন্ত্রের একটি সহজাত সম্পর্ক পৃথিবীব্যাপী পরিলক্ষিত হয়।

দেখার বিষয় বাংলাদেশ সে পথে হাঁটছে কিনা। বাংলাদেশে আইন আছে, নীতিমালা আছে এবং নিয়মনীতির মধ্যে থেকে সুশাসন নিশ্চিত করার কিছু প্রচেষ্টাও আছে। কিন্তু অনেক জায়গায় তা বিফল বা অচল।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো নিয়মিত বৈঠক করে না। স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে তিন মাস পরপর সংসদে আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে যে বিবৃতি দেওয়ার কথা, অর্থমন্ত্রী তা দেন না। অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কেনাকাটা নিয়েই কাজ করে বেশি। আগে পেশাদার আমলারা রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় থাকতেন। এখন আমলাদের মধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের চেয়ে অতিকথনের প্রবণতা দেখা যায়। ফলে অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য রক্ষাকবচগুলো অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে গেছে।

শেষ করব এই বলে যে, বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পর্যালোচনা বাদ দিয়ে জাতীয় ঋণ পরিস্থিতির আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

সমকাল
৪ মে ২০২৪

আমরা আবার ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অর্জনযোগ্য প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব জাতীয় সংসদে তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের প্রথম বাজেট হওয়ায় এর বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। এই বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ওঠে এসেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতিবিদদের দেওয়া প্রতিক্রিয়ায়। যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে বাজেট ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে নজর দেওয়া জরুরি। প্রস্তাবিত এই বাজেটে অর্থনীতির বিদ্যমান সংকটগুলো সমাধানে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা জানতে অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমানের মুখোমুখি হয় সকাল সন্ধ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করা এই অধ্যাপকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আশফাকুর রহমান।

সকাল সন্ধ্যা: অর্থমন্ত্রীর সদ্য দেওয়া বাজেট ২০২৪-২৫-এর শিরোনাম ছিল 'টেকসই উন্নয়নের পরিক্রমায় স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রায়'। এ শিরোনামে থাকা শব্দ যুগল 'স্মার্ট বাংলাদেশ'কে একজন অর্থনীতিবিদ, বাজেট বিশেষজ্ঞ বা সচেতন নাগরিক হিসেবে চলমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপট থেকে অবশ্যই আমরা একটা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' চাই। যেখানে ডিজিটালাইজেশনের সুবিধা, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের সুবিধা, যেখানে একটা আধুনিক উৎপাদনখাত থাকবে, শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কৃষি— হবে একটি পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ।

এই যে একটা অভীপ্সা— আমার মনে হয় যে, এটার সঙ্গে দেশের সব নাগরিকই একাত্মবোধ করেন। কিন্তু এবারের যে বাজেট— একটা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রণীত হয়েছে।

এবারের বাজেটের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ ছিল— যেটা আমাদের তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

একটা মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী অভীপ্সা ঠিক আছে। কিন্তু সেই অভীপ্সার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটা বাজেট করাও প্রয়োজন। কিন্তু এবারের বাজেটটা ব্যতিক্রমী বাজেট হওয়া প্রয়োজন ছিল।

আমাদের অর্থনীতি এখন যে ধরনের চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে— এই প্রেক্ষিতে সেটি মোকাবেলা করার বাজেট দরকার ছিল।

আমাদের অর্থনীতির বড় একটি শক্তির জায়গা ছিল— সেটি হলো প্রবৃদ্ধি— সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা— নিম্ন মূল্যস্ফীতি, উচ্চ পর্যায়ের রিজার্ভ, ব্যালেন্স অব পেমেন্টে একটা স্বস্তিপূর্ণ অবস্থা, আমাদের মুদ্রার বিনিময় হারে একটা স্থিতিশীলতা— এই জায়গা থেকে গত দুই বছরে আমাদের অর্থনীতি সরে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

তাই এবারের বাজেটে প্রয়োজন ছিল ওই লক্ষ্যের যার মাধ্যমে কীভাবে অর্থনীতিকে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এরপর এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'র দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু সেটা না করে এবার খুবই গতানুগতিক বাজেট দেওয়া হয়েছে— যেন এটাই স্বাভাবিক।

আমরা পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম— এর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রেখেই একটা বাজেট দেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের যে অভীপ্সা আছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নিয়ে সেটা অর্জন করাকে আমাদেরকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

আমাদের অর্থনীতির বড় একটি শক্তির জায়গা ছিল— সেটি হলো প্রবৃদ্ধি— সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা— নিম্ন মূল্যস্ফীতি, উচ্চ পর্যায়ের রিজার্ভ, ব্যালেন্স অব পেমেন্টে একটা স্বস্তিপূর্ণ অবস্থা, আমাদের মুদ্রার বিনিময় হারে একটা স্থিতিশীলতা— এই জায়গা থেকে গত দুই বছরে আমাদের অর্থনীতি সরে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

সকাল সন্ধ্যা: এবার বাংলাদেশের ঋণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই আপনার কাছে। ঋণ পরিশোধ নিয়ে বাংলাদেশ সংকটে রয়েছে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। এবারের বাজেটে সেটির প্রতিফলন কীভাবে দেখা গিয়েছে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের দেশে ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্যা হয়েছে, সেটি বাজেটীয় কাঠামোর মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তা নিয়েই আমরা এই বাজেটটি করেছি। এটিরও একটি প্রতিফলন এই ঋণের বিষয়টির মধ্যে আছে।

আমরা বাজেটে প্রাক্কলন করেছি যে, ৯.৭ শতাংশ (রাজস্ব আয় পাঁচ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা) জিডিপি'র (মোট দেশজ উৎপাদন) সমপরিমাণ নিয়ে যাব আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎসকে। ২০২২–২৩ অর্থবছরে এটি ছিল ৮.৩ শতাংশ। ২০২৩–২৪-এ সংশোধন করে এটি করা হয়েছে ৯.৩ শতাংশ। এখন এটি আমরা ৯.৭ শতাংশে নিয়ে যাব।

বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে আইএমএফ'র একটা প্রচ্ছন্ন চাপ আছে। এর কারণ প্রকৃত যে আয়টি হবে সেটা এনবিআর'র সংশোধিত লক্ষ্য থেকেও কম। আমাদের ধারণা, প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো কম আদায় হবে। এটাকে আমি বিবেচনায় নিয়ে ৯.৭ শতাংশে নিয়ে যেতে চাই তাহলে প্রায় ২৫ শতাংশের মতো এনবিআর'র অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বাড়াতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রাটা এই বছর অর্জন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

এটা হলো একটা দিক। দ্বিতীয় যেটা হলো এই ৯.৭ শতাংশ যদি আমরা আদায় করতে পারি, তাহলেও এটা আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় এবং উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় জিডিপি'র অনুপাতে আমরা অনেক পিছিয়ে থাকব।

এটার কারণে আমরা এখন আবার ঋণ নির্ভর হয়ে পড়ছি। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুরোটাই হয় অভ্যন্তরীণ না হয় বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। আমরা যদি দেখি, রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় প্রধান ব্যয়ের খাত আমাদের ঋণের সুদ পরিশোধ।

সকাল সন্ধ্যা: এবারের বাজেটে আমরা দেখছি যে, সুদ এবং শিক্ষা-প্রযুক্তিতে প্রায় সমপরিমাণ টাকা ব্যয় করবে সরকার। ধারণা করি, বিষয়টি একদমই কাকতালীয়। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই বিশেষ অবস্থায় টেকসই উন্নয়নের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা সেটা কোনওভাবে ব্যাহত হবে কিনা? শিক্ষা-প্রযুক্তিতে ব্যয়কে যদি আমরা এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি সূচক হিসেবে ধরে নিই...

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের সরকারের ৭৯ বিলিয়ন ডলারের মতো বৈদেশিক ঋণ আছে। ব্যক্তিখাত যোগ করলে সেটা দাঁড়ায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। জিডিপি'র হার হিসেবে সেটা ২২–২৩ শতাংশ। হার হিসেবে এটা বড় নয়।

সমস্যা কিন্তু এই জায়গায় নয়। একটা হলো, আমরা ক্রমান্বয়ে ঋণ নির্ভর হয়ে পড়ছি। যেহেতু আমরা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণ করতে পারছি না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫–২০২০) অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২০২০ সালেই জিডিপি'র ১৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য আমাদের ছিল। আর এখন ২০২৪ সালে এসে বলছি, ৯.৭ শতাংশ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা।

কাজেই আমরা যেটা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করি সেটারতো কোনটাই বাস্তবায়ন করতে পারছি না। এছাড়া বাস্তবায়ন করতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেগুলোর অনেকগুলোই আমরা নিচ্ছি না— সংস্কারও করছি না।

এখন এই ঋণ পরিষেবা আমাদের পরিশোধ করতে হয় বিদেশি মুদ্রায়। আমাদের রিজার্ভ এখন অনেক কম। আমাদের যখন ৪৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ছিল—তখন আড়াই বিলিয়ন ডলার ছিল আমাদের বৈদেশিক ঋণের ব্যয়ভার। যেটাকে আমরা পাবলিকলি গ্যারান্টেড ঋণ বলি। এখন আমাদের রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে। আগামী দুই-তিন বছরে আমাদের সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

তাহলে তুলনামূলকভাবে বোঝাই যাচ্ছে, জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে কম হতে পারে— কিন্তু দায়ভার হিসেবে— আমাদের রিজার্ভের পরিমাণের সঙ্গে এর তুলনা করি— আমাদের রাজস্ব আয়ের সঙ্গে ঋণ পরিষেবা তুলনা করি— তাহলেতো এটা অনেক বাড়ছে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রে এই ঋণগুলো আমরা সময়মতো ব্যবহার করতে পারছি না— সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করতে পারছি না— সুশাসনের স্বার্থে ব্যয় করতে পারছি না।

কিন্তু আমার যদি রাজস্ব আয় কম হয়, আমার আয়ের বড় একটা অংশ যদি ঋণ পরিষেবায় চলে যায়— তখন শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো বা সামাজিক সুরক্ষার মতো যে খাতগুলো আছে সেখানে বেশি টাকা সংকুলান করা মুশকিল হয়ে যায়।

এর ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। ইআরডি'র কাছে এই বিষয়ে হিসাব আছে, কোনও প্রকল্পে গড়ে আমাদের ৫০ শতাংশের মতো সময় বেশি লাগে। ফলে ব্যয়ও ওই অনুপাতে বাড়ে।

আমরা ক্রমান্বয়ে ঋণ নির্ভর হয়ে পড়ছি। যেহেতু আমরা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণ করতে পারছি না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫-২০২০) অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২০২০ সালেই জিডিপি'র ১৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য আমাদের ছিল। আর এখন ২০২৪ সালে এসে বলছি, ৯.৭ শতাংশ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা। কাজেই আমরা যেটা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করি সেটারতো কোনটাই বাস্তবায়ন করতে পারছি না। এছাড়া বাস্তবায়ন করতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেগুলোর অনেকগুলোই আমরা নিচ্ছি না— সংস্কারও করছি না।

সকাল সন্ধ্যা: কিন্তু টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষাতো একটি বড় উপাদান...

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: এ কারণে বছরে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় জিডিপি'র এক শতাংশেরও কম। সেটাও আমরা ব্যয় করতে পারি না। বাংলাদেশে 'আউট অব পকেট' খরচ দক্ষিণ

এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। ৭০ শতাংশের বেশি নিজের অর্থ খরচ করতে হয়। যেহেতু স্বাস্থ্য খাতে সরকারি অনেক সুবিধা পাওয়া যায় না।

শিক্ষাখাতে আমাদের যে ব্যয় হওয়ার কথা সেটা আড়াই শতাংশেরও কম। যেটা আমাদের মতো দেশে চার-ছয় শতাংশে নিয়ে যাওয়া উচিত।

যেসব দেশ এক সময় আমাদের পর্যায়ে ছিল তারা কিন্তু শিক্ষাখাতে ব্যয় থেকে তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এখনও আমরা যথেষ্ট সম্পদ আহরণ করতে না পারায় সম্পদ ব্যয় করতে গিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক সুরক্ষার মতো খাতে আমাদের যে ব্যয় করার কথা সেটা আমরা করতে পারছি না। দ্বিতীয়ত যেটুকুই ব্যয় করছি সেখানেও নানান ধরনের অদক্ষতা আমরা দেখছি। শিক্ষাখাতের বেশির ভাগ অংশ পরিচালনে ব্যয় হচ্ছে। আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যে বিনিয়োগ করা দরকার সেটা আমরা করতে পারছি না।

অথচ এটা এমন একটা সময় এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বাজারনির্ভর সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতায় আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে।

সকাল সন্ধ্যা: আপনি বললেন যে, শিক্ষাখাতেও পরিচালনে বেশ ব্যয় হচ্ছে। এবারের বাজেটে আমরা দেখছি যে, জনপ্রশাসনে ব্যয়ের হার সবচেয়ে বেশি। এর কারণ কী?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: জনপ্রশাসনে ব্যয় বৃদ্ধি সবচেয়ে বড় উল্লম্ফন হয়েছে বেতন-ভাতা-বিভিন্ন সুবিধার কারণে। জনপ্রশাসন যদি দক্ষভাবে সরকারি পরিষেবাগুলো দেয় তাহলে সেটা থেকে সবাই উপকৃত হবে।

কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখছি, একদিকে জনপ্রশাসনের ব্যয় বাড়ছে কিন্তু যে দক্ষতাটা আমাদের বৃদ্ধি হওয়ার কথা— বড় বড় প্রকল্পগুলো সময়মতো শেষ করা, সাশ্রয়ী হওয়া— সেগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে গিয়ে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেল সেটা থেকে এটি বোঝা যায়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনপ্রশাসনের দরকার আছে। এ খাতে সরকারের মোট ব্যয়ের ১৪ শতাংশ। বাকি ব্যয়তো প্রাইভেট সেক্টর থেকে হচ্ছে। আমরা দেখছি যে, হাসপাতাল ভবন আছে, যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু পরিচালনার লোক নেই। কিংবা শিক্ষাখাতে একই চিত্র দেখছি।

সকাল সন্ধ্যা: সাধারণভাবে দেখলে দেখা যায়, প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে খরচ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার বদ্ধ পরিকর। তারপরওতো জীবনযাপন ব্যয় বাড়বে। তাহলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পুরো প্রক্রিয়াটি কতটা সফলভাবে সম্ভব হবে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: এখানেইতো এবারের বাজেটের সঙ্গে বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার যে পদক্ষেপ— এর যে অসামঞ্জস্যতা— এটাইতো আমাদের মূল সমালোচনা। যে কয়টি পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট কমানো হয়েছে— এক কথায় সেটা হলো খুবই কম।

নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের সঙ্গে ভ্যাটের সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আইএমএফ'র একটা প্রচ্ছন্ন চাপ থাকতে পারে। এ বিষয়ে ২০১২ সালের ভ্যাট আইন অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে ভ্যাট বেড়েছে। তার মানে হলো পণ্য-সেবার মূল্য বাড়বে। নির্বাচিতভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক কমিয়ে মূল্য কম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এর সুবিধা আমদানিকারকরা পেলেও ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত আসে না। ফলে বাজার ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা শুধু রাজস্বের ওপরেই নির্ভর করে না। আমদানি শুল্ক কমালেই যে পণ্যের মূল্য কমে যাবে সেটি নয়। বাজার ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থায় নজরদারি বাড়াতে হবে। না হলে এটা ভোক্তাদের ঘাড়েই এসে পড়বে।

একদিকে জনপ্রশাসনের ব্যয় বাড়ছে কিন্তু যে দক্ষতাটা আমাদের বৃদ্ধি হওয়ার কথা— বড় বড় প্রকল্পগুলো সময়মতো শেষ করা, সাশ্রয়ী হওয়া— সেগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে গিয়ে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেল সেটা থেকে এটি বোঝা যায়।

সকাল সন্ধ্যা: এ অবস্থায় মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টার সুবিধা কি আমরা পাব না?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: যদিও চেষ্টা করা হয়েছে মুদ্রানীতি সংকোচমূলক করতে। বাজেটের আকার বড় না করে মূল্যস্ফীতি বাড়তে না দেওয়া। না হলে টাকার সরবরাহ বেড়ে গিয়ে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিত। ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছুটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুল্ক, বাজার ব্যবস্থাপনা সেখানে কিন্তু বড় ধরনের উদ্যোগ দেখা যায়নি।

আরেকটি বিষয় হলো, আয়কর কাঠামোতে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষের সামাজিক সুরক্ষার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্তৃতভাবে হয়নি।

সকাল সন্ধ্যা: বাজেটে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রস্তাব বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রাসঙ্গিক?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: এখানে দুইটি বিষয় আছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেই কিন্তু আছে— দুর্বৃত্তায়ন, অর্থপাচারকারী, ঋণখেলাপি, করখেলাপি তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাব এই ইশতেহারের সরাসরি বিরুদ্ধে।

এছাড়া আগে যারা এই সুযোগ পেত, অবৈধভাবে সম্পদ গড়তো তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা নিতে পারত। এবার কিন্তু তাদের আলাদা করে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা তাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না।

এটা সংবিধান বিরোধী। এটা নৈতিকতাপন্থী নয়। এর মধ্যে দিয়ে যারা ৩০ শতাংশ হারে কর দিচ্ছে তাদের কি বার্তা দেওয়া হচ্ছে? বিষয়টি যদি এমন হতো, ১৫ শতাংশ হারে কর দিয়ে ৭.৫ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়ে যদি এককালীন এই সুবিধা দেওয়া হলে তাহলেও না হয় হতো। কিন্তু এটার ফলেও যে সবটাকা সাদা হয়ে যাবে তা নয়।

আগেও এমন উদ্যোগে যে খুব সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল তা নয়। বরং সৎ করদাতাকে নিরুৎসাহিত করবে— কর না দেওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

এটা সংবিধান বিরোধী। এটা নৈতিকতাপন্থী নয়। এর মধ্যে দিয়ে যারা ৩০ শতাংশ হারে কর দিচ্ছে তাদের কি বার্তা দেওয়া হচ্ছে? বিষয়টি যদি এমন হতো, ১৫ শতাংশ হারে কর দিয়ে ৭.৫ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়ে যদি এককালীন এই সুবিধা দেওয়া হলে তাহলেও না হয় হতো। কিন্তু এটার ফলেও যে সবটাকা সাদা হয়ে যাবে তা নয়।

সকাল সন্ধ্যা: বাংলাদেশ তথ্য ও প্রযুক্তিখাত উৎসাহিত করতে কিছু কিছু ব্যবসায় কর সুবিধা দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। রাজস্ব আহরণ বাড়াতে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ একটি কার্যকর উপায়। বাজেটে কর সুবিধা দিয়ে এই সুযোগ কতটা তৈরি হয়েছে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ কী হবে সেটা হয়তো বাজেটে নেই। কিন্তু কর কাঠামোর সুবিধা কীভাবে পাওয়া যাবে সেটি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সবকিছুই পরিবেশের ওপর নির্ভর করবে। এখনও যেমন ১০০ ইকোনোমিক জোনগুলো কার্যকর করে তোলা যায়নি।

সকাল সন্ধ্যা: গত ১৫ বছরে এই সরকারের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বেশ কিছু বড় প্রকল্প চলমান। বেশ কিছু প্রকল্পের সুবিধা আমরা পেতে শুরু করেছি। তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যত ভাবনা বাজেটে কতটা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে আছে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরবর্তী পর্যায় উন্নীত হওয়ার জন্য এসব উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি, এগুলো খুব ইতিবাচকভাবে ভূমিকা রাখবে। এটা নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, এটি অতি অর্থায়ন করা হয়েছে কিনা। সময়মতো শেষ করতে না পারায় টাকা বেশি লেগেছে। এটা থেকে যে অভ্যন্তরীণ আয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে সেটা ঠিকমতো আসছে কিনা।

তবে এসব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সম্ভাবনা তৈরি করেছে। পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের শেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছি। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে।

এবারের বাজেটেও বিনিয়োগকে প্রণোদিত করার বিষয়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রাইভেট ক্রেডিট আপটেক করবে ৯ শতাংশ। আমার এখন সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি করা হয়েছে। সুদের হার ৯ শতাংশের জায়গায় এখন ১৪-১৫ শতাংশ। ফলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এগুলো কিছুটা সংকুচিত। এ জন্য আমাদের সময় লাগবে।

আমি যদি এখনকার চ্যালেঞ্জগুলোকে অস্বীকার করি— সঠিক সিদ্ধান্তগুলো না নিই তাহলে পরবর্তী যে অর্জন, সেগুলো তখন আরও প্রলম্বিত হয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তবতা স্বীকার করে আমাদের উচিত হবে, এখনকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা আছে সেটাকে একটু শান্ত করা— একটা নতুন ভারসাম্যে নেওয়া।

সকাল সন্ধ্যা: সংকোচনমূলক অর্থনীতির কারণে আমাদের আকাঙ্ক্ষর লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার গতিটি ধীর হবে। কিন্তু এ অবস্থা মোকাবেলা করার সক্ষমতা কতটা আমাদের আছে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। আমরা কিন্তু একটি শক্তিমত্তা অর্জন করেছি। গত ১৫ বছর সময়কাল ধরলে দেখতে পাই, ২০১৫ সালে আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ২০২৬ সালে আমরা এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাব। এখানে সরকারেরও ভূমিকা আছে, সেখানে ব্যক্তিখাতেরও ভূমিকা আছে।

কিন্তু গত দুই বছরে অর্থনীতি যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, এখন ফায়ার-ফাইটিং না করে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করাই এখন আমাদের মূল দায়িত্ব। সেখান থেকে আমাদের যখন একটা নতুন ভারসাম্য হবে তখন আমাদের যে মধ্যমেয়াদী আকাঙ্ক্ষা আছে সেই দিকে অগ্রসর হবো।

কিন্তু আমি যদি এখনকার চ্যালেঞ্জগুলোকে অস্বীকার করি—সঠিক সিদ্ধান্তগুলো না নিই তাহলে পরবর্তী যে অর্জন, সেগুলো তখন আরও প্রলম্বিত হয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তবতা স্বীকার করে

আমাদের উচিত হবে, এখনকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা আছে সেটাকে একটু শান্ত করা— একটা নতুন ভারসাম্যে নেওয়া।

সকাল সন্ধ্যা: এ জন্য আমাদের কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: প্রবৃদ্ধিকে কিছুটা ছাড় দেওয়া। মূল্যস্ফীতিকে কীভাবে আমরা কমিয়ে আনতে পারি তাতে জোর দেওয়া। সুশাসনের দিকে জোর দেওয়া। সরাসরি কর সংগ্রহ না করে, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কীভাবে আমরা আরও বেশি কর সংগ্রহ করতে পারি সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া— নিজস্ব সম্পদ আরও আহরণ করতে পারি। যার অর্থ হচ্ছে, জোর দিয়ে আমাদের একটা ভারসাম্যে আসতে হবে। যার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক লক্ষ্যকে ঠিকমতো পরিচালিত করতে পারব।

সকাল সন্ধ্যা: এমন অবস্থার জন্য নিশ্চয়ই সবাইকে আমাদের দরকার। সরকার কি সেই দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা আশা করব। আমাদের বাজেট হলো, আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ১৪ শতাংশ। বাকি ৮৬ শতাংশ বাংলাদেশের অন্যান্য খাত থেকে আসে। সরকারের কাজটা হলো তাদের কাজটাকে সহজ করে দেওয়া। তাই পুরো একটি দেশের ধারণা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সকাল সন্ধ্যা: আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

হাই-লাইটস্ (সারমর্ম)

১. আমাদের অর্থনীতির বড় একটি শক্তির জায়গা ছিল—সেটি হলো প্রবৃদ্ধি—সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা— নিম্ন মূল্যস্ফীতি, উচ্চ পর্যায়ের রিজার্ভ, ব্যালেন্স অব পেমেন্টে একটা স্বস্তিপূর্ণ অবস্থা, আমাদের মুদ্রার বিনিময় হারে একটা স্থিতিশীলতা—এই জায়গা থেকে গত দুই বছরে আমাদের অর্থনীতি সরে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।
২. আমরা ক্রমান্বয়ে ঋণ নির্ভর হয়ে পড়ছি। যেহেতু আমরা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণ করতে পারছি না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫–২০২০) অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২০২০ সালেই জিডিপি'র ১৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য আমাদের ছিল। আর এখন ২০২৪ সালে এসে বলছি, ৯.৭ শতাংশ আমাদের

লক্ষ্যমাত্রা। কাজেই আমরা যেটা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করি সেটারতো কোনটাই বাস্তবায়ন করতে পারছি না। এছাড়া বাস্তবায়ন করতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেগুলোর অনেকগুলোই আমরা নিচ্ছি না— সংস্কারও করছি না।

৩. একদিকে জনপ্রশাসনের ব্যয় বাড়ছে কিন্তু যে দক্ষতাটা আমাদের বৃদ্ধি হওয়ার কথা—বড় বড় প্রকল্পগুলো সময় মতো শেষ করা, সাশ্রয়ী হওয়া— সেগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে গিয়ে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেল সেটা থেকে এটি বোঝা যায়।

৪. এটা সংবিধান বিরোধী। এটা নৈতিকতাপন্থী নয়। এর মধ্যে দিয়ে যারা ৩০ শতাংশ হারে কর দিচ্ছে তাদের কি বার্তা দেওয়া হচ্ছে? বিষয়টি যদি এমন হতো, ১৫ শতাংশ হারে কর দিয়ে ৭.৫ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়ে যদি এককালীন এই সুবিধা দেওয়া হলে তাহলেও না হয় হতো। কিন্তু এটার ফলেও যে সবটাকা সাদা হয়ে যাবে তা নয়।

৫. আমি যদি এখনকার চ্যালেঞ্জগুলোকে অস্বীকার করি— সঠিক সিদ্ধান্তগুলো না নিই তাহলে পরবর্তী যে অর্জন, সেগুলো তখন আরও প্রলম্বিত হয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তবতা স্বীকার করে আমাদের উচিত হবে, এখনকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা আছে সেটাকে একটু শান্ত করা— একটা নতুন ভারসাম্যে নেওয়া।

সকাল সন্ধ্যা
১০ জুন ২০২৪

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণব্যবস্থাপনা এবং করণীয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

ক্রমবর্ধমান বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, উচ্চ সুদহার, ঋণ গ্রহণের কঠোর শর্তাবলি, প্রকল্পের ব্যয়ের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে একটি মাঝারি ঋণ বহনক্ষমতার দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিকট ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতের নিরিখে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থাপনা সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।...

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত (PPG) ঋণের স্থিতি বর্তমানে ৭৯ মার্কিন বিলিয়ন ডলার (সেপ্টেম্বর, ২০২৩)। যা সমপর্যায়ের অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনায় খুব বেশি নয়। বৈদেশিক ঋণ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ১৭ শতাংশের সমান। যদি দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার দায়ভার বৃদ্ধির প্রবণতাগুলো বিবেচনা করা হয়, তাহলে বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে গভীর মনোযোগের দাবি রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, বিগত বছরগুলোতে বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা এবং ঋণ বহনক্ষমতার বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বহুপক্ষীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে এ উৎকণ্ঠা উঠে এসেছে। জাতিসংঘের ২০২৩ সালের রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'এ ওয়ার্ল্ড ইন ডেবট ডিফল্ট', বিশ্বব্যাংকের 'আন্তর্জাতিক ঋণ রিপোর্ট' এবং ২০২৩ সালের আইএমএফ রিপোর্টে দেশগুলো ঋণসংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রকাশনাগুলো থেকে উদ্ভূত মূল বার্তা হলো, অনেক নিম্নআয়ের দেশ কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ, দেশীয় অর্থনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিরূপ প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণে ঋণসংকটের মুখোমুখি হতে পারে

এবং বিপজ্জনক মধ্যআয়ের ফাঁদে পড়তে পারে। লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি এবং এই দেশগুলোর বিদেশি ঋণ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা নিয়ে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ, সার্বভৌম ঋণ পরিষেবা এবং দেশের ঋণ বহনক্ষমতার বিষয়ে তাই বাংলাদেশকে আরও কৌশলী হতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পিপিজি ঋণ ২০১৮–১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২–২৩ অর্থবছরের মধ্যে ৪৪.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৭০.৮ বিলিয়ন হয়েছে অর্থাৎ চার বছরে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে সুদের অর্থ প্রদান ০.৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ১.৩১ বিলিয়ন হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ১৬৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে আসল প্রায় ৪৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২০২৩–২৪-এর প্রথম ৯ মাসে দেশের ঋণ পরিষেবা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৯ শতাংশ বেড়েছে। সুদের অর্থ প্রদান ১১৭.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আসল বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বর্তমান নিম্ন স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি থেকে আয় বৃদ্ধিতে মন্থরতা, ঋণের উচ্চ খরচ এবং অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য বড় বেশ কয়েকটি বিদেশি ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হতে চলেছে। সব মিলিয়ে এসব বিষয়ে আরও সতর্কতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

উদ্বেগের কারণ যেসব বিষয়

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান পরিষেবার অন্যতম একটি মূল কারণ দেশের মধ্যম আয়ের উত্তরণ। বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্নআয়ের দেশ (এলআইসি) থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে (এলএমআইসি) উন্নীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ আর বিশ্বব্যাংকের নিম্ন সুদের IDA-টাইপ ঋণের জন্য বিবেচিত হবে না (প্রায় ০.৭ শতাংশ বার্ষিক সুদে, ১০ বছর পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড এবং কর প্রদানের সময়কাল ৪০ বছর পর্যন্ত)। ফলে, বাংলাদেশ আইডিএ দেশ থেকে গ্যাপ অর্থাৎ একটি মিশ্র দেশ হিসেবে গণ্য হবে। ফলে ঋণ নেওয়ার শর্তগুলো আরও দিন দিন কঠোর হচ্ছে। দেশটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের তুলনামূলকভাবে উচ্চ সুদের IBRD কান্ট্রি ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় উভয় উৎস থেকে উচ্চসুদে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এটি সাম্প্রতিক সময়ের উপরোক্ত ক্রমবর্ধমান ঋণ পরিশোধের দায়ভারের একটি প্রধান কারণ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পোর্টফোলিও এবং ঋণের শর্তাবলিতে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। রেয়াতযোগ্য থেকে অ-রেয়াত, প্রধানত বহুপক্ষীয় থেকে দ্বিপক্ষীয় ঋণের প্রাধান্য এবং সহজ শর্তে ঋণ থেকে কঠোর শর্তের ঋণের আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পোর্টফোলিওতে স্বল্পসুদের আইডিএ ঋণের পরিমাণ ৩৮.0 শতাংশ থেকে ২৭ শতাংশে নেমে এসেছে। যেখানে

ভারত, চীন এবং রাশিয়ার মতো দ্বিপক্ষীয় উৎস থেকে ব্যয়বহুল ঋণের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া বহুপক্ষীয় সংস্থার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রেস পিরিয়ডের সময়ে শুধু ঋণের ওপর সুদ দিতে হবে। পরবর্তীতে সুদ এবং আসল উভয়ের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, কিছু বড় ঋণের গ্রেস পিরিয়ড ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে বা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হবে। প্রকৃতপক্ষে, বিগত বছরগুলোয় চালু করা কয়েকটি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেমন— রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প; যা ২০১৬ সালে চালু করা হয়েছে, রাশিয়ার ১১.৩ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নে, যার গ্রেস পিরিয়ড ১০ বছর ও ম্যাচুরিটি সময়কাল ২০ বছর এবং ২০১৮ সালে শুরু করা পদ্মা সেতু প্রকল্পের রেল সংযোগ, চীনের ২.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে, যার ৫ বছরের গ্রেস পিরিয়ড এবং ১৫ বছর মেয়াদসহ) গ্রেস পিরিয়ড উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উল্লিখিত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের হার যথাক্রমে LIBOR+১.৭৫ শতাংশ, এবং ২ শতাংশ (0.২৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ)। LIBOR/SOFR সুদের হার বিগত সময়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, কোভিড সময়কাল, এবং তার পরবর্তীতে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এ হার বেশ কয়েক গুণ বেড়েছে, তাই সুদাসলের পরিমাণও সমান তালে বেড়েছে। নমনীয় LIBOR/SOFR শর্তে ধার্যকৃত ঋণের পরিষেবা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া স্থানীয় মুদ্রায় আয় হয় এমন বৈদেশিক-অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোর জন্য ঋণ পরিষেবা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। এটি বেশির ভাগ অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেমন— পরিবহন এবং বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প) বেশিভাবে প্রযোজ্য। এর কারণ গত কয়েক বছরে টাকার মূল্যমানের উল্লেখযোগ্য অবনমন হয়েছে, প্রায় ৩০ শতাংশ। যখন এই ঋণগুলো নেওয়া হয়েছিল তখন এ ধরনের টাকার মূল্যমানের অবনমনের কোনো পূর্বাভাস ছিল না।

সময় এবং ব্যয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটে থাকে, এটা সুবিদিত। এর অর্থ হলো, প্রকল্পের ব্যয় প্রাথমিকভাবে যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে প্রকল্পগুলোর আয়ের অভ্যন্তরীণ, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক রিটার্নের হার সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনসমূহে প্রাক্কলিত অনুমানের চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে। এটি প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস করে এবং ভবিষ্যতে ঋণ পরিষেবার জন্য সমস্যা তৈরি করে।

এভাবে, ক্রমবর্ধমান বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ, উচ্চ সুদের হার, ঋণ গ্রহণের কঠোর শর্তাবলি, প্রকল্পের ব্যয়ের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনসহ কয়েকটি কারণ বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের চাপ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ, যা নভেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে, তার সঙ্গে বৈদেশিক ঋণের প্রাপ্যতা ও শর্তের সরাসরি কোনো প্রভাব নেই। বৈদেশিক ঋণের শর্তাবলি নির্ভর করে মাথাপিছু জিএনআইয়ের ওপর। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের কারণে রপ্তানি

খাত সে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। দেশের ঋণ বহনক্ষমতা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় নিতে হবে। এ ছাড়া, বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সহায়তা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা, এলডিসি জলবায়ু তহবিলের অ্যাক্সেস, এসব মনে রাখতে হবে। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকবে, কারণ বাংলাদেশকে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ঋণ থেকে বৈদেশিক উন্নয়ন ব্যয় বহন করতে হয়।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে একটি মাঝারি ঋণ বহনক্ষমতার দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিকট ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সুপারিশমালা

বিদ্যমান অবস্থার অবনমন রোধে এবং দুর্বল দেশের ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তির আশঙ্কা এড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সার্বভৌম ঋণ ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং নিম্নলিখিত বিবেচনাসমূহের নিরিখে তা নির্ধারণ করতে হবে:

(১) বাংলাদেশের উচিত নতুন উৎস থেকে ঋণের সুযোগ অন্বেষণ করা এবং তার ঋণ পোর্টফোলিওকে পুনর্বিন্যাস ও বিস্তৃত করা (যেমন- AIIB, এবং NDB থেকে বাংলাদেশ যার সদস্য) যেখান থেকে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ঋণ নিয়েছে)। সুদের হার এবং ঋণের শর্তাবলি সতর্কতার সঙ্গে সুদ পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষত, ঋণ প্রসূত দায়বদ্ধতা এবং ঋণ পরিষেবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রভাবগুলো অভিঘাত মূল্যায়ন করতে হবে। স্থির নাকি নমনীয় তা সতর্কতার সঙ্গে যাছাইবাছাই করতে হবে।

(২) ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি এবং বিনিয়োগের গুণমান উভয়ই সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ঋণদাতা নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই কঠোর হতে হবে। কোন ধরনের প্রকল্পের জন্য কোন ধরনের ঋণের দরকার, কোন শর্তে এবং কোন উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হবে সে বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রকল্প নির্বাচন, অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা এবং উপযুক্ত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সম্পাদিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে করা উচিত। প্রত্যাশিত আয় অবশ্যই নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে করা উচিত। প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করা, জবাবদিহি প্রয়োগ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) অ-রেয়াতি ধরনের ঋণের আলোচনা সতর্কতা এবং যত্নসহকারে করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ঋণের শর্তাদি মূল্যায়নের জন্য একটি সূত্র ব্যবহার করে যা প্রনিধানযোগ; ২৫ শতাংশ থ্রেশহোল্ডের বেশি ঋণকে অ-রেয়াতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দর কষাকষির সময় অ-রেয়াতি ঋণ যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে হবে।

(৪) বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন লক্ষ্যভিত্তিক তহবিল থেকে সমর্থন পাওয়ার সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে, যেমন- কোপ-২৮-এ ঘোষিত ক্ষতি এবং ক্ষতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের তহবিল। অন্যান্য তহবিল যেমন- আইএমেফের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই সুবিধা যা বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে।

(৫) শিক্ষা সফর, অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, নগদ বিতরণ ইত্যাদি উপাদানে আছে সেসব ঋণকে সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত মুদ্রার অবমূল্যায়নের জন্য তার ক্রলিং পেগ মোডালিটি কীভাবে কার্যকর করা হবে তা বলা। বিলম্ব অর্থ আরও অবমূল্যায়নের প্রত্যাশায় বিদেশে আয় রাখতে উৎসাহিত করবে, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে।

(৭) সার্বভৌম গ্যারান্টি দিয়ে আন্ডাররাইট করা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার গৃহীত ঋণসমূহ সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

(৮) বাজেট সমর্থনের সহযোগী ঋণ যখন ব্যয় করার ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেয়, সরকারকে অবশ্যই সেগুলো কীভাবে ব্যয় করা হয়, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই ধরনের তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) একক উৎস সংগ্রহের মতো শর্তযুক্ত ঋণসমূহ অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য সঠিকভাবে যাচাই করা উচিত। কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যগুলো স্থানীয়ভাবে কম দামে পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। অর্থের জন্য ভালো মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিত করা উচিত।

(১০) বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য মানবসম্পদ, দক্ষতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং দেশের ঋণ বহনক্ষমতা ইত্যাদির মূল্যায়নের জন্য এখন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সক্ষমতা পরিপ্রেক্ষিতে আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

(১১) এটা ইতিবাচক যে, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইআরডি বাংলাদেশের ঋণের অবস্থা এবং ঋণ পরিষেবা-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তর ওপর পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন তৈরি করে আসছে, যার মধ্যে বৈদেশিক ঋণ-সংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে। প্রকল্পের প্রতিবেদনের মান নিশ্চিতকরণ, প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বভৌম ঋণের পরিমাণ এবং মধ্যমেয়াদি ঋণ বহন করার ক্ষমতা আরও উন্নত করা সম্ভব।

খবরের কাগজ
১৪ নভেম্বর ২০২৪

অধ্যায় ৭

রাজনীতি ও সংস্কার

নির্ধারিত ফলাফল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। শুভ নববর্ষ। Happy new year. ২০২৩ সালকে আমরা বিদায় জানালাম এবং নতুন একটি বছরে পদার্পণ। এবং গত কয়েক বছরের মতো বিগত বছরটিকে মূল্যায়ন করবার জন্যে এবং নতুন বছরে আমরা কী দেখছি সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, সিপিডির ডিস্টিঙ্গুইশড ফেলো। স্বাগত আপনাকে এবং happy new year।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ, জিল্লুর। আমাকে ডাকার জন্য আজকে।

জিল্লুর রহমান: শুভেচ্ছা। একেবারে নতুন একটি বছর শুরু হচ্ছে এবং বেশ উত্তেজনাময় বছর বাংলাদেশের জন্য। অন্তত শুরুটা তো বটেই। আপনি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাবেন কীভাবে? কোন ভাষায়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাবো এইভাবে- যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছে– সেটা হলো যে ২০২৪ যেন ২০২৩ এর চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণকর, সুখকর, এবং সকলের জন্য শান্তিময় এবং বাঙ্গালাদেশের যে সম্ভবনা, সুযোগ সেগুলোকে আরো কার্যকরভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। অর্থাৎ ২০২৩ এর চেয়ে ২০২৪ আমাদের জন্য আরো বেশি ফলদায়ক, ফলপ্রসূ হোক। কল্যাণকর হোক। এইটেই আমার কামনা। এবং এটা দেশের ভেতরে যারা আছেন, দেশের বাইরে যারা আছেন,

ব্যক্তি পর্যায়ে, গোষ্ঠী পর্যায়ে, সামষ্টিকভাবে, সকলের জন্য এই শুভকামনা আমি আজকে আপনার মাধ্যমে পৌঁছাতে চাই।

জিল্লুর রহমান: Thank you. কিন্তু এটা বোধহয় সকলেরই, দেশে যারা আছেন, দেশের বাইরে যারা আছেন সবারই প্রত্যাশা এরকমটাই। ২০২৩ বাংলাদেশের জন্যে রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, কূটনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে কেমন গেল সেটা আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইবো। শুরুতেই অর্থনীতির দিকে যদি মনোযোগ দেই ২০২২ এর প্রায় শেষ অর্ধভাগ জুড়েই প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে ২০২৩ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালো যাবে না। এবং মানুষকে তিনি প্রস্তুত হতেও বলছিলেন। এবং ’২৩ আসলে শেষ পর্যন্ত যেটা দেখলাম আমরা অর্থনীতির কোনো সূচকেই সেই অর্থে বাংলাদেশের জন্য সুখকর ছিল না। এবং প্রধানমন্ত্রী এখন ২০২৩ শেষের দিকে এসে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ এ দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। এবং বিএনপি, তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তারা এই দুর্ভিক্ষ করবার ষড়যন্ত্র করছে, তাদেরকে অন্য কেউ কেউ প্ররোচনা দিচ্ছে, সে কথা বলছেন। তো সব মিলিয়ে অর্থনীতিটা আসলে কেমন গেল আপনি মনে করেন ২০২৩?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০২৩ এর যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ক্লেশকর এবং জটিল। এ ব্যাপারে তো এখন সর্ব মহলেই স্বীকৃতি আছে। এইরকম একটি পরিস্থিতি ২০২৩ এ আসবে এইটা কয়েক বছর যাবতই আমরা অনেকেই বলার চেষ্টা করেছি। এবং সেটা শেষ পর্যন্ত আসলো। এবং আমি অনেক সময় আপনাকেও বলেছি দুঃখের বিষয় হলো যে ১৫ বছরের শাসন আমলের ভিতরে সবচেয়ে সংকটময়, দূর্বলতম অর্থবছর নিয়ে নির্বাচনে গেল দলটি। এবং এটা নিঃসন্দেহে খুব প্রীতিকর না আরকী। উচ্চমূল্যস্ফীতি, আপনার করের নিম্ন আহরণ, আপনার সরকারি ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলো। কারণ হলো আপনি যে সমস্ত বিনিয়োগ করবেন তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করার ব্যবস্থা করতে না পারা। আপনি যেখানে আমরা এত বড়, সরকারের অন্যতম সাফল্যের জায়গা, সেটা হলো যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এত ২৪ হাজার মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি বা সক্ষমতা তৈরি করার পরেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি আমদানি করতে পারছি না যাতে এদের চালু রাখতে পারি। সেইটা যেমন আছে। রপ্তানি এবং আমদানি দু’টো বেড়েছে কিন্তু আমদানি আমার কমাতে হয়েছে পরবর্তী সময়ে এবং সেইটা কমানোর পরেও আমরা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রাখতে পারিনি। আগে যেটা ছিল সেটা হলো যে আমরা রপ্তানি আমদানি ভারসাম্যের যে ঘাটতিটা মানে আমদানীর যে ঘাটতিটা রপ্তানি দিয়ে পূরণ করতে না পারলেও সেটা আমরা রেমিটেন্স ইনকাম বা আয় দিয়ে আমরা পূরণ করতাম। কিন্তু এইবার যেইটা হয়েছে, আমরা যেটা বলি, ব্যালান্স অফ পেমেন্টে মানে আমার বৈদেশিক দায় দেনা পরিস্থিতির ভিতরে আমার যে আর্থিক

হিসাবটা ছিল যেখানে সেখানে সবসময় ইতিবাচক ছিল। আমাদের যে বৈদেশিক সাহায্য-টাহায্য এসেছে, এখন আমার সাহায্য আসার চেয়ে শোধ করার বেশি কারণে ওইটা আমার নেতিবাচক হয়ে যাওয়াতে আমার এই যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে যাওয়ার পরিস্থিতি হলো। এবং এর সাথে মূল্যস্ফীতি, টাকার বিনিময় হার, এই সুদের হার, ইত্যাদি জটিল একটা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটা বড় বিষয়। এবং যার ফলে আমাদের আইএমএফের কাছে যেতে হলো। এবং আইএমএফের কাছে যেতে হলো এটা একটু আগে আগেই গেছে সরকার সেটা সঠিকভাবে গেছে। এবং আইএমএফ যে সমস্ত সংস্কারের কথাগুলো বললো এগুলো কিন্তু বিগত দশক ধরে আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। কিন্তু সেটা খুব বেশি, সেই অর্থে মনোযোগ পায়নি। কিন্তু এখন সেটা তো হলো। তারপরে এগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো। আমার সমস্যাটা, জিল্লুর, এই জায়গায় না। আমার সমস্যাটা হলো এই যে অবস্থাটাতে আসলাম, এই অবস্থার আসার কারণটা সম্বন্ধে কিন্ত আমরা সেইভাবে আলোচনা শুনলাম না। বুঝেছেন? মানে এইটা এরকম কেন হলো?

জিল্লুর রহমান: এই পরিস্থিতি কেন এসে দাঁড়ালো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কেন এসে দাঁড়ালো? এবং এটাতো মানে বলা হয়েছে বৈদেশিক পরিস্থিতির কারণে। ইউক্রেন এবং কোভিড-উত্তর পরিস্থিতি। কিন্তু যে কোনো সাধারণ জ্ঞানের মানুষ আপনাকে বলবেন যে এইটার জন্য এটা হয়নি। নিজের বাজারে নিজের উৎপাদিত পণ্যের দাম যখন আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না; আলু, পেঁয়াজ, মুলা, শাকের; তখন আপনাকে শুধু ইউক্রেন যুদ্ধ দিয়ে আপনি এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এবং আপনি যখন টাকার মূল্যমান ঠিকমতো নির্ধারণ না করেন এবং হুন্ডি বাড়তে থাকে তখন কেন প্রবাসীরা রেমিটেন্সে টাকা পাঠবে না এই কারণটা তো আপনার না বুঝার কোনো কারণ নাই। যখন আপনি সুদের হার নয়-ছয় করে রাখেন এবং মনে করেন যে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়বে সস্তায় ঋণ পেলে পরে, তখনও আপনি কিন্তু অনুধাবন করেন না যে বিনিয়োগের জন্য ঋণ একটা বিষয় কিন্তু তার চেয়েও বড় বড় অনেক বিষয় রয়েছে। তার গ্যাসের লাইন পাওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য অনেক বিষয়াদি রয়েছে। সেহেতু এই আমাদের দুঃখটা এই জায়গায় যে শেষ পর্যন্ত আমরা সংকটটাকে স্বীকার করলাম কিন্তু সংকটের কারণটা নিয়ে চিন্তা করলাম না। ওই সংকটের কারণ নিয়ে যদি আমি চিন্তা না করি তাহলে আমার পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কী হবে সেগুলোর ব্যাপারেও স্বচ্ছতা আসে না। এবং আপনি যদি আইএমএফের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের দেখেন, যে সমস্ত দেশ আত্মস্থ করেছে এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাগুলো সেই সমস্ত দেশ কিন্তু দ্রুততর সংকট কাটিয়ে উঠেছে। শ্রীলঙ্কা সবচেয়ে বড় উদাহরণ এইটার জন্য।

জিল্লুর রহমান: খুবই দ্রুততম সময়ে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেহেতু আমরা যে শুধু সংকটটাকে নিয়েই যাচ্ছি তা না সংকটের উপলব্ধিটাকেও ব্যতিরেকে আমরা এখনে উপনীত হচ্ছি। এইটাই শঙ্কার জায়গা কারণ ২০২৪ এ তো এগুলো মোকাবিলা করতে হবে। এই মুহূর্তে একটা তিন মাসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিতরে আমরা ছিলাম।

জিল্লুর রহমান: রিজার্ভ কিছুটা...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে। এবং তারপরে বলছি যে এরপরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা তো আরেকটা শিশুতোষের মতো মনে হয়। এটা শিশুতোষ ছাড়া আর কিছু না। যে এগুলো জানে, বুঝে, তারা বুঝবে যে এটা করা কত কঠিন হবে। এটা আইএমএফেরও বোঝার কথা যে, যে সমস্ত কারণে এগুলো হয়েছে, যে আর্থ-সামাজিক কারণ বা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো যদি বিতাড়িত না হয় এবং সেই নির্বাচনের যে আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে সেটার মাধ্যমে যদি এটাকে নিরসন করার পথে না এগোতে পারে তাহলে ওই জটিলতাটা থেকেই যাচ্ছে। সেই জন্যেই বলছিলাম, ২০২৪ টা যেন ২০২৩-এর চেয়ে ভালো হয়।

জিল্লুর রহমান: আপনি রাজনীতি এবং নির্বাচনের প্রসঙ্গটা টানলেন যেহেতু...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তবে জিল্লুর, আমি আরেকটা কথা বলে নেই। ২০২৩ অবশ্যই আরেকটি কারণে আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এটা হলো যে এ সময়কালে তো সরকার তার অনেকগুলো বড় বড় প্রকল্পকে উদ্বোধন করেছে। সেটা আপনি পদ্মাব্রিজ-উত্তর পরিস্থিতিতে আমার টানেলই বলেন, ফ্লাইওভার বলেন, বা অন্যান্য যে সমস্ত অবকাঠামোগুলোকে, দৃশ্যমান উন্নয়নের যে প্রতীকগুলো আছে, সেগুলো এই সময়কালে হয়েছে। দুঃখটা হলো যে এই অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে, মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক সাশ্রয়ের কোনো যোগসূত্র আমরা স্থাপন করতে পারলাম না এখন পর্যন্ত। এই জায়গাটতেই হলো, এই বৈপরিত্যের জায়গাটা আমাদের দেশে ২০২৩ এ থাকবে। অর্থনীতির ছাত্ররা যখন পরবর্তীতে পড়াশোনা করবেন আরো, তখন তারা দেখবেন যে কীভাবে অবকাঠামো নির্ভর, সরকারি ব্যয় দ্বারা প্রণোদিত, ব্যক্তিখাত ব্যতিরেকে, এইরকম উন্নয়ন খুব দ্রুততার সাথে জনমানুষের জীবন-জীবিকাকে উন্নতি করার ক্ষেত্রে কাজে আসে না। এটার জন্য যেই সামাজিক উন্নতি এই সরকারও করার চেষ্টা করেছে, সেটা হলো যে সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোকে দাঁড় করানোর জন্য। এই সামাজিক কাঠামো এই সরকার ’৯৬ সালে শুরু করেছিল।

আমার সুযোগ হয়েছিল কিবরিয়া সাহেবের সাথে যুক্তভাবে থেকে সে সময়ে এটাকে রচনা করার, কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে। তো এখন সেটা হলো সেটা করেছে। কিন্তু দেখুন, যদি ওই ধরনের ব্যয়বহুল কাঠামো তৈরি না করতাম, তাহলে কিন্তু এই সামাজিক সুরক্ষাগুলোকে আরো বেশি কার্যকরভাবে, তাদের একশ'-দুইশ'-পাঁচশ' টাকা না দিয়ে আমরা হাজার-দু'হাজার টাকা করে দিতে পারতাম। এটা হলো না। এবং ওই প্রকল্পগুলো, যে দশ টাকার জিনিসগুলো আপনি হাজার টাকা দিয়ে কিনলেন, সেই দায়-দেনার পরিস্থিতি আগামীদিনে এটা থাকবে। এবং আপনার এখানে এবং আগেও আমি বলেছি যে, ২০২৪ এর পর থেকে আমরা একটা, এটাকে লোহিতরেখা, রেডলাইন যেটাকে বলেন, একটা লোহিত রেখা আমরা পার হবো যেখানে এইটা একটা বড় বিষয় হবে। আগামী সরকারের জন্য যদি মাথাব্যথা হয়, দুটো বড় জায়গা। একটা বড় জায়গা তো হলো দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে আনা। আরেকটা হলো বৈদেশিক দায়-দেনা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা।

জিল্লুর রহমান: এমনিতেও ক্ষমতাসীন দলের ইশতিহারে তো দ্রব্যমূল্যের বিষয়টাই তাদের অগ্রাধিকারের এক নাম্বার জায়গায় আছে। সর্বাত্মক চেষ্টা তারা চালাবেন সেটা তারা বলছেন। নির্বাচন এবং রাজনীতির প্রসঙ্গে যেহেতু আপনি কথা বলছিলেন, রাজনৈতিকভাবে কেমন গেল মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত এসে যেখানে দাঁড়াচ্ছে যে ৭ই জানুয়ারি একটা নির্বাচন হচ্ছে যেটাকে কোনো অবস্থাতেই '১৪, '১৮ এর চাইতে ভালো বলবার কোনো সুযোগ নেই। অন্তত ক্রেডিবল ইলেকশন হচ্ছে সেটা কেউ বলছেন না। যেহেতু প্রধানতম রাজনৈতিক, একটা বড় শক্তি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, বছরের শেষ ভাগ থেকে সেটা মনে হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী গত দুইদিন আগেও বলেছেন যে, বিএনপি রাজনীতি করবার অধিকার নেই, এবং বিএনপিকে অনেকেই এখন একটা টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে চিহ্নিত করছেন। বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে বিএনপির উপর এখন স্যাংশন দেয়া উচিৎ। বা তারা একটা টেররিস্ট অর্গানাইজেশন। বা আরো কেউ কেউ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সেটা বলেছেন, যে আমেরিকানরা এখন চুপচাপ কেন, আমেরিকান এম্বাসি ঢাকায় কী করছে, বিএনপির উপরে স্যাংশন আসছে না। তো সব মিলিয়ে আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে ২০২৩ এর রাজনৈতিক চিত্রটা কেমন গেল। এবং এর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক বেশি জড়িয়ে গেছে। বিশ্বের দু'টো- এক ভাগ অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এক ধরনের আহ্ববান বা দাবী নিয়ে আসছিল, অন্যদিক আবার বর্তমান সরকারের যে অবস্থান, সে অবস্থানের পক্ষে তিনটা অন্তত বড় শক্তি, রাশিয়া, চায়না এবং ইন্ডিয়া তারা মোটামুটিভাবে প্রকাশ্যেই ভূমিকা রাখছে। সব মিলিয়ে '২৩ আসলে কেমন গেল? এবং ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই ধারা কোন খাতে প্রবাহিত হবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর, আমি এটা অন্যান্য জায়গায় বলেছি, সেটা হলো, আপনারা নির্বাচন বলেন তো এই প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হলো

জিল্লুর রহমান: আপনি ইতোমধ্যেই বলেছেন। বিশেষ নির্বাচন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বলেছি যে, এটা আমি পুটিন সাহেবের কাছ থেকে ধার করেছি শব্দ তিনটি। সেটা হলো যে উনি বলেন যে ইউক্রেনে উনার যে যুদ্ধ উনি করছেন, সেইটা নাম হলো স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন। সেহেতু ওইটা থেকে ধার নিয়ে আমি বলছি, এইটা স্পেশাল ইলেক্টোরাল অপারেশন হচ্ছে। আসলে যেটা আমার কাছে পরিতাপের জায়গা সেটা হলো যে নির্বাচন কেন গুরুত্বপূর্ণ জাতির জীবনে, এইটা আমাদের উপলব্ধির ব্যাপার। দেখুন নির্বাচন হলো, আমাদের সমাজের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ থাকে, মত পার্থক্য থাকে, এবং আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে সমাধান করার জন্য বিভিন্ন মনোভাব থাকে। এই সমস্ত এবং এইটার থেকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বকে নিরসন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা দেশে, প্রত্যেকটা জাতির একেকটা প্ল্যাটফর্ম দরকার করে। একেকটা দ্বন্দ্ব নিরসনের সমাজ কাঠামোর ভিতরে একেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম থাকে। যেমন যদি আপনি আইন সঙ্গত, আইনের বিষয়ে আপনার কোনো দ্বন্দ্ব হয় তাহলে আপনি বিচার ব্যবস্থার জন্য যান। আপনি যদি অন্য কোনো এই মুহূর্তে সুরক্ষা, নিরাপত্তার বিষয় হয় তাহলে আপনি সমাধান করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যান। আপনার যদি কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে যায়, নাগরিক সমাজের কাছে আপনি যান, মিডিয়ার কাছে আপনি যান। সেরকম পৃথিবীতে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আদর্শিক এবং রাজনৈতিকের জন্য সেটা হলো প্রতিযোগীতাপূর্ণভাবে জনমানুষের মনোভাবের প্রতিফলন নিয়ে নির্বাচন করে সংসদ গঠন করা। সংসদ যেটা করে সেটা হলো যে আপনার বাইরে যত সমস্যা আছে, তাকে ভিতরে নিয়ে এসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আপনি সমাধান করেন। এই যে আমরা বলি না, সংসদ হলো সমস্ত তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। তো ওইটেই যদি সত্য হয় তাহলে এইটা। এখন আমাদের যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে, সেটাতে কি সেই ধরনের সমাধান দিবে? আমরা যেই সংসদকে আমরা প্রত্যাশা করি সেটার ভিতর অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে। আপনি যে কোনোভাবেই হোক, এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক মানুষ যদি এইটার ভিতরে স্বচ্ছন্দবোধ না করে, প্রথম কথা, অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং কার্যকর চয়ন করার মতো তাদের বেছে নেয়ারও সুযোগ না থাকে তাহলে সেটা সেই অর্থে কার্যকর হয় না। এটা আমাদের বুঝতে হবে। এবং ওইটা যদি কার্যকর না হয় তাহলে এর আগে যে আমরা অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় আমরা আলাপ করলাম, এবং এর সাথে হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরও আলোচনা করা যায়। সেগুলো সমাধান করার রাস্তা আমরা এগোতে পারবো না। সেহেতু আমি যেটা আপনাকে

পুনরায় বলতে চাই সেটা হলো যেই নির্বাচনী তৎপরতা হচ্ছে এটার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে মৌলিক সমস্যাটা এই মুহূর্তে, সেটা হলো যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা সেটা প্রতিনিধিত্বশীল হবে এবং জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটবে, এবং তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। এই প্রত্যাশাটা কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে না। এবং এইটা হচ্ছে না এই না, শুধু এই কারণে হচ্ছে না যে হয়তো প্রধান বিরোধী দল এটাতে অংশগ্রহন করছে না, এবং তার সাথে অন্যান্য বাম-ডানরাও অংশগ্রহণ করছে না। শুধু তা না। যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের আচার, আচরন থেকেও আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝি তাদের মূল চালিকা শক্তি, মূল প্রণোদনাটা এই মুহূর্তে জনকল্যাণের চেয়ে অন্য অনেক বেশি হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর এক ধরনের কর্তৃত্ব স্থাপন করা যেইটার মাধ্যমে হবে। যেইটার প্রকাশ পেয়েছে হলফনামাতে। অনেকে হলফনামা নিয়ে আপনারা অনেকেই আলোচনা করেছেন, ইত্যাদি। যেই কৃতিত্বটা হলফনামা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে সবাই দেয় না সেটা হলো এই অর্জনটা হলো আমাদের নাগরিক সমাজের অর্জন। ২০০৭ সালে এই নাগরিক সমাজ এটা নিয়ে আন্দোলন করেছে। আরপিও বা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে যে সংশোধন আনা হয়েছিল সেটার মাধ্যমে। এবং এটা করা হয়েছিল দুই কারণে। একটা কারণে করা হয়েছিল যে, যেই আয়ের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে সেই আয়টা বৈধ আয় কি না। আর দ্বিতীয়ত, যেই আয়টা হচ্ছে সেইটার স্বচ্ছতার কারণে আমরা নাগরিকরাও তাদের কাকে আমি নির্বাচন করতে যাচ্ছি সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকবে। এবং বৈধ আয়, কর প্রদত্ত আয় এবং তার সাথে তার সামগ্রিক যে সামাজিক চিত্রটা সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। এটা নাগরিক সমাজের অর্জন, এটা মনে রাখতে হবে। তো এইটার ভিতর দিয়ে আমরা কী দেখতে পেলাম, এই নির্বাচনের ভিতরে। সেটা হলো একতো হলো যে মানে সমঝোতা, ভাগাভাগি, ইত্যাদির বিষয় আছে। তাছাড়া যেই সমস্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে এখন দাঁড়ালেন তাদের যে হাজার গুণ বিভিন্ন সম্পদ বেড়েছে, সেই সম্পদের ভিতর থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে প্রতিনিধিদের আমরা পাঠাচ্ছি তাদের মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক চরিত্রটা কী? সে কী আসলেই বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষকে বা মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে করতে পারবে কি না। সেহেতু ওই সংশয়টা রয়ে গেছে। মানে একদিকে আপনি মূল দ্বন্দ্বটাকে নিরসন করলেন না এবং যাদের আপনি নিয়ে আসলেন সেই নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটাও আপনার সেরকমভাবে।

জিল্লুর রহমান: এই হলফনামার সূত্র ধরেই আরো কিছু প্রসঙ্গ, যেমন ধরেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, বা সুজন কিছু কিছু তথ্য এই সময়টাতে জনসম্মুখে প্রকাশ করেছে এবং সেইটা নিয়ে আবার সরকারি মহল তো বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এবং কেউ কেউ কাউকে কাউকে তো বিএনপির দালালও বলা হয়েছে। এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আপনাদেরকে ইঙ্গিত করে অনেক কথা বলা হচ্ছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর, আমি বলি। আমি অনেকদিন যাবৎ এই কাজ করি তো। প্রায় তিরিশ বছরের উপরে-চল্লিশ বছরের উপরে কাজ করছি। আমি দেখেছি যে প্রত্যেক সরকারেই দুই-একজন বিদুষক থাকে। দুই-একজন বিদুষক থাকেন তারা জটিল সমস্যাকে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেন তাতে আমোদিত হতে হয়। চিন্তিত করে না। তো উনারা অনেকেই অনেক কিছু বলেন। ওটাতে আমি আমোদিত হই, উৎফুল্লবোধ করি যে উনারা এই জটিল সমস্যাকে কী সুন্দরভাবে, এরকমভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এবং আমার অভিজ্ঞতা হলো যে যখন আপনি কোনো যুক্তিতর্কে কারোর সাথে পারেন না, তথ্য-প্রমাণে যখন পারেন না, তখন আপনি এমন কিছু বলবেন যেটার উপর আপনার হাত নেই। এখন যদি বলি, আপনি পুরুষ মানুষ এ কাজ তো করবেনই, আপনি উমুক ধর্মের এ কাজ তো করবেনই। মানে হলো যে আমি আর কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি যেটা দিয়ে আমি তথ্য-প্রমাণ দিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো। সেহেতু তখন এর পক্ষের ওর পক্ষের বানিয়ে দেয়াটা সবচেয়ে সহজ পথ। সেহেতু বিদুষকদের কথা নিয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করছি না। আমি প্রকৃত বিষয়ের ভিতর আসি। দেখুন এই যে হলফনামাটি হয়েছে, এই হলফনামা আমাদের নতুন কতগুলো সুযোগ করে দিয়েছে। এবং নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি এখানে আসবে। সেটা হলো যে, প্রথম কথা হলো, যে আয়ের ঘোষণা দিলো সেই আয়ের ঘোষণা তথ্য গোপন করা এবং অবৈধ আয় কি না এইটা দেখার সুযোগ কিন্তু উনাদের ছিল। উনারা সেই আয়টা মিলিয়ে দেখলেন। অপরদিকে আপনি দেখেন, সেইটার কিন্তু কার্যকরভাবে সম্পদ-তথ্য গোপন করার কারণে, অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যত্যয়ের কারণে কারোর সংসদ প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে আমি খুব একটা দেখি নাই। এখন কার্যকরভাবে শুধু খেলাপী ঋণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হচ্ছে বা আপনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি যদি সরকারি পরিষেবা শোধ না করে থাকেন সেখানে হতে পারে। কিন্তু আরেকটা বড় জায়গা আছে। এই বড় জায়গাটা কিন্তু এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে যাবে। আমি দেখেছি নামিয়ে ইন্টারনেট থেকে, উনারা যে সম্পদের ঘোষণা দিয়েছেন আর উনারা কর প্রদানে যে কাগজটি দিয়েছেন সেটার ভিতরে উনাদের সম্পদ এবং আয়ের সংখ্যাটা একই। তাহলে তাই যদি হয় যে এই সময়কালের একটি লোকের আপনার একশ গুণ, দুইশ গুণ, হাজার গুণ বেড়ে গেল।

জিল্লুর রহমান: চার হাজার পাঁচশ কত গুণ। সাড়ে চার হাজার।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার এইটা চিন্তা করতে ভয় লাগে। কল্পনার ভিতরে আনতে পারি না কয়টা শূন্য ওখানে যাবে। আমরা মধ্যবিত্ত মানুষের চিন্তার ভিতরেই ওটা আসে না। সেটা হলো যে উনার যদি পাঁচশ গুণ আয় বেড়ে থাকে, উনার কি পাঁচশ গুণ আয় কর বেড়েছে? লক্ষ্য করে দেখবেন যে এরা বেশিরভাগই ঘোষণা দিয়েছে উনারা সবাই

মুরগির খামারি হয়ে গেছেন। কারণ মুরগির খামারের ক্ষেত্রে কর রেয়াত দেয়া ছিল। সেহেতু সব কর ওখানে। সবাই মৎস ব্যবসায়ী হয়ে গেছে কারণ ওখানে কর রেয়াত দেয়া ছিল। আর যখন আপনি বলেন যে আমার হাতে দশ কোটি টাকা, কাঁচা টাকা আছে ঘরে। কীভাবে সম্ভব একটা মানুষের এইগুলো? সেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আইএমএফের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর ক্ষেত্রে। এইটেই তো সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ। আমি দেখতে চাই আগামী ছয় মাসে কর-জিডিপি বাড়ানোর জন্য রাজস্ব বোর্ড সমস্ত নির্বাচনের প্রার্থীদের করের যে ঘোষণা সেইগুলোকে পুনর্বিবেচনা করছে কি না। রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন সময় হয়রানির জন্য কাউকে কাউকে করে থাকে। এইখানে তো আমি মনে করি একটা যৌক্তিক জায়গা ছিল যেখানে দেখার সুযোগ আছে। এইটার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যেগুলো আমাদের নজরদারি প্রতিষ্ঠান সেটা আপনি দুর্নীতি দমন, আমি এখনই দুর্নীতির কথা বললাম না। আমি শুধু কর আহরণের দিকটাই বললাম। তারা এটা করে কি না। সেহেতু আপনার নির্বাচন কমিশন, রাজস্ব বোর্ড, আপনার দুর্নীতি দমন কমিশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে যে ফাইন্যানশিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট আছে তারা এগুলোকে কীভাবে দেখেন এটা এখন আগামী দিনে দেখার বিষয় হবে। এটা তো নির্বাচনি প্রতিযোগিতার বাইরে এটা চলমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে আমি দেখার জন্য অপেক্ষায় আছি।

জিল্লুর রহমান: রাজনীতি প্রসঙ্গে ছিলাম এবং কেমন গেল। এবং ৭ই জানুয়ারি আসলে গতিপ্রবাহের কোনো পরিবর্তন আনবে কি না বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে। ইতোমধ্যেই বিএনপির রাজনীতির অধিকার আছে কি না, বিএনপিকে নিষিদ্ধ করা হবে কি না, টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে তার উপরে স্যাংশন আসা উচিৎ, এইসব আলোচনা আছে। এবং এট দ্যা সেইম টাইম, এইটাও একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইবো যে অপজিশনের যে পলিটিক্স, সেটাও আসলে, তারা জনগণের হয়ে যে দায়িত্ব পালন করবার কথা সেটা তারা করতে পারলো কি না বা পারছে কি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার নির্বাচনের তৎপরতার তো এখনো কয়েকটা দিন বাকি আছে। সেহেতু এই সময়কালে কী হয় না হয় এইটাও আমাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপার আছে। সেটা হলো যে রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে নিজেকে, এই পুরো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে।

জিল্লুর রহমান: এবং এখানে আরেকটা কথাও একটু বলে রাখি। প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের কর্তা ব্যাক্তিরা মাঝখানে কিছুদিন চুপ ছিলেন বৈদেশিক যে তৎপরতা সেগুলো নিয়ে এবং এখন তারা বলতে শুরু করেছেন যে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, চেষ্টা হচ্ছে। এবং ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। দেশি-বিদেশিরা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার কাছে একটু আশ্চর্য লেগেছে, আমি পরবর্তীতে আসবো। কারণ হলো যদি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে এই ধরনের বক্তব্য আমার কাছে একটু আশ্চর্যজনক লাগে। কারণ যার কাছে পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে সে এরকম ধরনের আপনার মন্তব্য করাতে হয় যেটাতে অস্বস্তি আছে বলে মনে হয়। প্রথমে এই জায়গাটাতে আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে নির্বাচন কিছুদিন বাকি রয়েছে। সেটার ভিতরে কী ঘটনাবলি ঘটে মাঠ পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সেটা দেখার বিষয় আছে। সহিংসতা কতখানি বাড়ে এবং সহিংসতা তিনটি উৎস আমি দেখি। এক হলো যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না তাদের সাথে সরকারি যন্ত্রের। কারণ এইটা তো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব না। সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব। এবং যারা নির্বাচন চান না, প্রচারের ক্ষেত্রে তারা যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেটাও আমরা দেখছি। কারণ সেটা তো আমরা একসময় না-ভোটের জন্য আন্দোলন করেছিলাম। সেহেতু আমরা মনে করি যে আমি নির্বাচন চাই না এ কথাটা যদি কেউ আপনার অহিংসভাবে বলে তাহলে সেই কথাটা বলার তার অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে। আর দ্বিতীয়ত যেইটা সহিংসতার জায়গা এইটাই বড়। যারা নির্বাচন করছেন তাদের ভেতরে সহিংসতা।

জিল্লুর রহমান: সংঘাত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আর তৃতীয় আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হলো এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যদি অন্য কোনো বিষয়কে কেউ ব্যবহার করে সহিংসতা করে পারে বলে আমি মনে করি। আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন, যেই জায়গাটাতে সমস্যা একটা হয়েছে একটা নাগরিকদের জন্য, সেটা হলো যে প্রধান যে রাজনৈতিক দল তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেন না। এবং প্রথম থেকে বলছেন যে নির্বাচনে যাবো না যদি একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা না আসে। কিন্তু সেটাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে দৃশ্যমান জনসম্পৃক্তি দরকার করে সেটা কিন্তু সেইভাবে তারা টেকাতে পারেন নাই। এইটাই বাস্তব। নাগরিকরা হয়তো সেখানেই একটু হতাশ হয়েছে এমন হতে পারে। কারণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি থাকলে পরে নাগরিক শক্তি বাড়ে। এইটাই তো নিয়ম। প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি থাকলে পরে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকে, মেধার আমরা তখন কদর করতে পারি। তো দেখেন উনাদের যেটা সমস্যা হলো যে ২৮ তারিখের পরে যখন উনাদের সভা ভণ্ডুল হয়ে গেল উনাদের অন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি আছে না এটা কোনো সময় পরিষ্কার হয়নি। ঐ এক পথে উনারা পরে যে সমস্ত কর্মসূচি দিয়েছেন এই অবরোধ, হরতাল, তারপরে এই অসহযোগ, এগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল ছিল বলে মনে হয় নাই। কারণ এগুলোকে টিকানোর জন্য যে জনগণের সম্পৃক্তি দরকার করে, যে সমাবেশের দরকার করে, যে প্রস্তুতি এবং অবদানের দরকার

করে সেটা উনাদের ছিল না এটা পরিষ্কার। এটা মাঠ পর্যায়ের ব্যর্থতা নাকি নেতৃত্বের ব্যর্থতা এটা অন্য কোনো দিন হয়তো ইতিহাস বলবে। আমার কাছে কোনো তথ্য নাই। তৃতীয়ত দেখুন উনাদের বিরুদ্ধে যে নাশকতার অভিযোগগুলো আছে উনারা সেই নাশকতার তথ্যগুলো সামাজিক মিডিয়াতে বিভিন্ন কথা আমরা দেখি, কিন্তু উনারা কিন্তু ঐ বয়ানের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী প্রতিবয়ান দাঁড় করাতে পারেননি। উনারাই যে আগুন দিচ্ছেন না, বাস পোঁড়াচ্ছেন না, উনারা যে মায়ের কোলে শিশুকে মারছেন না, এইটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে উনারা নিজেদের মতো করে উপস্থাপন করতে পারেননি। এইটাও উনাদের একটা ইংরেজিতে কমিউনিকেশন ফেইলিওর বলবো। উনাদের সেই অর্থে জনগনের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হিসেবে এসছে। আরেকটা ক্ষেত্রে উনাদের আমি সমালোচনা করবো এটা। সেটা হলো উনারা খুবই একটি মাত্র সরকার বদলের উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু সরকার বদল হলে কী হবে, উনারা আসলে যে সুশাসন দিতে পারবেন এই নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আস্থার জায়গা উনারা কিন্তু তৈরি করতে পারেননি।

জিল্লুর রহমান: উনারা যে বলছেন উনারা রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার রূপরেখা এগুলো দিয়েছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনারা যে কত দফা? ২৬ নাকি ৩০?

জিল্লুর রহমান: ৩০।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ৩০ দফা তৈরি করেছেন। আপনি কি কোনো বক্তৃতাতে শুনেছেন যে এই ৩০ দফাতে আমি ব্যাংকিং খাতকে এইভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাবো এবং খেলাপী ঋণকে এইভাবে করবো। ওখানে আছে। উনারা সেমিনারও করেছেন। কিন্তু এইটাকে উনারা রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ করতে পারেননি। মানুষ শুধুমাত্র সরকার বদল করবো, এই বদলের জন্য বদল করবো এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝে। কিন্তু এইটার থেকে আমি মানে যেটা বলে আরকী সেটা হলো মানে গরম তেলের থেকে আপনি আমাকে আগুনে ফেলবেন কিনা এইটারও নিশ্চয়তা চায়। জনমানুষের এই নিশ্চয়তা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উনারা করেননি। আমি একটা খুব সুনির্দিষ্ট জায়গা আপনাদের বলি। উনারা উনাদের যে এক দফা দাবীর সাথে উনাদের ৩০ দফা দাবীর সংযোগও স্থাপন করয়ে পারেননি। কীভাবে পারেননি? উনাদের ওখানে আছে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ তৈরি করার কথা। উনারা ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই উপরি কাঠামো যদি হতো, ওইটা ওই যে নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে ছাতা হিসেবে কাজ করতে পারতো। পাকিস্তানে যেটা হয়। ওদের সেনেট যেভাবে কাজ করে। আমাদের কিন্তু সুযোগ ছিল, যারা বলেন যে অনির্বাচিত সরকারের অধীনে কোনোদিন থাকবেন না, সেইটার জন্য কিন্তু এটা সবচেয়ে

ভালো ব্যাখ্যা এইটার ভিতরে হতে পারতো। যে আমার উপরের সংসদ থাকে রাজ্যসভার মতো। বাংলাদেশে রাজ্যসভার সুযোগ নাই। আমাদের ফেডারেল স্ট্রাকচার না। কিন্তু উনারাও এটা করেন না। সেহেতু, আমি মনে করি উনারা উনাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই বলেই আমি মনে করি। এবং এখন যে পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হলো সেই পরিস্থিতিটার জন্য আমাদের নাগরিকরা কিন্তু দুই দিক থেকে ঠকে গেল। এবং সেইজন্য উনাদের পুরো প্রক্রিয়াটার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। একটা দল যে ক্ষমতায় যেতে চায় তার প্রস্তুতি আরেকটু ভিন্ন হয়।

জিল্লুর রহমান: কিন্তু তারা যেটা বলেন যে একটা ভয়ের আবহ তৈরি করা হয়েছে ২৮ তারিখের পরে...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি সব মানছি। এটা তো আমি বললাম। পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির লোকেদের ধরে নিয়ে গেলেন আপনি তাদের জামিন দিলেন না নেতৃত্বকে। তাদের নামে আপনি আগের দিন দল ভেঙে রাজার দল বানাতে চেয়েছেন পরের দিন যখন হয়নি তখন তাকে জেলে পাঠাচ্ছেন। আপনি একইরকমভাবে বাবাকে না পেলে ছেলেকে ধরছেন। আপনি জেলের মধ্যে তিনজন এ পর্যন্ত কর্মী মারা গেছে বিরোধীদলের। এগুলো সব আমি স্বীকার করি। তারপরেও একটা দল যখন ক্ষমতায় যেতে চাই তার প্রস্তুতি ভিন্ন ধরণ থাকে। আমার মনে হয় সেই তারা একটা বড় ঘাটতি এখানে উন্মোচন করেছে। আর যেটা আপনি বলছেন যে আগে বলতো না এখন হঠাৎ করে যে প্রচারণা বিএনপির বিরুদ্ধে এবং তাকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে বাজেয়াপ্ত নাকি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা ইত্যাদি। এইটা নির্ভর করে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে এই নেতৃত্ব কী আচরণ করে। ইতিহাস বলে যে দ্বিতীয় দশকে কোন কর্তৃত্ববাদী সরকার আরো বেশি কঠোর হয়। কারণ তার যে সমস্ত ক্ষমতা সেই ক্ষমতাগুলো অনেক বেশি নিরঙ্কুশ হয়ে যায়। এবং সেইটা রাজনৈতিক না রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের উপর হয়। সেটা বিচার ব্যবস্থা, সাধারণ আমলা, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এমনকি মিডিয়া অনেক সময় নাগরিক সমাজের অংশ। এই জিনিসটা নিয়ে তখন সে একরমের পরিস্থিতির ভিতরে যায়। এখন আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে যদি রাজনৈতিক তাৎপর্য এরকমই হয়ে যে এই রাজনৈতিক দলকে আমি রাজনৈতিকভাবে আর কোনো জায়গা দিতে চাইনা এবং সেটার সুযোগ আছে তাহলে হয়তো নিষিদ্ধ করার মতো পদক্ষেপে যাওয়াটা অসম্ভব না। শুধু রাজনৈতিক দলনা এইটার সাথে যেটা যুক্ত হবে সেটা হলো নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বরও আরো হবে। আমি আজকে সকালেও বলেছি যে আপনি আওয়ামীলীগের যদি ইশতেহার দেখেন সেখানে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা আছে তাদের স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে, জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে, বৈদেশিক ইত্যদির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে। একবারও বলে নাই দেশ গঠনে এরা স্থানীয় পর্যায়ে, তৃণমূলে কী বড় ধরনের অবদান রেখেছে,

কী কোভিডের সময়, কী তার আগে। বাংলাদেশ আজকে যে পর্যায়ে এসেছে সেখানেও তাদের একটা অবদানের জায়গা আছে আগামীতেও দরকার আছে। এসডিজি বাস্তবায়ন করার জন্য, এলডিসি থেকে বেরোনোর জন্য, এবং উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার জন্য। তো এটার ভিতর দিয়ে মনোভাব বের হয়। এটা অসম্ভব না কিন্তু। এবং কিন্তু যেটা মনে রাখার ব্যাপার, ধরুন আপনি আজকে বিএনপির মতো একটি দলকে নিষিদ্ধ করে দিলেন। বা তার মতো আরেকটি কাছের অন্য রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলকেও। মানুষ, তাদের পক্ষেও যদি মানুষ থাকে তারা কি উবে যাবে? আপনার তো বিষয়টা হলো শেষ বিচারে রাজনীতিতে আপনার আদর্শের সংঘাত করতে হবে। আপনি রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আপনি কাউকে দমন করতে পারবেন। কিন্তু তাকে উৎখাত করতে পারবেন না। তারা অন্য অবয়বে আপনার সামনে এসে হাজির হবে তখন। এবং যে অবয়বে হাজির হবে, তখন সে অবয়বটা আপনার প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে নিয়ন্ত্রণ করার ভিতরে আপনার সেই শক্তি থাকবে না। দেখুন ক্রমান্বয়ে আমার মনে হয় যে সাধারণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ভিতরে শান্তিপূর্ণভাবে আমি সরকার বদল করার কোনো সুযোগ আমার নাই। আপনি তো এই লোকগুলোকে অদৃষ্টবাদী দিবেন। তারা তখন ইংরেজিতে বলে ডিভাইন ইন্টারভেনশন। অর্থাৎ অদৃষ্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু হয় না। আর অদৃষ্টকে তখন দেশের মাটিতে মূর্ত রূপ দেয়, ইনসানই দেয়। তখন মানুষ এসে তাকে রূপ দেয়। এটা কি আমরা বিভিন্ন দেশে দেখি নাই। সেইতো আমি যেই কাজের জন্য যেই পদক্ষেপ নিচ্ছি বলছি সেইটা প্রকৃতপক্ষে ওই কাজকেই আরো উস্কে দিচ্ছে কি না। দেখুন, আপনি প্রতিবেশী বা অন্য দেশের কথা বলছিলেন। ভারতবর্ষের মনের ভিতরে থাকতে পারে যে বাংলাদেশে যদি একটা সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল, উগ্র সরকার হয় তাহলে সেটা তাদের শান্তি, সংহতির জন্য অনুকূল না। ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কী পদ্ধতিটা গ্রহণ করছেন?। আপনি যদি এইটাকে, মূল ধারার রাজনীতির ভিতরে যদি এই দ্বন্দকে না নিয়ে আসেন তাহলে তো রাজনীতির আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এটা বড় হবে। এবং সেই যে ছেলে যদি স্কুলে না যায় না তাহলে তো সে বেয়াদব বেকায়দা হয়ে যায় না? তো সেই জিনিসটাই করছে। অর্থাৎ মানুষের ভিতরে আপনি যদি এই আলোচনাটাকে না আনতে পারেন যে আপনি যে আপনি মুখে যখন বলেন আমি নাগরিকদের সাথে আছি, আমি দেশের সাথে বন্ধুত্ব করছি, সরকারের সাথে করছি না; তখন তো সেইটা প্রমাণের এইটেই বড় জায়গা যে আপনি উৎসাহিত করবেন। মূলধারা রাজনীতির ভিত্তিতে। আপনি সেটা না করে অন্য পথে যাচ্ছেন। এবং আপনি যদি ধরেন এটার সাথে যদি আপনি যুক্ত করেন। চিন্তা করে দেখেন কীরকম ধরনের আপনার একটা বিপদসংকুল অবস্থার সৃষ্টি করে। আর অন্যদিকে আপনি নিজের দেশে যদি আপনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করেন এবং এরকম একটা সরকার আসে যে সরকারটি আগামীতে আসবে হয়তো তাদের দেশে যে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর মনোভাব নিয়ে আসবেন। তো আপনার দেশে যদি আপনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংকীর্ণ বৃহত্তর মনোভাব নিয়ে আসেন

তাহলে আমার দেশে কি এইটার প্রতিক্রিয়া হবে না? কারণ ওই দেশের সংখ্যালঘু তো এই দেশের সংখ্যা গুরু।

জিল্লুর রহমান: বা আপনার সেই ইথিকাল পজিশন থাকে কি না বা আপনি বলতে পারেন কি না? যদি সেভাবে বলি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর, অন্যদিন বলেছি যে মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি তো এখন নাই। এখন ইংরেজিতে বলে ট্র্যানজাকশনাল পলিটিকস। অর্থাৎ তুমি কী দিবা আমি কী দিবো। আমি তো ঐ জায়গাতেই নামায়ে নিয়ে এসে বলছি যে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেই চাওয়াটা কিন্তু পদ্ধতিটা তো ঠিক হলো না। আপনি খুবই স্বল্পমেয়াদি একটা চিন্তা করলেন। বাংলাদেশ কি ৩ বছর পর থাকবে না? বাংলাদেশ তো থাকবে।

জিল্লুর রহমান: এটা কেন হচ্ছে? মানে ভারতের মতো একটা দেশে আমার এটা একটা প্রশ্ন যে তাদের মতো একটা দেশে, বিশ্বের সবচাইতে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত। সেই দেশে মানে একদিকে পলিটিশিয়ানরা বলি, এডমিনিস্ট্রাশনের লোকজন আছে, সেখানকার সিভিল সোসাইটি বা থিংক ট্যাঙ্কগুলো অনেক শক্তিশালী, মিডিয়া অনেক শক্তিশালী। তারাও তো সবাই একই সুরে একই ঢোল পেটাচ্ছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যদি, দেখুন, আপনার প্রতিবেশী যদি দূর্বল হয় তাহলে তো আপনার চাওয়া পাওয়াগুলো আদায় করা সহজ হবে না? প্রতিবেশীর সাথে আপনার যদি দ্বন্দ্ব থাকে তখন ঐ প্রতিবেশীর যদি গৃহবিবাদ থাকে, তাহলে সেটা তো আপনার জন্য উপকারি হয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখুন চিন্তাটা। ট্রানজ্যাকশনাল। এখানে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। কিন্তু এখানে আরেকটা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো রাজনীতির ক্ষেত্রে কম্ফোর্ট লেভেল থাকে, স্বাচ্ছন্দবোধ থাকে। কিন্তু তার সাথে থাকে যেটা যেই সমস্ত আমলারা এই রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করে, বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি, তারা আসেন তিন বছরে জন্য। তারা আসেন পাঁচ বছরের জন্য। তারা যেটা দেখেন যে আমার সময়কালে যেন বড় ধরনের কোনো সমস্যা না হয়। সেহেতু তারা সবসময় স্থিতিশীলতা বলেন। এবং তারা স্থিতিশীলতাকে প্রকারান্তরে মানে অব্যহত থাকার, পরিস্থিতির অব্যহত প্রলম্বন হিসেবেই দেখেন। ইংরেজিতে যেটাকে বলেন, উনারা stability বললে আসলে continuity বোঝান। Continuity আর stability কিন্তু এক জিনিস না। কারণ পৃথিবীতি তো গণতান্ত্রিক দেশে তো stability বলতে একই সরকারকে বহুদিন শাসন বুঝায় না। সে বুঝায় যে সরকার বদল হবে কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামো সংহত থাকবে এবং সুচারুভাবে পরিপালন করবে। যেখানে প্রশাসন দলীয় চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে না। সেখানে আমার বিচারের ব্যবস্থাও দলীয় চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠায় থাকবে না। এইটেই

তো থাকার কথা। সেই জায়গা থেকে তো আমরা দূরে গেছি। মানে আপনাকে, জিল্লুর, একটু বড়ভাবে চিন্তা করতে হবে। এটা হলো যে বাংলাদেশ যেই জায়গাতে আগাচ্ছে, যেই জায়গায় আমরা যাবো এবং বর্তমান সরকার যেখানে নিতে চায়, সেইখানে আপনার যাওয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের রাজনীতি দরকার। এই রাজনীতি তো আমার এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধারণ করতে পারছে না। আপনি দেখেন যেই গরীব এক শতাংশ মানুষের সাথে উচ্চ এক শতাংশ মানুষের আয়ের, পাঁচ বছর আগেও যদি দশ-এগারো-বারো গুণ থাকতো, এটা আশি গুণের উপরে হয়ে গেছে। এইরকম একটা মানে বৈষম্যপূর্ণ সমাজ নিয়ে কি আসলেই কল্যাণকর রাষ্ট্রের পথে আমরা যেতে পারবো কি না।

জিল্লুর রহমান: এখানে আমার প্রশ্ন আছে যে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি বা মিডিয়া এইক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করছে কি না? আপনি যেমন অপজিশনের কথা বললেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো নাগরিক সমাজ কখনো অখণ্ড নাগরিক সমাজ হয় না। নাগরিক সমাজের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের মানুষ এটার ভিতরে থাকে। আমি তো বলি আমরাও নাগরিক সমাজ করি। ওখানে আরো অনেকে যারা ধরেন সরকারের বাইরে আছে, সরকারের সাথে যুক্ত না এমন তো আরো অনেক মূল্যবোধের মানুষ বাইরে আছে। আমরা বলি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা। কেউ হয়তো সাম্প্রদায়িক চিন্তারও নাগরিক সমাজ থাকতে পারে। এইটা আমাদের মেনে নিতে হবে। কারণ আমাদের প্রথম স্বীকারোক্তির জায়গা হলো বহুত্ববাদ। অর্থাৎ আপনার আমার মন যে একই হবে এইরকম কোনো কারণ নাই। গণতান্ত্রিক সমাজে সবাইকে এক চিন্তা করতে হবে এইটা হলো ইংরেজিতে totalitarian approach বলে। একচ্ছত্র বাদের এটা একটা বড় পরিষ্কার ব্যাপার। কিন্তু নাগরিক সমাজের যেটা হয়েছে সেটা হলো, আপনার একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার যখন বহুকাল ধরে থাকে তক্ষণ আপনারা দেখবেন তারা ক্রমান্বয়ে সমাজের যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাকে তারা কঠিন বাংলা হলো কুক্ষিগত করে। আর যদি বলেন চলতি বাংলায় হজম করে। আর নাহলে হলো তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহলে তক্ষণ তারা কী করেন? আমি আপনাদের উদাহরণ দেই। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনর সময় আমরা যেভাবে পেশাজীবীদের পেয়েছি। শামসুল হক সাহেব যখন সুপ্রীম কোর্ট থেকে ওই কালো কোটটা পরে বের হতেন দুনিয়ার তো উনার পিছনে দাঁড়িয়ে যেত। কী পেশাজীবীদের কী বড় ধরনের একটা প্রভাব ছিল সম্মান ছিল। আপনি এখন বলেন দেখি। উকিল বলেন, ডাক্তার বলেন, অর্থনীতিবিদ বলেন, আপনার মিডিয়ার মানুষ তাদের পিছনে মানুষ দাঁড়াবে? মানুষও তো অত বোকা না। তো সেই পেশাজীবীরা কিন্তু তাহলে আমাদের সম্মানটা আমরা হারিয়েছি। একইরকমভাবে আপনি যদি দেখেন যে ব্যক্তিখাত। তো উনাদের তো কোনো নির্বাচনই হয় না। হাতে ধরে একজনকে বসানো হয়। উনারা তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন না। সেহেতু উনারা উনাদের

ব্যবসা বাণিজ্যের যারা নেতা হন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখেন, বাদবাকিদেরটা গরীব, খুঁদে, মাঝারি তাদেরটা তাদের মতো সেহেতু এই সমস্যাটা আসলে অনুষঙ্গ। আমার যেই রাষ্ট্রযন্ত্র আমরা চালাচ্ছি তার অনুষঙ্গ। এটা মিডিয়ার জন্য সত্য। এটা পেশাজীবীদের জন্য সত্য এইটা আপনার ব্যক্তিখাতের জন্যও সত্য। নাগরিক সমাজও তার ভিতরে আছে। নাগরিক সমাজের জন্য আরো যেটা সমস্যার জায়গাটা যেটা হয়, যারা প্রতিষ্ঠান চালান। তো বিএনপির মতো এত বড় রাজনৈতিক শক্তিকে, যারা বিভিন্ন সময় দেশ চালিয়েছে যদি নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে ওই তেলাপোকার মতো দুই-তিনটি নাগরিক প্রতিষ্ঠানকে এটা তো কোনো ব্যাপারই না। বুঝেছেন? আপনি তাকিয়ে দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে স্বনামখ্যাত নাগরিক প্রফেসর মূহম্মদ ইউনুস, তাকে যদি আমি এরকম পরিস্থিতিতে নিতে পারি। পহেলা তারিখে জানুয়ারিতে কী রায় ঘোষিত হবে আমরা জানি না।

জিল্লুর রহমান: ৭ তারিখ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ৭ তারিখে হবে, না?

জিল্লুর রহমান: না। প্রফেসর ইউনুসের মামলার রায় পহেলা জানুয়ারি। মানে আজকেই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রফেসর ইউনুসের মামলার রায় ১ তারিখে ঘোষিত হবে। কী হবে আমরা জানি না। কিন্তু উনার সাথে যদি এরকম আচরণ হতে পারে যার জন্য বিশ্ব যার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দ যার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্যভাবে দাঁড়িয়েছে। তো অন্যান্যদের কথা আপনি চিন্তা করে দেখেন। তাহলে আপনি কী মানে আজকের লড়াই জিতবেন নাকি পরবর্তী যুদ্ধ জিতবেন এইটা মনে করে লড়াই থেকে পালান যুদ্ধ জেতার জন্য। এরকমও তো হতে পারে। সেহেতু আপনাকে এটাকে মনের ভিতর রাখতে হবে। এবং একটা এইরকম পরিস্থিতি যখন থাকে না, সবচেয়ে বড় থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ। ইংরেজিতে তাকে self-censorship বলে। যে শব্দগুলো আমরা উচ্চারণ করি না। যেগুলো জেনেও আমরা প্রকাশ্যভাবে বলি না। সেইটার ভিতরে। এই জায়গা থেকে থেকে বের হতে না পারলে পরে দেখা যায় পৃথিবীতে কোন জায়গাতেই এইটা আসে না। এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বড় শক্তিটা দাঁড়ায় হলো বিকাশমান মধ্যবিত্ত। বিকাশমান মধ্যবিত্তর যখন পরিস্থিতি হয়, এই যে মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই যে অবর্ণনীয় বৈষম্য বা মানে এইযে সম্পদের বৃদ্ধির এই যে উৎকট প্রদর্শন, এগুলো আমরা যখন হয় তখন। এবং তার সাথে যুক্ত হয় আমাদের তরুণ সমাজ। পৃথিবীতে কী বলেন আপনারা? বয়স কত আঠারো যার, যুদ্ধে যাওয়ার

সময় তার। তো বাংলাদেশে এক-তৃতীয়াংশের উপরে তরুণ সমাজ। তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এই তরুণ সমাজের মনে, আত্মায় কিছু লাগে না?

জিল্লুর রহমান: তারা তো দেশেই থাকতে চায় না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো পলায়ন মনোবৃত্তি। মানে মেধা থাকবে বিদেশে যাবে না, শিক্ষা নিবে না এটা কেউ বলে না।

জিল্লুর রহমান: না না। আমি সেটার কথা বলছি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু তারা ফিরতে চায় না। থাকতে চায় না।

জিল্লুর রহমান: ফিরতে চায় না। দেশটাকে নিজের মনে করে কি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটা হলো একটা আপনি যে, কর্তৃত্ববাদী সমাজের ভিতরে না এটা বড় বড় দেশে আমি দেখেছি। আরো অন্য দেশে আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। এটাকে ইংরেজিতে বলে denial syndrome। অর্থাৎ আমি এটাকে অস্বীকারের মনোভাবের মধ্যে থাকি। তারা দেখবেন দুই জগতে বসবাস করে। একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নেয়। ওই সামাজিক মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে। আমি এগুলোর ভিতরে নাই। আমার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই। ওইটা একটা নোংরা জায়গা, আমি একটা শুদ্ধ মানুষ। আরে ভাই ওই পুরো দুটো নিয়েই তো পৃথিবী। ঐ নোংরা জায়গা, আজ হোক, কাল হোক তোমার কাছে এসে পৌঁছাবে। এটা তো অবধারিতভাবে হবে। সেহেতু দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই।

জিল্লুর রহমান: আমি একটা জিনিস দেখেছি মানে এই যে তরুণরা যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশি এনগেজড। আমরা আসলে অনেক সময় হয়তো তাদের সঙ্গে কথা বলি না। কিন্তু কথা বলে দেহেছি, আমি বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই, সবাই কিন্তু পুরো পরিস্থিতিটা ওয়াকিবহাল। মানে দেশে কী হচ্ছে, বিদেশে কী হচ্ছে। ইভেন আমাদের আঞ্চলিক রাজনীতিতেও কী হচ্ছে। তারা হয়তো এগুলো সেগুলো শেয়ার করে না, আলোচনা করে না। বাট তারা নিজেরা নিজেরা করে এবং তাদের একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বলে আমার মনে হয়। বাট সেটাকে এক্সপ্লোর আমরা করতে পারি নাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা এক্সপ্লোর করি নাই এটা আমি পুরো বলবো না। আমি মনে করি যে প্লারা একটা হিসাব করে দেখেছে যে এই রকম আন্দোলন, সংগ্রামের ভিতরে বা কোনো ধরনের প্রকাশ্য বক্তব্যের ভিতর দিয়ে উনারা উনাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চান নাই। এটা তো খুবই পরিষ্কার যে এরকম ফেসবুকে পোস্টিং চেক করে সরকারি চাকরিতে তারা নির্বাচিত হওয়ার পরও তারা আর চাকরি পায় নাই। এটাই তো সত্য। এই জায়গাটা তো আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

জিল্লুর রহমান: সমাজটাও তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা মানুষ বন্দি অবস্থায় মারা গেছে ডান্ডাবেড়ি অবস্থায়, তার ডেডবডিটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায়। কোন জায়গায় আমাদের মানবিক...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেইটাই। আমরা কী নিষ্ঠুর এবং নির্মম হয়ে যাচ্ছি সমাজ হিসেবে। আমি আজকে আপনাকে, যেহেতু নতুন বছর, আমি আপনাকে সামনের দিকে আপনাকে বলি।

জিল্লুর রহমান: সামনের দিকে, শেষের দিকে আমরা। পাঁচ-সাত মিনিট সময় আছে। আমি ৭ই জানুয়ারিতে কে জিতবে, কে জিতবে বলতে আপনি জেতা-হারার কথাগুলো বলছিলেন আসলে। এই নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কী? শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত নানা রকম শঙ্কা-আশঙ্কা, সম্ভাবনা আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি। সরকার হয়তো আরো দৃঢ়ভাবে টিকে যাবে। প্রতিপক্ষগুলোকে কী করা হতে পারে সেটা আপনি খানিকটা ইঙ্গিত করছিলেন। হয়তো করতেও পারে নাও করতে পারে। আবার তারাও আশঙ্কা করছেন যে তাদের পজিশনটাও খুবই হয়তো নড়বড়ে। নানারকমের স্যাংশন এটা সেটা এগুলো নিয়ে নানারকমের প্রশ্ন, আলোচনা আছে। সব মিলিয়ে আপনি আসলে কী দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি দুই একটা কথায় এটা শেষ করি। এক নম্বর হলো, এটা একটা নির্ধারিত ফলাফলের নির্বাচনী তৎপরতা কিন্তু এটা আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে। ফলাফল নির্ধারিত। ভবিষ্যতটি অনিশ্চিত। এরকম একটা পরিস্থিতির ভিতর আমরা আছি কিন্তু। এবং ওই নির্ধারিত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমি আগামী দিনের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করতে পারবো, এটা আমি মনে করছি না। দ্বিতীয়ত হলো, এই ফলাফলের পরে দেশের ভিতরে যেটা হবে এবং এটা এই যুব সমাজকে কেন্দ্র করে আমি বলছি, এটলান্টিকের ওপার থেকে এসে আমাদের সমস্যা কেউ সমাধান করে দিয়ে যাবে এটা যদি কেউ মনে করে তাহলে বোকার স্বর্গে বসবাস করে। ওইযে বিরোধী দলের কথা বলছেন না উনারা অতিমাত্রায় হয়তো এটলান্টিক, প্যাসিফিক দেখেছেন। উনারা আরো বেশি দেশের ভিতরে থাকতে হবে। এই দেশ আমাদের এবং আমাদের

সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে। এই মনোভাবের ভিতর নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। আর সেই আমার দেশের আমার সমস্যা আমি সমাধান করলে পরেই সেটা একটা সক্রিয়তা নিয়ে টেকসই হবে বলে আমি মনে করছি। এবং এইটা ২০২৪ এর সবচেয়ে বড় কাজের ভিতরে অন্যতম হবে। তৃতীয়ত যেটা বলা সেটা হলো যদি প্রথাগত রাজনীতি এখানে হোঁচট খায়, চলমান রাজনীতি যদি হোঁচট খায়, ঠিকমতো আমার সুরাহা দিতে না পারে জনজীবনের, তাহলে অবশ্যই দুটো জিনিসের আশঙ্কা থেকে যায়। মানে একটা প্রয়োজন, একটা আশঙ্কা। একটা প্রয়োজন থেকে যায়, সেটা হলো যে, যদি প্রথাগত রাজনীতিবিদরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে আপনার নাগরিক সমাজের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। সেহেতু আগামী দিনে আমি নাগরিক সমাজের, মিডিয়ার দায়িত্ব আরো অনেক বেশি দেখছি। কারণ গণতান্ত্রিক পরিশীলন যদি থাকে, অনুশীলন যদি থাকে, তাহলে বিভাজিত পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কথাগুলো বলার জায়গা তাহলে থাকে, তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। ঐ প্রতিনিধিরা যদি এরও প্রতিনিধি হয় তাহলে আমাদের নাগরিকদের, মিডিয়ার দায়িত্ব, ভুমিকা আরো অনেক বেশি।

জিল্লুর রহমান: আপনি কীভাবে আসা করেন যেখানে আঠারো জন অন্তত ন্যাশনাল লেভেলের মিডিয়া ওনার ইলেকশন করছেন, শতাধিক আঞ্চলিক লেভেলের মিডিয়া ওন করেন এরকম। সেখানে মিডিয়া কী রোল প্লে করবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি এখন তো প্রযুক্তি আমাদের কিছু কিছু বিকল্প দিয়েছে। এবং প্রযুক্তি বিকল্প দিয়েছে যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষকেই এখন মিডিয়ার অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। এবং এটা হচ্ছে আপনারা জানেন। যারা জনতার মঞ্চ করেছেন থেকে আরম্ভ করে যারা আরব বসন্ত করেছেন তারা সকলেই এটা জানেন। এবং উনাদের ভিতরেও যে খুব বন্ধুত্ব আছে তা তো না। উনারাও একেক জনের সাথে একেক জন প্রতিনিধি। এইটা আমি মনে করি। আরেকটা জায়গা, আমাদের নাগরিক সমাজের ভূমিকাটা আরো একটা জায়গায় আছে। সেটা হলো যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থা যদি হোঁচট খায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক বা অনেক সেই অর্থে অনেক কঠিন মনোভাবের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিও আসে।

জিল্লুর রহমান: উগ্র শক্তি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উগ্র শক্তিও আসে। উগ্র শক্তি তো আমার নাগরিক সমাজ আবার চায় না। সেহেতু ওই উগ্র শক্তি নাগরিক সমাজ চায় না দেখে তার জন্যও তার এখানে আরো...

জিল্লুর রহমান: জোরালো।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আরো সচেতন থাকতে হয়। এই সচেতনতাটা আমার থাকবে। কিন্তু জিল্লুর, আমি একটা কথা কিছুদিন আগে আপনার অনুষ্ঠানে বলেছিলাম আপনার অংশগ্রহণকারীরা খুব বেশি আমাকে দেয়নি। দেখুন এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, পনেরো বছরের মতো দেশ শাসন করেছেন। নেত্রী করেছেন এবং আগামী দিনে যদি উনি ক্ষমতায় আসেন এইটা চিন্তা করার একটা সময়। যে আমি দেশের, পৃথিবীর জন্য , বাংলাদেশের জন্য আমি কী ঐতিহ্য বা কী উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই। পদ্মা ব্রিজ তো হলো, টানেল হলো, স্যাটেলাইট হলো। মানে এগুলোর পরে এগুলো নিয়ে মনে থাকবে? নাকি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আমার যেখানে সামাজিক সুরক্ষার জায়গাটা এত কমে গেছে। আপনি দেখেন একটা হিংসা পরায়ণ জাতি তৈরি করছি। আমরা একজনের প্রতি একজনের আগ্রাসনমূলক এইসব যে আচরণ করছি কীরকমভাবে। এইটা কোনো জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্যে দীর্ঘ মেয়াদে কোনো সময়েই বড় শক্তি না। একসময় আমরা বলতাম যে আমরা এখানে সমধর্মী জাতি, এখানে এক ভাষা-ভাষী জাতি। শক্তির জায়গা ছিল। এখন দেখুন কীরকম বিভাজিত জাতি আমরা তৈরি করছি। এই বিভাজিত জাতি নিয়ে আমরা কীভাবে আগাবো? আমরা যদি একের সাথে অন্যের সন্দেহের সম্পর্কের ভিতরে দাঁড়াই, পৃথিবীতে তত্ত্ব বলেছে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক পুঁজি যতখানি না দরকার করে তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার করে আমাজিক পুঁজি। সামাজিক পুঁজি এই একতাবোধ, ঐক্যবদ্ধ চিন্তা। এবং সামনের দিনে এগোনোর জন্য আমাদের একটা অভিন্ন প্রয়াস বা আমাদের অভিন্ন রূপকল্প বা অভিন্ন চিন্তা। এইটা নেতৃত্বকে আনতে হবে। যে নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ তার উপরে দায় বর্তায় সবচেয়ে বেশি। এইটিই হলো ২০২৪ এর প্রত্যাশা যে আমাদের ভূমিকা আমরা পালন করবো, যুব সমাজের ভূমিকা পালন করতে হবে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা পালন করতে হবে, রাজনীতিবিদদের ভূমিকাও রাজনীতিবিদকে পালন করতে হবে। রাজনীতিবিদ যদি ভূমিকা পালন না করে ঠিকমতো সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে তাহলে অন্য ভূমিকাগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমরা বাধাগ্রস্ত হই। তাই ২০২৩ এর থেকে ’২৪ এ যখন যাই আমার মানে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। সেটা হলো যে উনি বলেন ঈশ্বর তুমি যাকে দাও দুঃখ, তাকে বহিবারে দাও শকতি বলে না? তো আমার জাতির যেন সেই শক্তিটা থাকে। এইগুলোকে অতিক্রম করতে পারে। শক্তি, সাহস, উদ্যম এবং উপলব্ধি নিয়ে যেন ২০২৪ এ ঢুকি। ৭ তারিখ আসবে যাবে। তারপরেও অনেক তারিখ থাকবে। ওই তারিখের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

জিল্লুর রহমান: অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য। দর্শক, আমাদের সাথে কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আর নতুন বছরের শুরুতেই অতীত

নিয়ে মূল্যায়ন করলেন, সামনের দিনগুলোর কথা বললেন এবং ৭ই জানুয়ারি যেহেতু জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং যদিও তিনি বলছেন এর ফলাফল নির্ধারিত, ভবিষ্যতটা অনিশ্চিত। এবং ৭ তারিখ যাবে আসবে এরকম কিন্তু আরো অনেক দিন আসবে সেই দিনগুলো হয়তো বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেখানেই কিছু শঙ্কার কথাও তিনি বলেছেন যে প্রথাগত রাজনীতি যদি হোঁচট খায় এবং যেটি ইতোমধ্যেই হোঁচট খেতে শুরু করেছে সেখানে আশঙ্কাগুলো কী। যেটা আমরা অনেকেই হয়তো চাই নাই। এবং সেখানে নাগরিক সমাজের, গণমাধ্যমের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি খানিকটা হতাশাও প্রকাশ করলেন তরুণদের ভূমিকা দেখে এবং তরুণদের আরো জোরালো ভূমিকা এখানে প্রত্যাশা তিনি করেন। সব মিলিয়ে নতুন শক্তি, নতুন উদ্যমে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াক এটি আমাদের সকলের প্রত্যাশা। যদিও একেক জনের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর অর্থ একেক রকম। বাট আমরা অপেক্ষা করি সামনের দিনগুলোর জন্যে। এবং সবারই প্রত্যাশা যে নতুন বছরটা আমাদের জন্য আরো কল্যাণকর এবং স্বস্তিকর ও সুখকর হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা। আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

চ্যানেল আই
১ জানুয়ারি ২০২৪

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন
ভোটগ্রহণ শেষ, গণনা শুরু

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অনন্যা দত্ত: এখন আমাদের আরও বিস্তারিত জানাতে ঢাকা থেকে যুক্ত হয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের একজন সম্মাননীয় ফেলো, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগতম ড. ভট্টাচার্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুভ সন্ধ্যা!

অনন্যা দত্ত: আপনি কি মনে করেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচন বয়কট বাংলাদেশের মানুষের জন্য উপকারের বদলে ক্ষতির কারণ হচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি আজকের দিনটি ঘটনাবহুল হলেও সৌভাগ্যবশত আমাদের অনেকের আশঙ্কার চেয়ে কম সহিংসতা দেখা গিয়েছে। তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি বলতে, দিন শেষে আজকের এই বিশেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, দেশের মূল সমস্যা ও ভোগান্তির অন্তর্নিহিত কারণের সমাধান করতে পারেনি। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক মীমাংসা প্রয়োজন যা বিশেষত সংস্কার ও অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে তুলবে এবং একইসাথে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে যাবে। সুতরাং, আপনি দেখবেন যে ভোটের হার এবং ভোটারের উপস্থিতির হার আজ সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত বিষয়গুলোর একটি হিসেবে যোগ হবে। কারণ সরকার ভোটার উপস্থিতির হারকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের যৌক্তিকতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু আপনিই মাত্র উল্লেখ করলেন যে ৩ টায় ভোটার উপস্থিতির হার ২৭.৫ শতাংশ এর মত ছিল। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তা

লাফিয়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। আমি মনে করি এই বিষয়টা অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, আপনি যদি দেখেন, ভোটার উপস্থিতি ছাড়াও ভোট জালিয়াতি, প্রার্থীদের প্রত্যাহার, বা নির্বাচনের মাঝে প্রার্থীদের হতাশার বিষয় রয়েছে। এমনকি রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাগ্রস্ত এলাকার মত জায়গায়ও অন্তত দুটি কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে একটি ভোটও পড়েনি। সুতরাং, আমি মনে করি যে সমস্যাটি দেশের ওপর প্রভাব ফেলছে, তা এখনও সমাধান হয়নি। আপনি তো জানেন, দেশ এখন নির্বাচনী দ্বন্দ্বের সম্মুখীন, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এখন আমরা আরেকটি দল দেখতে যাচ্ছি যারা এই পুরো নির্বাচনী কার্যক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে যেখানে শাসক দল এবং তাদের জোটের পরাজিত প্রার্থীও থাকবে।

অনন্যা দত্ত: আপনি বলেছেন ঠিক ৩টা নাগাদ ভোটার উপস্থিতির হার ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ, যা ৪টা নাগাদ প্রায় ৪০ শতাংশ এ এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশাল পরিবর্তন হয়েছে, যা হয়তো কিছু বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। এটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার মতে, আপনি যদি ইতিহাস ঘেটে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে ৪০ শতাংশ হারের কথা নির্বাচনের আগে থেকেই আলোচনা হচ্ছিল। নির্বাচনের আগেও ৪০ শতাংশ এর কথা ছিল। এটা ছিল নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্যদের বলা টার্গেট নম্বরগুলোর মধ্যে একটি। নির্বাচনপন্থী, শাসক দল সবসময়ই ৪০ শতাংশ উপস্থিতি হারকে একটি যুক্তিসঙ্গত সংখ্যার হিসেবে বিবেচনা করে গেছে, বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে।

যদিও এটা ২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সর্বশেষ সুষ্ঠু নির্বাচনের অর্ধেকেরও কম। এমনকি সংবাদ মোতাবেক ২০১৮ সালেও এটা ৮০ শতাংশ এর বেশি ছিল। তাহলে, আপনি দেখেন, এই হার বৈধতা বিতর্কের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যথেষ্ট কম।

অনন্যা দত্ত: জি অবশ্যই। ড. ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে সংগ্রামের মুখাপেক্ষী, এবং বিশ্ব এ সম্পর্কে অবগত। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে শেখ হাসিনা দেশের অর্থনীতি এবং এর বৃহৎ পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়ানোর কৃতিত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে, তার বিরুদ্ধে দেশকে স্বৈরাচারের দিকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। সুতরাং, একটি দৃশ্যমান উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র বিতর্ক আছে। আপনি এটা কিভাবে দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিগত এক দশকে আমরা যে অনেক উন্নতি করেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০১৫ সালে আমরা একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন

করেছি। ২০২৬ সালে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষে আগাচ্ছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ না হলেও উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সুতরাং, আমি মনে করি এটি বেশ স্পষ্ট এবং এটাও ভাবার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে যে এটি শুধুমাত্র আকাশকুসুম কল্পনা নয়। তবে চ্যালেঞ্জ হলো এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছি, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় গুরুতর চাপ সৃষ্টি করেছে। এটা প্রধানমন্ত্রীর জন্য বড় দুর্ভাগ্যের যে তাকে সম্ভবত অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল অর্থবছরের মাঝে নির্বাচনে যেতে হচ্ছে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা আমাদের বৈদেশিক দেনা, বিশেষ করে অপরিশোধিত আমদানির বিল এবং আসন্ন বৈদেশিক ঋণের সেবার দায়ভার পরিশোধ করতে পারছি না। এর সাথে টাকার মান দুর্বল হচ্ছে, যা আবার মুদ্রাস্ফীতিকে বাড়িয়ে তুলছে। সুতরাং, যদি এটি নির্বাচন প্রসঙ্গে দেখা হয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচন কি সরকারের সামনে কঠিন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক গতি সঞ্চার করতে পেরেছে? নাকি পুরোনো প্রভাবশালী এবং প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো আবার এই সম্ভাবনাগুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করবে? এ বিষয়ে আইএমএফের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে এবং আশা করি সরকার এই বিষয়টা দেখতে সক্ষম হবে।

অনন্যা দত্ত: একদম ঠিক। এটাই আশা, ডক্টর ভট্টাচার্য। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দুঃখিত, আমাদের সংলাপ সংক্ষেপে শেষ করতে হচ্ছে, তবে আপনার মূল্যবান মতামত ও ঢাকা থেকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ!

WION
৬ জানুয়ারি ২০২৪

রাজনৈতিক বিভাজন সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে

অধ্যাপক রওনক জাহান

বিশেষ সাক্ষাৎকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ডিস্টিংগুইশড ফেলো রওনক জাহান প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচন–পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র, দলগুলোর কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অবস্থা এবং রাজনীতির সামনের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এ কে এম জাকারিয়া

প্রথম আলো: সাধারণভাবে আমরা জানি যে নির্বাচন মানে প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফলাফল যেহেতু জনগণের ভোটের ওপর নির্ভর করে, তাই এ নিয়ে অনিশ্চয়তাও থাকে। কিন্তু যে নির্বাচনের ফলাফল জানা, তাকে আমরা কেমন নির্বাচন বলব? বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারি যে নির্বাচন হলো তাকে কি কোনো বিশেষ বা নতুন কোনো নামে আখ্যায়িত করা যায়?

অধ্যাপক রওনক জাহান: স্বীকৃত গণতান্ত্রিক দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের যে প্রতিযোগিতা, তা দিয়ে ৭ জানুয়ারির সংসদীয় নির্বাচনকে বিবেচনা করা যায় না। যেহেতু আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ দল বিএনপি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, তাই এই নির্বাচনে কোনো দলভিত্তিক প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমান সুযোগ পায়নি। তাদের বহু নেতা-কর্মী ছিলেন জেলে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল অসংখ্য মামলা।

অবশ্য বিরোধী দলের ওপর এর আগের বিভিন্ন শাসনামলেও আমাদের দেশে অনেক দমন–পীড়ন হয়েছে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনটির নতুনত্ব হচ্ছে এই নির্বাচনটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক

দেখানোর জন্য সরকারি দল নানা অভূতপূর্ব কলাকৌশল নিয়েছিল, যা আমরা আগে দেখিনি। আওয়ামী লীগেরই প্রার্থী যাঁরা দলের মনোনয়ন পাননি, তাঁদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হলো। জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল সরকারি দল সমর্থিত হিসেবে।

এর আগে ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে সামরিক শাসকদের আমলে আমরা অনেক ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং দেখেছি যেখানে কে জিতবে, কে হারবে, কে বিরোধী দল হবে, তা সামরিক শাসকেরাই ঠিক করে দিত; গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দল গঠন ও ভাঙনে সক্রিয় ছিল। কিন্তু তখন এই সব ইঞ্জিনিয়ারিং এত প্রকাশ্যে হয়নি।

এবার সব দর-কষাকষি, সব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কলাকৌশল বেশ প্রকাশ্যেই হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল, বিশেষ করে কোন দল ক্ষমতায় যাবে, তা নিয়ে কোনো সংশয়ই ছিল না। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাঁরা সবাই নিজেদের আওয়ামী লীগ অনুসারী বা সমর্থিত বলে প্রচার করেছেন। নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল সাজানো।

এই নির্বাচনের কোনো বিশেষ নাম আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি যে গণতান্ত্রিক ছিল না, তা স্পষ্ট বলে দিয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণও যে নির্বাচনটিকে গণতান্ত্রিক মনে করেছে, তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।

প্রথম আলো: ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সংসদ গঠিত হয়েছে, তা কার্যত একদলীয়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া প্রশ্নবিদ্ধ ভোটের হার বিবেচনায় নিলেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই নির্বাচনে ভোট দেয়নি। ওয়েস্টমিনস্টার বা সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি, তা কতটুকু টিকে থাকল?

অধ্যাপক রওনক জাহান: যদি সর্বগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দল বারবার নির্বাচিত প্রধান দল হয়ে সরকার গঠন করে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। ভারতে কংগ্রেস দল ১৯৪৭ সালের পর একটানা ২০ বছর পরপর নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করেছিল। আজ পর্যন্ত কংগ্রেস ১০ বার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। ভারতে এসব নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা হলো পরপর তিনটি নির্বাচন— ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সর্বজন গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এই নির্বাচনগুলোর প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের দেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে সবার আগে আমাদের নির্বাচনব্যবস্থার ওপর সব দলের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ সব দেশেই নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে, কটূক্তিও হচ্ছে। কিন্তু সবাই নির্বাচনব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখছে। নির্বাচনে

অংশ নিচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিচ্ছে। আমরাই একমাত্র দেশ, যারা স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলাম না।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফলে সব দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল। পরপর তিনটি নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। যে দল হেরেছিল, তারা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও শেষ পর্যন্ত ফলাফল মেনে নিয়েছিল। প্রত্যেক বার ক্ষমতার পালাবদল হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ২০১১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দেওয়ার পর আর কোনো সর্বদল গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থা আমরা উদ্ভাবন করতে পারিনি। এর পরের সব নির্বাচনই ক্ষমতাসীন দলের একচেটিয়া দখলে ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় এবং নির্বাচনের ফল আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের জনসাধারণ ক্রমাগত ভোট দিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এবারের ভোটের হার এখনো প্রশ্নবিদ্ধ; তবে সরকারি হিসাব মেনে নিলেও দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ ভোট দেয়নি। যত দিন পর্যন্ত আমরা একটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য নির্বাচন না করতে পারব, তত দিন পর্যন্ত আমরা গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারব না; আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাব না।

প্রথম আলো: ফলাফল জানা থাকলেও ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সরকার ও মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। এই সরকারের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ আছে, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সামনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ কী? অথবা আদৌ কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি?

অধ্যাপক রওনক জাহান: পরপর তিনটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার পর সরকার নিশ্চয়ই ভাবতে পারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার, দলীয় শক্তি প্রয়োগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কলাকৌশল দিয়ে তারা প্রতিপক্ষের সব চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতেও মোকাবেলা করতে পারবে। কিন্তু বহুদিন ধরে আমাদের কয়েকটি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যার সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে। সমাজ ও রাজনীতিতে বিভাজন বেড়ে চলেছে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সরকারের নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। এসব সমস্যার সমাধান সরকারের সামনে বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

এই নির্বাচন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন বয়ান এবং জনসাধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো মিল নেই। সরকার বলছে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে; গণতন্ত্র সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু এই বয়ান কি জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে? বরং সরকারি বয়ান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে তফাতটা দেশে এখন একটা বড় আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে, যা সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে। সরকারের সামনে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের গণতন্ত্রের অঙ্গীকারের প্রতি জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা। আর আস্থা ফিরিয়ে

আনতে হলে প্রথমেই নির্বাচন নিয়ে সব বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সর্বদল গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। গত ১৫ বছরে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি। দেশের জনগণ একটি সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। নির্বাচনগুলো বিতর্কিত হওয়ায় বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে যত দিন বিতর্ক চলবে, তত দিন দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে না।

এই সরকারের সামনে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কী উপায়ে নিজেদের কাজের দুর্বলতা বা ঘাটতি ভবিষ্যতে তারা চিহ্নিত করবে? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত সংসদের বিরোধী দল, মিডিয়া কিংবা নাগরিক সমাজ সরকারের ভুলভ্রান্তি নিয়ে সমালোচনা করে; ভিন্ন নীতি কিংবা পন্থা নিয়ে আলোচনা করে। প্রচার করে। কিন্তু বহু বছর ধরে আমাদের সংসদে বিরোধী দল কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। এবারের সংসদে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই। সবাই সরকারের অনুসারী কিংবা সমর্থক। সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের অবর্তমানে আমাদের সংবাদমাধ্যম, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ এত দিন সরকারের কাজের পর্যালোচনা, সমালোচনা করে এসেছে। সরকারের জবাবদিহি আদায়ের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্রমেই আমাদের সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজও সরকারের বিভিন্ন আইন ও নানাবিধ চাপের মুখে পড়ে শঙ্কিত। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বা মিডিয়াতে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে সরকার এসব প্রতিবেদনের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধান না করে বরং প্রতিবেদন বা সংবাদগুলোকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিতে অভ্যস্ত। যদি নির্ভয়ে সরকারের কাজ নিয়ে কোনো আলোচনা, সমালোচনা করার স্থান বা পরিবেশ না থাকে, তাহলে সরকারের পক্ষে তো কোনো ভিন্নমত শোনার সুযোগ থাকবে না। শুধু শ্রুতিবাক্য বা একপক্ষীয় সংবাদ ও আলোচনার ওপর নির্ভর করে নীতি প্রণয়ন বা প্রয়োগ করলে শেষ পর্যন্ত তা সরকারের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। তাই সরকারের আরও একটি কাজ হবে বাক্‌স্বাধীনতা পরিপন্থী বিভিন্ন আইন বাতিল করে মুক্ত আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সরকারের সামনে তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো আমাদের রাজনৈতিক বিভাজন একটি সহনীয় পর্যায়ে রাখা, যাতে সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিভাজনের দুদিকে থাকা ব্যক্তিরা থাকতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করতে পারেন। রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমাদের রাজনীতিবিদেরা প্রায়ই বলে থাকেন, রাজনীতি এখন আর তাঁদের হাতে নেই। রাজনীতি চলে গেছে ব্যবসায়ী এবং আমলাতন্ত্রের হাতে। রাজনীতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আবার হাতে নিতে হবে রাজনীতিবিদদের।

প্রথম আলো: সরকার নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক দেখাতে গিয়ে যে কৌশলে নির্বাচন করল, মানে দলের লোকজনকেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দিল, এটা কি দলের ঐক্য ও সংহতির জন্য ভালো হলো? এই নির্বাচন দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ওপর কী প্রভাব ফেলল বলে মনে করেন?

অধ্যাপক রওনক জাহান: আমরা অনেক দিন ধরেই লক্ষ করছিলাম উপদলীয় কোন্দল ও সহিংসতা আওয়ামী লীগের একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাটা বিএনপির মধ্যেও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে দলের ভেতর নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। সাধারণত দলের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হয় কারা নেতা হবেন বা দলের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হবেন। আমাদের দেশে এই প্রথা প্রচলিত নেই। দলের ওপরমহল থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় কারা দলের বিভিন্ন পদে থাকবেন। এবার ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দলের অন্য নেতাদেরও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু এখনো দেখছি যাঁরা ভোটে হেরেছেন, তাঁরা ভোটের ফল মানছেন না; বলছেন বিভিন্ন কারচুপি বা শক্তি প্রদর্শন করে তাঁদের হারানো হয়েছে। আসলে আওয়ামী লীগের ঐক্য ও সংহতি বহু বছর ধরেই নির্ভর করছে দলের প্রধানের ওপর। সব নেতা-কর্মী একমাত্র তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। অন্য কারও সিদ্ধান্ত বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে উপদলীয় কোন্দল মেটানো যায়।

দলের মনোনীত এবং দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগটি যদিও ভোটের অংশ বাড়ানোর বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ সৃষ্টি করার কৌশল হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু এটি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কিছু দুর্বলতাকেও প্রকাশ করছে। প্রথমত, ৫৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী দলের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে দলটির নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিরা তৃণমূলে দলটির কোনো নেতা বা নেত্রী বেশি জনপ্রিয়, তা প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসনে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সহিংসতাকে যে দলীয় শৃঙ্খলার মধ্যে আনা কঠিন হয়ে পড়েছে, তা এই নির্বাচন আবার দৃশ্যমান করল। আমি জানি না আওয়ামী লীগ দলের প্রধান এরপর দলের ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সব পদের জন্য এভাবে উন্মুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা চালু করবেন কি না। দলের ভেতরে নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হবে। যদি তিনি তা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই বিপুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দলপ্রধানের মূল চ্যালেঞ্জ হবে এমন একটি নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রচলন করা, যার মাধ্যমে অন্তর্দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। এখন পর্যন্ত সব সিদ্ধান্ত বা মীমাংসাই থাকছে ব্যক্তিনির্ভর।

প্রথম আলো: নির্বাচনের আগে দেশের রাজনীতি এক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। নির্বাচনের পর এখন ভিন্ন পরিস্থিতি। এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক বা ব্যবধান কতটুকু এবং তা কী কী?

অধ্যাপক রওনক জাহান: নির্বাচনের আগে যখন বিএনপি বিভিন্ন জনসমাবেশ করছিল, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল, ভিসা নীতি, শ্রমনীতি নিয়ে কথা বলছিল, তখন মনে হচ্ছিল সরকারের ওপর এই নির্বাচন নিয়ে কিছু চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, হয়তোবা সরকার সব দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য একটি উদ্যোগ নেবে। কিন্তু সরকার সব চাপ উপেক্ষা করে তাদের ইচ্ছানুযায়ী একটি নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। আপাতত দুই পক্ষের এই দ্বন্দ্বে সরকার বিজয়ী হয়েছে।

তবে নির্বাচনটি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখলেও নির্বাচন নিয়ে দেশে–বিদেশে বিতর্ক শেষ হয়নি। সরকারের সামনে সর্বদল গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থার উদ্ভাবন করার চ্যালেঞ্জটা এখনো রয়ে গেছে।

প্রথম আলো: দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি সামনে কী করতে পারে? তারা কি আরও শক্তিহীন হয়ে পড়তে পারে? বিএনপি দাবি করছে তাদের নির্বাচন বর্জনের ডাকে জনগণ সাড়া দিয়েছে। দলটি এখন কী করতে পারে?

অধ্যাপক রওনক জাহান: হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে জেলে নেওয়ার পর এবং একটি গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ায় আপাতদৃষ্টে বিএনপিকে শক্তিহীন মনে হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে প্রায় ১৮ বছর থাকার পরও বিএনপি যে এখনো অনেক নেতা-কর্মী, সমর্থক ধরে রাখতে পেরেছে, তাতে তাদের দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। নির্বাচনের আগে যখন বিএনপি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করছিল, তখন তারা প্রচুর জনসমাগম করতে পারছিল। অবশ্য মিটিং–মিছিলের জনসমাগম দিয়ে দেশে কত জনসমর্থন আছে, তা বোঝা যায় না। সব দলকে সমান সুযোগ দিয়ে নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন করতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আসলে দেশে কোন দলের কত সমর্থক আছে। জনসমর্থনও এক নির্বাচন থেকে অন্য নির্বাচনে পরিবর্তিত হতে পারে।

বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ডাকে যে জনগণ বিপুল সাড়া দিয়েছে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। যেহেতু নির্বাচনের ফল আগেই জানা ছিল, তাই বহু লোকই ভোট দিতে যেতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। বিএনপির সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতার বাইরে থেকে এবং সরকারের অনেক দমন-পীড়নের শিকার হয়ে নেতা-কর্মীদের মনোবল উজ্জীবিত রাখা, আন্দোলন–সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বিএনপির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপিকে সরকার ২০১৪ সালের পর থেকেই একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যা দিয়ে আসছিল। গত বছর বেশ কয়েক মাস ধরে বিএনপি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও অন্যান্য প্রতিবাদের কর্মসূচি পালন করার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল যে তারা আসলে একটি সন্ত্রাসী দল নয়। কিন্তু ২৮ অক্টোবরের সহিংসতা এবং তার পরবর্তী সময়ের বাস, ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার আবার প্রচার করছে যে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল। বিএনপি অবশ্য এর প্রতিবাদ করে বলেছে যে দলটি এসব সহিংসতার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। এখন বিএনপির প্রথম কাজ হবে তথ্য–উপাত্ত দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যা ব্যবহার করে তারা জনসমক্ষে প্রচার করতে পারবে যে ২৮ অক্টোবর এবং তার পরবর্তী সব সহিংসতার ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই।

বিএনপির অন্য একটি কাজ হবে তারা ক্ষমতায় গেলে যে গণতান্ত্রিক ব্যবহার করবে এবং গণতন্ত্রের মান উন্নয়ন করবে, সে ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা। বিএনপি এত দিন একটি ইস্যু—নির্বাচন ইস্যু নিয়েই গণসংযোগ করছিল। তারা ক্ষমতাসীন দলকে স্বৈরাচারী

আখ্যা দিয়ে বলছিল বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ১৯৯০–এর পর দুবার বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। তখন তারা গণতান্ত্রিক আচরণ করেনি। তারাও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দমন–পীড়ন করেছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার ঘটনা বিএনপি শাসনামলেই ঘটেছে, যেখানে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নিহত ও আহত হয়েছেন। বিএনপিও নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারাও সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে। এখন যদি বিএনপি জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে চায়, তাহলে দলটিকে প্রথমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে যে তারা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে। শুধু সরকার পতনের নেতিবাচক অ্যাজেন্ডা নিয়ে আন্দোলন করলেই হবে না। গণতন্ত্র, সুশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এসব বিষয়ে কিছু ইতিবাচক অ্যাজেন্ডা নিয়ে বিএনপিকে জনসাধারণের কাছে যেতে হবে। সবার ওপর নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, সমন্বয়হীনতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে দলটিকে আরও সুসংহত করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করতে হবে।

প্রথম আলো: সরকার বিএনপির ওপর নতুন করে কোনো দমনমূলক পদক্ষেপ নেবে বলে মনে করেন? বিএনপি নিষিদ্ধ করা হতে পারে, এমন কথা আলোচনায় আছে। আপনি কি মনে করেন সরকার সেই পথ ধরবে? দেশের রাজনীতিতে এর ফল কী হতে পারে।

অধ্যাপক রওনক জাহান: সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতা বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যা দিলেও তাদের হয়তো নিষিদ্ধ করবে না। বিএনপিকে সরকার দুর্বল করে রাখতে চাইবে। তাদের নিষিদ্ধ করলে দেশ-বিদেশে এ নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হবে, তাতে তো সরকারের কোনো লাভ হবে না। সরকার তো জামায়াতে ইসলামীকেও নিষিদ্ধ করেনি। তাদের কিছুটা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

প্রথম আলো: বিএনপি ছাড়াও যে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদের বাইরের আছে এবং নির্বাচন বর্জন করেছে, সেই দলগুলোর ভবিষ্যৎ কী?

অধ্যাপক রওনক জাহান: আমাদের দেশের ছোট দলগুলো যারা নির্বাচন বর্জন করেছে, তারা তেমন কোনো জনসমর্থন অর্জন করতে পারছে না। ১৯৯০–এর পর জনসাধারণ নির্বাচনী রাজনীতিতে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। তারা জানে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হলে প্রচুর টাকাপয়সা, কর্মীবাহিনী ও পেশিশক্তির প্রয়োজন। ছোট দলগুলো যাদের টাকাপয়সা, কর্মীবাহিনী বা পেশিশক্তি নেই, তারা নির্বাচনী রাজনীতি বা গণ-আন্দোলনের রাজনীতিতে জনসমর্থন আদায় করতে পারছে না। এখানে অবশ্য ইসলামি আদর্শভিত্তিক দলগুলোর কতটা জনসমর্থন আছে, তা আমি বলতে পারব না। বিভিন্ন ইস্যুতে তারা প্রচুর জনসমাগম করতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে গণতন্ত্র সংকুচিত হলে এবং নির্বাচনী রাজনীতি সবার জন্য উন্মুক্ত না হলে শেষ পর্যন্ত ইসলামি আদর্শভিত্তিক দলগুলোর প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

প্রথম আলো: পরিস্থিতি উত্তরণে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আসার আহ্বান বিভিন্ন জনের মুখ থেকে শোনা গেছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কার্যত একটি একদলীয় সরকার গঠনের পর সরকার কি এ ধরনের কোনো বন্দোবস্তের উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হবে? রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আশা কতটা বাস্তবসম্মত?

অধ্যাপক রওনক জাহান: সরকার হয়তো ভাবছে যে আপাতত তারা রাজনৈতিক খেলায় আবার জিতেছে। বিএনপির তেমন শক্তি নেই যে তারা একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটাবে। দেশের বিভিন্ন শক্তিশালী গ্রুপ বা জনসাধারণও তেমন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে না। তবে নিজেদের উদ্যোগে সরকার যদি বিএনপি বা বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের দেশের সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেয়, তাহলে তারা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক রওনক জাহান: আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রথম আলো
২ জানুয়ারি ২০২৪

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা যাবে না

ড. ফাহমিদা খাতুন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশে নতুন যে সরকার এসেছে তার জন্য বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিগত বছরগুলোয় মূল্যস্ফীতির ফলে দেশের অর্থনীতিতে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণখেলাপিদের থেকে ঋণ আদায় করা, ব্যাংকিং খাতে যেসব অনিয়ম চলছে তা বন্ধে কাজ করা নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। নতুন বছরে নতুন সরকারের সামনে কী কী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, মধ্যম আয়ের দেশ হতে গেলে কী করণীয়—এমনতর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম

নতুন সরকারের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশে নতুন যে সরকার এসেছে তার জন্য বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিগত বছরগুলোয় মূল্যস্ফীতির ফলে দেশের অর্থনীতিতে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণখেলাপিদের থেকে ঋণ আদায় করা, ব্যাংকিং খাতে যেসব অনিয়ম চলছে তা বন্ধে কাজ করা নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতি আমদানিনির্ভর তাই আমাদের অবশ্যই

রিজার্ভ বাড়াতে জোর দিতে হবে। বর্তমানে আমরা আমদানি সংকুচিত করে রিজার্ভ ধরে রাখার চেষ্টা করছি, তবে এটা সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কারণ দেশে যদি আমদানি কমে যায় তাহলে উৎপাদনও কমবে। পণ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের যে কাঁচামাল প্রয়োজন সেটা যদি আমরা আমদানি করতে না পারি তাহলে দেশে উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেবে, ফলে আমাদের রফতানিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমদানি সংকোচনের ফলে রফতানি ছাড়াও দেশের অন্যান্য যে খাত রয়েছে যেমন কর্মসংস্থান, বৈদেশিক আয়েও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমদানি সংকোচন নীতির কিছু সুফল পেলেও দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা করলে এর প্রভাব নেতিবাচক। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সংকুচিত হবে। তাই আমি মনে করি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এছাড়া ডলার বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে মিল রেখে নির্ধারণ করতে হবে। আমি মনে করি, এসব বিষয় নতুন সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতির ওপর কেমন অভিঘাত পড়ছে বলে মনে হয়?

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একটি দেশের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতিবাচক সূচক হিসেবে কাজ করে। যখন একটি দেশ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে তখন বিনিয়োগকারীরা সেই দেশকে পর্যবেক্ষণে রাখে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীরা স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের বিষয়েও নজরদারি করে যে তারা কোথায় বিনিয়োগ করছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা যদি অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী না হয় তাহলে দেশের বাইরের বিনিয়োগ সেভাবে আসবে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশে এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

আমরা উন্নয়নশীল দেশে পা রেখেছি, মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই। সে লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের কী কী করা দরকার?

এখন দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমেই আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আমাদের বিশেষ সেবা চালু করতে হবে। যেমন যারা দেশে বিনিয়োগ করতে আসবে তাদের দাপ্তরিক কাজগুলো যেন সহজে সম্পন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখা, এ খাতে যেসব নীতি রয়েছে সেগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পরিষেবা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। তবে আমার কাছে মনে হয় এসব বিষয়ে ঘাটতির ফলেই দেশে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ হচ্ছে না। কারণ আমাদের এখানে এসব সেবা পেতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফলে এখানে বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে আমরা দেশে বিনিয়োগ হারাচ্ছি।

এছাড়া আমাদের প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতাও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিশেষ করে আমাদের এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও দুর্বল। এসব কারণে আমরা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারছি না বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সংকটের ফলে আমরা কিন্তু অনেক ব্যবসায়ীর পেমেন্ট প্রদান করতে পারিনি, এ বিষয়ও এ খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে দেশের এক প্রকার অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। যার ফলে সামগ্রিকভাবে আমরা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারছি না।

দেশে যেসব বিদেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন ব্যাংক, বীমা, সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসহ দেশে যেসব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমরা এসব প্রতিষ্ঠানের পেমেন্ট সঠিকভাবে পরিশোধ করতে পারছি কিনা, এসব বিষয় কিন্তু তারা পর্যবেক্ষণ করে। মূলত এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের চিন্তা করে। এ খাতে উন্নতির জন্য আমাদের অবশ্যই এসব বিষয় মাথায় রেখে পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

তৈরি পোশাক ব্যতীত আর কোন কোন খাত বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সম্ভাবনাময়?

তৈরি পোশাকের পাশাপাশি সড়ক ও সেতু নির্মাণ বৈদেশিক বিনিয়োগের বড় একটি খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতেও বৈদেশিক বিনিয়োগের বড় সুযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনেও বৈদেশিক বিনিয়োগ বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত যে খাতে আমরা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারিনি সেটা হচ্ছে আমাদের শেয়ারবাজার। এক্ষেত্রে আমরা যদি দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারী করতে পারি তাহলে আমাদের আর্থিক খাতে একটি উল্লম্ফন সৃষ্টি হবে বলে আমার ধারণা।

এখন পর্যন্ত আমরা যেসব খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ পেয়েছি এর বাইরেও দেশের স্বাস্থ্য খাতে সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা খাতেও এ বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে পারে। কেননা জনসংখ্যার দিক থেকে আমাদের বৃহৎ একটি বাজার রয়েছে। এখানে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো খাতগুলোয় বিশেষ উন্নতির সুযোগ রয়েছে। যেমন এক্ষেত্রে আমরা বুয়েটের মতো বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারি। বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এখানকার প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে আমরা আরো উন্নত করতে পারি। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাইরের বিনিয়োগ হলে দেশে বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। আমি মনে করি এসব ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ হলে দেশের সমুদয় অর্থনীতি সচল গতি ফিরে পাবে।

বাংলাদেশে অর্থনীতির আকার যেভাবে বড় হয়েছে, সেভাবে আমরা পুঁজিবাজার বড় করতে পারিনি। এর পেছনে কারণ কী?

সত্যি বলতে দেশে এখনো আমরা সুশাসনের অভাব বোধ করছি। আমরা দেখছি দেশের পুঁজিবাজার গুটি কয়েক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে। তারাই পুঁজিবাজারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এই গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠান বাজারে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং তারাই এর সুবিধা পাচ্ছে। অন্যদিকে বাজারে এমন একচেটিয়া প্রভাবের ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তারা অল্পতেই তাদের পুঁজি হারাচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি বাজারে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না যায়, তাহলে পুঁজিবাজার বড় করা সম্ভব না।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা। আমরা যদি শিক্ষা খাতের কথা বলি সেখানে দেখবেন এ খাতে সরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে জিডিপির ২ শতাংশের কম। বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ যদি হয় ২ শতাংশের কম হয় তাহলে আপনি কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করবেন? জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর তথ্যমতে, একটি উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা খাতে অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকতে হবে। সে জায়গা থেকে চিন্তা করলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। উন্নত দেশগুলোয় কিন্তু শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের বরাদ্দ আরো বেশি।

অন্যদিকে যে ২ শতাংশ বরাদ্দ হচ্ছে তাও সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। এ খাতের বেশির ভাগ ব্যয় চলে যাচ্ছে অবকাঠামো নির্মাণে। দেখা যাচ্ছে যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণেই শিক্ষা খাতের বড় একটা অংশ ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষার মূল যে বিষয়গুলোয়—কারিকুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ল্যাবরেটরিসহ আরো অন্যান্য বিষয়—তেমন ব্যয় নেই। এদিকে আমাদের নজর দেয়া জরুরি বলে মনে করি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে একদমই অবহেলিত দিক হচ্ছে গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনে। দেখা যাচ্ছে যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যয় একদমই কম। শিক্ষাকে কীভাবে আরো আধুনিক করা যায়, সে বিষয়ে নজর না দিলে আমাদের দেশে মানবসম্পদ তৈরি হবে বলে আমি মনে করি না। গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের আরো অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। আমরা ভৌত অবকাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছি, কিন্তু মানবসম্পদের ওপরও জোর দিতে হবে। মানবসম্পদ যদি আমাদের শক্তি না হয়ে বোঝা হয়ে যায় তাহলে আমরা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে এগোতে পারব না।

আমাদের রফতানি পণ্য ও রফতানি গন্তব্য সীমিত। সিংহভাগই যায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে। চীন-ভারতসহ অন্যান্য বৃহৎ বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন?

দুটো দেশই কিন্তু উন্নয়নশীল। আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটো দেশে গিয়েছি। আমরা তো স্বল্পোন্নত দেশ। ফলে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোয়ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাই। আমরা কিছু পণ্য রফতানি করি। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো চীন নিজেই তো পোশাক তৈরি করে, রফতানি করে। এখন আমাদের দেখতে হবে চীন কী কী রফতানি করে না। একই কথা ভারতের ক্ষেত্রেও। মূল বিষয় হচ্ছে বাণিজ্য কখন হয়? আপনার কোনো জিনিস আছে আর আমার কোনটা নেই। আবার আমার কোন জিনিস আছে যেটা আপনার নেই। এক্ষেত্রে আমি আপনার কাছ থেকে কিনব আর আপনি আমার কাছ থেকে কিনবেন। একই জিনিস থাকলে তো আর কেউ কিনবে না। তাই বাজার খুঁজে বের করতে পারলে পণ্যপ্রবাহ অটোমেটিকই চলবে। যেমন ইউরোপীয় বাজার আমাদের ওপর নির্ভরশীল। আমরা প্রকৃত দামে মানসম্পন্ন পণ্য তাদের কাছে সরবরাহ করতে পারছি। প্রতিযোগিতামূলক দামে দিতে পারছি। চীন-ভারত জনবহুল দেশ। তাই শুধু পোশাক নয়, আরো কী কী পণ্য বা সেবা আছে যা আমরা রফতানি করতে পারি তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে খুবই জোর দেয় এবং একের পর এক অবকাঠামো উন্নয়নও করছে। কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বা প্রয়াস কি যথেষ্ট বলে মনে হয় আপনার কাছে?

আমার কাছে মনে হয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ দরকার। সেটা দেশীয় বিনিয়োগ হোক আর বিদেশি। বড় বড় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তো অবশ্যই বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু বিনিয়োগ কখন আসে একটি দেশে? তারা কেবল কাঠামো বানাতেই আসে না। এখানে পারিপার্শ্বিক বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শারীরিক অবকাঠামোর পাশাপাশি মানবসম্পদও গুরুত্ব বহন করে। কেননা মানবসম্পদও একধরনের সফট অবকাঠামো। মানবসম্পদের দক্ষতা একটি অন্যতম ক্রাইটেরিয়া বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য। কারণ তারা বিনিয়োগ এবং এক্সপার্ট নিয়ে আসে কিন্তু সব মানবসম্পদ তো নিয়ে আসতে পারে না। আমাদের দেশের জনগণকে দিয়েই কাজটা করাতে হয়। সুতরাং বিনিয়োগ যেই করুক না কেন, প্রডাক্টিভিটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রডাক্টিভিটি যদি ভালো না হয় তখন সেটা কস্ট ইফেক্টিভ হয় না। আর প্রডাক্টিভিটি তখনই ভালো হবে যখন মানুষের দক্ষতা থাকবে। আবার বিনিয়োগের জন্য প্রযুক্তি আছে কিনা, রাজনৈতিক জটিলতা আছে কিনা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কতখানি আছে, দুর্নীতি আছে কিনা, এখনো দাঙ্গা হয় কিনা এসব বিষয়ও জড়িত। এর পাশাপাশি মানবসম্পদ জড়িত। এখন মানবসম্পদের জন্য আমাদের যে কিছু কিছু সরকারি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আছে, স্থানীয়দের মতে যারা এসব সেন্টার থেকে বের হয় তাদের কোথাও নিয়োগ দেয়া যায় না। কারণ তাদের দক্ষতা প্রয়োজনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় না। সুতরাং ভোকেশনাল সেন্টারগুলো শুধু তৈরি করে রাখলেই হবে না। সেখানে কী পাঠদান

করা হচ্ছে, কারা দিচ্ছে এগুলোর একসঙ্গে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ভবিষ্যতে এ মানবসম্পদের দক্ষতা না বাড়ালে হবে না। কারণ ভবিষ্যতে আমরা যখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে যাব, তখন খুব বেশি জনসংখ্যার প্রয়োজন পড়বে না কোনো কোনো কাজে। রিপিটেড কাজগুলো অলরেডি এআই করে দিচ্ছে। এআই, রোবোটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের জায়গাগুলো নিয়ে নিচ্ছে। যেসব মানুষ ওই কাজগুলো থেকে চলে যাবে, ঝরে যাবে, তাদের নিয়ে আমরা কী করব? তাদের স্কিল তৈরি করে অন্য একটা জায়গা তাদের জন্য করে দিতে হবে। কিংবা তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে প্রযুক্তি খাতে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। নয়তো বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে যাবে। অলরেডি আমাদের যুবকদের বেকারত্বের হার ১০ শতাংশের বেশি। প্রযুক্তি আমাদের স্বচ্ছন্দ্য দেবে, উৎপাদনশীলতা বাড়াবে ঠিকই, অন্যদিকে অনেককে কর্মচ্যুতও করবে। তাদের কীভাবে কর্মসংস্থান দেব বা আয় বর্ধনকারী কাজে যুক্ত করব, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি মূল্যায়ন করেন, তাহলে বিগত ২০২৩ সালটা বাংলাদেশের জন্য কেমন ছিল?

২০২৩ সালটা অর্থনৈতিকভাবে খুবই চ্যালেঞ্জিং বছর ছিল। সেখানে কিছু স্বল্পমেয়াদি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং চলমান কিছু সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছিল। স্বল্পমেয়াদি সমস্যার মধ্যে ছিল মূল্যস্ফীতির চাপ, টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার নিয়ে অস্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া। এর পাশাপাশি কিছু কাঠামোগত সমস্যাও ছিল। যেমন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা প্রতিভাত হওয়া, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঘাটতি। এগুলো আগে থেকেই চলে আসছে।এখানেও আমরা খুব একটা উন্নয়ন করতে পারিনি। সুতরাং আমাদের তাৎক্ষণিক কিছু সমস্যা, চলমান কিছু সমস্যা, দুটো সমস্যা মিলেই আমাদের অর্থনীতি চরম একটা অভিঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে। যার কারণে মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সে অনুযায়ী তাদের বেতন বাড়েনি। ঋণখেলাপির মতো বহুল আলোচিত বিষয় তো ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি ব্যাংকের কিছু সূচক থাকে, যেমন ক্যামেল সূচক। অর্থাৎ এখানে মূলধনের পর্যাপ্ততা আছে কিনা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কেমন। প্রায় সবকিছুতে ব্যাংক খাতগুলো দুর্বল। আমি যদি ভাগ করে দেখি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, ব্যক্তি খাত ও বিদেশি ব্যাংকগুলো ছাড়া বাকি সব ব্যাংকের ক্ষেত্রেই যে সূচকগুলো যে পর্যায়ে থাকার কথা সেটি নেই। আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তো আমরা কোনোভাবেই এগোতে পারছি না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে জোর দিলেও আমরা ২০২৩ সালে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দেখিনি। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কথাটি জোর দিয়ে বলছি কারণ আমাদের যে ব্যাংক খাতের সমস্যা, ঋণখেলাপির সমস্যা, আমরা কোনোভাবেই কমাতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা আরো শক্তিশালী হওয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করা জরুরি। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা যদি না কমানো যায় তাহলে এটা কাজ করতে পারবে না। আমাদের ব্যাংক খাত ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুর হবে। তেমনি জাতীয় রাজস্ব

বোর্ড যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে, কর না দেয়া প্রভাবশালী ব্যক্তির থেকে কর আদায় করতে সাহস না পায়, তাহলে কিন্তু চলবে না। সাধারণ মানুষ যারা নিয়মিত কর দেয়, কর আদায় করতে শুধু তাদের পেছনে পড়ে থাকলে হবে না। প্রভাবশালী অনেকেই কর দেয় কিন্তু আমরা প্রায় শুনে থাকি অনেকে দেয় না, দেশ থেকে চলে যায় তাদের থেকে কর আদায় করার মতো স্বাধীনতা এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নেই। এখানে সংস্কার করাটা প্রয়োজন এবং এটা ২০২৩ সালে হয়নি। ২০২৪ সালে এগুলো করা উচিত। এমনিতে আইএমএফের যে শর্তে বিভিন্ন টার্গেট বেঁধে দেয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে প্রতি বছর রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে দশমিক ৫ শতাংশ করে। কিছু অন্যান্য সংখ্যাগত টার্গেট আছে, নীতিমালাবিষয়ক টার্গেট আছে। কিন্তু মূল বিষয়টি হলো আমি যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যদি না করতে পারি, তাহলে সমস্যা থেকে উত্তরণ হবে না।

নতুন বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কী?

আমার প্রত্যাশা হলো মূল্যস্ফীতির চাপ যেন কমে আসে। মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া দরকার তা নিতে হবে। সাময়িক কষ্ট হলেও যতক্ষণ না মূল্যস্ফীতি কমে আসছে, সুদের হার বাড়াতে হবে। পরবর্তী সময়ে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে গেলে, এ কষ্টটা দূর হয়ে যাবে। মূল্যস্ফীতির চাপ কমানো এটা আমার প্রথম প্রত্যাশা। আর আরেকটি প্রত্যাশা হলো, টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার নিয়ে বাজারে যে অস্থিতিশীলতা সেটা দূর হওয়া। খোলাবাজারে আমাদের ১২৫ টাকা ১২৪/১২৩ টাকায় ডলার কিনতে হচ্ছে। আবার যারা ব্যাংক থেকে আমদানি করছে, তারা ডলার পাচ্ছে না। এজন্য আমরা বলেছি বাজারের হাতে বিনিময় হারটা ছেড়ে দেয়ার কথা। আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বলেছে তারা বাজারের হাতে ছেড়ে দেবে কিন্তু সেখানে এখনো মূল্য নির্ধারণ করার প্রবণতা রয়েছে। বাফেদা ও ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন বিনিময় হার নির্ধারণ করছে। কেউ স্বাধীনভাবে কাজ করছে না। মূল্য নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে হয়তো ফ্ল্যাকচুয়েট করত যে আজকে দাম বাড়ল, কালকে দাম কমল কিন্তু এনোমেলি থাকত না যে একেকটা রেট একেকজনের জন্য। একটা জায়গায় গিয়ে স্থিতিশীল হতো। আমরা বলি যে বৈধপথে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের রেমিট্যান্স আসে না। এমনকি আড়াই শতাংশ ইনসেনটিভ দেয়ার পরও আসে না। ৭–৮ টাকার পার্থক্য যদি থাকে তাহলে একজন প্রবাসী কেন তার কষ্টার্জিত টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে আনবে। অথচ আমরা যদি বাজারের হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে ওই ইনসেনটিভ দেয়ারও প্রয়োজন হবে না। কারণ সেটাও তো সরকারের কোষাগার থেকে যাচ্ছে। বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে বাজারে ডলারও আসবে। আমি তাৎক্ষণিকভাবে সুদের হার ও বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার কথা বলব। আশা করি এ বছর তা বাস্তবায়ন হবে। আর চলমান সংকটের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শুরু হবে। এটাই আমার প্রত্যাশা।

বণিকবার্তা
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

রাজনৈতিক নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব চলে গেছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সম্প্রতি প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় অর্থনীতির চলমান সংকট, দায়দেনা পরিস্থিতি, অর্থনীতিতে কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস, রাজনীতিবিদদের ভূমিকা—এসব বিষয় উঠে এসেছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ওয়ালিউর রহমান ও জাহাঙ্গীর শাহ

প্রথম আলো: বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্যা সবাই স্বীকার করছেন। অর্থনীতির সমস্যাকে কীভাবে দেখতে হবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান সমস্যার সর্বজনীন স্বীকৃতি এসেছে। হালকা সংকট আর গভীর সমস্যার মধ্যে আছে অর্থনীতি। সরকারের প্রশাসনিক লোকেরা আগে মেনে না নিলেও এখন এই সমস্যার কথা স্বীকার করছেন। সমস্যা লোহিত রেখা বা 'রেড লাইন' তখনই অতিক্রম করেছে, যখন ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে ধারদেনা করতে গেলাম।

অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে বিবেচ্য বিষয় হলো তিনটি। প্রথমত, এ পরিস্থিতির চিত্রায়ণ কীভাবে করব, পরিস্থিতির বর্তমান অভিপ্রকাশ কী কী সূচক ও প্রবণতা দিয়ে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই রকম পরিস্থিতি উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য কতখানি অনুকূল। কারণ, সামনে এলডিসি উত্তরণ, এসডিজি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার সমাপন, নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা ইত্যাদি আছে। তৃতীয়ত, এই মুহূর্তে কী করণীয়? মূলত স্বল্প মেয়াদে।

কিছুটা বিস্ময়কর হলেও, বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা 'রোগনির্ণয়' ও 'চিকিৎসা'র বিষয়ে মোটামুটি একমত। পরিহাসের জায়গা হলো, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাছ থেকে

এখন যেসব বক্তব্য আসছে, তা দেশীয় অর্থনীতিবিদেরা বহুদিন ধরে বলে আসছেন। তাই বাংলাদেশের সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে শুধু জাতীয় নয়; আন্তর্জাতিকভাবেও একধরনের ঐকমত্য আছে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি আলোচিত উত্তরণকালীন ব্যবস্থাগুলো সৎ ও সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারবে?

প্রথম আলো: পরিস্থিতি কতটা জটিল?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলো সংশ্লেষিত ও ঘনীভূত প্রকাশ ঘটেছে। এটি ধরা পড়ে প্রবৃদ্ধির ধারা শ্লথ হয়ে যাওয়ার ফলে। এর দুটি কারণ আছে। একটি হলো প্রবৃদ্ধির অনুমিতি সম্প্রতি (আইএমএফের শর্তে) তিন মাস পরপর করা হচ্ছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানোর যে প্রবণতা আলোচিত ছিল, তা আগের চেয়ে সংযত হয়েছে। গত প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) দেখেছি, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ শতাংশের নিচে। দ্বিতীয়ত হলো বিনিয়োগ আরও হ্রাস পাওয়ায় এবং ভোগও কমে যাওয়ায় অর্থনীতির বেগ আগের চেয়ে কমে গেছে। আগামী অর্থবছরে (২০২৪–২৫) প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে, তা কেউ বলছে না। সব আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্বাভাসের অবনমন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গত ১৫ বছরের মেয়াদে জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ ৩০–৩২ শতাংশের বেশি নিতে পারেনি। বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩–২৪ শতাংশে এসে আটকে আছে। বিদেশি বিনিয়োগও প্রায় স্থবির। সামনে বিনিয়োগ কমবে বৈ বাড়বে না। কারণ, সরকার বিবিধ কারণে ঋণপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কাঁচামাল ও পুঁজি পণ্য আনার আমদানিপত্র খুলতে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে সুদের হারে '৯–৬' নীতি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে পারেনি। উপরন্তু ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে।

বিষয়টা হলো সরকার এত দিন এক ইঞ্জিনে বোয়িং বিমান চালিয়েছে। ইঞ্জিনটি ছিল সরকারি বিনিয়োগ। বন্ধ দ্বিতীয় ইঞ্জিনটি হলো বেসরকারি বিনিয়োগ। এখন প্রথম ইঞ্জিনটির শক্তিও নিঃশেষ হতে চলেছে। এত দিন সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৭–৮ শতাংশের মতো ছিল। সরকারের যে আর্থিক সংগতি দরকার, তা রাজস্ব আদায় দিয়ে মেটানো যাচ্ছে না। সরকার তার রাজস্ব বাজেট দিয়ে দায়দেনা পরিশোধ, বেতন-ভাতা, ভর্তুকি দিতেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বাজেট বাস্তবায়নে অর্থ দেওয়া যাচ্ছে না। আবার প্রকল্পে বিদেশি অর্থ ব্যবহার করতে পারছি না, কারণ ওই সব প্রকল্পের দেশীয় সম্পূরক অর্থায়ন জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ বছর তো স্মরণাতীতকালের মধ্যে সবচেয়ে কম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার, ২৭ শতাংশ (প্রথম সাত মাস)।

প্রথম আলো: কেন অর্থ পাচ্ছি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ব্যয়যোগ্য অর্থ না পাওয়ার বড় কারণ হলো আমাদের প্রয়োজনীয় রাজস্ব আয় নেই। প্রবৃদ্ধি হলো, প্রবৃদ্ধি মানেই তো আয়। তাহলে সে আয়ের ওপর কর আদায় করা

কেন গেল না? এখনো কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের নিচে। এত দিন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম কর-জিডিপি অনুপাত ছিল বাংলাদেশে। এখন আফ্রিকার গরিব অঞ্চলের দেশগুলোর চেয়েও কম কর-জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশের।

এটা আর্থিক বা রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় চরম সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। এতে প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে বৈরী রাজনৈতিক অর্থনীতির কারণে কর খেলাপি ও টাকা পাচার—কোনোটাই আটকানো সম্ভব হয়নি। উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর আয় প্রায় অনেক এক্ষেত্রে 'পবিত্র' ছিল না। তাই সে আয় কার্যত করের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। তবে এত দিন রাজস্ব খাতে সংকট থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। কারণ, বাজেট ঘাটতি জিডিপির মোটামুটি পরিমিতভাবে ৫ শতাংশের আশপাশে ছিল।

বিগত দশকে অর্থনীতিতে শক্তির জায়গা ছিল বৈদেশিক খাত। নিট রপ্তানি ও প্রবাসী আয় ওঠানামা করলেও, প্রবণতা ছিল ইতিবাচক। আর বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহও বৈদেশিক খাতকে চাঙা রাখে। তবে প্রকাশমান বৈদেশিক খাতের ভারসাম্যহীনতা এখন রাজস্ব খাতের পুঞ্জীভূত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এটা অর্থনৈতিক সমস্যার জটিল ত্রিযোগ।

প্রথম আলো: বিদেশি দায়দেনা পরিস্থিতি কতটা নাজুক বলে দেখতে পাচ্ছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বহিঃখাতের বিষফোড়া এখন দায়দেনা পরিস্থিতি যা টাকার বিনিময় হারেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সরকার গত দেড় দশকে যে 'দৃশ্যমান' উন্নয়ন পরিচালনা করেছে, এর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রকাশ হলো এই দায়দেনা পরিস্থিতি। যথাসময়ে নীতি সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি মোচন না করা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি থাকায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বলা চলে অর্থনীতির ডায়াবেটিস হয়েছে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সময়মতো না করলে তা সারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমান্বয়ে বিকল করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ রোগের চিকিৎসা আমরা সময়মতো করিনি। এখনো অবহেলা অব্যাহত আছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে না পারায় বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, এ সময় আমরা বিদেশের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে দুই গুণের বেশি ঋণ নিয়েছি। অনেকে বিদেশি ঋণ নিয়ে চিন্তিত, আমি বরং বেশি চিন্তিত দেশি ঋণ নিয়ে। ব্যাংক খাত থেকে সরকার ব্যাপকভাবে ঋণ নেওয়ায় ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ সীমিত হয়েছে। উচ্চ সুদে ট্রেজারি বন্ড দিয়ে ঋণ নিচ্ছে সরকার। সরকার দুই হাজার কোটি টাকার চেয়ে বেশি বন্ড ছেড়েছে জ্বালানি খাতের দায় মেটাতে।

বিদেশি ঋণের আলোচনায় ব্যক্তি খাতের নেওয়া বিদেশি ঋণের বিষয়টি আসে না। দেশ ১০০ টাকা ঋণ পেলে তার ২০ শতাংশ যায় ব্যক্তি খাতে। ব্যক্তি খাতের বিদেশি ঋণ পরিশোধ

করতে না পারলে তা বিনিময় হারসহ সামষ্টিক বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে।

বলা হয়, বাংলাদেশ কখনো বিদেশি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। অথচ মাসের পর মাস বিদেশিরা বিক্রিত পণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। বিনিয়োগকারীরা তাদের মুনাফার অর্থ দেশে নিতে পারছে না। এর ন্যূনতম পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলার। এই বাংলাদেশ কোনো বিদেশি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়নি। এই গর্বের জায়গায় তো ফাটল ধরেছে।

প্রথম আলো: কেন এমন হলো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই পরিস্থিতি তৈরির পেছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত কর আহরণ করা যায়নি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বিনিয়োগ তেজি করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া বিবিধ কারণে বিদেশি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পও যথাযথভাবে যথাসময়ে করা যায়নি। অবকাঠামো প্রকল্পগুলো অতিমূল্যায়িতভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে।

আবার সরকার যে জনগ্রাহী প্রকল্প নেয়নি, তা–ও বলতে পারব না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তবে সুবিধাভোগীদের নামমাত্র ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আবার প্রকৃত সুফলভোগীদের সঙ্গে সুবিধা বিতরণের দুর্নীতি হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের অবহেলা করা হয়েছে। শিক্ষায় জিডিপির ২ শতাংশের বেশি অর্থ বরাদ্দ দিতে পারিনি। স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ১ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দিতে পারিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি পরিসংখ্যানে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি দেখার মতো। একটি চিত্র উঠে এসেছে। যেমন সম্প্রতি প্রকাশিত স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের মানুষের গড় আয়ু কমেছে, শিশুমৃত্যু বেড়েছে। মানুষ ধারদেনা করে সংসার চালাচ্ছে। খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। অন্যদিকে যুব বেকারত্ব বেড়েছে। শ্রমশক্তিতে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষ হয় বেকার, না হয় শিক্ষার অভাবে আছে। যেটুকু কর্মসংস্থান হয়েছে, তা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে হয়েছে, শোভন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। সরকারি খানা জরিপ বলে ভোগ, আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে অনুভবনীয়ভাবে। বাংলাদেশ এখন দ্রুততম শতকোটি টাকা বানানোয় বিশ্বে প্রথম।

প্রথম আলো: এ ধরনের ঘাটতি হলো কীভাবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্বীকার করতে হবে, বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের একটি পরিবর্তনশীল রূপকল্প এবং একটি বাস্তবধর্মী পথরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বেশ কিছু ইতিবাচক ও জনকল্যাণকর নীতি ও কর্মসূচি নিয়েছে। তবে এই পথচলার গণতন্ত্রহীনতা তাকে কায়েমি স্বার্থের কাছে জিম্মি করে ফেলেছে, উন্নয়ন চেষ্টা সুষম সুফল দেয়নি। জ্বালানি খাত এই পরিস্থিতিকে উৎকট করেছে।

লক্ষণীয়, গত দেড় দশকে বাংলাদেশে কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর বিন্যাসে বড় পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর বিজিএমইএ-কে একচেটিয়া পরাক্রমশালী বলা যায় না। এখন জ্বালানি খাতে সংশ্লিষ্টরা ক্ষমতাবান, ব্যাংকের মালিক তথা খেলাপিরা প্রতিপত্তিশালী, বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের ঠিকাদারেরা প্রভাবশালী।

প্রথম আলো: এসব সমস্যা সমাধান না হওয়ার কারণ কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এক ইঞ্জিনের প্লেন নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের পর আর উড়তে পারে না। এক ইঞ্জিনে চলার সময় দ্বিতীয় ইঞ্জিন চালুর জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা, তা নিতে পারে না। এসব দেশ প্রায়ই কর্তৃত্ববাদী কেন্দ্রায়িত ও গণতান্ত্রিকতাবিচ্যুত রাষ্ট্র হয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) পায়, এসব রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেসব রাস্তা ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যায়। দলের ভেতরে গণতন্ত্রের অভাব, প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার না থাকা, প্রতিযোগিতাহীন জাতীয় নির্বাচন ইত্যাদি এর বৈশিষ্ট্য। প্রশাসন, আইন রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারব্যবস্থা ও নজরদারি সংস্থাগুলো নিরপেক্ষতা হারাতে থাকে। দেখা যায় চাটুকার পেশাজীবী সম্প্রদায়, সংযত গণমাধ্যম ও ম্রিয়মাণ নাগরিক সমাজ।

বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক উচ্চবর্গের সঙ্গে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকাঠামোভিত্তিক গোষ্ঠীর কলুষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক অর্থনীতিতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে। অথচ প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা ভীষণভাবে প্রয়োজন বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ক্রমবর্ধনশীল উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি। আমাদের রাজনীতি তো এখন একটি অপস্রিয়মাণ প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুশীলনে অধিকার ও মেধার চেয়ে আনুগত্য ও মেধাহীন সংযোগ প্রাধান্য পাচ্ছে। দেশে উদ্যোগ, উদ্ভাবন ও উৎকর্ষের বিস্তারে এটি একটি বড় অন্তরায়।

প্রথম আলো: রাজনীতির সঙ্গে এই পরিস্থিতির সম্পর্ক কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগে বলেছি, গত দেড় দশকে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রচলিত ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর নতুন বিন্যাস হয়েছে। পুরোনোদের নতুন অবয়ব এসেছে, নতুন গোষ্ঠী যুক্ত হয়েছে। আগে রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক দেখতাম। এখন এর সঙ্গে প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তঃস্থিত গোষ্ঠীর স্বার্থ যুক্ত হয়েছে। ফলে প্রতিযোগীসক্ষম উদ্যোক্তারা হতাশ হয়ে গেছেন।

নতুন সরকার এসে ব্যাংক খাতে সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল, লক্ষ করি তা তিন সপ্তাহের মধ্যেই থমকে গেছে। আসলে যেসব কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী দেশের এই জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রেখেছে, তাদের মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক শক্তি দরকার। সেই শক্তি বিগত জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার অর্জন করতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

বাগাড়ম্বরের সঙ্গে বাস্তবতার পার্থক্য আছে, এটাই প্রতারণামূলক বাস্তবতা। এসব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ মৌলিক মূল্যায়ন করে আগামী বাজেটে একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত কর্মসূচি নেওয়া উচিত। কিন্তু এখানেও হোঁচট খেতে হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যে নেতৃত্ব দরকার, তা দেখছি না। এখন আর নীতি সংস্কারের মৌখিক আশ্বাসে আইএমএফও আস্থা রাখে না। বাজারও বিশ্বাস করে না। এর মানে, অর্থনীতি একটা আস্থাহীনতার সংকটে আছে। এমন অবস্থায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি শ্লথ হবে, কর্মসংস্থান কমে যাবে। সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। এ সরকারের আমলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, তারাই সবচেয়ে বেশি আঘাত পাবে।

প্রথম আলো: তাহলে কী করা উচিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সার্বিকভাবে বিগত সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব চলে গেছে। আগে রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়রা (এলিটরা) ছিলেন, করপোরেট জগতের উচ্চবর্গীয়রা ছিলেন। এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চবর্গীয়রা যুক্ত হয়েছেন। এই নতুন গোষ্ঠীর কেউ উর্দি পরা, কেউ উর্দি ছাড়া। এই নতুন ক্ষমতার গোষ্ঠীবলয় বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আস্থা রাখে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের অনুশীলন ফিরিয়ে আনতে হবে। জবাবদিহিহীন ও দায়বদ্ধহীন শুভচিন্তা শেষ বিচারে উপকারী হয় না। টেকসইও হয় না।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও ধন্যবাদ।

প্রথম আলো
১২ মে ২০২৪

উন্নয়ন চাইলে সংস্কারের বাজেট করতে হবে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মোঃ মাহবুবুল আলম: কর ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আপনাদের মূল্যায়ন কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাদের যেই জিনিসটা বলি। আপনারা বলছেন তো, যে এইটা উন্নয়নমূখী বাজেট হতে হবে। উন্নয়ন করার জন্য বাংলাদেশে এখন সংস্কারটা হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি উন্নয়ন চান, তাহলে সংস্কারের বাজেট চাইতে হবে। সংস্কার কোন জায়গায় হবে? আমি দুটো এলাকা আপনাকে বলি। শ্রদ্ধেয় মশিউর রহমান যখন বলেন, উনার সাথে সম্পর্ক আছে বলে আমি সাহস করে উনার কথার উপরে কথা বলছি। উনি বলেছেন, যে তাহলে, ভর্তুকি কোথায় দিবেন? ভর্তুকির টাকা আসবে কোত্থেকে? আমি বলি আপনাদের। জ্বালানি খাত এখন বাংলাদেশের এখন একটা সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। আপনারা সবাই স্বীকার করবেন। সাতাশ হাজার মেগাওয়াটের আমার ইনস্টল ক্যাপাসিটি, বারো-তেরো হাজারের বেশি ব্যবহার করতে পারি না। লোডশেডিং হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ কী? কারণ আমার তেল আনার পয়সা নাই। এখন দেখেন, আপনি যদি বলেন এখানে ভর্তুকি কমাতে বলেছে আইএমএফ। আপনি ভর্তুকিটা কোথায় কমাবেন? উনচল্লিশ হাজার-সাড়ে উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা ওখানে ভর্তুকি আছে। বত্রিশ হাজার কোটি টাকা হলো কোথায়? ক্যাপাসিটি চার্জ। আপনি ক্যাপাসিটি চার্জে ধরবেন না, আর আপনি অন্য জায়গাতে ভর্তুকি কমাবেন, এইটা কী ধরনের সামাজিক অন্যায় আপনি আমাকে বলেন। ভর্তুকি কমানোর জায়গা নাই? আপনি সামঞ্জস্যকরণ করবেন। আমি আপনাকে অন্য উদাহরণ দেই। সংস্কার করবেন, মার্জার করবেন, দুই ব্যাংকের সাথে আরেক ব্যাংকের। অদ্ভুত কথা! মার্জার হচ্ছে ব্যাংক, রাত্রিবেলা মালিকানা বদল হয়ে গেছে। এইটাই কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়-দায়িত্ব? নজরদারী করার কথা? এইটাই কি প্রুডেনশিয়াল গাইডলাইনস? তাহলে আপনি

কেমন করে ব্যাংকিং খাতকে করবেন? যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাংকিং খাত এবং আমার জ্বালানি খাতে সংস্কার না হবে, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন, এলডিসি থেকে বেরোনো, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ, সবগুলোকে ওরা বিপদসংকুল করে ফেলবে। যদি আপনি বাংলাদেশকে সামনে নিতে চান, ব্যাংকিং খাত ঠিক করেন, জ্বালানি খাত ঠিক করেন। এই দুটো আমার দুটো ফুসফুসের মতো কাজ করবে আমার আগামীদিনের উন্নয়নের বাংলাদেশের। আমি আরেকটা কথা বলি। আমি আরেকটা আপনাদের কথা বলি। আপনারা কেউ বলেন রেমিটেন্সের পাঁচ পার্সেন্ট করতে হবে। আরে! কী অদ্ভুত কথা! সবেমাত্র আমরা, সকলে জানে, যে বহুবিধ বিনিময় হার কোনো সময় অর্থনীতির জন্য ভালো না। এটা সব সময় আপনার বিভিন্ন ধরনের অদক্ষতার জন্ম দেয়। আমরা আইএমএফের কাছে স্বীকার করেছি, এটা ক্রমান্বয়ে আমরা খুলে একত্রিত করতে যাচ্ছি। এইরকম দাবী কেন করবেন আপনারা এইটার সাথে? আপনারা দেখেন গতকাল আপনারা, আজকেই গেছিলেন বোধহয়, বিরাট বড় একটা মিটিং হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে, নেতাদের সাথে। আমি হেডলাইন পড়লাম। চৌদ্দ পার্সেন্টের বেশি সুদের হার হবে না। আরে বাবা! সবেমাত্র সাতদিন আগে আপনি বলেছেন যে সুদের হারকে বাজারভিত্তিক করবেন, নমনীয় করবেন, ইত্যাদি। আর আপনাকে বলে দিলেন চৌদ্দ পার্সেন্ট করবেন। এইটা বলার মতো উনার এই মুহূর্তে কি সেই প্রাধিকার আছে? এইটা কেমন করে সম্ভব? আপনি দেখেন, ওইটা চৌদ্দ কেন, বারোও হতে পারে, দশও হতে পারে, নয়ও হতে পারে। এইটা পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে হবে। কীভাবে সেই একইরকমভাবে করার কথা বলছি? সংস্কারের বাজেট হতে হবে। আরেকটা বাজেট হতে হবে। সুরক্ষার বাজেট হতে হবে। এতদিন যাদের কাছে গড়ে তোলা হয়েছে, যে মধ্যবিত্তরা গড়ে উঠেছে, এই যেই নিম্নবিত্তরা এই সরকারের আমলে গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন জায়গাতে আপনাদের দেয়া চাকরিতে। তাদের যদি সুরক্ষা না দেন, বাংলাদেশ আবার পিছিয়ে যাবে। তাদের আপনারা কীভাবে এই মূল্যস্ফীতি, কর্মহীনতার ভিতরে সুরক্ষা দিবেন, সেইটা চিন্তা করেন। তাদের সামাজিক নিরাপত্তাটার ব্যবস্থা কীভাবে হবে, যুবসমাজের কর্মসংস্থানে তাদের কীভাবে হবে, এই জায়গা। সংস্কারের বাজেট হতে হবে। সুরক্ষার বাজেট হতে হবে।

এনটিভি
১৭ মে ২০২৪

সরকার মুখে যেসব নীতির কথা বলে বাস্তবে তা মেলে না

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মোঃ মাহবুবুল আলম: আমরা জ্বালানি অবকাঠামো বিনিয়োগ ও আর্থিক খাত নিয়ে একটা রিপোর্ট দেখলাম। এখন আমি ড. দেবপ্রিয় আপনার কাছে আবার আসলাম। এটা নিয়ে আপনি সরকারের কী করণীয় এটা যদি একটু বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি শ্রদ্ধেয় মশিউর রহমান সাহেবের কথা থেকে শুরু করি কারণ উনি সরকারের ভিতরে উপদেষ্টা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আছেন। উনি আমার কথার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাখ্যা করেছেন, যে আমি বাস্তবায়ন সক্ষমতাকে ইঙ্গিত করে বলেছি যে এত বড় কেন করা হচ্ছে। আমি আদও সেটা করিনি। আমি করেছি অর্থায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এইটা সম্পূর্ণভাবে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন, রাজস্ব বাজেট থেকে বিন্দুমাত্র উদ্বৃত্ত নেই যেটা দিয়ে আমি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে অর্থায়ন করতে পারি। সেহেতু আপনার নিঃসন্দেহে এখানে সংযত হওয়ার জায়গা ছিল। নাহলে এই যেই বাজেটটি হবে, কারণ বাজেট এক ধরনের ইঙ্গিত দেয়। বাজারকে দেয়, ভোক্তাকে দেয়, বিদেশিকে দেয়, বিনিয়গকারীকে দেয়। সেই জায়গায় যদি ইঙ্গিতের যদি বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকে তাহলে সেই বাজেটের বাস্তবায়নও অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় আরকী। আপনারা এখানে আলোচনা করছেন যে, আপনারা দেখুন যে আলোচনাটা ওই স্ক্রিনে হচ্ছে, আর যে আলোচনাটা আমরা করছি তার ভিতরে কি সামঞ্জস্য হচ্ছে কিনা। ওই মানুষগুলো যে সমস্যাগুলোর কথা বলছে, সেই সমস্যাগুলো কি আমরা প্রতিধ্বনি করছি কি না। আপনারা এই মুহূর্তে ভালো করে দেখেন, যে আপনার এই বাজেটের ভিতর দিয়ে, এই পর্যন্ত যেই সমস্ত তথ্য উপাত্ত এসেছে, তার ভিতরে দেখবেন আবার ষাট থেকে সত্তর শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য, পরিবহনের জন্য যাচ্ছে। যেখানে আমরা খুব ভালো করে জানি ন্যূনতম তিরিশ শতাংশের বেশি অতিমূল্যায়িত এবং এই প্রকল্পগুলো একভাবে বাংলাদেশের রাজস্বের এক ধরনের ব্লিডিং এর জায়গা এইখানে সৃষ্টি হয়েছে। আর

আপনারা দেখেন,এই মুহূর্তে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশে আওয়ামীলীগের যে ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র আছে, যে নির্বাচনী ইস্তেহার আছে, সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে কত শতাংশ, কীরকম ভাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে যাবে। আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে যাচ্ছে। সেইখানে যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দের কথা বলা ছিল, তার অর্ধেক বরাদ্দও তারা পায়নি। আর ওখানে পরিবহন আর অবকাঠামো যা বলা ছিল তার চেয়ে দেড়গুণ টাকা ওখানে গেছে। এই যে খাতওয়ারি এই যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, এইটার ফলাফল আপনারা পাচ্ছেন। কারণ অর্থায়নের ফলে এইটা থেকে অর্থনীতি থেকে তো এক ধরনের সমাধান এক ধরনের আসতে হবে। সেই আয়টা আসতে হবে। এইটা নিয়ে বলা যায়। আপনারা যদি সকলকে, এই আজকের বাজেটের ভেতরে আগামী দিনের থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়ে রাখেন, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতি অন্যায় করা হবে। এই মুহূর্তে একটি খুবই উদ্ভাবনী কৌশল করার কথা। একটা কৌশলপত্র দরকার। নতুন সরকার এসছে। নতুন সরকার যদি আবার সেই পুরোনোভাবে ধারাবাহিকতা অব্যহতভাবে থাকে, তাহলে আমাদের যে প্রত্যাশাটা থাকে, নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার ভিতর দিয়ে, সেটাতো পূরণ হবে না। এবং আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, যে সামাজিক সুরক্ষার কথা আমরা বলছি, সরকারের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটা হলো এবার ফসল ভালো হয়েছে। এবার ফসল ভালো হওয়াতে একটা খাদ্য নিরাপত্তার দেয়ার জন্য সুযোগ হয়েছে। সরকার সেখান থেকে ফ্যামিলি কার্ড দিয়েছে। এই ফ্যামিলি কার্ডগুলোকে যদি ডিজিটাইজড করে এক্সেস না করা যায় এবং এর সাথে যদি সামাজিক সুরক্ষার যারা কার্ড পেয়েছে, সেই নামগুলোকে যদি মিলানো না যায়, তাহলে যাদের জন্য করা হলো সেগুলো হলো না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সরকার মুখে যেটা বলে নীতির কথা, বাস্তবে পদক্ষেপের সাথে তা মেলে না অনেক সময়। এবং যেইটাকে বাস্তবায়ন করে সেইটা সুষ্ঠুভাবে করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জবাবদিহিতা আসে না। এই জায়গাটাতে যদি আমরা মনোযোগ না দেই, শুধুমাত্র সাধারণ পদক্ষেপের এদিক ওদিক করে হবে না। আমি মশিউর রহমান ভাইয়ের আরো অন্যান্য কথা বলতাম, শুধু আমি এইটুকু বলি, বাংলাদেশের একদিকে বিনিয়োগ হবে না, ক্যাপিটাল গেইন্স ট্যাক্স দিবো না, এক্সচেঞ্জ রেইট ঠিক করবো না, ইন্টারেস্ট রেইট ঠিক করবো না। আর দুবাইতে ৫৩২ জন মানুষ বাংলাদেশের বাড়িঘর বানাবে, এই বাংলাদেশ তো আমি ’৭১ সালে স্বাধীনতার সময় চাইনি।

এনটিভি
১৭ মে ২০২৪

অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাস, নতুন প্রয়াস

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্যে। প্রিয় দর্শক, গোটা বাংলাদেশে সম্ভবত কেউই ভালো নেই। এবং সবাই শোকার্ত, শোকাহত। যদিও কারো কারো কাছে কখনো কখনো মনে হয়েছে যে জীবনের চেয়ে সম্পদের মূল্য অনেক বেশি। বাংলাদেশ গোটা পৃথিবী থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এবং ৫৩ বছরে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি অনেক সংকট অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও সবাই মিলে আমরা গড়ে তুলেছিলাম, সেই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি গত কয়েক সপ্তাহে একেবারেই ভিন্ন একটা রূপে আবির্ভূত হয়েছে গোটা বিশ্ববাসীর কাছে। এবং এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা কেউই বলতে পারি না। যে আন্দোলন ছাত্রদের সেই আন্দোলন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এবং নতুন নতুন কর্মসূচি প্রতিদিন নতুন নতুন নামে। সরকারের দিক থেকে প্রথমে পুরো পরিস্থিতিটাকে অস্বীকার করবার একটা চেষ্টা। পরে সেটাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সামাল দেয়ার প্রয়াস। এবং সেখান থেকে বের হয়ে এসে আবার পরিস্থিতিটাকে খানিকটা স্বীকার করে নেবার একটা চেষ্টা। এবং তার মধ্যে এটাও আমরা লক্ষ্য করলাম যে সরকারের ভেতরেও নানারকমের অস্বস্তি, নানারকমের দুর্বলতা, নানাভবে প্রকাশিত হচ্ছে। এবং তারাও যে খুব একটা স্বস্তিতে এবং শান্তিতে এবং ভালো আছে সেটাও বলবার কোনো সুযোগ নেই। সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন-সংগ্রাম কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, এর পরিণতি কী, এটা কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সম্ভবনার দ্বার উন্মোচিত করলো, কোন কোন ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করলো, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা কোন ধরনের মাত্রা যোগ করছে, সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমার সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, সিপিডির ডিস্টিঙ্গুইশড ফেলো ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আপনাকে স্বাগত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ জিল্লুর।

জিল্লুর রহমান: গতকাল ছাত্রদের এই আন্দোলনের কর্মসূচির যে টাইটেল তারা দিয়েছে সেটা ছিল রিমেম্বারিং দ্যা হিরোস। এবং এই কর্মসূচিতে আমরা আপনাকেও দেখলাম কর্মসূচিটার একটা অংশে অংশ নিতে। আপনি ডিবি কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। আপনাদের একটা আল্টিমেটাম দেয়া ছিল ছয় সমন্বয়ককে মুক্তির বিষয়ে। এবং আপনারা যাবার, মানে চব্বিশ ঘণ্টা পেরুবার আগেই সেটা খানিকটা কাজেও দিয়েছে আমরা দেখলাম যে তার আগেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এবং ডিবি প্রধানকে তার আগে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাও আমরা দেখলাম। সব মিলিয়ে কী দেখলেন? বা কালকের দিনটি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার বক্তব্য, আপনার উপলব্ধি আমি একটু শুনতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ জিল্লুর। দেশের এরকম একটি অবস্থায় আপনি আমাকে ডেকেছেন। সাধারণত আপনি তো আমাকে অর্থনীতি আলোচনার জন্য আনেন।

জিল্লুর রহমান: রাজনৈতিক-অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আজকে রাজনৈতিক-অর্থনীতিই নাহয় একটু আলোচনা করি। সমাজনীতিও আলোচনা করি। আপনি বলেছেন যে আমাদের ছাত্রনেতৃবৃন্দ বা ছাত্র-যুব আন্দোলন যারা করছেন তারা বিভিন্ন জিনিস খুব সক্রিয়ভাবে এবং খুবই সৃষ্টিশীলভাবে নাম দিয়েছেন। বাংলা ব্লকেড, তারপরে কমপ্লিট শাটডাউন, তারপরে উনারা দিলেন মার্চ ফর জাস্টিস, এবং তারপরে এখন আজকে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে রিমেম্বারিং দ্যা হিরোস বা অনারিং দ্যা হিরোস। আমাদের যে সমস্ত জাতির যে গর্বিত সন্তানরা আছেন তাদের কথা স্মরণ করা। তো আমি সেই সুযোগে আপনাকে তাদের কথা স্মরণ করার জন্য প্রথমে আমি যেহেতু আগস্ট মাস শুরু হচ্ছে, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস আছে, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবার এরকম একটি সময়ে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সেইটাকে মাথায় নিয়েই আমি স্মরণ করতে চাই। আমি বাংলাদেশের অন্যতম বড়, সেই অর্থে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা এবং তাঁর প্রয়াণের ব্যাপারে। আমি দ্বিতীয় যেটা স্মরণ করবো আপনার সাথে রিমেম্বারিং দ্যা হিরোস বা অনারিং দ্যা হিরোসে সেটা হলো এই যে দুইশ' এর উপরে আমার যে নাগরিকরা, তরুণ, যুবক, সাধারণ মানুষ নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো, তারা যে জীবন দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গেল, আমি সেই হিরোদের, সেই আমাদের গর্বিত নাগরিকদের আমি স্মরণ করতে চাই। এবং যারা এই আন্দোলন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আহত হয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি বাংলাদেশের সরকারি সহায় সম্পত্তি যেটা আমাদের নাগরিকেরই সহায় সম্পত্তি সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের সাথে সম্পর্কিত যারা আছে তাদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা, সমবেদনা এবং ভালোবাসা জানাতে চাই। সেহেতু আমার তরুণ ভাই-বোনেরা যে এরকম একটি নাম বা এরকম একটি বিষয়কে নির্বাচন করেছেন, যারা করেছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাতে চাই আজকে আপনাদের এই সুযোগে। আজকের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। জুলাই মাসের ১৬

তারিখ আমি ঢাকাতে বিদেশ থেকে এসে নামি। হঠাৎ করে খুব বড় ধরনের আর্তচিৎকার আমি শুনতে পাচ্ছি। আর্তচিৎকার শুনছি এবং মানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁদছে একটি লোক। এবং সে বলছে দুটো কথা। সে বলছে যে আমার একমাত্র ছেলেকে তোমরা মারলে কেন? বুঝলাম যে কোনো পিতা তার সন্তান মৃত্যুর কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে। শ্রমিক শ্রেণি। খেটে খাওয়া মানুষ। মানে গায়ে কোন কোট নাই। একটা লাল গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মালপত্র ছাড়া উনি চলে এসেছেন আমার ঐ ফ্লাইটেই। এমিরেটসে। এবং দ্বিতীয় কথাটা বলছে, দশটা বছর ম্যাসকটে থেকে আমি একে পড়াশোনা করিয়েছি। এখন আমার কী হবে? এই পিতার যে আর্তচিৎকার এইটা নিয়ে আমি, এই ঘটনাতে আমি ফিরে এসেছি। তারপরেই লোকটি কাঁদতে কাঁদতে ইমিগ্রেশনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। হাঁটু গেড়ে বসে, যখন অসহায় মানুষের আর কেউ থাকে না তখন বোধহয় সর্বশক্তিমানের কাছেই তারা একমাত্র আবেদন করে। যে সর্বশক্তিমানের কাছেই আবেদন করলো যে আমি যদি না পারি তুমি একে শাস্তি দিও। যারা এই কাজটা করেছে। এত বড় অভিশাপ, এই দীর্ঘশ্বাস! মানে ওই মুহূর্তে প্রত্যেকের জন্যই একটা বিচলিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যারা এই আন্দোলন সংগ্রামে আক্রান্ত হয়েছে তাদের যারা কাছের থেকে দেখেছে তাদের কারোর পক্ষেই আগামী কত জন্ম বা কত সময় এটা বুকের ভিতর থাকবে বা তাদের রাত্রের ঘুম হারাম করে দিবে, এটা আমি কল্পনা করতে পারি না। এবং এই যে ব্যথা, এই ব্যথা যদি আমার সারেও কিন্তু এর দাগ যেটা থাকবে, এই দাগ অমোচনীয়। একে নিয়ে জাতিকে আগামীদিনে আগাতে হবে। এবং এইটা কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালের যে সবচেয়ে বড় আমাদের জাতীয় মানে সেই অর্থে জাতীয় অভিশাপও বলতে পারেন, জাতীয় অভিজ্ঞতাও বলতে পারেন। এইটাকে আমরা কীভাবে ধারণ করবো, এইটাকে নিয়ে আমরা আগামী দিনের পথচলাকে কীভাবে আলোকিত করবো, ইতিবাচকভাবে, এইটাই এখন আমার কাছে যদি বলেন বড় বিষয়। আজকে আপনি যেই মানববন্ধনের কথা বললেন, আমরা ডিবি বা গোয়েন্দা অফিসের সামনে আমরা দাঁড়ালাম। এটা ঠিক যে আগের যে চূড়ান্ত বক্তব্য দেয়া হয়েছিল সেই সময়ের আগেই উনাদের ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু উনারা কী অবস্থায় আছেন কেমন আছেন তখনও আমরা কিছুই সেই অর্থে জানি না। তারা কি আগামীতে শান্তিতে আবার আন্দোলন-সংগ্রামে ফিরতে পারবেন কি না। পরে শুধু জেনেছি উনারা ওখানে অনশন ধর্মঘটে ছিলেন। এই কথাটাও তো আমরা কিন্তু সেইভাবে জানিনি। সমন্বয়করা যে অনশন ধর্মঘটে ছিলেন আরকী। দেখুন উনাদেরও কত ভুল বুঝানোর কত ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে।

জিল্লুর রহমান: তাদের ব্যবহারও করা হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে বাংলার মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞ হয়ে গেছে।

জিল্লুর রহমান: সবাই বুঝছে।

ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অনেক বেশি বিচক্ষণ হয়ে গেছে। এবং এগুলোই যে কাজে দেয় না, এই মিথ্যা।

জিল্লুর রহমানঃ আপনি দেখবেন যে ২০০৭-২০০৮ এর সেই পুরনো ভিডিও আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সেগুলো মানুষ সামনে নিয়ে এসেছে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে ওগুলোও সত্য হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মানুষ এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণ হয়ে বের হয়েছে। সেহেতু আমার মনে হয়েছে যে আজকে কী বলার। আজকে আমি দুটো বিষয়কে বলেছি। আমি সেইটিই আপনাকে পুনরায় আবার উল্লেখ করতে চাই। আমার প্রথম বক্তব্য ছিল যে গুলি তুমি করছো, যেই বন্দুক তুমি ব্যবহার করছো, এটা আমার করের টাকায় তোমার কেনা। যে লোকগুলোকে আপনি মারছেন সেই লোকগুলোও আপনার ভ্যাট দেয়। সেই লোকগুলোর প্রত্যক্ষ কর। সবচেয়ে গরীব মানুষও কর দেয়। সেই গরীব মানুষের পয়সায় কেনা বন্দুক-গুলো দিয়ে তার সন্তানকে আপনি হত্যা করছেন। এটা তো হত্যা।

জিল্লুর রহমান: অফকোর্স হত্যা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেইটা আপনি করছেন। এইটা নৈতিকভাবে অর্থনৈতিক বিবেচনাতেও। কারণ অর্থনীতির ভিতরেও তো এক ধরনের নৈতিকতার বিষয় আছে। এইটা কেমন করে সম্ভব? আমার দেশের মানুষের নিজের ট্যাক্সের পয়সায় সেই নাগরিকের সন্তানদের আপনি গুলো করে মারছেন। এইটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। কী বাজেট বলেন, কী বিদেশি সাহায্য বলেন, কী অন্যকিছু বলেন। এইগুলোর কাছে এই নৈতিকতা সর্বোপরি বলে আমার মনে হয়। মানুষের জীবন, জীবদ্দশার বিষয়। আর দ্বিতীয় যেইটা আমি বলার চেষ্টা করেছি, সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শই বলা হয় যে এই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আমি খুব জোর দিয়ে বলেছি, যদি কারোর ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এটা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আমার দেশের ভাবমূর্তি না। দেশ আমার সরকারের চেয়ে অনেক বড় এবং দেশের এই কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে, যুব সমাজের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বরঞ্চ আমাদের দেশের যে আত্মশক্তি আছে সেইটা প্রকাশ পেয়েছে। যখন আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের জন্য ইউনিভার্সিটির ছেলেরা আন্দোলন সংগ্রাম করে এবং তাদের যখন পিটায় তখন কি আমরা বলি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে? আমরা বলি যে বাইডেন প্রশাসনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সেহেতু আমাদের এই পার্থক্যটা করতে হবে না? আমার যদি ভারতে মোদি সরকার কোন পঁচা কাজ করে তাতে কি আমি বলবো ভারতের জনগণের কথা? আমি বলবো রাষ্ট্রের কথা। বাংলাদেশের সমস্যা হয়েছে এই...

জিল্লুর রহমান: আমরা রাষ্ট্র এবং সরকারকে গুলোয়ে ফেলি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুধু রাষ্ট্র এবং সরকার না। রাষ্ট্র, সরকার এবং শাসক দল। এই তিনটে একত্রিত করে ফেলি।

জিল্লুর রহমান: আমি অবশ্য সূচনায় রাষ্ট্রের কথা বলেছি, বাংলাদেশের ভাবমূর্তির কথা বলেছি। আমি বলেছি এই কারণে, আমি জাস্ট একটু ক্লারিফিকেশন দেই যেহেতু আপনি বললেন। আমি বলেছি এই কারণে যে তিপান্ন বছর পরেও আমরা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক করতে পারিনি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনার কথার মর্মার্থ অনুধাবন করি।

জিল্লুর রহমান: আপনি আমাকে কনটেস্ট করেননি সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু দর্শকদের কাছে আমি এইটা পরিষ্কার করতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকারের কাছ থেকে যে বারবার বলা হয়, দোষারোপ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র যে মিথ্যাচার করা হয় তা না অনেক সময়ই আপনার মনঃস্তাত্ত্বিক কৌশল করা হয়। এই যে মনঃস্তাত্ত্বিকভাবে আপনাকে দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যেটা সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে আপনি কিছু বললে পরেই আপনি রাজাকার, আপনি জামাত, অথবা আপনি বিএনপি ইত্যাদি। এই সমস্ত খেলো কথা এখন চলে না।

জিল্লুর রহমান: এই যে জামাত এবং শিবিরকে নিষিদ্ধ করলো এইটাও দিনের খবর। কালকেই প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, জামাত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার যৌক্তিকতা নিয়ে গুঢ় আলোচনা হতে পারে। ইতিহাস সম্পৃক্ত আলোচনা হতে পারে। সেটা কারো পক্ষে থাকতে পারে, বিপক্ষে থাকতে পারে। কিন্তু উনারা এই মুহূর্তে যেই আন্দোলনবিরোধী বয়ান তৈরি করাকে শক্তিশালী করার জন্য জামাতকে যে এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ করলেন এইটা তো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সবাই বোঝে। দেখেন কী করলেন। জামাত যদি সত্যি সত্যি অপশক্তি হয়ে থাকে তাকে আপনি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এই মুহূর্তে ব্যবহার করে বরঞ্চ আপনি এইরকম একটা বড় বিষয়কে এইরকম একটা ছলা-কলার মধ্যে ফেলে দিলেন। আপনি কত বড় অপকার করলেন বাংলাদেশের দেখেন। আপনি বারবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলেন এবং এই মূল্যবোধের কথা বলেন এই তরুণ সমাজের কাছে। আমি আপনাকে বলবো এই তরুণ প্রজন্মের পরিস্থিতি, নতুন উপলব্ধি কী। আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করে দিলেন এদের কাছে অন্যভাবে। আমার সবচেয়ে বড় বড়, যারা যুদ্ধ দিয়ে জীবন দিয়ে আমার দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আপনি মুখোমুখি করে দিলেন এই তরুণ প্রজন্মের কাছে। এই অধিকার কে দিল? এবং শুধুমাত্র খুবই সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে পবিত্র স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে আমরা

অপব্যবহার করেছি। এইটার দুঃখ রাখার জায়গা খুব কম হবে। কারণ এই প্রজন্মকে আমরা তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই রাখতে চাই। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন, আমি আবার এই প্রজন্মের কাছে ফিরে আসবো। উনারা কত বিজ্ঞ, কত মানে সেই অর্থে চিন্তাশীল। দেখেন ওরা যে গানগুলো গাচ্ছে, সে গানগুলো কোথাকার গান? মুক্তিযুদ্ধের গান, দেশপ্রেমের গান, মানবতার গান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ওরা মিছিল করছে। কার বাংলাদেশ? এটা ওদের বাংলাদেশ। এই কথাটা কি এই বয়সেও আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না? আমার এইখানেই আফসোসের জায়গাটা।

জিল্লুর রহমান: গত কয়েকদিনের বা কয়েক সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে চাই বা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আপনি নতুন কী দেখলেন এখানে? একটা হচ্ছে যে নতুন কী দেখলেন সেটা একটা প্রশ্ন। আরেকটা প্রশ্ন আমি একই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই যে আমরা ২০০৯ থেকে এই সরকারকে দেখছি মানে ধারাবাহিকভাবে তিনটে নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে অনেকরকমের প্রশ্ন। আমি সেই বিতর্কে যদি না যাই। অনেক রকমের ক্রাইসিস গেছে এবং সরকার কিন্তু প্রতিটা ক্রাইসিস, সেই প্রথমে পিলখানা হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে মনে হচ্ছে সরকার নাই। কিন্তু সেই সরকার বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তো সেই জায়গায় এই পরিস্থিতিটা একেবারেই এখন পর্যন্ত অনেকেই মনে করেন যে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা যদিও মনে করছেন পরিবেশ স্বাভাবিক-শান্ত হয়েছে কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে আসলে রাজনৈতিক এবং মোর‌্যাল একটা ডিফিট হয়ে গেছে অলরেডি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর আমি শেষের থেকে শুরু করি। আমি আপনাকে বলতে চাই পিলখানা বলেন, কোভিড বলেন, দুটো বড় বড় নির্বাচন বলেন...

জিল্লুর রহমান: তিনটে নির্বাচন। ’১৪, ’১৮, ‘২৪।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইতো ’১৪ তারপরে ’১৮ তারপরে ‘২৪। এই তিনটি নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি এবং সেই সময়কার সহিংসতা, আন্দোলন এবং বৈরিতার ইতিহাস আমরা জানি। যেভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল সেই কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এখন বড় ধরনের ফারাক দেখা যাচ্ছে। ওইখানে সেই অবস্থার ভিতরে অনেক বড় ধরনের কিছু ব্যাত্যয় দেখা যাচ্ছে। আমি কয়েকটা আপনাকে বলি। দেখুন এই সবগুলো সময়ে একটা বড় বয়ান ছিল বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে। এবং এই উন্নয়ন বলতে আমরা অবশ্যই দৃশ্যমান বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর প্রকল্পের কথা বলেছি। আর আমরা বলতে চেয়েছি যে উন্নয়নের এই বয়ানের পাশাপাশি আরেকটি সমান্তরাল বয়ান আছে। সেটা হলো এই উন্নয়ন থেকে সবাই সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে না। বাংলাদেশে দারিদ্র যদি কমেও বৈষম্য বাড়ছে। আপনার সময় নাই। নাহলে আপনাকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে খানা জরিপের তথ্য দিয়ে আপনাকে আরো বলতে পারতাম। এবং এই উন্নয়ন বয়ানের কারণে আপনি যেটা করেছেন সেটা হলো যে উন্নয়ন বলতে যে মানবাধিকার বোঝায়, উন্নয়ন বলতে যে কথা বলার অধিকার বোঝায়, উন্নয়নে যে আমাকে

প্রতিনিধিত্ব চয়ন করবার জন্য নির্বাচন বোঝায়, এই উন্নয়ন বলতে যে আমার সমাবেশ করবার অধিকারকে বোঝায়, মিডিয়ার স্বাধীনতা, নাগরিকদের স্বাধীনতা এগুলোকে বোঝায়, এগুলোকে আমরা তাচ্ছিল্য করেছি। একটা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে যে তথাকথিত অবকাঠামো আগে, মানুষের কথা বলা পরে হবে। পেটে ভাত হলেই হবে। বিভিন্ন ধরনের বিকৃত ঐতিহাসিক উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এবং সেটার বড় ক্রেতা ছিল আমাদের বিদেশি সহযোগী গোষ্ঠীরা। এই সময়কালে সবচেয়ে বড় পার্থক্য যেটা হয়েছে উন্নয়নের এই তথাকথিত বয়ানের সারবত্ত্বাহীনতা অনেক প্রকাশ্য হয়ে গেছে। এবং যেটা আমরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বুঝিয়ে উঠিয়ে পারিনি মানুষের, জনগণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এসেছে। যখন যুবক এবং তরুণদের পাশে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-আয়ের মানুষ, পেশাজীবীরা বিভিন্ন জায়গাতে এসে যুক্ত হয়েছে। আপনি বলবেন রাজনৈতিক পরিচয়ের লোকেরাও এসেছে। আরে রাজনৈতিক পরিচয়ে যারা এসেছে তারা কী নাগরিক না?

জিল্লুর রহমান: আর তাদের কাজও তো সেটাই আসলে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তারা তো এই কাজ করার জন্যই আছে। সহিংসতার পক্ষে আমি বলছি না। আমি আগুন দেয়ার পক্ষে বলছি না। আমি আন্দোলন-সংগ্রামের কথা বলছি। এইটা হলো প্রথম পার্থক্য।

জিল্লুর রহমান: এবং আগুন সহিংসতা কারা করেছে, কে করেছে, সেটা তো আবার আরেক আলোচনার বিষয়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবং সেটাও তদন্তের ভিতরে সঠিকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন হয়তো দেখবো আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বের হচ্ছে। আসলেই কে করেছে। তো প্রথম যেটা পার্থক্য দেখছি, এর আগের বিভিন্ন উৎক্রমণের সময় উন্নয়নের যে বয়ানটা দিয়ে নেওয়া হয়েছে সেইটা এখন সেইভাবে আর কার্যকর নাই। সেহেতু আপনাকে নতুন কোনো বয়ানের কাছে যেতে হবে, যে বয়ানের আলোচনায় আমি আসছি। দ্বিতীয় দেখেন কী হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত নেত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী, সকলেই উনাকে এক ধরনের ছাড় দিয়ে কথা বলেছে। বলছে উনি হয়তো পুরোটা জানেন না। উনাকে হয়তো ভুল বোঝানো হচ্ছে। কথাটা উনার কাছে ঠিকমতো পৌঁছলে পরে হয়তো এইটা এরকম হতো না। আমার মনে হয় গত কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানুষ উনাকে আর ওই ছাড়টা দিতে চাচ্ছে না। এবং আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন যে সমস্ত আক্রমণ, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে যুবকদের সাথে, সেই রাজাকার বিতর্ক থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিতর্ক যদি বলেন, হেলমেট বিতর্ক। এই সবগুলোই সোজাসুজি নেত্রীর সাথে হয়েছে। অর্থাৎ উনার যে আচ্ছাদনটা ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই। উনি মুখোমুখি হয়ে গেছেন। এইটা একটা বড় পরিবর্তন। অর্থাৎ শুধু বয়ান প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি, নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যে বয়ানকে আমরা সৃষ্টি করেছি যেই আস্থার নেতৃত্বের অধীনে সেইটা এখন আর কার্যকর হচ্ছে না।

জিল্লুর রহমান: আরেকটা বিষয় বোধহয় হয়েছে, ভয়ের যে একটা সংস্কৃতি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আসছি। তৃতীয়ত পার্থক্য কী হয়েছে, দেখুন রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে প্রশাসন নিয়ে বিভিন্ন রকমের তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তার দলীয়করণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা র‍্যাব এবং পুলিশের বিভিন্ন মহাপরিচালকদের উপরে স্যাংশন হতে দেখেছি। কিন্তু তারপরে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং আছে বলেই আমি আশা করি, সেটা হলো আমাদের সেনাবাহিনী। এটা গর্বের জায়গা। আন্তর্জাতিক পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা। যুব সমাজের একটা গৌরবের আশ্রয়স্থল হিসেবে। সেই সেনাবাহিনীকে আমরা এইবার বিতর্কিত করেছি। আমরা বিতর্কিত করেছি শুধু দেশের ভিতরে না, আন্তর্জাতিকভাবে এই জাতিসংঘের লোগো লাগিয়ে। এটাকে আপনি বালখিল্যতা বলবেন নাবুদ্ধির অভাব বলবেন না অতি চালাকি বলবেন। মুছতে ভুলে গেছিলাম। মুছতে ভুলে গেছিলাম। দেখুন কী শুধু বাংলাদেশের মানুষকে আপনি তাচ্ছিল্য করেন, তাদের বোধগম্যতাকে আপনি নিম্নস্তরের মনে করেন তা না বিদেশকেও আপনি তাই মনে করেন। তৃতীয়ত, সেনাবাহিনীকে আমাদের এইটার ভিতর দিয়ে বিতর্কের ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছে। এইটা খুবই দুঃখজনক এবং চিন্তার বিষয়। চতুর্থ যেইটা আমি আপনাদের বলবো সেটা হলো এতদিন পর্যন্ত আমরা বলেছি যে যুব সমাজ ওরা সোশ্যাল মিডিয়া করে। ইতিহাস কিছু জানে না। ওরা খুব চঞ্চলমতি। ওরা কিছুতেই রেগে যায়। ওরা অনেক মাদকাসক্ত। কেউ হয়তো মানসিক বিড়ম্বনার ভিতরে থাকে। কেউ কেউ সহিংসতার ভিতরে থাকে। কেউ কেউ উগ্রবাদের ভিতরে আকর্ষিত হয়। এরকম বর্ণনা তো আমরা করেছি। কিন্তু আমরা কোনো সময় ভালো করে যেটা বলার চেষ্টা করিনি এই যুব সমাজ যে নতুন চিন্তা, নতুন ধ্যান-ধারণার পাশাপাশি বিশ্বায়িত যুব সমাজ, ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং করা যুব সমাজ, প্রত্যেকের সাথে যুক্ত থাকা যুব সমাজ যারা এই নামগুলো দিলো এবং যারা যুক্ত হলো। এবং যারা জীবন বাজি রেখে রাস্তায় নামলো। তারা দেখলো যে যত আপনি শিক্ষা দিবেন, মানে যদি আপনি শিক্ষিত না হন তাহলে প্রতি চারজনে একজন বেকার থাকে আর যদি আপনি শিক্ষিত হন তাহলে তিনজনে একজন বেকার থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা যত পায় যে বেকার তত থাকে সে। এই যুব সমাজ তো সেইটা দেখছে। কেন ওরা কোটার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে গেল এটা আপনাকে বুঝতে হবে না? যে চাকরির নিশ্চয়তা বা উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার পরে কর্মসংস্থানের চিন্তা থেকে। এবং কেন করলো? কারণ আপনার ব্যক্তিখাতে যে বিনিয়োগ, আমি ইকোনমিস্ট হিসেবে বলি আপনাকে। ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ তো জিডিপির অংশ হিসেবে তেইশ শতাংশের বেশি বাড়লো না। সেহেতু ব্যক্তিখাতে তো যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এইটিই তো একটা বড় কারণ ওদের ঠেলে দিয়েছে এখানে। আর যদি ওই যে বিশ লক্ষের বেশি প্রতি বছর কর্মসংস্থানের জন্য বাজারে আসে তার যদি দশ লক্ষ যদি মধ্যপ্রাচ্যে আর অন্য জায়গায় না যেত তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী হতো? সেই মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মানুষগুলোকেও তো আমরা সম্মান করি না, টাকার মূল্য দেই না, ইত্যাদি ইত্যাদি গেল। তো এইটা যুব সমাজ যে নতুন এসেছে আমার ভাষায় হলো বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক পর্ব যেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের, ওই পর্ব শেষ হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের ওই পর্ব, আমার মতো মানুষরা, আমি পনেরো বছর বয়স ছিল আমার যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়। আমরা

স্কুল-কলেজে যারা পড়েছি, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে আন্দোলন করেছি, রাজনীতি করেছি, আমাদের সময় শেষ। এইটা আপনার মানতে হবে। নতুন, উত্তর পর্ব এসেছে। উত্তর পর্ব হাজির হয়ে গেছে। তারা তাদের জানান দিয়েছে। আমাদের এটা দেখতে হবে। আপনি এটাকে শুধু বাংলাদেশ মনে করবেন না, দেখেন ইউরোপ ধরে, ল্যাটিন আমেরিকা ধরে গড় নেতৃত্বের বয়স কত? আরে আঠাশ বছর বয়সের প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। বুঝেছেন? আর আমি সত্তরের কাছে পৌঁছে যাই, পঁয়ষট্টি পার হয়ে গেছে আমরা এখনো মনে করি আমরা দেশ জাতির নেতৃত্ব দিবো। অনেক হয়েছে। অনেক হয়েছে। তাদেরকে আমাদের স্থান ছেড়ে দিতে হবে। এই যে উত্তর পর্ব এসেছে। এখন হয় কী ইতিহাসে দেখবেন এক পর্ব থেকে আরেক পর্বে যখন যায় মানে তাৎক্ষণিক পর্ব থেকে যদি আপনি উত্তর পর্বে, পরবর্তী পর্বে যান, মধ্যেখানে আরেকটা সময় থাকে। একে বলে কাল পর্ব। কাল পর্বের ভিতরে মরণ থাকে, ধ্বংস থাকে, সৃষ্টিও হয়। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ওই তাৎক্ষণিক পর্ব আর উত্তর পর্বের মাঝখানে কাল পর্বতে আছে। এই কাল পর্ব কত দ্রুততার সাথে শেষ হবে এইটা নির্ভর করবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিদের বিচক্ষণতার উপরে। সমস্যাটা হয়েছে কোথায়। যে সমস্ত দেশে এই তাৎক্ষণিক পর্ব থেকে উত্তর পর্বে যায় সে সমস্ত দেশের যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থাকে এগুলোতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে আত্মস্থ করে সমাধান দেওয়ার ব্যবস্থা রাখে। সবচেয়ে পঁচা দেশেও যদি ভালো একটা নির্বাচন হয় তাহলে ভালো একটা ফলাফল পাওয়া যায়। দেখুন ভারতবর্ষে যে নির্বাচনটা হলো এটার ভিতর দিয়ে তো জনগণের এক ধরনের যে চিন্তা চেতনা এবং এক ধরনের তাদের মধ্যে দূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। মোদি সরকারকে যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা কমিয়ে দিল। আপনি সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সের নির্বাচন দেখেন। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা আসতে নিয়েছিল। কীভাবে তারা সেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তারা বের হয়ে আসলো। মধ্যপন্থীরা এবং বামপন্থীরা। আপনি দেখেন সাম্প্রতিককালে যুক্তরাজ্যে, গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানেও কীভাবে লেবাররা বের হলো। আপনি যদি দেখেন যে সমস্ত দেশে স্বৈরাচারী, কর্তৃত্ববাদী দেশ আছে সেখানেও কী হয়। এই গত সপ্তাহে যে ভেনিজুয়েলার নির্বাচন হয়েছে, মাদুরুর সাথে কী হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন। কীভাবে মারামারি হচ্ছে। এবং সেখানে বিরোধী শক্তিকে জিতানো হয় নাই। এমনকি আপনি এই যে রোয়ান্ডার মতো জায়গায় যেখানে নিরানব্বই শতাংশ ভোট পেয়ে জিতছে, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের ঘটনাবলি ঘটছে এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলাদেশকে বুঝতে হলে ইতিহাসকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশকে বুঝতে হলে ভূগোল বুঝতে হবে। বাংলাদেশকে বুঝতে হলে সমাজতত্ত্ব বুঝতে হবে।

জিল্লুর রহমান: এখন কেউ কেউ যদি মনে করেন যে বাংলাদেশকে বুঝতে হলে আপনি বলছেন ইতিহাসকে বুঝতে হবে, তারা যদি মনে করেন যে ইতিহাস তো আমরাই। আমরাই তো ইতিহাস।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর,এই প্রশ্নের উত্তরে আমি একটা প্রসঙ্গ আনতে চাই। অহমিকার একটা সীমা থাকে। দম্ভর একটা সীমা থাকে। অহমিকা, দম্ভ এবং ইংরেজিতে আমরা যাকে

ইগো বলি, এইটার পরিণতি কী হয়, আজকের বাংলাদেশ তা। অনেকে আমাকে বলে, ভিন্ন কিছু হতে পারতো না? অনেকে আমাকে বলে যদি ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলতো। কোমলমতিরা তাহলে তো রাজী হয়ে যেত। আমি তাদের সকলকেই বলি, অন্যকিছু হওয়ার সুযোগ ছিল না। যে রাষ্ট্র কাঠামো আমরা দাঁড় করিয়েছি, যেখানে ভিন্নমতের কোনো স্থান নেই। যেখানে যে কোনো সৎ পরামর্শকে এক অর্থে আপনার নিন্দা হিসেবে দেখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যখন সর্বজনীনভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন না তখন আপনার এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনি সবসময়, অহমিকার যেটা হয়, কোনো আলোচনার ভিতরে থাকেন না। তখন আপোষ মীমাংসা অন্য কারো যুক্তির মধ্যে আপনি থাকেন না। এইটা হওয়া ছাড়া আর ছিল না। আপনি ভালো করে আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে দেখেন তারা কী বলে। আপনার এই অনুষ্ঠানে কী বলে আমি জানি না কিন্তু ঘরে কী বলে সবাই আমরা ভালো করে জানি। লক্ষ্য করে দেখেন, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এখন কোন প্রতিষ্ঠান? আমার রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থায় সমস্যা হয়েছে। বেসামরিক প্রশাসন নিয়ে আমাদের যুক্তি আছে। কিন্তু যদি বলেন সবচেয়ে বড় ভিক্টিম কে? এটা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। এই বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এত বড় একটা দল। স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেয়া একটা দল। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করে আসার এত বড় একটা দল। যে দলের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করি। বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করি। এমনকি বর্তমান নেতৃবৃন্দের কথাও বলি। সে দল এখন, এই যে নতুন একটা শব্দ চালু হয়েছে না? এটা আগে ছিল না। কী যেন শব্দটা?

জিল্লুর রহমান: ভুয়া।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটাও একটা নতুন রাজনৈতিক সংযোজন। তো দেখুন নিজের দলের লোকেরা বলছেন। আদর্শিক সংগ্রাম না করে তারা মাঠ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। আর যারা সুবিধাভোগী ছিল তারা হয়তো অনেকেই দেশ ছেড়েই চলে গেছেন। দেশ ছেড়ে উনারা না যাক, টাকাগুলো চলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে জানেন। এই মুহূর্তে ডলারের যে পরিস্থিতি হচ্ছে এটার একটা বড় কারণ হলো বড়ভাবে বিদেশে টাকা পাচার হচ্ছে বা টাকা সকলে সরাচ্ছে। এই অশান্তির এই পরিবেশ কাল পর্ব চলছে। এই কাল পর্বকে ছোট করতে হবে। নতুনদের জায়গা করে দিতে হবে।

জিল্লুর রহমান: আরেকটা প্রসঙ্গ বলছিলাম যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ভয়ের যে আবহ তৈরি হচ্ছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি এটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছেন। এটা হলেই আপনার আগামীর আলোচনা আসবে। আগামীর আলোচনায় ভয় ভেঙ্গে গেছে এবং তার ফলে কী হচ্ছে তাতে আসবো কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাছি। সেটা হলো ওই যে আগের পরিস্থিতির সাথে এখনকার পার্থক্য। একটা বড় পার্থক্য হলো আপনি দেখেন, ২০১৫-১৬ সেই সময় বড়

বিষয় ছিল আগুন সন্ত্রাস এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ। ধর্মীয় উগ্রবাদ সে সময় যে তুঙ্গে ছিল সেটা চলে গেছে। এটা এখন একটা ব্যবস্থাপনার ভিতরে এক ধরনের শক্তি প্রয়োগও আপনি বলতে পারেন, মনঃস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বলেন, ভূরাজনীতি দিয়ে এইটা এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আপনি যতই জঙ্গিবাদের কথা বলতে চান, এইবার এইটা খাটবে না।

জিল্লুর রহমান: সাধারণ বাংলায় বললে খাচ্ছে না এইটা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটার কারণে যেটা হয়েছে সেটা হলো বিদেশিরা যারা এতদিনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে খুবই প্রশংসা করতো তাদের কাছে এটা বড় ধরনের ধাক্কা হিসেবে যাবে। আমার তো মনে হয় আমার প্রতিবেশীর কাছেও এটা একটা বড় ধাক্কা হিসেবে যাবে। উনারা কল্পনাও করতে পারেন নাই বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে অসন্তোষ। এটা শুধু উন্নয়নের ভিতরে ছিদ্র আছে বলে না, কারণ এই উন্নয়নের সুযোগ সকলে পায়নি ওখান থেকে টপটপ করে পড়ে গেছে অন্যের কপালে। এর পাশে যে মানুষ কথা বলার অধিকার, নাগরিক অধিকার এগুলোর ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে যে এত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। অর্থনৈতিক দূর্দশা এবং সেই সাথে কথা বলার সুযোগ না পাওয়া এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পক্ষে না দাঁড়ানো, নাগরিকের পক্ষে। এইটা একটা বিদেশিদের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা হয়েছে। এই ধাক্কার সাথে, যেটা এখন দেখছেন, ছাত্র-যুব আন্দোলনের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বিজয় যেটা, এইটা আরেকটা বড় পার্থক্য, সেটা হলো আগে কোনোদিন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাইরে কেউ রাস্তায় আসেনি। প্রথম আমার এই তরুণ সম্প্রদায় আসলো এবং এর সাথে এখন অন্যান্যরাও আসছে। এবং আমাদের মতো ভীতু নাগরিকরাও এখন রাস্তায় যেয়ে পুলিশের সামনে দাঁড়াচ্ছে। আজকে আমি লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত আনন্দ লেগেছে আমার, শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা গান-বাজনা নিয়ে পথে নেমেছে। আমার ঊনসত্তরের কথা মনে হয়েছে। আমার এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের কথা মনে হয়েছে। ওইরকম একটা নতুন উৎসবের আমেজ এটার ভিতরে এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো এটার মধ্যে এসেছে। এইটা লক্ষ্য করেন যে ভয় কেটে গেছে। আগে যেই সমস্ত পোস্টিং দিতে ভয় পেত সেই পোস্টিংয়ের বদলে সবাই তো রক্তে রক্তে লাল করে ফেললো। এবং যে হ্যাশট্যাগ দিলে পরে কালকে সকালে আপনাকে চোখ বেঁধে নিবে কি না সে হ্যাশট্যাগ দিতেও সে এখন আর কার্পণ্য করছে না।

জিল্লুর রহমান: ইভেন ধরেন ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা এবং মেয়েরা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঐ সাহসী মেয়েটার কথা চিন্তা করে দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েটা সে তার বড় ভাইকে নিতে দিবে না। যেভাবে দাঁড়িয়েছে। অন্যদের বলছে গুলি করেন।

জিল্লুর রহমান: চট্টগ্রামে দেখলাম ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পার্থক্যের কথা বলেন। এইবারের আরেকটা দৃশ্যমান পার্থক্য হলো নারী সমাজের অংশগ্রহণ। আমাদের তরুণ-তরুণীরা যেভাবে অংশগ্রহণ করছে, গর্বে বুক ফুলে যায়। মানে এইটা তো কল্পনা করা যায় না যে আমাদের মেয়েরা। আমরা যে বলেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মেয়েরা এগুলো কোনোকিছুতে মাথা ঘামায় না এত বড় মিথ্যে কী হতে পারে বলেন?

জিল্লুর রহমান: শুধু আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলছেন, নটর ডেম কলেজ যাদের নাম আমরা কোনদিন শুনিনি, ভিকারুন্নেসা স্কুল তো আছেই। বিইউপি যেটা পুরোপুরো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, এমআইএসটি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেখান থেকে মারা গেছে। সেখান থেকে একজন মারা গেছে বলে দেখেছি। তো এই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এইটা গুণগতভাবে বটে। আপনি এইটা মনে করতে পারবেন, আপনি ওইযে ম্যানেজমেন্ট থিওরি, ম্যানেজমেন্ট থিওরি খুবই কনটেক্সটচুয়াল। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের সাথে আপনার থিওরি ব্যবহার হয়। সেহেতু আপনি ওই একই রকমের অস্ত্র ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে হয়তো কামিয়াব হয়েছেন, পরিস্থিতি বদলে গেছে। আপনি আগের মতো ওই একই অস্ত্র ব্যবহার করছেন। এবং এইটা করা ছাড়া আপনার কোন উপায় নাই। অমোঘ আপনার। মানে যেই কাঠামো আপনি দাঁড় করিয়েছেন এই কাঠামোতে বল প্রয়োগ ছাড়া যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার কোনো স্থান সেই অর্থ নেই। সেহেতু আমি মনে করি যে অনেক পরিবর্তন এইটার মধ্যে হয়েছে। এখন আপনি বলবেন তাহলে কীভাবে হবে। এমন হতে পারে যে এটা হয়তো সাময়িকভাবে কমবে কিন্তু এটা যাবে না।

জিল্লুর রহমান: সামনে কী হতে পারে সেই আলোচনার আগে আমি সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির যে চিত্রটা দাঁড়াচ্ছে, কোথায় ছিল, এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সেটা কোথায় এসে দাঁড়ালো সেটা একটু বুঝতে চাই। এবং একই সঙ্গে যেটা আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশকে বিশ্ব একভাবে চিনতো, নানা ছোট ছোট প্রশ্ন ছিল নানা সময়ে কিন্তু এবার একেবারে নেকেডলি সেটা এক্সপোজড। তো সেটা এই জায়গাটাতে আপনি বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া এবং বৈশ্বিক সম্পর্কের চিত্রটা কীভাবে দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভালো প্রশ্ন করেছেন, জিল্লুর। আপনাকে আমি স্মরণ করাই, নির্বাচনের আগেই গত এক বছর যাবত, ২০২৩ ধরে অর্থনীতির ভঙ্গুরতা খুব প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যারা দুর্মুখ ছিলাম, যারা আগে বলেছি, সেগুলো আপনার এখানেও বলেছি তারা তখন সেটাকে কোনো সময়ই যুক্তি-তর্ক তো গ্রহণ করেই নাই, এমনকি ঘরে যেয়েও এগুলোকে জোরালোভাবে বিবেচনা করেনি। এমনকি এ পরিস্থিতিতে আমাদের মোকাবেলা করার জন্য উনারা তথ্য-উপাত্তকে গুম করছেন। উনারা তথ্য-উপাত্তকে সেইভাবে নাটক সাজিয়েছেন। মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত করেছেন।

জিল্লুর রহমান: গুম করেছেন বা হত্যা করেছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবং এইটা আমি বলেছি যে তথ্য-উপাত্তের নৈরাজ্য চলছে, তথ্য-উপাত্তের অন্ধত্ব চলছে। তখন নির্বাচনের সামনে এসে যখন বিশেষ করে আমাদের মজুদের ক্ষেত্রে সমস্য হলো, বিদেশি মুদ্রা আসছে না, আমরা দ্বারস্থ হলাম আইএমএফের কাছে তখন যেটা হলো যে নির্বাচন যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা সব ঠিক করে ফেলবো। এইতো তিন মাস। উনাদের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যেই দিনই বলে ওই দিন থেকে তিন মাস শুরু হয়। যেই দিনই বলবেন ওইদিন থেকে তিন মাস। আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করি উনারা কেন কোনোদিন একবারও ক্যালেন্ডার নিয়ে বসেন না উনার সাথে। দেখুন, আপনার এই আলোচনায় আমি বলেছি, যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে এইটার উপর নির্ভর করবে উনারা কীভাবে আচরণ করবেন। কারণ হলো এই আচরণের বড় জায়গাটা হলো সংস্কার করতে পারেন নাই উনারা। উনারা পুঁজিবাজারে সংস্কার করতে পারেন নাই। উনারা ব্যাংকিং খাতে সংস্কার করতে পারেন নাই। উনারা কর আহরণে সংস্কার করতে পারেন নাই। উনারা সরকারি বিনিয়োগের যে গুণমান সেগুলো রক্ষা করতে পারেন নাই। উনারা বৈদেশিক বিনিয়োগকে যথেচ্ছাচার করে ব্যবহার করেছেন। এবং স্থানীয় সরকারকে যেভাবে দেয়ার কথা সেভাবে দেন নাই। এবং বিতরণ ব্যবস্থার ভিতরে বড় ধরনের ব্যত্যয় রয়ে গেছে। এগুলোকে মোকাবেলা করতে গেলে একটা সরকারের যে ধরনের রাজনৈতিক শক্তি দরকার এই নির্বাচন সেই রাজনৈতিক শক্তি তাকে দিবে বলে মনে হয় না। উপরন্তু যে সমস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহে এবং আনুকূল্যে নির্বাচন হবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করাটাই তো নির্বাচন-উত্তর সরকারের মূল কাজ হবে। লক্ষ্য করে দেখেন, আপনি কি কোন ব্যাংকিং খাতে কিছু করতে পেরেছেন? অনেক বন্ধুরাই বলেন এই করা দরকার ওই করা দরকার। আমি তাদের বলি টেকনিক্যাল সল্যুশনের সমস্যাই কি মূল সমস্যা? নাকি না, রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা লাগবে। তো আমি জিজ্ঞেস করি রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভিপ্রকাশটা কী? রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভিপ্রকাশ হলো জনমানুষের স্বার্থে, দক্ষতা এবং উপযোগিতার পক্ষে আপনি যদি কোন কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারেন, যে আপনার আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠির স্বার্থে আঘাত লাগে, সেইটাই হলো আপনার রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা। তাহলে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার তো কোনো নিয়ামক আমি এই মুহূর্তে দেখছি না। অন্যান্য খাতের কথাও আমরা বলতে পারি, টাকা পাচার থেকে আরম্ভ করে। উপরন্তু আপনি কী করলেন গত বাজেটে? আমি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম সেটা অনেকেই ব্যবহার করেছে। যে গত বাজেটটা তাহলে কী ছিল, আমি বলেছিলাম এইবারের বাজেট বে-নজির বাজেট। তে বে-নজির কোন উদাহরণ নয়। অন্যেরা অবশ্য অন্যভাবে বুঝেছে। তো যাই হোক ওইখানে দেখেন আপনি কালো টাকা সাদা করার জন্য কী উৎস হবে এইটাও প্রশ্ন করবেন না। আপনি সোজাসুজি অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকাকে অনুমোদন দিলেন। এবং এটা দিয়ে আপনি যে টাকা পাবেন তা না। এটা দিয়ে বোঝা যায় শক্তিশালী ব্যক্তিরা কীভাবে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এবং আপনি যেটা করলেন সেটা হলো সংবিধানের বিরোধী। অর্থাৎ সকলের সমান অধিকার। আমার মতো মানুষেরা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ শতাংশ আমরা কর দিবো আর উনি দশ শতাংশ- পনেরো শতাংশ দিয়ে বের হয়ে

যাবেন চুরির টাকা নিয়ে। আজকাল তো অবশ্য রিসোর্ট ব্যবসা খুব ভালো হয়েছে। এগুলো করে বের হবে। এইটা তো গ্রহণযোগ্য হলো না। অর্থাৎ এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল জায়গাটা হলো যে সংস্কার আপনার করা দরকার সম্পদ আহরণের জন্য, সম্পদ ব্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সেইটা করার শক্তি আপনার নাই। এইটেই সত্য। এবং এই যে সত্য অর্থনোতিক সত্য। আর এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সত্য এই দুটো এখন মিশ খেয়ে গেছে। অর্থাৎ আগে বলতাম অর্থনীতি যদি ভালো হতো তাহলে রাজনীতি ঠিক করা যাবে। কারণ মানুষের খাওয়া, পরা, থাকা। দারিদ্র্য বিমোচন এগুলো হলে পরে হয়তো করা যাবে। কিন্তু এখন হয়ে গেছে এই, আপনি যদি রাজনীতি ঠিক করতে না পারেন এই অর্থনীতি নিয়ে, আপনার এই দুই শতাংশ আর পাঁচ শতাংশ, এক টাকার ডলার না দুই টাকার ডলার এই আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশ এখন যেই মহাকালে আছে, এই মহাকালে অর্থনীতির এই পরিস্থিতিতে মনোযোগ দেয়ার জন্যও শাসকগোষ্ঠীর সময় নেই। জনগণও অবধারিতভাবে ধরে নিয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার জীবন মানের উন্নয়নের যে সুযোগ নেই, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত। আমি গ্রামে গেলাম, আমাকে বলছে যে ১৫ টাকা কলার হালি। ১২০ টাকা ডিমের দাম হয়ে যাচ্ছে। আমাকে একজন বলছে সত্তর-আশি হাজার টাকা আমি মাসে আয় করি। আমার ছয়জন মানুষের পরিবার। দু'জন স্কুলে এবং কলেজে যায়। বাবা-মা আছে। বাবা-মা, দু'টো সন্তান, স্বামী-স্ত্রী। এই ছ'জনের সংসার আমি সত্তর-আশি হাজার টাকা দিয়ে আমার পক্ষে চালানো সম্ভব না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করতে হচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের কী বলবো। আমি লজ্জায় কিছু বলতে পারি না। আপনি বোঝেন না কেন ছেলে-মেয়েরা পথে এসেছে? ওরা কি শুধু কোটার জন্য পথে এসেছে? এই কোটা হলো জীবনের কোটা, চাকরির কোটা না। আমরা যে বলি বাহাত্তর বছর বাঁচবে গড়ে বাঙালি, ওই বাঁচার মধ্যে সে আছি কি না নেই এইটা বোঝার জন্য সে এইটার ভিতরে এসেছে। এইটাই এখন আমাদের বোঝার বিষয় রয়ে গেছে। অর্থনীতির আলোচনা আপনি করতে পারেন। সাম্প্রতিককালে অর্থনীতির যে অন্য আলোচনা আসবে সেটা হলো বিদেশের সাথে।

জিল্লুর রহমান: বৈশ্বিক চাপ বা প্রতিক্রিয়া।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা তো আমি বলেছি সেনাবাহিনী সম্পর্কিত। সেনাবাহিনী সম্পর্কিত আলোচনা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গেছে। আগের সাথে এখনকার তফাতটা হলো এই, আগে শান্তিরক্ষীবাহিনীর যখন লোকজন যেত জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ব্যক্তি হিসেবে দেখার বিষয় ছিল যে এই লোকটি অন্য কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজ করেছে কি করেনি। আমরাও এটাকে কৌশল করতে চেয়েছি। উনারাও এটাকে অত ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, খুব একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া। এইবার যেটা হলো তাতে ব্যক্তি না, এইটাতে পুরো প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু আলোচনার ভিতরে চলে গেল। এই প্রতিষ্ঠানটা যে গেল, এটা শুধু ইউএনের লোগো ইত্যাদির বিষয় না। আরো বড়ভাবে আছে। এটার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিষয় আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্টের ভিতরে নির্বাচনের যে ডামাডোল উনাদের চলছে, কী ফলাফল হবে জানি না। দুটোই বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে পারে বিভিন্ন কারণে। তার

পরে কী দাঁড়াবে সেটা বোঝার বিষয় আছে। অর্থাৎ একটা জাতিসংঘের প্রক্রিয়া আরেকটা দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস যেটা দাঁড়িয়েছে এটা যদি আমার সেনাবাহিনী, রেমিটেন্স আয় ইত্যাদির বিষয় থাকে কিন্তু রেমিটেন্স আয়ের ক্ষেত্রে আন্দোলন সংগ্রাম করছেন আমাদের প্রবাসীরা। তারা আন্দোলন সংগ্রাম করছেন টাকা পাঠাবেন না। হুন্ডি করেন। তার ফলাফল তো আমরা এ মাসে আমরা দেখেছি। আগামীতে কী হবে এটা দেখার বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা হয়েছে দু'দিন আগে সেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের সাথে আমাদের আলোচনাকে স্থগিত করে দিয়েছে। এবং স্থগিত করেছে, দেখুন আপনি লক্ষ্য করে, উনারা বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। এখন আপনি বলতে পারেন যে বর্তমান পরিস্থিতিটা কী। এটা হয়তো আমাদের মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা করছে সিকিউরিটি এলার্ট আছে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেহেতু তারা এখানে আসছে না। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এরপরে উনারা যেটা বলছেন, এইটাকে বিবেচনা করতে হবে উনাদের যে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর বোরেনের যে বিবৃতি তার আলোকে। সেহেতু এটাকে আপনি আলগা করতে পারবেন না। আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি যে বর্তমানের যে ব্যবস্থা চলছে এই ব্যবস্থায় শুধু গরীব মানুষের জীবনের সমস্যা না, আমার উদ্যোক্তাতারা এখন হুমকির মুখে পড়বে। এবং এটার বড় কারণ কী? ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আমাদের সাথে এখন বড় আলোচনা চলছে যে এলডিসি থেকে বের হলে পরে তারপরে আমরা শুণ্য শুল্কে থাকবো কি না। তিন বছরের আছে, ওটাকে আরো বাড়ানো যায় কি না। ওই তিন বছর রক্ষা করা আমাদের এখন কষ্টকর হয়ে যেতে পারে। ওই ধরনের শুণ্য শুল্ক ছিল শ্রীলঙ্কা থেকে আরম্ভ করে, পাকিস্তান থেকে আরম্ভ করে, কম্বোডিয়া থেকে আরম্ভ করে, তাদের ওটা থাকা অবস্থায় বিভিন্ন অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণে নাগরিকদের, তারা ওটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই বন্ধ করার আশঙ্কার মধ্যে আমাদের ওই কালো ছায়াতে আপনি আমাদের নিয়ে গেলেন।

জিল্লুর রহমান: একটা বিষয়, যেহেতু আপনি জাতিসংঘের কথা বললেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বললেন। বাংলাদেশের রাজনীতির আলোচনায় আমাদের প্রতিবেশীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পলিটিক্যাল ডিসকাশনের মধ্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রথমবারের মতো ভারতীয় গণমাধ্যমের মধ্যে ভাগ হয়েছে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও নানাভাবে কথাবার্তা বলছেন। কেউ হয়তো বলছেন যে বাংলাদেশে, বাংলাদেশ বলতে তারা বাংলাদেশ সরকারকে বোঝায়, পূর্ণ সহায়তা দরকার। কেউ আবার একেবারেই বলছেন না। এই যে আপনি মুক্তিযুদ্ধের কথা যেটা বলছেন সেটাও আমি বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছি। একটা লেখাও পড়লাম আজকে, সেখানেও তারা বলছেন যে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এই প্রসঙ্গটা আসলে ইররেলেভেন্ট হয়ে গেছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বলি অতিক্রান্ত বিষয়।

জিল্লুর রহমান: এবং এইটা করবার জন্য তারা আবার বলছেন ক্ষমতাসীনরাই দায়ী। সেটাও তারা বলছেন। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা সামগ্রিকভাবে ভারত সরকার, সাউথ ব্লক, তাদের ইনটেলিজেন্স এজেন্সি তারা সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতি কীভাবে দেখতে পারে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাদের চিন্তা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। সেহেতু আমি এটা বলতে পারবো না। কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পারি। সেটা হলো ওই যে বয়ানের যে ঘাটতি হয়ে গেছে না, সেইটার জন্য সবচেয়ে বড় নিহত যদি কেউ হয়ে থাকে এই ক্রসফায়ারে এটা হয়েছে আমার উন্নয়ন বয়ান। এবং মুক্তিযুদ্ধের বয়ান। এইটা হলো এখন আমার সবচেয়ে বড় ভিক্টিম। এবং ভারতবর্ষের জন্য যেটা হয়েছে আরকী, এটা তো দুইভাবে হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য এবং ভারতের জন্য। ভারতের জন্য তারা যে নিরঙ্কুশভাবে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, সমাজ নিয়ে চিন্তা ব্যতিরেকে উনারা যে সমর্থনটা দিয়েছেন এই সমর্থনটা যে টেকসই হচ্ছে না এই উপলব্ধিটা উনাদের এসেছে। এইটেই আমি বলতে চাচ্ছি। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সেটা বলতে পারি না। এই উপলব্ধিটা ওইযে কনটেক্সট, প্রেক্ষিত, প্রেক্ষিত তো যদি দেশের ভিতরে বদলায় আর বিশ্বে বদলায় সেখানে কি মনে করেন যে অঞ্চলে না বদলে পারবে? এবং সেখানে আপনি দেখেন চীনের পক্ষ থেকে কী বলা হয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতি খুব দ্রুত ফিরে আসছে, প্রকল্পের কাজগুলো শুরু হবে। গত যে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে সেগুলোর অনুকরণ আমরা করবো। সেহেতু জিও-পলিটিক্স বা ভূ-রাজনীতি এখানে আরেকভাবে খেলবে। বাংলাদেশের রাজনীতি, এটাও আপনার এখানে বলেছি আজ থেকে পাঁচ-ছয় বছর আগে, কোনোদিন এতখানি ভূ-রাজনীতির ছত্রছায়ায় ছিল না যতটা এখন যেটা আছে।

জিল্লুর রহমান: আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। পাঁচ-সাত মিনিট সময় আমার হাতে আছে। সামনে কী আসলে এখন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর, আমি তো ভবিষ্যতদ্রষ্টা না। তবে দুর্মুখ তো বটেই। সেহেতু আমাদের হাতে যে বিজ্ঞান আছে এবং যে তথ্য-উপাত্ত আছে, পৃথিবীর ইতিহাস যা বলে, সেইগুলোকে ভিত্তি করে একটা কথা বলার সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয়। সেটা হলো, আপনার এখানে বসেই নিরবাচনে প্রাক্কালে আমি বলেছি, নির্বাচনের উত্তরকালেও আমি বলেছি, ৭ই জানুয়ারি নির্বাচনের। সেটা হলো এই নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আপনি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু এর রাজনৈতিক বৈধতা এবং এর নৈতিক বৈধতা আপনার থাকবে না। এবং ওইটা যদি না থাকে তাহলে একটি রাষ্ট্রকে, সরকারকে, দেশকে সামনে অগ্রসর করার জন্যে প্রতি মুহূর্তে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত থাকে এগুলোকে মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু সমাধানের ভিত্তিতে গড়ে তোলার যে জায়গাটা ধাপে ধাপে, সেই জায়গাটায় ঘাটতি হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে দেখেন আমার রাজনৈতিক জায়গাটার কোন সমাধান আপনি দিতে পারেন নাই। এবং যে রাজনৈতিক সমাধান দেয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন সে আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এটা তো এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে হয়েছে। আপনাকে বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এইটা টেকসই হয় না। আর সবচেয়ে এখন এইবার যেই সংকটটা হয়েছে রাজনৈতিক সংকটের সাথে সাথে আপনার নৈতিক সংকট হয়ে গেছে। জন-মানুষের সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্র শাসন করা যায় না। মানুষ যদি

আপনাকে নেতা হিসেবে, দল হিসেবে, গোষ্ঠী হিসেবে সম্মান না করে তার কথায় আপনি যে পরিবর্তনগুলো আনতে চাচ্ছেন তাতে মানুষকে সেই পথে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয় না। সেহেতু বাংলাদেশের জন্য, আগামী দিনের বাংলাদেশ, আগামী দিনের যে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশ, উত্তর-পর্বের বাংলাদেশ, সেখানে যেতে হলে একটি নতুন রাজনৈতিক নিষ্পত্তি আমরা বলতাম, এখন মনে হয় আমার কাছে একটি রাষ্ট্রীয় নিষ্পত্তি দরকার। এটা শুধু আর রাজনীতিতে নাই। রাষ্ট্রের যে অন্যান্য অঙ্গ আছে সেইগুলোতে আমার বুঝতে হবে বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, এই সমস্ত বিষয়াদি নিয়ে একটা নতুন নিষ্পত্তি লাগবে। এই নতুন প্রজন্মে নতুন বাংলাদেশ হতে হলে নতুন ধরনের চিন্যতা-চেতনের একটা নতুন মডেল আমাদের সামনে আসতে হবে। এবং এইগুলো আনতে হলে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু ওই আলাপ-আলোচনা করার জন্য আমার জনগনের প্রকৃত প্রতিনিধিদের দরকার। জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের আনতে হলে একতা ভালো জাতীয় নির্বাচন ব্যতিরেকে আপনি এটা পারবেন না। আপনি যদি বলেন চার বছর অপেক্ষা করেন, বাংলার মানুষ ওই চার বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছে কি না আজকে সন্ধ্যায় আমি নিশ্চিত না। যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে।

জিল্লুর রহমান: আর কিছু যোগ করতে চান আপনি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন কথা হলো যে এইটাই যদি হয়, মানে এই পুরো পরিস্থিতির কারণ হলো জবাবদিহিতার অভাব, গণতান্ত্রিকতার অভাব, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। তো সেইটাকে আনতে হলে আপনাকে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতি আনতে হবে স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় সরকারের ক্ষেত্রে। এবং সেইটাকে প্রাক্কালে বেশ কিছু সংস্কারের আলোচনা আসতে হবে। যেমন সংস্কারের আলোচনা আসতে পারে যে আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট কিছু করবো কি না যাতে করে বারবার আমাদের তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নিরপেক্ষ সরকারে যেতে হয় না। পাকিস্তানে যেভাবে সিনেট দিয়ে চলে সেরকমভাবে করবো কি না সরকারের একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার অংশ হিসেবে। অথবা এমনকি জন-মানুষের প্রতিনিধিদের ওখানে নেয়ার জন্য অন্য ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা। আমরা সংখ্যানুপাতিক ভোটের দিকে যাবো কি না যাতে করে কেউ এক-চল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে ছিয়ানব্বই শতাংশ সিট নিয়ে যেন চলে না যায়। ছোট ছোট দলগুলো যেন এইটার ভিতরে স্থান পায়। আমাদের দেখতে হবে যে সরকারের মেয়াদ পাঁচ হবে না চার হবে এ আলোচনা হতে পারে। একাধিক মেয়াদে থাকতে পারবে কি না, থাকলে একজন ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধান হবেন কি না। আমাদের যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে, আমাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা আদিবাসী যাদের বলি, এমনকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব আমরা কীভাবে নিশ্চিত করবো আগামী দিনে। এই সমস্ত বিষয় রয়েছে। নারীদের আমরা স্থান দিয়েছি পঞ্চাশটা, উনাদের আমরা প্রত্যক্ষ ভোটে নিয়ে যাবো কি না, ইত্যাদি বিষয় আছে। সেহেতু সংস্কারের জন্য, কী যেন বলেন আপনারা রাষ্ট্রকে মেরামতের করতে হবে?

জিল্লুর রহমান: রাষ্ট্র মেরামত করতে হবে। তরুণরা বলছেন। আমরা না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো মেরামতের জন্য ইংরেজিতে আবার বলি ওভারঅলিং লাগে কি না। ওটার ডেন্টিং-পেইন্টিংয়ের সময় চলে গেল। এখন ওভারঅলিংয়ের সময় চলে আসছে, ইঞ্জিন বদল করার সময় হচ্ছে কি না। কিন্তু কেউ যদি বলেন এই কথাগুলোর অর্থ হলো যে আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বাধীনতার মূল্যবোধ অস্বীকার করছি, ইত্যাদি, আমি বলছি মোটেও না। স্বাধীনতার মানেই হলো নতুন চিন্তা করার ক্ষমতা। স্বাধীনতার মানেই হলো আমার নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেয়ার জায়গা সৃষ্টি করা। আমিই তো পরাধীন হয়ে রয়েছি পুরনো চিন্তাতে। আমিই তো স্বাধীন করতে চাচ্ছি না দেশটাকে। আমার মনে হয় আগামীদিনে এই স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়া নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ হয়েছে। একদিকে মনে হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আমরা একদম নিপতিত হলাম, আবার মনে হয়েছিল ১৯৮৯–৯০ এ আমরা হয়তো গণতন্ত্র ফিরে পেলাম। আবার দেখেন এখন আরেকটা পরিস্থিতির ভিতরে আছি। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় আমি বলতে চাই বাংলাদেশে তাৎক্ষণিক পর্ব শেষ হয়ে গেছে। বা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার সংকেত চারিদিকে আছে। সেইটার দামাম বাজছে। এবং সেই উত্তর-পর্বের দায়িত্ব নেয়ার জন্য মানুষগুলো আছে। তার মধ্যেখানে আমরা কাল পর্বে বিচরণ করছি। এই কাল পর্বকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যাতে সর্বাপেক্ষা কম ধ্বংস, মৃত্যু এবং হানাহানিকে দিয়ে এইটা যায়। কারণ এই কাল পর্ব যতই বড় হবে তত এই সমাজের ভিতরে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা, বিদ্বেষ, হিংসা এগুলো বৃদ্ধি পাবে। আমরা ইংরেজিতে আমাদের সাইন্সে আমরা বলি এটা হলো সোশ্যাল ক্যাপিটাল। যে সমাজে সোশ্যাল ক্যাপিটাল কমতে থাকে তার ইকোনমিক ক্যাপটাল দিয়ে সে বেশি দূর আগাতে পারে না। এই সোশ্যাল কাপিটালটা নষ্ট হতে যেন না দেই। স্বাধীনতার সময় সোশ্যাল ক্যাপিটাল, এই সামাজিক পুঁজি আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওইটেই হলো স্বাধীনতা ২০২৪-এ। আমি এইটা নিশ্চিত যে এইটার ভিতর দিয়ে আমরা একটা নতুন, উন্নততর, আরো অনেক বেশি ন্যায়-ভিত্তিক একটা বাংলাদেশের দিকে আমরা এগিয়ে যাবো।

জিল্লুর রহমান: অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দর্শক, কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাৎক্ষণিক কাল সেটা প্রায় শেষ। আমরা এখন কাল পর্বে আছি। এবং ভবিষ্যতটা তিনি উত্তর পর্ব মনে করেন। এবং কাল পর্ব তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন সেটা একটা ভয়ংকর পর্ব এবং সেই পর্বের মধ্যে আমরা আছি। তিনি অর্থনীতিদবিদ হয়ে এটাকে যেহেতু মহাকাল বলছেন, তিনি অর্থনীতির আলোচনাও করতে চাননি। সমাধান যা কিছু এক কথায় এক বাক্যে রাজনৈতিক সমাধান দরকার এবং সেই রাজনৈতিক সমাধানটার মধ্যেও তিনি সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি। তার জন্য অবশ্যই পলিটিক্যাল উইলের কথা বলেছেন, সেটা থাকতে হবে। এর একটা রাষ্ট্রীয় নিষ্পত্তি করতে হবে। এবং সেই নিষ্পত্তির আলোচনার মধ্যে অনেকগুলো সংস্কারের কথা এসেছে। অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে। সব কথার মূল কথা গত কয়েকদিন আমরা যা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে তিপান্ন বছরের বাংলাদেশ থেকে একেবারেই ভিন্ন একটা

বাংলাদেশ। এবং বাংলাদেশ আসলে যেভাবেই বলি না কেন আমরা আমূল বদলে গেছে। এইটা এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিটি নাগরিকের মাথায় নিতে হবে। যে বাংলাদেশ আমরা ভেবেছিলাম যে নির্মাণ করেছি, বাংলাদেশ আমরা সামনে দেখবো বলে মনে করেছি, সেই বাংলাদেশ আসলে নেই। ভিতরে ভিতরে অনেক বদলে গেছে, আমূল বদলে গেছে। এবং সেখানে একটা আশার আলো আছে। এবং আমরা চাই কিংবা না চাই সেই আশা বা সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিবে সেটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আমাদের তরুণরা-তরুণীরা তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে।

চ্যানেল আই
২ আগস্ট ২০২৪

অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য আসবে আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবতা ও নেতৃত্বের সক্ষমতার সমন্বয়ে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতির খারাপ সময় যাচ্ছে। গণরোষে বিদায় নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে ৮ আগস্ট। অর্থনীতির নানা দিক, চ্যালেঞ্জ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে প্রত্যাশা ইত্যাদি নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে গতকাল রোববার সিপিডি কার্যালয়ে কথা বলেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম।

প্রথম আলো: দেশের অর্থনীতির অবস্থা কী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এখন প্রধান করণীয় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশের অবস্থা ভালো বলার সুযোগ নেই। অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটা শ্বেতপত্র তৈরি করতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ সরকার কতটা, কী করতে পারবে, তা নির্ভর করবে অবশ্য সরকারের মেয়াদের ওপর। দেশে যে জটিল পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে, শ্বেতপত্র তৈরি হলে উত্তরণের জন্য একটি পথনির্দেশিকা পাওয়া যাবে। একদিকে পরিস্থিতির ভিত্তি, অন্যদিকে ইতিহাস—দুই দিক থেকেই কাজ করবে এ শ্বেতপত্র। শ্বেতপত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি মূল অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা দেবে একধরনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি। কোনো কারণে সরকার যদি তা না করে, তাহলে পেশাজীবী নাগরিক সম্প্রদায়ের এগিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি, এ ধরনের শ্বেতপত্র পরামর্শমূলক দলিল হিসেবে কাজে দেয়। অর্থাৎ, সরকারকে বেঁধে ফেলে না। সরকারের কৃতিত্ব বা দায় নেওয়ার জন্যই এটি হওয়া দরকার। সরকার যদি এটি না করে, তাহলে আর্থিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে সিপিডিরই তা করা উচিত। তবে কাজটি করতে এক মাসের বেশি সময় নেওয়া যাবে না। বড়জোর দেড় মাস সময় নেওয়া যেতে পারে। সরকার যদি অন্য কিছু না-ও করে, এ শ্বেতপত্রই একটা অবদান হিসেবে থেকে যাবে।

প্রথম আলো: আপনি যে শ্বেতপত্রের কথা বলছেন, সেটির কাঠামো বা কীভাবে সেটি তৈরি হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই কাঠামোর সঙ্গে সরকারের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোও যুক্ত হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান তখন একটি অবস্থানপত্র তৈরি করবে। যেমন দায়দেনা পরিস্থিতি নিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবস্থানপত্র রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থানপত্রও লাগবে। নিতে হবে অংশীজনদের মতামত। আর যুক্ত করতে হবে বেসরকারি খাত, বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের। ব্যক্তি খাতের বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মতামতও নিতে হবে।

প্রথম আলো: এর বাইরে নতুন সরকারকে আর কী কী করতে হবে বলে মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অন্তর্বর্তী সরকারের আরেকটা কাজ করা দরকার। সেটা হচ্ছে ডেটা বা তথ্য-উপাত্ত কমিশন। তথ্য-উপাত্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ। তথ্যের যেসব ব্যত্যয় হয়েছে, যেসব ঘাটতি আছে, সেসব পরিষ্কার করতে হবে। যুক্ত করতে হবে তথ্যের উৎপাদক, ব্যবহারকারী এবং মূল্যায়নকারী—এই তিন পক্ষকে। সরকারি তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে পেশাদারির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

প্রথম আলো: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলবেন কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ব্যাংক খাতের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ফুসফুসের মতো কাজ করে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য অন্তত একটা টাস্কফোর্স গঠন করা চাই। আর ব্যাংক খাতের জন্য চাই ব্যাংক কমিশন। ২৩ থেকে ২৪ হাজার মেগাওয়াটের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন ১২ থেকে ১৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমদানি করতে হচ্ছে, টাস্কফোর্স তার ওপর প্রাথমিক একটা প্রতিবেদন দেবে। রেন্টাল, কুইক রেন্টাল ও দায়মুক্তির বিষয়গুলোও উঠে আসবে টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে।

প্রথম আলো: আপনারা অনেক দিন ধরেই ব্যাংক কমিশনের কথা বলছেন। এ কমিশন গঠন করলে কী সুবিধা হবে বলে মনে করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগে ব্যাংক কমিশন একটা হওয়া উচিত। সরকার ব্যাংক খাতের রোগনির্ণয় করার সময় পাবে, নাকি পথ্য দেওয়া ও চিকিৎসা করার সময় পাবে, জানি না। ফলাফল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে কি না, তা–ও জানি না। তবে ব্যাংক খাতে তথ্য-উপাত্তের সঠিকতা যাচাই করা হবে কমিশনের প্রথম কাজ। বড় কাজ হবে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা। প্রভিশন ঘাটতি ও মূলধন পর্যাপ্ততার মতো বিষয়গুলোও স্বচ্ছতার সঙ্গে যাচাই করা দরকার। ব্যাংক কোম্পানি আইনে এক ব্যাংকে এক পরিবার থেকে তিনজনকে টানা ৯ বছর থাকার সুযোগ দেওয়া আছে। এগুলো শিথিল করতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য আমানতকারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত করা যাবে না। বরং একটি বাস্তবসম্মত 'এক্সিট পলিসি' প্রণয়ন করতে হবে। পর্যালোচনা করতে হবে ঋণ অবলোপনের নিয়ম। ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগপ্রক্রিয়া এখন ঠিক নেই। এখানে আরও স্বচ্ছতা ও পেশাদারি আনা দরকার।

প্রথম আলো: রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর অনেকে ব্যাংকের মালিকানায় রয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে করণীয় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি খুবই জটিল রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। তাঁদের মালিকানার প্রশ্নটি স্বচ্ছতার সঙ্গে সুরাহা করতে হবে। ব্যাংক খাতে করপোরেট সুশাসনে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে, যার সঙ্গে মালিকানা ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা জড়িত। ব্যাংক থেকে একক ব্যবসায়ী কত ঋণ পাবেন, পরিচালনা পর্ষদে এক পরিবার থেকে কতজন থাকবেন, এগুলোর মূল্যায়নও দরকার। আরও দরকার খেলাপি গ্রাহকদের খেলাপি তালিকা থেকে বের হওয়ার নীতি এবং অবলোপন নীতি প্রণয়ন করা। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ভালো কাজ করে না।

প্রথম আলো: রাষ্ট্রমালিকানাধীন ও সরকারি ব্যাংকগুলোর বিষয়ে সরকারের কী করা উচিত বলে মনে করেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকারি ব্যাংক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যাওয়া ভালো হবে। আরেকটা পরামর্শ দিতে চাই। সেটা হচ্ছে ব্লু রিবন কমিটি করা। অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ ও পেশাদারদের সমন্বয়ে তা গঠিত হবে। যারা ব্যাংকে পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী নিয়োগের সুপারিশ অনুমোদন দেবে। ব্যাংকের পাশাপাশি এ ধরনের কমিটি দুদক, নির্বাচন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এতে করে রাজনৈতিক অনুগ্রহে নিয়োগ দেওয়ার চর্চা বন্ধ হতে পারে।

প্রথম আলো: প্রায় দেড় বছর ধরেই দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে নতুন সরকারের করণীয় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যনিরাপত্তা হতে হবে সরকারের এক নম্বর অগ্রাধিকার বিষয়। খোলাবাজারে সাশ্রয়ী দামে যে নিত্যপণ্য বিক্রি করা হচ্ছিল, তা বজায় রাখতে হবে। আর নিশ্চিত করতে হবে মাথাপিছু খাদ্যনিরাপত্তা। খাদ্য উৎপাদনের তথ্য এত দিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এগুলো ঠিক করতে হবে। আর ঠিক রাখতে হবে পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রথমে দরকার বর্তমানের খাদ্য মজুত পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং আমন সংগ্রহ অভিযান কার্যকরের পরিকল্পনা গ্রহণ। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং ঘাটতি থাকলে আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বন্দরগুলোকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা।

প্রথম আলো: সরকারের দায়দেনা পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটির মূল্যায়ন হওয়া জরুরি। বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যেন উন্নয়ন সহযোগীরা পূরণ করে, সেই চেষ্টা অবশ্যই থাকতে হবে সরকারের। কারণ, সাহায্যের ভালো একটা অংশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হয়। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যদের ঋণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে মনোযোগ থাকতে হবে। আগের সরকার যেসব চুক্তি করেছে, কোনো অবস্থাতেই এসব অর্থায়ন আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি যাতে না হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যাতে ভাতা বন্ধ না হয় বা পরিধি যাতে সংকুচিত না হয়।

প্রথম আলো: বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনার শেষ কথা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি, তিনটা বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা। এ তিনের ভালো সমন্বয়েই সাফল্য আসবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের। আর এ ধরনের সরকার আগেও ছিল। আগের সরকারগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকারও আছে নতুন সরকারের। আশা করছি, নতুন সরকার একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি আমার আরেকটি প্রবল আশা আছে। সেটি হচ্ছে, নতুন সরকার যেন নতুন একটি সংবিধান রচনা করে।

প্রথম আলো
১৩ আগস্ট ২০২৪

সরকারকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতা ও সক্ষমতার সামঞ্জস্য রাখতে হবে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-সিপিডির একজন সম্মাননীয় ফেলো। তিনি এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক। এ ছাড়া তিনি জাতিসংঘের এলডিসি সংক্রান্ত কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি-সিডিপির অন্যতম সদস্য। এর বাইরে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা, মস্কো, অক্সফোর্ড ও ওয়াশিংটনে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৫৬ সালে। আদি নিবাস টাঙ্গাইল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের সহযোগী সম্পাদক শেখ রোকন।

সমকাল: ওয়ান ইলেভেন সরকার এবং এবারের সরকারের মধ্যে মিল খুঁজে পান?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অথবা ক্ষমতার গণতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, দেশ প্রথমে হোঁচট খায়, পরে আছাড় খেয়ে পড়ে। এটা ওয়ান ইলেভেনের সময় হয়েছিল, এবারও হলো। ২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়নি, তিন মাস পরে ২০০৭ সালে জানুয়ারির ১১ তারিখে হয়েছে। এবারও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। বিনা ভোটের নির্বাচনে সরকার বানানোর চেষ্টা হয়েছে ৭ জানুয়ারি, আছাড় খেয়েছে আগস্ট মাসে এসে।

সমকাল: কেন আছাড় খেতে হয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচনে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা থাকলেও রাজনৈতিক বৈধতা থাকে না। পরবর্তী সময়ে নৈতিক বৈধতার সংকট অবধারিতভাবেই একটা পর্যায়ে গিয়ে ক্ষোভের উদ্গিরণ সৃষ্টি করে।

সমকাল: ওয়ান ইলেভেন পরিস্থিতি ও এবারের গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিএনপি সরকারের রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে বিরোধী দলগুলো নেতৃত্বে ছিল। এবার প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তির বদলে নতুন সামাজিক শক্তি ছাত্র-যুবারা নেতৃত্ব দিয়েছে। সেবার প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলো সামনে রেখে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পরে সেটা আর্থ-সামাজিক সংস্কারের দিকেও গড়িয়েছে। এবার অরাজনৈতিক বিষয়, যেমন কোটা সংস্কারের বিষয়টি সামনে রেখে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পরে সেটা রাজনৈতিক লক্ষ্যে গড়িয়েছে।

আপনি বলতে পারেন, সেবার আমরা বড় বিষয় থেকে ছোট বিষয়ে নেমে এসেছিলাম। সুষ্ঠু নির্বাচনের ইস্যু থেকে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদত্যাগ ইস্যুতে নেমেছিলাম। সিন্ধু থেকে বিন্দুতে নেমেছিলাম। এবার আমরা বিন্দু থেকে সিন্ধুতে গেছি। কোটার মতো সামাজিক ইস্যু থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক ইস্যুতে এসেছি। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, প্রফেসর ইউনূসের সরকার একটি দৃশ্যমান ছাত্র-জনতার সমর্থন নিয়ে এসেছে।

সমকাল: সেনাবাহিনীর ভূমিকার মধ্যেও বোধহয় পার্থক্য রয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেবার সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল অ্যাকটিভ; এবারের ভূমিকা রেসপন্সিভ। সেবারের পরিবর্তনে সেনাবাহিনী নেতৃত্ব দিয়েছে; এবার নেতৃত্ব দেয়নি বা দিতে চাচ্ছে না বা দেওয়ার পরিস্থিতি নেই। এবার তারা শুধু পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে।

সমকাল: নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে দুই পরিস্থিতির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগেরবার আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে প্রচলিত বিষয়াদি সামনে ছিল। নির্বাচন, ভোটার তালিকা, দুর্নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। এবার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। সেই অর্থে সমাজে এক ধরনের পরিপক্বতা দেখা যাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে, টোটকা ওষুধে কাজ দেবে না। আরেকটু গভীরে গিয়ে কাঠামোগত চিকিৎসা লাগবে। সংস্কার শব্দটি আবার জনপ্রিয় হয়েছে।

সমকাল: কাঠামোগত চিকিৎসা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যেমন– সংস্কার চাই। কিন্তু সংস্কারের সাংবিধানিক ব্যাকরণ কী হবে, পরিধি কী হবে, কর্মপদ্ধতি কী হবে, নেতৃত্ব কে দেবে, মূল্যায়ন কে করবে ইত্যাদি। উপরন্তু সংস্কার প্রক্রিয়ার ভেতরের জবাবদিহি কে নিশ্চিত করবে; আস্থাভাজন জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে

জনগণের প্রকৃত প্রত্যাশা কীভাবে প্রতিফলিত হবে; নাগরিক সম্পর্ক কী ভূমিকা রাখবে; সেই সংস্কার কীভাবে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে স্থাপিত হবে– এগুলো।

সমকাল: অনেক বেশি বিষয় টেবিলে তুলতে গিয়ে সরকারের গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্ন কি উঠতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনির্বাচিত সরকার নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হোক না কেন; একটা সময়ের পরে তার গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নটি সামনে আসেই। ওয়ান ইলেভেন সরকার দুই বছর মেয়াদ শেষ করে দ্রুত বের হয়ে গেছে অনেকটা সেই প্রশ্নের মুখে পড়েই। তাই এ ধরনের সরকার অনির্বাচিত হলেও অবৈধ নয়। কারণ ওয়ান ইলেভেন সরকার বা এখনকার সরকার যে সংবিধানের ১০৬ ধারাবলে বৈধ– সেই রায় সুপ্রিম কোর্টই দিয়েছেন। কিন্তু মেয়াদ দীর্ঘায়িত হতে থাকলে গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নটি জোরালো হতে থাকে।

সমকাল: ওয়ান ইলেভেন সরকারের অগ্রাধিকারের এক নম্বরে ছিল সুষ্ঠু নির্বাচন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সে জন্যই তো দুই বছরের মধ্যে সুষ্ঠু ভোটার তালিকা, এনআইডি কার্ড তৈরির বিষয়টিকে তারা অগ্রাধিকার দিয়ছিল। দুই বছরের মধ্যেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়কে তারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তবে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়ও ছিল, যা পরে বিপথগামী হয়।

সমকাল: নির্বাচন এবারের সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার কত নম্বরে রয়েছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবার কয় নম্বরে আছে, আমি জানি না। তবে এটা ন্যূনতম লক্ষ্য। কিন্তু দেখছি যে অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা অগ্রাধিকার তালিকার ওপরের দিকে উঠে এসেছে। এটাকে আমি বলব সামাজিক পরিপক্বতার লক্ষণ। নির্বাচন দিয়ে শাসক বদল করলেই যে সুশাসন আসে না– এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। যুবসমাজ যথার্থই বলছে যে, আবার যেন পুরোনো পরিস্থিতি না হয়। যে যে আচরণের জন্য বিগত সরকারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, আগামী সরকার এসে যদি সেই আচরণই করে, তাহলে লাভ কী হলো? এ বদল করে বি বা সি এনে লাভ কী?

সমকাল: কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময় কি পাওয়া যাবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেই ঝুঁকি রয়েছে। কারণ বাঙালি একটু ছটফটে জাতি। বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। যে বাঙালি আপনাকে আজকে কোলে তুলে উল্লাস করছে, সেই বাঙালি আগামীকাল হয়তো পদদলিত করে ফেলবে। এই জাতির উচ্ছ্বাস ও হতাশা দুটোই দ্রুত আসে।

সমকাল: এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় নতুন সরকার কী করতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নতুন সরকারকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতা ও সক্ষমতার সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কেউ কেউ বলছেন, এই সরকার তিন বা পাঁচ বছর থাকবে। অসম্ভব! গণতান্ত্রিক বৈধতা ব্যতিরেকে একটি সরকার তিন বা পাঁচ বছর থাকার কোনো সুযোগ নেই। যারা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকার এনেছে, সেই জনগণই রাজি হবে না।

সমকাল: গণতান্ত্রিক বৈধতার চেয়েও বড় প্রশ্ন, একটি বড় রাজনৈতিক দল ক্ষমতার ঘরে ঢোকার জন্য ১৮ বছর ধরে অপেক্ষা করছে। তাদের আপনি কতক্ষণ দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সে তো বটেই। বিএনপি তো অপেক্ষায় আছেই। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগও তাড়াতাড়ি নির্বাচন চায় বলে ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে। এক্ষেত্রে অনেক দেশে যেটা করে, সেই গণভোট দিতে পারে। আমাদের দেশেও একবার গণভোট হয়েছিল।

সমকাল: আমাদের দেশে আসলে তিনবার গণভোট হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের শাসন নিয়ে, এইচএম এরশাদের শাসন নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে যাওয়ার প্রশ্নে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তিনবার হয়েছিল নাকি! তাহলে তো ভালো, আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই গণভোটের মাধ্যমে সরকার কিন্তু গণতান্ত্রিক বৈধতা পেতে পারে। গণভোটের ভেতরে সরকারের মেয়াদকাল ছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিষয় থাকতে পারে। যেমন– সরকার প্রধান দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না; সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; রাজনৈতিক দলের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা; জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি।

সমকাল: গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠনের নামটাও নিশ্চয় সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য– বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ছাত্ররা যে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার কথা বলছে, সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে আসলে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার প্রতিফলিত। এখন দেখতে হবে, কোথায় কীভাবে বৈষম্য দূর করা যায়। নতুন সরকারকে অংশীজন নিয়ে এসব বিষয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

সমকাল: ওয়ান ইলেভেনের সময় সেনাবাহিনী ছিল চালকের আসনে। এবার নাগরিক সমাজকে চালকের আসনে দেখা যাচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি কি সেটাই মনে করছেন?

সমকাল: আমি আপনার পর্যবেক্ষণ জানতে চাইছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, এটা সত্য যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেখানে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকারবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। অ্যাডভোকেসি এনজিও, বাস্তবায়নকারী এনজিওর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। যেসব ব্যক্তি আছেন, তারা নিঃসন্দেহে স্বনামখ্যাত। কিন্তু প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব এবং প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব বা কার্যকর পরিবর্তনের সংহত শক্তি– দুটো ভিন্ন বিষয়। পরিবর্তনের জন্য যে অনবরত সংঘবদ্ধতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার চালিকাশক্তি থাকতে হয়, সেটা দৃশ্যমান হতে হবে।

সেটা বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের আছে, দেখার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু সামনের দিনগুলোতে প্রতীয়মান হতে হবে। আরেকটি বিষয় আছে। জনমানুষের কথা বলে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া এক জিনিস, আর সেগুলো পরিপালন করার ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়া আরেক জিনিস।

সমকাল: সেই জবাবদিহি ব্যবস্থা কেমন হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, এই সরকার ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নিয়ে গঠিত হয়েছে মাত্র কয়েক দিন হলো। এই সরকারকে ভেতরে-বাইরে জবাবদিহির মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে যেসব উদ্ভাবনী ব্যবস্থা থাকা উচিত, সেগুলো এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়ার জন্য সময় দেওয়া উচিত। আবার এটাও ঠিক, প্রথম থেকেই জবাবদিহির একটি রূপরেখা থাকতে হবে। বেশি দেরি করলে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে।

সমকাল: জবাবদিহির রূপরেখার মধ্যে কী থাকতে পারে? কোনো উদাহরণ দিতে পারেন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যেমন মিডিয়া কী ভূমিকা পালন করবে, মিডিয়ার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে। যেমন নাগরিক সমাজে থাকা সহকর্মীদের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। ব্যক্তি খাতে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী ছিল। তাদের জায়গায় ব্যক্তি খাতের নতুন যে গোষ্ঠী নেতৃত্ব নেবে, তারা কী ভূমিকা পালন করবে। উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আগের সরকারের যেসব অঙ্গীকার রয়েছে, সেগুলোর কী হবে। এসব বিষয় এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে স্পষ্ট করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে চর দখলের যে প্রবণতা দেখি তা চিন্তিত করে।

সমকাল: স্পষ্ট করার প্রক্রিয়াটা কেমন হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার প্রত্যাশা থাকবে, এসব বিষয় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, পরামর্শ করার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সবটার জন্যই যে তৈরি সমাধান রয়েছে, এমন নয়। ভবিষ্যৎমুখী সংলাপ ও গঠনমূলক বিতর্ক দরকার।

সমকাল: নতুন সরকারের সময় সিভিক স্পেস বা নাগরিক পরিসর কি প্রশস্ত হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নাগরিক সমাজের কাজের ক্ষেত্রে সরকার আরোপিত যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা কিছুটা দূর হবে বলে মনে হয়। কিন্তু এই সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সক্ষমতা রাখি কিনা, সেটা ভাবার বিষয়। আমি মনে করি, সিভিক স্পেস বাড়ানোর ক্ষেত্রে যতখানি না নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, গ্রহীতাদের সক্ষমতার ভূমিকা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সিভিক স্পেস যারা বাড়াতে চান, তাদের উদ্যোগ, সক্ষমতা, সাহসিকতা, চিন্তার উদ্ভাবনী শক্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অংশীজনের নাগরিক পরিসর থাকলেই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা ব্যবহৃত হবে, এমন নয়।

নাগরিক পরিসর বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এখন নাগরিক সমাজকে তাদের সক্ষমতা দেখাতে হবে। যেহেতু প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তির একটি অংশ দুর্বল হয়ে গেছে, সেহেতু জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। এ কথা যখন বলি, তখন তাদের কৌশলগত সহযোগী মিডিয়ার ভূমিকার কথা কম করে বলার সুযোগ নেই।

সমকাল: গণঅভ্যুত্থানকালে মিডিয়ার ভূমিকা কেমন দেখেছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গণতান্ত্রিক উত্তরণকালে মিডিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। সীমিত সুযোগ নিয়েও মিডিয়া বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি। ক্ষমতাচ্যুতির আগে সরকারের সরাসরি সমালোচনা করতে না পারলেও প্রতিদিন কতজন নিহত হলো, কোথায় কীভাবে নিহত হলো– এগুলো পরিবেশন করে অভিনবত্ব দেখিয়েছে।

তবে কিছু মিডিয়ার ভূমিকা তাদের জনবিদ্বেষী চরিত্র প্রকাশ করেছে।

সমকাল: নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বা ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় নাগরিক সমাজের উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া দেখা গেছে। এবার...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্মরণ করাতে চাই, নাগরিক সমাজের দিক থেকে কখনও রাজনৈতিক দল গঠনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়নি। নাগরিক সমাজের ব্যক্তিবিশেষের উৎসাহ থাকতে পারে।

সেটা তো বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকই করতে পারেন। যে কোনো নাগরিক রাজনৈতিক দল গঠন বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। সেটা নাগরিক সমাজের সামষ্টিক কোনো অবস্থান নয়। এ দুটো বিষয় আপনাকে আলাদা করে দেখতেই হবে।

সমকাল: এবার কী হবে, নাগরিক সমাজের কেউ কি রাজনৈতিক দল গঠনে আগ্রহী হতে পারেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিষয়টি সম্পর্কে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে যেদিন নাগরিক সমাজের কেউ রাজনৈতিক দল গঠন করবেন বা কোনো দলে যোগ দেবেন, সেদিন থেকে তিনি নাগরিক সমাজের কেউ নন। সেদিন থেকে তিনি রাজনৈতিক সমাজের অংশ। সেদিন থেকে তাদের দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক সমাজের; নাগরিক সমাজের নয়।

সমকাল: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তারা যদি দল গঠন করতে চায়, করবে। একাধিক দলও হতে পারে। এতে বাংলাদেশের রাজনীতি আরও পুষ্ট হবে। এর আগেরবার কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব তো একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। আমি তো তরুণদের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা রাজনীতিতে বিনিয়োগের পক্ষে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একটি অংশ তো সরকারেরও অংশ হয়েছে। সেটা তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বাড়াবে। একই সঙ্গে সরকারের বাইরে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে, আগামী নির্বাচনেও তারা অংশ নিতে পারে। আমার উৎসাহ থাকবে নতুন নেতৃত্ব দেখার।

সমকাল: সরকারের আগামী পথ কেমন দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিপ্লব করা কঠিন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কঠিন রাষ্ট্র পুনর্গঠন ও পরিচালন। এই উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকবে। নতুন টেনশন সৃষ্টি করবে। ইংরেজিতে বলে, 'সিঙ্ক' করবে। আমরা এখনও ইউফোরিয়ার মধ্যে আছি। ইউফোরিয়ার বাংলা কী?

সমকাল: উচ্ছ্বাস।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা এখনও উচ্ছ্বাসের মধ্যে আছি। ক্রমান্বয়ে বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। সেটা দ্রুতও ঘটতে পারে। সেই সময়ে উদ্ভাবনী শক্তি, নেতৃত্ব, সক্ষমতা, জনসম্পৃক্ততা—এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টার মধ্যেই বিজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। বাস্তবতার সঙ্গে সামনের দিনগুলোতে নতুন সরকার কামিয়াব হোক, সেটাই প্রত্যাশা করি।

সমকাল: শেষ করি এই প্রশ্ন দিয়ে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে আপনিও থাকছেন— এমন আলোচনা সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, আপনি নেই। চাইলে এ প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার মানে তো শুধু কয়েকজন উপদেষ্টা নয়। বুঝতে পেরেছেন?

সমকাল: বুঝতে পেরেছি, সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাদেরও ধন্যবাদ।

সমকাল
১৯ আগস্ট ২০২৪

আর্থিক খাত সংস্কারের সময়নির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা উচিত

ড. ফাহমিদা খাতুন

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের সহযোগী সম্পাদক জাকির হোসেন

ড. ফাহমিদা খাতুন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ - সিপিডির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালক ছিলেন। তিনি বিআইডিএসে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন।

পরিচালক পদে কাজ করেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েট ফাহমিদা যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল সম্পন্ন করেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের সহযোগী সম্পাদক জাকির হোসেন

সমকাল: বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে নানা সংকট মোকাবেলা করছে। এর মধ্যে গণঅভ্যুত্থানে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। আপনি কি অর্থনীতির প্রধান সংকটগুলো এবং সেগুলোর উৎস নিয়ে বলবেন?

ফাহমিদা খাতুন: অর্থনীতিতে বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি হয়েছে মূলত নীতিগত দুর্বলতার কারণে। সঠিক সময়ে সঠিক নীতি নেওয়া হয়নি। নীতির ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা ছিল। একই সঙ্গে কিছু ভুল নীতি নেওয়া হয়েছে। এ কারণে সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। অর্থনীতির প্রায় সব সূচক নিম্নমুখী হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমেছে। মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বড় ধরনের পতন হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা দেখা গেছে। কর-জিডিপি হার বাড়েনি, যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের তুলনায় কম। পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়েনি। জ্বালানি খাতে নানা সংকটের পাশাপাশি অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি

ঘটেছে। অর্থনীতি ঋণভারে জর্জরিত। সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক খাত বিশেষত ব্যাংকিং খাতের ভয়াবহ দুর্বলতা। এসবের ফলে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে এক সময় যে স্থিতিশীলতা ছিল, অর্থাৎ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নিম্ন মূল্যস্ফীতি এবং বহির্খাতে যে শক্তিশালী অবস্থা ছিল, তা নষ্ট হয়েছে।

আরেকটি বিষয় হলো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। পাশাপাশি বৈষম্য কমাতে পারেনি, বরং বেড়েছে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে এসব সংকটের অনেকটাই এড়ানো যেত। অথচ নীতিনির্ধারকরা অর্থনীতির সংকটকে স্বীকৃতিই দিতে চাননি। যেমন– দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির চাপ ছিল এবং এ চাপ কমাতে সঠিক মুদ্রানীতি নেওয়া হয়নি। সুদের হার বাড়িয়ে বেশির ভাগ দেশ যখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করছিল, বাংলাদেশ ব্যাংক তখন সুদের হারের ওপর সীমা দিয়ে রেখেছিল। যদিও গত জুলাই মাসে ওই সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনেক দেরিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সমকাল: কিন্তু মূল্যস্ফীতি তাতে কমেনি।

ফাহমিদা খাতুন: সুদের হার বৃদ্ধির ফল পেতে সময় লাগবে। আবার মুদ্রানীতি এককভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ জন্য সহযোগী রাজস্ব বা আর্থিক নীতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গেছে, মুদ্রানীতি সংকোচনমূলক করা হলেও সরকার ব্যয় সংকোচন করতে পারেনি। অন্যদিকে বাজার ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা কাটানো যায়নি। বেশকিছু নিত্যপণ্যের আমদানিকারকের সংখ্যা খুবই সীমিত। আবার আন্তর্জাতিক বাজারের অজুহাত দিয়ে দেশে উৎপাদিত পণ্যের দামও সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। পণ্যের সরবরাহ চেইনে রাজনৈতিক কর্মী, মাস্তান, এমনকি পুলিশকেও চাঁদা দিতে হয়। মূল্যস্ফীতি কমাতে গেলে সব সমস্যা দূর করার নীতি থাকতে হয়, যা এতদিন আমরা দেখিনি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনেছে। কিন্তু ভুল নীতির কারণে মূল্যস্ফীতিসহ অর্থনীতির সংকট কাটিয়ে উঠতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

সমকাল: গণমানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাজারে জিনিসপত্রের দাম সহনীয় থাকা। অন্যদিকে যাদের আয় খুবই কম তাদের খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। নতুন সরকার মানুষের এ প্রত্যাশা পূরণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

ফাহমিদা খাতুন: বাজারে পণ্যের সরবরাহ থাকলেও মানুষের হাতে টাকা না থাকলে তো সে কিনতে পারে না। তখন তার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এখন যে বন্যা হচ্ছে, তাতে মানুষের জীবন-জীবিকার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ জন্য সরকারের কিছু পদক্ষেপ আগে থেকেই নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়াতে হবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা এবং পরিমাণ। সিপিডির পক্ষ থেকে গত বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, খাদ্য বিতরণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে বরাদ্দ কমে গেছে। এখন কিন্তু এগুলো বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কমে এলে মানুষ একটু স্বস্তি পাবে। এ

ছাড়া মানুষের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি হতে হবে। যারা কাজে নেই, তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

সমকাল: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে একটি ব্যাংক কমিশন গঠন করেছে; ১০০ দিনের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপনসহ সংস্কারের একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে। আপনার মতে, এর প্রক্রিয়া কী হলে আমরা ভঙ্গুর ব্যাংকিং খাত নিয়ে আশার আলো দেখতে পারি?

ফাহমিদা খাতুন: ব্যাংক কমিশন গঠনের ঘোষণা অবশ্যই ইতিবাচক। এর মানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যাংকিং খাতের সমস্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১২ সালে হলমার্ক কেলেঙ্কারির পর থেকেই সিপিডি ব্যাংক কমিশনের কথা বলে আসছে। এর পর গত ১২ বছরে একটার পর একটা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। এখন ব্যাংক কমিশন গঠন এবং ১০০ দিনের মধ্যে অর্থনীতির চিত্র উপস্থাপনের যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এ কারণে যে, এতে ব্যাংকিং খাত এবং অর্থনীতির আসল স্বাস্থ্য বেরিয়ে আসবে। বেশ কিছু ব্যাংকের অবস্থা খুবই দুর্বল। দুর্বলতার গভীরতা ব্যাংক কমিশন বের করে যেসব সুপারিশ করবে, তা বাস্তবায়ন করলে আমরা এ খাতের উন্নতি দেখতে পাব।

সমকাল: সিপিডির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণের নামে ৯২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। কারা কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ পেয়েছে? এ অর্থ আদায় করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো এখন কী করতে পারে?

ফাহমিদা খাতুন: ১৫ বছরের যে তথ্য আমরা দিয়েছি, তা পুরো চিত্র নয়। বড় ২৪টি ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা থেকে আমরা এ অঙ্কের কথা বলেছি। ভুয়া কোম্পানি, ভুয়া জামানতসহ নানা জালিয়াতির মাধ্যমে এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকারদের সঙ্গে যোগসাজশে এসব অন্যায় হয়েছে। ব্যাংকার অনেকেই চাপে পড়ে অন্যায় করেছেন। আমার পরামর্শ, যেসব ব্যাংকে বড় অনিয়ম হয়েছে, তাদের পর্ষদ ভেঙে দেওয়া এবং নতুন পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা নিয়োগ করা। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অনিয়মের ঋণের বিপরীতে যতটুকু জামানত রয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অপরাধীদের শেয়ারগুলো জব্দ করে বিক্রি করে দিতে হবে। এসব প্রক্রিয়ায় কিছু টাকা ফেরত আসবে। তবে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে এক পর্যায়ে অন্য সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করতে হবে। অবশ্য তা জোর করে নয়। আগে ব্যাংকের আসল পরিস্থিতি জানাতে হবে। এর পর আগ্রহের ভিত্তিতে একীভূত করতে হবে।

সমকাল: গত দুই বছরে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল। এ কারণে রিজার্ভের পতন এবং অন্য অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো আমাদের সার্বভৌম ঋণমান কমিয়েছে। এ অবস্থা থেকে আমরা কীভাবে বের হতে পারি?

ফাহমিদা খাতুন: দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে সমস্যা দেখা দিলে আমদানি কমিয়ে আনার নীতি নেওয়া হয়েছিল। তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কেননা, আমদানিনির্ভর দেশ হিসেবে কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি ঠিকমতো আনতে না পারলে রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। গত দুই বছরে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে গতি কমে যায়। এর অন্যতম কারণ, টাকা-ডলার বিনিময় হার দীর্ঘদিন ধরে রাখা। অথচ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী প্রতিটি দেশ তাদের মুদ্রার মান কমানোর দিকে গেছে। এতে রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যায়। অন্যদিকে রেমিট্যান্সে গতি না আসার অন্যতম কারণ ছিল অর্থ পাচার। অর্থ পাচারের কারণে হুন্ডি উৎসাহিত হয়েছে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমিয়ে দিয়েছে। এসব কারণে আমাদের রিজার্ভের বড় পতন হয়েছে। ফলে আমাদের ওপর ঋণদাতাদের আস্থা কমে গেছে। এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার প্রথম উপায় হলো, বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া। আমরা দেখছি সম্প্রতি রেমিট্যান্স বাড়ছে। এটি যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্য পদক্ষেপ থাকতে হবে। আর রপ্তানি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যে কোনোভাবেই অর্থ পাচার বিশেষত বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে।

সমকাল: আর্থিক খাতের পাশাপাশি জ্বালানি খাতেও অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কথা সিপিডি ধীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে। জ্বালানি খাতের মূল সংকটগুলো কোথায়? অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকারকে কী করতে হবে?

ফাহমিদা খাতুন: জ্বালানি খাতের ব্যবসায় অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়াভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছে। ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্লান্ট বা কুইক রেন্টালের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ অপচয় হয়েছে। এখানে কোনো স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। তাদের দায়মুক্তিও দেওয়া হয়েছে। বসিয়ে বসিয়ে তাদের সরকারি অর্থ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকসান হয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো, সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে উল্টো গত দুই বছরে ধাপে ধাপে বেড়েছে। বিপিসির লোকসান, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হয়েছে। আমি মনে করি, এখন শুধু বিদ্যুৎ পেলেই তাদের পরিশোধের নিয়ম করা যেতে পারে। একই সঙ্গে যেসব চুক্তি হয়েছে, তার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। সরকার হয়তো সব চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। দেখতে হবে কোনগুলো আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। সেগুলো অবশ্যই পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র অদক্ষ। এগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের হাতে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কমলে তার সুফল জনগণকে পেতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, জ্বালানি খাতে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যেতে হবে। গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করতে হবে। এখানে কিছু বিনিয়োগ করতে হবে।

সমকাল: নতুন সরকার আর্থিকসহ বিভিন্ন খাতে সংস্কার করে একটি নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। নতুন সরকারের মেয়াদ নিয়ে নানা মত রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মত বলবেন?

ফাহমিদা খাতুন: সবাই আসলে এটি জানতে চাইছে। মানুষের আগ্রহ থাকা দোষের নয়। মানুষ জানতে চাইছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতদিন থাকবে এবং কী কী করবে। আসলে এমন কোনো জায়গা নেই, সেখানে সংস্কারের দরকার হবে না। এই যে এত বছরে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে, তা পরিষ্কার করতে অনেক বছর লাগবে। কিন্তু সবকিছুই তো এ সরকার করতে পারবে না। সে জন্য সব জায়গায় হাত না দিয়ে মূল কিছু জায়গা যেমন– বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন এবং আর্থিক খাতের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এ সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার সংস্কারের একটি সময়নির্দিষ্ট রূপরেখা দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে, কোন বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেবে এবং তার জন্য কত সময় লাগবে– এটি প্রকাশ করা উচিত।

সমকাল: বাংলাদেশের দায়দেনা পরিস্থিতি বিশেষত বড় কিছু অবকাঠামো প্রকল্পের ঋণ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। আমরা কি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কোনো আশঙ্কার মধ্যে রয়েছি? এসব বিষয়ে সার্বিক বিবেচনায় নতুন সরকারের সুনির্দিষ্টভাবে কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ফাহমিদা খাতুন: আমরা উন্নয়ন বলতে শুধু প্রকল্প বুঝেছি। আমরা এত বেশি প্রকল্পের দিকে ঝুঁকে গেছি, এটার 'কস্ট ইফেক্টিভনেস' বা ব্যয়ের বিপরীতে আমরা কী সুফল পাচ্ছি, সেদিকে নজর দিতে পারিনি। যত বড় প্রকল্প তত বেশি দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের মতো উদীয়মান দেশে উন্নত অবকাঠামো দরকার। কিন্তু যেসব মেগা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ব্যয় শুধু বেড়েছেই। এর বিশেষ কারণ দেরিতে বাস্তবায়ন; প্রকল্প যথাসময়ে শুরু করতে না পারা। কোনো কোনো প্রকল্পে চার-পাঁচ গুণ ব্যয় হয়েছে। যত দেরি হয়েছে তত খরচ হয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর দুর্নীতি ও অপচয় হয়েছে। ফলে প্রকল্প থেকে যথাযথ রিটার্ন পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কোনো প্রকল্পে যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই হয়নি। রূপপুর কিংবা রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কিন্তু সরকার তা আমলে নেয়নি। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদার সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এখন প্রকল্পগুলো যাচাই-বাছাই করতে হবে। যেসব প্রকল্প জরুরি দরকার সেগুলো আগে বাস্তবায়ন করতে হবে। দরকার মনে না হলে কিছু প্রকল্প বাদ দিতে হবে। কিছু প্রকল্প প্রয়োজনে পরে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর ফলে কিছু অর্থ নষ্ট হবে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। মূল কথা, কোনো প্রকল্প যাতে শ্বেতহস্তী না হয়।

সমকাল: আপনাকে ধন্যবাদ।

ফাহমিদা খাতুন: সমকালকেও ধন্যবাদ।

দৈনিক সমকাল
১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

রাজনৈতিক পচন অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে

ড. ফাহমিদা খাতুন

ড. ফাহমিদা খাতুন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক। ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, অর্থনীতির সংস্কার, রাজনীতি-অর্থনীতিসহ নানা বিষয় নিয়ে কালবেলার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। এই গণঅভ্যুত্থানের কারণ কী বলে মনে করেন?

ফাহমিদা খাতুন: বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান শুধু রাজনৈতিক কারণে ঘটেনি। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এ গণঅভ্যুত্থানের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে। গত দেড় দশকে বা স্বাধীনতা-উত্তর ৫০ বছরে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তা দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য দেশের অর্থনীতিতেও পচন ধরেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে, প্রবৃদ্ধিও হয়েছে তবে এতে শুধু একটি শ্রেণি উপকৃত হয়েছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ সেই অর্থনৈতিক উন্নতির বা সামাজিক অগ্রগতির সুফলগুলো পায়নি।

গত ৫০ বছরের অর্থনীতিতে আমরা দেখেছি, একদিকে অগ্রগতি অন্যদিকে বৈষম্য। একদিকে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলছি, অন্যদিকে অসহনীয় বেকারত্ব। ফলে আমরা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা দেখেছি, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যবিহীন। আর এটা আমাদের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের একটি প্রতিফলন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে পচন ধরেছে, সেই পচন আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও প্রচণ্ডভাবে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

দেশে এখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বা রাষ্ট্র সংস্কারের জোর দাবি উঠছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে একটি অন্যতম দাবি রাষ্ট্র সংস্কার এবং এর মাধ্যমে একটি বৈষম্যবিহীন সমাজ

ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ দাবির কারণ বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা বঞ্চনা। আমরা যতই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুণগান গাই না কেন, সেই প্রবৃদ্ধির সুফল মানুষের কাছে পৌঁছেনি। আমরা আসলে কখনোই একটি বৈষম্যবিহীন সমাজ পাইনি। বিগত দশকে আমাদের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তাতে সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে কিন্তু অন্যদিকে বৈষম্যও বাড়ছে। ওপরের ৫ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৩০ শতাংশের বেশি সম্পদ। আর নিচের ৫ শতাংশ মানুষের হাতে মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৩৭ শতাংশ সম্পদ। প্রতি বছর এই বৈষম্য আরও বাড়ছে। এই যে সমাজ ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছি, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের কোনো প্রতিফলন দেখতে পাইনি। ফলে ছাত্ররা প্রথমে রাস্তায় নেমে এসেছে এবং সেই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে সাধারণ মানুষ। গত দুই-তিন বছর ধরে, অধিক মূল্যস্ফীতি কিন্তু মানুষের আয় না বাড়া মানুষকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে।

মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিগত সরকার। অন্যদিকে একটি শ্রেণি রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে। তাদের থামানোর জন্যও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। মানুষ সবকিছু দেখেছে এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে। সবমিলে এ আন্দোলনটি ছাত্রদের মাধ্যমে শুরু হলেও তা ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই আন্দোলন ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে। মানুষ সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি চাচ্ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করছেন?

ফাহমিদা খাতুন: অর্থনীতির প্রতিটি খাতেই সংস্কার প্রয়োজন। বিগত দশকগুলোতে আমাদের অর্থনীতিতে যে উন্নয়ন বা অগ্রগতি এসেছে, তা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। যখন কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় সেখানে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে আসে, সেবা এবং শিল্প খাতের অবদান বাড়ে। বাংলাদেশেও আমরা সেই ধারাবাহিকতা দেখতে পেয়েছি। আমাদের জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫০ শতাংশের ওপরে। শিল্প ক্ষেত্রে অবদান ৪০ শতাংশের কাছাকাছি এবং কৃষি খাতের অবদান ১০ শতাংশের মতো। একসময় আমাদের জিডিপির ৮০ শতাংশই আসত কৃষি খাত থেকে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেখানে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটেনি। আমাদের সামনে যে সম্ভাবনা ছিল, তা আমরা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের শিল্প খাত আশানুরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। আমাদের একটি বড় ব্যর্থতা, জিডিপিতে কৃষির অবদান কমেছে কিন্তু মোট জনশক্তির একটি বড় অংশই কৃষি খাতে নিযুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হলো, অনেকেই এখানে রয়েছেন যারা অর্ধ বেকার বা মৌসুমির বেকার। এজন্য প্রতিটি খাত ধরে ধরে সংস্কার প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর চিন্তা করতে হবে। একদিকে আমাদের দরকার দক্ষ মানবসম্পদ, পাশাপাশি দরকার উন্নত

প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইনোভেশনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বার্ষিক বাজেটে ইনোভেশনে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না।

আমাদের অর্থনীতিতে কোনো বৈচিত্র্য আসছে না। নির্দিষ্ট কয়েকটা খাতের ওপরই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। রপ্তানির ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকই আমাদের সবকিছু। এর বাইরে পণ্যের বহুমুখীকরণ ঘটছে না। নতুন কোনো শিল্প গড়ে উঠছে না। তৈরি পোশাক রপ্তানি কোনো কারণে কমে গেলে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। আমাদের এই বিশাল জনশক্তিকে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সবার জন্য নিরাপদ জীবিকার বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমাদের জরুরিভাবে অর্থনীতির বহুমুখীকরণ চিন্তার কোনো বিকল্প নেই।

কোথায় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন?

ফাহমিদা খাতুন: আমাদের অর্থনীতি একটি উদীয়মান অর্থনীতি এবং সামনে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন শক্তিশালী অবকাঠামো। একই সঙ্গে ভৌত এবং সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন বাড়াতে হবে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আমাদের কর জিডিপির রেশিও অনেক কম। তাই এখানে একটি বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন। সংস্কারের প্রয়োজন সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলোতেও। কারণ গত ১৫ বছরে আমরা এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প দেখেছি যেগুলো আদতে কোনো কাজে আসেনি। এসব প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা বা ইচ্ছা কোনোটাই বিগত সরকারের ছিল না। এসব প্রকল্পে ব্যয়ের কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। শুধু নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে খুশি করতে এবং লুটপাট করতেই এসব প্রকল্প নেওয়া হয়।

আমাদের সংস্কারটা এমন হতে হবে যে, কোনো প্রকল্প নেওয়ার আগে সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, মানুষের কতটুকু প্রয়োজনে আসবে, তা যাচাই করা এবং প্রতিটি প্রকল্পে ক্ষেত্রবিশেষে জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকা।

একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার আরেকটি অন্যতম উৎস হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ। বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশে টেকসই কর্মসংস্থান বাড়াতে সহযোগিতা করে। আমাদের অর্থনীতিকে আমরা উদীয়মান অর্থনীতি বলছি, অথচ আমাদের জিডিপিতে এফডিআইয়ের অবদান ১ শতাংশের নিচে। এত কম বৈদেশিক বিনিয়োগ দিয়ে কোনো দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যেতে পারে না। ফলে একদিকে যেমন আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, অন্যদিকে প্রয়োজন সংস্কারের। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তৈরি করতে হবে। কাগজে-কলমে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশের অনুকূল পরিবেশ নেই। এ কারণেই বিদেশিরা বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন না।

আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেক বেশি। সঙ্গে রয়েছে দুর্নীতির দৌরাত্ম্য ও মসৃণ অবকাঠামোর অভাব। জ্বালানি ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের সংকট, পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রযুক্তির অভাব। এসব কারণে আমাদের দেশে এখনো আশানুরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রেও বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সংস্কার প্রয়োজন আমাদের আর্থিক খাতে। ব্যাংক খাত, নন-ব্যাংকিং প্রাইভেট খাত এবং পুঁজিবাজার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। গত ১৫ বছরে দেশের ব্যাংক খাতে চরম লুটতরাজ হয়েছে, যার কারণে ব্যাংকের ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে গেছে। একই সঙ্গে ব্যাংক থেকে লুটপাট করা এসব অর্থ দেশের বাইরে পাচার করে দেশের অর্থনীতিকে একটি সীমাহীন সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক খাতের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

ফাহমিদা খাতুন: ভালো আইন থাকা একটি বিষয় আর ভালো আইন থাকার পাশাপাশি তার প্রয়োগ করা আরেকটি বিষয়। আমাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে তা হলো, ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দখল করা হয়েছে। ফলে আইন থাকার পরও সেসব আইনের কোনো কার্যকারিতা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকগুলোর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে দলীয় ব্যক্তিদের। অনেক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন করে সেগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে দলীয় লোকজনের হাতে। এরপর ঋণ দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং রাজনৈতিক সুপারিশে। ফলে বড় বড় সব ঋণখেলাপি হয়েছে। ব্যবসা, পুঁজিবাজার, বিদ্যুৎসহ প্রতিটি খাতে এই একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে দেশের আর্থিক খাত গুটিকতক ব্যক্তির হাতে জিম্মি হয়ে গেছে এবং তারা দেশের অর্থনীতিতে ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবজনিত কারণে তারা কখনোই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। একইভাবে রাজনৈতিকভাবে আনুগত্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ায় তারা কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেননি বরং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ উদ্ধারে তাবেদারি করে গেছেন।

পরিসংখ্যানের মান নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন?

ফাহমিদা খাতুন: আমাদের দেশের অর্থনৈতিক তথ্য বিভ্রাট নিয়ে আমরা বহু বছর ধরে কথা বলে আসছি। অর্থনীতিবিদরা যখন কোনো কিছু বিশ্লেষণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কোনো সুপারিশ দেন, সেখানে সঠিক তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত এক দশকে অর্থনৈতিক খাতে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য সঠিক ছিল না সেটা আমরা সবসময় বলে এসেছি। কারণ একজন অর্থনীতিবিদ তথ্য দেখলেই সহজে বুঝতে পারেন সেটা সঠিক নাকি তাতে গোঁজামিল

রয়েছে। সরকার বিরাট অঙ্কের প্রবৃদ্ধি দেখাচ্ছে, আমরা সেটা দেখেই প্রশ্ন করেছি, এত প্রবৃদ্ধি কোথা থেকে হচ্ছে? আমরা প্রশ্ন করেছি যদি প্রবৃদ্ধি এ পরিমাণ হয়েই থাকে তাহলে তার প্রভাব অন্য জায়গায় পড়ছে না কেন? আমরা বারবার অনুরোধ করে এসেছিলাম যাতে জনগণকে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়। তথ্য সঠিক হলে নীতিনির্ধারকদেরও নীতি প্রণয়নে সুবিধা হয়। ভ্রান্ত তথ্যের ওপর ভ্রান্ত নীতিমালা হবে।

আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছি, সেখানে যে তিনটি শর্ত বা সূচক রয়েছে সবই বাংলাদেশ পূর্ণ করতে পেরেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হবে। এর আগে ২০২৪ সালেই বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েট করার কথা ছিল কিন্তু সে সময় কোভিড আসায় বিভিন্ন সূচকে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। এ কারণেই দুই বছর পর এটা হতে যাচ্ছে।

তবে আমার কাছে মনে হয়, যদি আমরা সঠিক তথ্য এবং প্রকৃতপক্ষেই সূচকগুলোতে আমাদের অবস্থান কী, সেটা যদি বের করি তাহলে হয়তো হিসাবটা অন্যরকম হতে পারে। যদি দেখা যায় সত্যিকার অর্থে সূচকগুলোতে আমাদের অতটা উন্নতি হয়নি তাহলে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে আরও দুই বছর সময় বাড়াতে পারি। কারণ যে মুহূর্তে আমরা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব তখনই আমরা অনেক সুযোগ হারাব। এটা সত্যি যে, এলডিসি উত্তরণ একটি ইমেজের বিষয় কিন্তু নিজেদের সংকটের মধ্যে রেখে ইমেজ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমরা উন্নয়নশীল দেশ হওয়া নিয়ে অনেক উৎসাহিত। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হলে আমরা যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ব, তা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি আমাদের নেই। আমরা শুল্কমুক্ত বাজার ব্যবস্থার সুবিধা হারাব, যা আমাদের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল কর্মসংস্থানহীন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

ফাহমিদা খাতুন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে অনেক সুযোগ রয়েছে। সরকারে যারা রয়েছেন তারা কেউই কোনো দলীয় ব্যাগেজ নিয়ে আসেননি। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞ। ছাত্ররা যেসব দাবিদাওয়া করে আসছে এবং আমরা যেসব কথা বলছি, সরকারের যারা রয়েছেন তারা সবাই এসব দাবি এবং কথার সঙ্গে একমত। সুতরাং কর্মসংস্থানের যে দাবি শুরু হয়েছিল কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তা পূরণ করতে না পারলে সেটা হবে বড় ব্যর্থতা। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য অনেক দিক থেকে দরিদ্র হতে পারি কিন্তু আমাদের রয়েছে বিশাল জনশক্তি। এ জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে না পারলে আমরা পিছিয়ে থাকব।

এ বিশাল জনশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ আমাদের রয়েছে। আমরা এটাকে বলি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। আমাদের শ্রমবাজারে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ শ্রমশক্তি যুক্ত হচ্ছে। এই ২০ লাখের সবার জন্য অফিসে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা যাবে না। কারণ আমাদের

অর্থনীতির আকার এখনো এতটা বড় হয়নি। তাই কাউকে কাউকে অফিসে চাকরি করার চিন্তার বাইরে উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা করতে হবে। আমাদের একটি উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের তরুণদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করতে হবে। একজন উদ্যোক্তা একই সঙ্গে নিজের কাজের ক্ষেত্রে তৈরি করেন এবং পাশাপাশি আরও অনেকের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করেন। তাই বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়া শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সহজ শর্তে মূলধন সরবরাহ করতে হবে। আমাদের তরুণদের বোঝাতে হবে যে, চাকরির থেকে উদ্যোক্তা হওয়াটা অনেক বেশি সম্মানের। এ জায়গাটায় যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে দেশের অর্থনীতি যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

আমরা দেখেছি, আমাদের ব্যাংকগুলোতে লাখ লাখ কোটি টাকা ঋণখেলাপি হয়েছে। একেকজন ব্যক্তি কত হাজার কোটি টাকা একাই আত্মসাৎ করেছেন। অথচ এরকম একজনের খেলাপি ঋণের সমপরিমাণ টাকা যদি শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাদের উদ্যোক্তা হতে সহযোগিতা করা হতো, তাহলে কত হাজার হাজার উদ্যোক্তা তৈরি হতো! কর্মসংস্থান হতো লাখো মানুষের। তাই আমাদের সে রকমই একটি পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে শিক্ষিত তরুণরা স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমাদের অনেক ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। এসব ট্রেনিং সেন্টারে তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এমনকি বিগত সরকারের আমলেও হয়েছে। কিন্তু এসব ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষণের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ ট্রেনিংয়ের গুণগত মান আমাদের শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে মেলে না। তাই এখানেও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সরকারের অর্থনৈতিক প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর উপায় কী?

ফাহমিদা খাতুন: সরকারি প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি সমস্যা দেখা যায়। একটি হলো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প, অন্যটি মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়। দুভাবে ব্যয় বাড়ানো হয়। প্রথমত প্রকল্পে অত্যধিক খরচ ধরে এবং দ্বিতীয়ত প্রকল্প দীর্ঘায়িত করে। অতিরিক্ত খরচ করার কারণে প্রকল্প কস্ট ইফেকটিভ হয় না। আর এ সমগ্র ভারটি পড়ে জনগণের কাঁধে।

প্রকল্প পরিচালক কিংবা জনপ্রশাসনের কোনো জবাবদিহি নেই। জবাবদিহি নেই কারণ এ দুর্নীতিতে একেবারে উচ্চপদস্থ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সবাই সম্মিলিতভাবে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় এসেছে মন্ত্রী থেকে সচিব পর্যন্ত সবাই এ সিন্ডিকেটের সদস্য। অর্থাৎ সবাই সম্মিলিতভাবে এখানে লুটপাট করে। যত বড় প্রকল্প তত বেশি লুটপাট। সুতরাং প্রকল্প কতটুকু প্রয়োজনীয় বা ভালো হচ্ছে নাকি খারাপ হচ্ছে সেটা দেখার থেকে তাদের আগ্রহ বেশি

থাকে নতুন নতুন প্রকল্প শুরু করতে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসে জনপ্রশাসনের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা যদি সংস্কার করতে সফল হন এবং যদি জবাবদিহির ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে পারেন, তবে সেটা হবে রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় পুরস্কার।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

ফাহমিদা খাতুন: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রবৃদ্ধির সঠিক হিসাব। আমরা যে ধারার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলে আসছি, সেটার বাইরে যেতে হবে। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময় প্রবৃদ্ধি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। এখানে হয়তো রাজনৈতিক ফায়দা পাওয়া যায় কিন্তু আদতে সেটা সঠিক নীতি গ্রহণে বাধা প্রদান করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ জায়গাটায় সঠিক হিসাব জনগণের সামনে তুলে ধরুক এবং সঠিক নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিক।

একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষভাবে গড়ে তুলুক। দেশে মানুষের মধ্যে যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে, সরকার সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হোক।

গত ১৫ বছরে যে লুটপাট হয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে সরকার অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হোক। এ সরকারের ওপর মানুষের আস্থা রয়েছে। তবে আমাদের হাতে সময় সীমিত। এই সীমিত সময়ের মধ্যে সরকারকে অনেক দিকে সংস্কার করতে হবে। আমি আশা করি, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকার দেশের ক্ষতগুলোকে নিরাময় করে একটি সুন্দর দেশ উপহার দিতে পারবে।

কালবেলা
২৩ অক্টোবর ২০২৪

সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু প্রশ্ন

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বাংলাদেশে সংস্কারের আলোচনা ও উদ্যোগ নতুন কিছু নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা যায়নি। এবার অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও বিভিন্ন মহল থেকে সংস্কারের দাবি উঠেছে এবং বেশ কিছু সংস্কার কমিশনও গঠিত হয়েছে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে সংস্কারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত, তা নিয়ে লিখেছেন রেহমান সোবহান

সামনের চ্যালেঞ্জ

বিগত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত অপশাসন নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য। সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনপ্রয়োগ, দুর্নীতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া—এই ছয় ক্ষেত্রে সংস্কার-পরিকল্পনার খসড়া তৈরির জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়া দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। একটি কমিটি দেশের মূল অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য। আরেকটি কমিটি হয়েছে নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো অবিলম্বে মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য, নারী, গণমাধ্যম ও শ্রম-সম্পর্কিত আরও চারটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে এটি একটি বিশাল কাজ, বিশেষ করে এর বাস্তবায়ন। আমরা অতীতে এ রকম প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর

ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছি। অনুমান করা যায়, এই অপশাসনের প্রক্রিয়া ঘুরিয়ে দিতে কমিশন ও কমিটিগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে কী করা দরকার, সে সম্পর্কে একগুচ্ছ উপযুক্ত ধারণা হাজির করবে।

তবে এ বিষয়ে জনসাধারণের কাছে একটি বিষয় তেমন স্পষ্ট নয়। তা হলো, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কারগুলো কার্যকর করা হবে এবং কারা এসব সংস্কার কার্যকর করবেন?

আমাদের মনে রাখা দরকার, যেসব ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন, সেসব সমস্যা যে কেবল বিগত শাসনামলেই উদ্ভূত হয়েছে, এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলো কয়েক দশকের বেশি সময় আগের। প্রতিটি শাসনামলে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে ব্যর্থতা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আওয়ামী লীগের প্রায় ১৬ বছরের শাসন এসব সমস্যাকে ক্যানসারের মতো গভীরতর করেছে। আমাদের রাজনীতিকে অপূরণীয় ক্ষতি থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন গুরুতর অস্ত্রোপচারেরমতো হস্তক্ষেপ।

সংশ্লিষ্ট কমিশনগুলো যেসব সমস্যা সুরাহা করার কথা, সেগুলো দীর্ঘদিনের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে যে বিগত বছরেও সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব জনগণের সামনে হাজির করা হয়েছিল। সেগুলোর কোনোটা এসেছিল বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির মাধ্যমে, কোনোটা নাগরিক সমাজ বা গবেষকদের পক্ষ থেকে।

প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারে (ডিসেম্বর ১৯৯০-মার্চ ১৯৯১) আমি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলাম। সে সময় ২৯টি টাস্কফোর্স গঠনে আমি নিজেও যুক্ত ছিলাম। টাস্কফোর্সগুলোর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতি ও প্রশাসনপ্রক্রিয়ার নানা রকম সমস্যার সমাধান করা।

এসব সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে এরশাদের আমলে। টাস্কফোর্সগুলোয় ছিলেন সেই সময়ের দেশের ২৫৫ জন সেরা পেশাদার প্রতিভাবান ব্যক্তি। সেখানে নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে দুই মাসের মধ্যে এসব প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য কাজ করেছিলেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস (অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা) ছিলেন স্বনির্ভরতাবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন টাস্কফোর্সের প্রধান। অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে টাস্কফোর্সের প্রধান। আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতো যাঁরা এখন বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরাও সে সময় এসব টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন।

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেন ১৯৯১ সালের মার্চের নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার এবং সংসদে বিরোধী দল উভয়কেই পেশ করা যায়। দুঃখজনকভাবে, নির্বাচিত বিএনপি সরকার প্রতিবেদনগুলো সামান্যই কাজে লাগিয়েছিল।

২০০১ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে একই রকম চেষ্টা করেছিল সিপিডি। সেই সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও সংস্কারের প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৬০ জন পেশাদার ব্যক্তিকে নিয়ে ১৬টি টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। সেই প্রতিবেদনগুলোকেও তৎকালীন নির্বাচিত সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

বিভিন্ন সরকার নীতি সংস্কারের জন্য এ রকম আরও কমিশন গঠন করেছিল। সেই প্রতিবেদনগুলোও সেসব সরকারের দ্বারাই বহুলাংশে উপেক্ষিত থেকে গেছে। এ রকম দুটি প্রতিবেদনের কথা মনে পড়ছে। একটি হচ্ছে, শেখ হাসিনার প্রথম সরকার কর্তৃক কমিশনকৃত জনপ্রশাসন সংস্কার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১৯৯৬-০১) এবং ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন।

সংস্কারপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাসকগোষ্ঠী কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেটাই এখনো প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে আছে। প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন কোনো সরকারের সংস্কার বিষয়ে আন্তরিকতা নিয়ে সামান্যই সন্দেহ করা যায়। বিশেষ করে যেহেতু এই সরকার বাংলাদেশের তরুণদের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। এত বছর ধরে জাতীয় রাজনীতি যে রোগের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, এসব তরুণ এখনো সেই রোগে দূষিত হননি।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এসব সংস্কার বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধরে নিয়ে আমি নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বাস্তব প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। বিগত সরকারগুলোর সংস্কার প্রচেষ্টার তুলনায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টা যাতে তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক ফল প্রদান করে, তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের এসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

১. সংস্কার চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া

ক. কমিশনের খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করা হবে?

রাজনৈতিক দল: কোন দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করা হবে, তা নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড কী হবে?

সুশীল সমাজ: এই বড় অংশের মধ্য থেকে কারা আলোচনার জন্য অগ্রাধিকার পাবে?

তরুণ: যাঁরা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেবল তাঁরাই কি সুযোগ পাবেন, নাকি অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অন্যরাও সুযোগ পাবেন?

অংশীজন: নির্দিষ্ট কমিশনগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অংশীজন?

খ. উপরিউক্ত প্রতিটি অংশে উদ্ভূত মতামতের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কাদের মতামত অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

গ. ধরে নিচ্ছি, সব (?) রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গণতন্ত্রের স্বার্থে আলোচনা করা হবে। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব ও সম্ভাব্য নির্বাচনে গুরুত্বের বিচারে সব দল সমান নয়। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে আমলে নেবেন?

ঘ. জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শপ্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়াটি সম্ভবত পুরো উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা আলোচিত ও অনুমোদিত হবে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংস্কার এজেন্ডায় সেটিই কি অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দিষ্ট অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে? উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্কার এজেন্ডা কি আবার অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে? যদি হয়, তাহলে সেখানে উদ্ভূত মতবিরোধ কীভাবে খসড়ায় স্থান পাবে?

২. সংস্কার বাস্তবায়ন

উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা চূড়ান্ত সংস্কার কখন, কীভাবে এবং কে বাস্তবায়ন করবে?

ক. সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলোকে নীতি প্রস্তাব, আইন প্রণয়ন এমনকি সাংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়। কাজটি করার দায়িত্ব কার হবে?

খ. অন্তর্বর্তী সরকার কি তার মেয়াদেই প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বা সব সংস্কার বাস্তবায়ন শুরু করার পরিকল্পনা করছে? এই সরকার যদি কেবল কিছু নির্বাচিত সংস্কার বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কোন সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা হবে, তা বেছে নেওয়ার জন্য নীতিমালা কী হবে?

গ. কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিএনপি ইঙ্গিত দিয়েছে যে সংস্কার শুধু নির্বাচিত সরকারই বাস্তবায়ন করতে পারে।

এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান কী?

রাজনৈতিক দলগুলো যদি সবুজ সংকেত দেয়, তবেই কি অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে?

অন্তর্বর্তী সরকার যদি মনে করে, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান যা-ই হোক না কেন, সংস্কারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, তাহলে কি অন্তর্বর্তী সরকারের এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট সংস্কার বাস্তবায়ন শুরু করা উচিত?

ঘ. চূড়ান্ত বিচারে, প্রশাসন ও নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে এ রকম অর্থপূর্ণ সংস্কার এমন একটি সরকারকে টেকসই ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, যা চার-পাঁচবছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে বলে আশা করা যায়। আর তা সাধারণত নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই সম্ভব। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সংস্কারের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের জন্য মেয়াদ বাড়ানোও সম্ভব হতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে, বিশেষ করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে। অন্তর্বর্তী সরকার কি আদৌ এই পথে যেতে আগ্রহী?

৩. অন্তর্বর্তী সরকার-পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কার বাস্তবায়ন

এমনও হতে পারে যে অন্তর্বর্তী সরকার অনিচ্ছুক এবং/অথবা সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার এজেন্ডার ভাগ্য সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকার দ্বারা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে। বিষয়টি মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচন-পরবর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা আছে, এমন রাজনৈতিক দল/দলগুলোর সংস্কার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি, ইচ্ছা ও ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে।

সংস্কার বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নির্বাচিত শাসনামলের সময়জুড়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টাই শুধু যথেষ্ট নয়; বরং তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকেও সংস্কারপ্রক্রিয়া এবং এর উদ্দিষ্ট ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

নীতি ও সংস্কার উভয় ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শাসক দল ও এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যকার এই দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিকভাবে পরবর্তী শাসনের সময়কালে সংস্কার বাস্তবায়নকে হতাশায় পর্যবসিত করেছে। এ জাতীয় উদ্বেগগুলোকে মাথায় রেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো প্রণিধানযোগ্য:

ক. বড় নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কোনো সরকার যদি সংস্কারের সূচনা করা বা সংস্কার অব্যাহত রাখার মধ্যে নিজের স্বার্থ আর খুঁজে না পায়, তাহলে সংস্কারের টেকসই নিশ্চিত করার জন্য কী করা যেতে পারে?

খ. অন্তর্বর্তী সরকার দ্বারা চূড়ান্ত করা সংস্কারগুলো কি এমনভাবে করা হবে, যাতে সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকারগুলোর সংস্কারগুলো সম্পাদন করতে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যায়?

গ. নিচের পক্ষগুলোর মাধ্যমে সংস্কারের ক্রমাগত তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সংস্কারগুলোর মধ্যে কী রকম তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির ব্যবস্থা তৈরি করা যায়:

১. সংসদ; ২. বিচার বিভাগ; ৩. সুশীল সমাজ; ৪. সংবাদমাধ্যম; ৫. সংস্কারের দাবি তুলেছেন যেসব তরুণ; ৬. অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

জনপরিসর বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত। সেই তুলনায় বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময়ের পরিচিতি আছে। এই দুই থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে সব সরকার যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তা আসলে নীতির ঘাটতি বা সংস্কারের অভাব নয়। সমস্যা ছিল বরং নিজস্ব নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতায়। এই ব্যর্থতাগুলোর উৎপত্তি ঐকান্তিকতার অভাব, কায়েমি স্বার্থের উপস্থিতি থেকে।

নীতিগুলো বাস্তবায়িত হলে কায়েমি স্বার্থের ক্ষতি হয়। আর সেই সঙ্গে আছে প্রশাসনের গুণমানে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের কারণে সক্ষমতার অভাব। আশা করি প্রফেসর ইউনূস, অন্তর্বর্তী সরকার এবং কমিশনগুলো সংস্কারের জন্য তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করতে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ মাথায় রাখবেন।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

প্রথম আলো
১২ নভেম্বর ২০২৪

‘গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না’

অধ্যাপক রওনক জাহান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. রওনক জাহান সমকাল-এর সঙ্গে কথা বলেছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। সেখানে উঠে এসেছে রাজনীতিতে বিভাজন, নির্বাচন ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিভিন্ন দিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মাহবুব আজীজ***

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে গণতন্ত্রের পথে এই যাত্রাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের পতন হওয়ার পর জনমানসের মধ্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। কিন্তু গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না। কারণ, পুরোনো অনেক অগণতান্ত্রিক চর্চা রয়ে যায়। যারাই ক্ষমতায় যান, তাদের পক্ষে পুরোনো পথে হাঁটা সহজ। নতুন পথে হাঁটতে গেলে অনেক ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। বৃহৎ সব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ব্যাপারে ঐকমত্যের প্রয়োজন। অনেক সময় সেই নতুন পথে হাঁটতে গেলেও যে সাফল্য আসবে, তাও নয়। মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে হবে। এজন্য অনেক সময় মানুষ পুরোনো পথেই হাঁটে।

আমরা এর আগে ১৯৯০ সালে একবার সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়েছিলাম এক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। তারপর আমাদের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়, সেই যাত্রা প্রথমদিকে কিছুটা হলেও সামনে এগিয়েছিল। চারটা জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে; যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা-বদল হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে। কিন্তু ২০০৬–০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই অকার্যকর হয়ে গেল! আমরা দুই

বছরের মতো সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দ্বারা শাসিত হলাম। এরপর ২০০৯ সালে মনে হয়েছিল, আমরা গণতন্ত্রের পথে আবার নতুনভাবে যাত্রা আরম্ভ করতে পারব; যে দুই দলের মধ্যে পালা-বদল হয়েছে, তারা একে-অপরের প্রতি আরেকটু সহনশীল হবেন। আমরা দেখলাম, তা আর হলো না।

ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পরপর তিনটি একপক্ষীয় নির্বাচন করেছে। এরপর আমরা আবার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালে আরেকবার গণতন্ত্রের পথে হাঁটার সুযোগ পেয়েছি।

প্রতিবারই আমরা রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার সংকটে পড়ছি। রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদরা, যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন; তারা যদি গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ না হন, তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো– আমরা কীভাবে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের গণতান্ত্রিক আচরণ, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতি সত্যিকারভাবে দায়বদ্ধ রাখতে পারব। নির্বাচনের আগে ও পরে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোকে যদি আমরা সার্বক্ষণিক দায়বদ্ধতার মধ্যে না আনতে পারি, তাহলে আমরা আবার পথভ্রষ্ট হতে পারি। এর জন্য দরকার মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

এর আগে যতবার সরকারবিরোধী আন্দোলন হয়েছে, বা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এবার নেতৃত্বে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। এ আন্দোলনের ভিন্নতা কোথায়?

এর আগে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে; মাঝে মাঝে সরকারবিরোধী আন্দোলনও হয়েছে। সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতা মিলেই করেছে। ছাত্ররা নেতৃত্বের ভূমিকায়ও ছিল। আমরা যদি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দিকে তাকাই, দেখা যাবে– সেটি ছাত্ররাই করেছে। পরে দেশের জনসাধারণ এতে সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে যে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হলো, সেটি ভাষা আন্দোলনের প্রভাবেই হয়েছে। এরপর আমরা যদি ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দেখি, সেখানেও ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণিও ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানেও ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। অবশ্যই ওই আন্দোলনে দেশের সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ সরকার পতনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে।

যে কোনো সফল আন্দোলনের একটা পটভূমি থাকে। দেখা যাবে, সফল হওয়ার আগে একই বিষয়ে দুই-তিনটা আন্দোলন হয়েছে, সেগুলো হয়তো সরকার দমন করে দিতে পেরেছে। এরপর একটা আন্দোলন হয়তো সফল হয়। কারণ, ততদিনে হয়তো বা জনসাধারণের মধ্যে অনেক সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি,

এরশাদ ক্ষমতায় আসার পরপরই ছাত্ররা বেশ কয়েকবার আন্দোলন করেছে; কিন্তু সেগুলো দমন করা সম্ভব হয়। এরপর বড় দুই দলসহ সব দলই এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে আন্দোলন সফল হয়।

এবার ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলন সফল হয়েছে। তার আগে ছাত্ররা কয়েকটি আন্দোলন করেছে। ২০১৮ সালে তারা কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন করেছে। সেগুলো সরকার দমন করে দিতে পেরেছিল। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত বিএনপি সরকার পতনের একদফা আন্দোলন বেশ কয়েক বছর ধরেই করছিল। বিগত সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে তিনটা জাতীয় নির্বাচন করেছে। বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলন খুব দ্রুত জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। কোনো আন্দোলনই মাত্র একবার করেই তা সফল হয় না। তার পেছনে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম থাকে, যা হয়তো সফল হয়নি।

এবারের আন্দোলন প্রধানত ছাত্ররাই করেছে। খুব অল্প সময়, মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যে সরকারের পতন হয়েছে। এই আন্দোলনে কিছু ভিন্নতা দেখা গেছে। এবারের আন্দোলনে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে, হতাহত হয়েছে; এর আগে এত বিশাল আকারে হতাহতের ঘটনা দেখা যায়নি। এর আগে যেসব আন্দোলন হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বেশ দৃশ্যমান ছিল। সেটি এবার সেভাবে দৃশ্যমান ছিল না। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আন্দোলনের সময় সেভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এবারের আন্দোলনের আরেকটা ভিন্নতা হলো– ছাত্ররা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র পরিচিতির প্রকাশ ঘটিয়েছে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে। আন্দোলনের পরও তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। এসবের ফলে এবার আন্দোলন শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনে কার কী ভূমিকা ছিল, কার জন্য এ আন্দোলন সফল হয়েছে, তা নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে আন্দোলন শেষ হওয়ার অল্প সময়ের পরই যারা মিলে একটা আন্দোলন করেছে, তাদের মধ্যে এমন বিভাজন দেখা যায়নি।

দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি কি জনগণের অস্থার অভাব দেখা দিয়েছে?

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে হয়তো এখন খুব ভালো ধারণা রয়েছে, এমন নয়। তারা দেশের দুই বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কয়েকবার ক্ষমতায় থাকতে দেখেছে। জনগণ জানে, কোনো দল যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তারা সহজে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। তারা হয়তো নির্বাচন নিয়ে নানা কারচুপি করে। ক্ষমতাসীনদের সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে যান। চাঁদাবাজিসহ তারা বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং অর্থনীতির লুটপাট যে হয়, সেটি জনগণ ভালোই জানে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা না হলেও জনগণ এটাও জানে যে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক দল দিয়েই দেশ পরিচালনা করতে হবে। সাধারণ

মানুষের সঙ্গে কথা হলেই আমি যে কথা শুনি, তা হলো– ‘আপা, আপনি অনেক লেখাপড়া জানেন। আপনি অনেক ভালো মানুষ। কিন্তু আপনাদের মতো ভালো মানুষ, বা এত লেখাপড়া জানা লোক এ দেশে রাজনীতি করতে পারবে না। রাজনীতি করতে হলে রাজনীতিবিদদেরই দরকার হবে।’ যেহেতু আমি এ বিষয়ে গবেষণা করিনি, তাই এ কথা বলতে পারব না যে, সব রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হয়েছে কিনা। আমার ধারণা, জনগণকে জিজ্ঞেস করলে তারা হয়তো এখনও একটা নির্বাচনের কথা বলবে; যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোই অংশগ্রহণ করবে।

সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-বিতর্ক চলছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

আমার মতে, এখনই সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন করে প্রণয়নের বিতর্ক আরম্ভ করার দরকার নেই। আমাদের আগে জানতে হবে, আলোচনা করতে হবে, আমরা সংবিধানের কী কী সংশোধন চাই এবং কেন চাই। এসব বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করতে হবে। এরপর দেখতে হবে, কোন কোন পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য আছে বা নেই। তারপরই হয়তো আমরা এ আলোচনায় যেতে পারি যে, সংবিধানের সংশোধন করলেই চলবে কিনা। সংবিধান রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দলিল। জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া এর পরিবর্তন করা যুক্তিসংগত নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যিকারের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ। এ ছাড়াও সংবিধান সংশোধনের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া আছে; যা আমাদের মেনে চলতে হবে।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনৈতিক লুটপাট থেকে মুক্তির উপায় কী?

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনীতিতে লুটপাট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে খুব সহজে বের হওয়ার তেমন কোনো উপায় নেই। আমাদের দেশে দলগুলো এবং নির্বাচনে অর্থায়ন অনেকটা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে, যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং রাজনীতির কাছাকাছি থাকাতেই হয়তো তারা অর্থনৈতিক লুটপাটের সঙ্গে যুক্ত। যদি আমরা রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারি বা নির্বাচনে বিপুল অর্থের ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়; তাহলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনীতিতে লুটপাট অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। এজন্য দরকার হবে একসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার। আমাদের দেশে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ব্যাপারে আমরা যে সংস্কার চাচ্ছি, তার কোনোটাই সম্ভব হবে না, যদি না আমরা এসব ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারি।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম তিন মাসকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস হয়েছে। তা খুব বড় সময় নয়। দায়িত্বে এসে এ সরকার একটা ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছে। রাষ্ট্র কাঠামো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও একটা ভঙ্গুর অবস্থায়

ছিল। অতএব তাদের একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেশ চালানো, সরকারের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে তারা বেশ কিছু সংস্কারের কাজও হাতে নিয়েছে। তারা কোনো বৃহৎ দলের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। সব মিলিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়েছে। আমি বলব, তাদের প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি নেই।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিএনপি রোডম্যাপ (রূপরেখা) ও দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

বিএনপি যে রোডম্যাপ (রূপরেখা) ও দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাবে, এটিই স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগ যেহেতু মাঠে নেই; তারাই এখন দেশের সবচেয়ে বড় দল। তারা বহু বছর ধরে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। একটি প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। নির্বাচনের বাইরে থেকে দলকে সংগঠিত রাখা একটি দুরূহ কাজ, যা তারা এতদিন করেছে। অতএব তারা যে একটি রূপরেখা চাইবে এবং দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাবে, এমনটাই হওয়ার কথা।

নির্বাচনের আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার বলে মনে করেন?

একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এবং যে দলই নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা যেন জবাবদিহির বাইরে না যেতে পারে; তার জন্য প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের কিছু সংস্কার আনতে হবে। ভবিষ্যতে কোনো সরকার যেন দলীয়করণ না করতে পারে সেই ধরনের সংস্কারগুলো অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সিয়াল খাতে, যা আমাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে; এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চার সংকটগুলো কী কী?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজেও আমি দেখেছি, গণতান্ত্রিক চর্চায় যে ধরনের সহিষ্ণুতার দরকার হয়, ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতার দরকার হয়, আমাদের মধ্যে তার অভাব রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য এখন আরও বেশি প্রকট হচ্ছে। যে কেউ যা কারও সম্পর্কে একটা অভিমত প্রকাশ করে ফেলতে পারেন এবং যে কাউকে একটা তকমা লাগিয়ে দেওয়ার চর্চা দেখা যাচ্ছে। এগুলো বহুমত চর্চার ক্ষেত্রে একটা বড় সংকট সৃষ্টি করছে।

দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

আমরা বারবার গণতন্ত্রের যাত্রায় হোঁচট খাচ্ছি। ভবিষ্যতেও এ যাত্রা খুব মসৃণ হবে না। সবাইকে অনেক ধৈর্য দেখাতে হবে; ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। গণতন্ত্র মানেই বহুমতের সমাবেশ। কোনো ভিন্নমতকে বের করে দেওয়া নয়। একদিক থেকে হয়তো বলি, আমরা 'ইনক্লুসিভ' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক। কিন্তু আজকাল 'ক্যানসেল কালচার'ও দেখা যাচ্ছে। আবার আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতাও আছে বহু বছর ধরে। অথচ গণতন্ত্র মানেই শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো। অতএব শান্তিপূর্ণভাবে এবং পরস্পরের ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের রূপরেখায় পথচলাই আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

সমকালকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

সমকাল
৫ ডিসেম্বর ২০২৪

অধ্যায় ৮

অন্যান্য

হয়ে উঠুন বন্ধু

ড. ফাহমিদা খাতুন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় চলে যায়। মেধাবিকাশের ক্ষেত্রে তা অন্তরায়। মেধা কোনো সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল, উদ্ভাবনমূলক কাজে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। চিন্তা করার সৃজনশীল মনন তৈরি হয় না। অনেকে বলতে পারেন যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো অনেক কিছুই দেখায়, ভালো কিছুও দেখায়, এতে তরুণদের মেধার বিকাশও হতে পারে, তারা অনেক কিছু শিখতে পারে, তাদের মননের বিকাশও হতে পারে। ভালো কিছু দেখলে, শিখলে তা থেকে কারও বিকাশ হতেই পারে; কিন্তু সমস্যাটা হলো– কী ব্যবহার করছে, সেটিতে তো তাদের নিজেদের কোনো চিন্তা থাকে না, চিন্তা করার বিষয় থাকে না। অনেক সময় ব্যবহারকারীরা আসক্ত হয়ে পড়েন। ভালো-মন্দ বিচার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানেই হাতের মুঠোয় অনেক ধরনের বিধ্বংসকারী চিন্তা রয়েছে। যেগুলো ব্যবহারকারীকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অভিভাবকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত। আজকাল প্যারেন্টিংয়ের ধরনও বদলে গেছে। আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, সেটি এখন আর করা যায় না। আধুনিক বিশ্বের ছোঁয়া প্রায় সব দেশেই লেগেছে, উন্নত বিশ্বের যে স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতার একটা চরম বিকাশ ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে তরুণ– সবার জন্যই প্রযোজ্য। ছোট বাচ্চারাও তাঁদের স্বাধীনতাকে বেশ মূল্য দেয় এবং বাবা-মা সেখানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ খুবই কম থাকে। বিদেশে তো আবার বাচ্চাকে কিছু বললে ওরা 'চাইল্ড অ্যাবিউজ' হিসেবে ধরে নেয়। আমাদের দেশে এমনটা না হলেও বেশি শাসন করলে বাচ্চারা আবেগতাড়িত হয়ে খুব খারাপ পথে চলে যেতে পারে। অনেকে আত্মহননের দিকে চলে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় বা খারাপ হয়ে যায়। এজন্য এ সময়ে অভিভাবকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে বাচ্চাদের সংযোগ করানোর ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। যদিও এটি খুবই কঠিন কাজ।

মনস্তত্ত্ববিদ বা সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, বাবা-মায়ের অনেক সময় দেওয়া উচিত। বাচ্চাদের সঙ্গে একদম ছোট থেকে যত বেশি সময় দেওয়া হবে, তত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে মা-বাবার। এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ গড়ে উঠবে। সন্তানকে বোঝাতে হবে, সে তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো মা-বাবার কাছে বলতে পারবে। এটি না হলে তরুণরা যেমন ফোন বা তাদের ব্যবহার করা ডিভাইস দেখতে দেবে না, ফোনে কী করছে তারা, কাদের সঙ্গে কথা বলছে এই তথাকথিত প্রাইভেসি থেকে বাবা মা থেকে লুকিয়ে রাখবে।

এখানে প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত বৈষম্যটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা একটু শিক্ষিত, একটু সচেতন তাদের ক্ষেত্রে প্যারেন্টিং তুলনামূলক সহজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে দরিদ্র পরিবারের তরুণেরা। ধরা যাক, একটি পরিবার খুব দরিদ্র। সেখানকার সম্ভাবনাময় একটি ছেলে বা মেয়ে, যে কিনা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারত; কিন্তু সে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত হয়ে বা খারাপ মানুষের ফাঁদে পড়ে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। এটি হলো দারিদ্রতার বৃত্ত। সে আর দারিদ্রতার বাইরে আসতে পারল না। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণেও এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়া আশঙ্কা রয়েছে।

সমকাল
২০ জানুয়ারি ২০২৪

ড. ইউনূসকে নিয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নিবন্ধ

কার জন্য ঘণ্টা বাজছে...

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী, জাতির সম্পদ অধ্যাপক ড. ইউনূসের মতো একজন ব্যক্তি নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অথচ কীভাবে তাঁকে কাজে লাগানো যায় বা একজন দূত হিসেবে যেসব বিশ্বনেতা, যাঁরা সাধারণত আমাদের মন্ত্রী ও কূটনীতিকদের নাগালের বাইরে থাকেন, তাঁদের কাছে তাঁকে কীভাবে পাঠানো যায়, সেই উপায় খুঁজে বের করতে আমাদের নেতারা কোনো চেষ্টাই করেননি।

বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সর্বজনীন সম্মানিত ব্যক্তি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চলতি বছরের প্রথম দিন শ্রম আদালতের ছয় মাসের কারাদণ্ডের রায় দেওয়ার ঘটনা দেখাটা ছিল দুঃখজনক। অথচ দিনটি নতুন বছরের প্রতিশ্রুতির দিন হওয়া উচিত ছিল।

ড. ইউনূস ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে মর্যাদার এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন, যা তাঁর খ্যাতির ওপর লেপন করা কলঙ্ক থেকে তাঁকে নিষ্কলুষ মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম করে তুলবে। তাঁর বিরুদ্ধে বিচারে অবস্থান নেওয়া সরকারি কৌঁসুলিরা এতটা সুবিধাপ্রাপ্ত না–ও থাকতে পারেন।

সরকারের প্রভাবশালী কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিস্ময়করভাবে এই মামলা থেকে সরকারকে আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এটিকে সম্পূর্ণ আইনি বিষয় বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর—যা রাষ্ট্রের একটি ছোট ও অখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই মামলা করেছে।

অন্যায্য একটি সমাজে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের অগুনতি ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। এ ধরনের হাজার হাজার মামলা শ্রম আদালতে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে আছে। যেখানে মামলার ফাইল চলে শম্বুকগতিতে, রায় হয় কদাচিৎ। আর রায় হলেও কারাদণ্ডের সাজা বিরল। সরকারের অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে খুব কম লোকই এ কথা বিশ্বাস করেন যে অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এমন একটি মামলা করেছেন, যে মামলার বৈশ্বিক প্রভাব থাকতে পারে। আর মামলাটি অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়েছে, যাতে রেকর্ড কম সময়ের মধ্যে সাজার রায় হয়ে গেছে।

এমন একটি বহুল আলোচিত ও প্রচারিত রায় ইতোমধ্যে আমাদের বিচারব্যবস্থা ও শাসনচর্চাকে জনপরীক্ষার মুখে ফেলেছে। নোবেলজয়ী ও বিশ্বের বিশিষ্ট ১৬৪ ব্যক্তি ইতোমধ্যে অধ্যাপক ইউনূসকে 'হয়রানি' করার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আদালতের এই রায়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অনেকেই এখন বাংলাদেশের শ্রম আদালতের রায়ের বিশদ বিবরণ আরও নিবিড়ভাবে যাচাইয়ে তাঁদের উচ্চ ধীশক্তি প্রয়োগে মনোনিবেশ করতে পারেন, যাতে তাঁরা মামলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানতে পারেন।

> *এ ধরনের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে মুহাম্মদ ইউনূসের মতো বৈশ্বিকভাবে অনেক উঁচু পর্যায়ের একজন ব্যক্তির অধিকারের ওপর আক্রমণের অর্থ হলো, যে কেউ—রাজনৈতিক বিরোধী, বন্ধুহীন ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজের সংগঠন, স্পষ্টভাষী ব্যক্তিরা 'বিপন্ন প্রজাতি' হিসেবে থাকছেন। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে অধ্যাপক ইউনূসের মতো কোনো ব্যক্তির জন্য যখন ঘণ্টা বাজছে, তখন একদিন সেই ঘণ্টা আমাদের যে কারও জন্য বাজতে পারে।*

ইউনূসের বিরুদ্ধে রায় যদিও বিশ্বব্যাপী যাচাই-বাছাইয়ের মুখে পড়তে পারে, তবু বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি নিয়ে আমাদেরও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। এটা সেই পরিস্থিতি, যেখানে একজন ব্যক্তি তাঁর পেশাগত জীবনের সেরা সময়টা বাংলাদেশের দরিদ্র নারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ করেছেন। আর তিনি এখন কারাবাসের শঙ্কার মুখে।

এই আদালতের মামলাই প্রথম ঘটনা নয়, যেখানে অধ্যাপক ইউনূস নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। সরকার ও তাদের বুদ্ধিজীবী সহযাত্রী— উভয়ের কাছ থেকে তিনি অবজ্ঞা আর নিন্দার চলমান এক সংগঠিত প্রচারণার শিকার হয়েছেন। এ ধরনের একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই প্রতিকূল সম্পর্কের যৌক্তিকতা, প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে প্রমাণসিদ্ধ কোনো যুক্তি তুলে ধরা হয়নি।

ড. ইউনূসের মতো উচ্চ মর্যাদার একজন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য যখন একটি জাতির হয়, তখন আশা করা যেতে পারে, দেশের সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্ব তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। আর সরকারের দেশ গঠনের কাজে সহায়তার জন্য এ ধরনের সব ব্যক্তি তাঁদের শক্তি–সামর্থ্য দিয়ে কাজ করবেন।

অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে এই কল্পিত বা বাস্তব মতপার্থক্যের বিষয়ে সমাধান করতে সংলাপ আয়োজনে আমাদের নেতৃত্ব কোনো ধরনের চেষ্টা করেছেন, এমন কিছু আমার জানা নেই। জাতির সম্পদ হিসেবে কীভাবে তাঁকে কাজে লাগানো যায় বা একজন দূত হিসেবে যেসব বিশ্বনেতা, যাঁরা সাধারণত আমাদের মন্ত্রী ও কূটনীতিকদের নাগালের বাইরে থাকেন, তাঁদের কাছে তাঁকে কীভাবে পাঠানো যায়, সেই উপায় খুঁজে বের করতে আমাদের নেতারা কোনো চেষ্টাই করেননি।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের ওপর এই ঘটনার ব্যাপক প্রভাব নিয়ে আমার গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে বছরের পর বছর ধরে আইনের একতরফা অপব্যবহার করা হচ্ছে। সরকার সামরিক বা রাজনৈতিক যেমনই হোক না কেন, এই অপব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে আমাদের গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ব্যাপক আক্রমণের অংশ হিসেবে বিচারব্যবস্থাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু আমাদের বিচারব্যবস্থাই নয়; আমাদের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আমাদের সাংবিধানিক সংস্থা—যেমন সংসদ, নির্বাচন কমিশন (ইসি), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সবই এমন পর্যায়ে দলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে তারা সুশাসনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীলসমাজ, স্বাধীন গণমাধ্যম, এমনকি সরকারের সমালোচক হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের দমন–পীড়নে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার এই ক্ষয়ের লক্ষণ হচ্ছে অধ্যাপক ইউনূসের ঘটনা। তাঁর বিরুদ্ধে তুচ্ছ ঘটনা ও সংকীর্ণতার এই মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কোনো বিচারব্যবস্থায় প্রাথমিক ভিত্তি পেত না।

হাজার হাজার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কারাগারে বন্দী। বিপুলসংখ্যক ভুক্তভোগী জামিন ছাড়াই জেল খাটছেন। কিংবা মাথার ওপর ঝুলে থাকা বিপদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) বা সাইবার নিরাপত্তা আইনের (সিএসএ) মামলায় অভিযুক্ত হচ্ছেন। যা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সুরক্ষাকে অগ্রাহ্য করার মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরে।

সাদাপোশাকের ব্যক্তিরা কোনো পরোয়ানা ছাড়াই মধ্যরাতে যে কোনো বাড়িতে আসতে পারেন এবং আপনাকে টেনেহিঁচড়ে কোনো অজানা গন্তব্যে নিয়ে তাঁরা আপনার সঙ্গে যা ইচ্ছা তা–ই করতে পারেন। আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের কাজ এ জন্যই করতে পারে, তারা আইনের সামনে নিজেদের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে মনে করে। অন্যদিকে নাগরিকদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে তাঁরা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় আর আমাদের আদালতের ওপর নির্ভর করতে পারছেন না।

টানা কয়েকবার অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আমাদের দুদককে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও পছন্দের ব্যবসায়িক বন্ধুদের বিদ্যমান সুস্পষ্ট দুর্নীতির ব্যাপারে তারা যেন অন্ধ। সংসদে এখন একচেটিয়া ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য। নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে খোদ সংসদ তার দায়িত্ব থেকে পিছু হটেছে। জনগণের কিছু গুরুতর উদ্বেগ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই সংসদের তৎপরতার অভাব প্রকট।

সব স্তরে আমাদের নির্বাচনী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব এখন স্বঘোষিত ও প্রত্যাশিত ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজেদের দপ্তর ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বের নিয়মের লঙ্ঘন। যার ফলে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার কাজ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আইনের শাসন রক্ষা ছাড়া ব্যবসায়িক অগ্রগতি, তা দেশি বা বিদেশি যা-ই হোক না কেন, বিষয়টি রাজনৈতিক পরিচয়, সঠিক যোগাযোগ ও বস্তুগত প্রণোদনা দেওয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড নিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের কারণে অন্যান্য এশীয় দেশের তুলনায় আমাদের এখানে কম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আসছে।

শাসনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন-সহযোগিতা ছাড়া নাগরিক সমাজ বিপন্ন থেকে যায়। তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের করুণায় চলতে হয়। কারণ, তাদের টিকে থাকার আর্থিক উপায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো হাতে রাখা হয়েছে। একটি নাগরিক সমাজের সংগঠনের (সিএসও) ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কোনো বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই। এটা নির্ভর করে ক্ষমতার সঙ্গে তাদের সমীকরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর।

এ ধরনের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে মুহাম্মদ ইউনূসের মতো বৈশ্বিকভাবে অনেক উঁচু পর্যায়ের একজন ব্যক্তির অধিকারের ওপর আক্রমণের অর্থ হলো, যে কেউ—রাজনৈতিক বিরোধী, বন্ধুহীন ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজের সংগঠন, স্পষ্টভাষী ব্যক্তিরা 'বিপন্ন প্রজাতি' হিসেবে থাকছেন। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে অধ্যাপক ইউনূসের মতো কোনো ব্যক্তির জন্য যখন ঘণ্টা বাজছে, তখন একদিন সেই ঘণ্টা আমাদের যে কারও জন্য বাজতে পারে।

প্রথম আলো
২১ জানুয়ারি ২০২৪

তৈরি পোশাকের বাইরে অনেকগুলো খাত আছে যেগুলো খুবই সম্ভাবনাময়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

রফতানি বৈচিত্র্যকরণের দিকটাকে আমি দুভাবে দেখি। একটা হলো, আমাদের জন্য এটা খুবই ইতিবাচক যে আমরা এক পণ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছি যার বিশাল বাজার রয়েছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল মিলিয়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট। আরো ৫০টি পণ্যে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হলে সেগুলোর বিশ্ববাজার হয়তো ১০০ বিলিয়ন ডলারের

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য। নতুন বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম।

আমাদের অর্থনীতির একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে তৈরি পোশাক বা আরএমজি-নির্ভরতা। আমাদের রফতানির সিংহভাগই আরএমজি। কোন কোন খাত সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখছেন?

রফতানি বৈচিত্র্যকরণের দিকটাকে আমি দুভাবে দেখি। একটা হলো, আমাদের জন্য এটা খুবই ইতিবাচক যে আমরা এক পণ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছি যার বিশাল বাজার রয়েছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল মিলিয়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট। আরো ৫০টি পণ্যে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হলে সেগুলোর বিশ্ববাজার হয়তো ১০০ বিলিয়ন ডলারের বাজার হবে। কিন্তু এমন একটা প্রতিযোগিতায় আমরা সক্ষমতা প্রমাণ করেছি যে যেটার প্রায় ১ হাজার বিলিয়ন ডলারের

বিশ্ববাজার আছে। আমরা তৈরি পোশাকে বিশ্বে দ্বিতীয়। আমরা ৬ শতাংশে, যেখানে চীন ৩০ শতাংশের মতো। এখন প্রায় সবাই চায়না প্লাস ওয়ান বলেছে। আর আমি মনে করি, তৈরি পোশাক খাতের বৈচিত্র্যকরণও একটা বড় সুযোগ। আমাদের তৈরি পোশাক খাত কটনের ওপর ৭০ ভাগ নির্ভরশীল। রফতানি হলো কটনভিত্তিক তৈরি পোশাক খাত। বিশ্ববাজারে কিন্তু সিংহভাগ নন-কটন যা সিনথেটিক, ম্যানমেড ফাইবার ও পলিয়েস্টার ইত্যাদি। আমাদের তৈরি পোশাক খাতের ভেতরেও বড় ধরনের বৈচিত্র্যকরণের সুযোগ আছে। একই সঙ্গে আমাদের মোট রফতানির ৮৮ শতাংশের মতো যায় উত্তর আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলোয়। দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও আসিয়ান মিলে মাত্র ১২ শতাংশ রফতানি হয়। বাজার বৈচিত্র্যকরণের দিকটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তৈরি পোশাক খাতের বড় বাজারটা আমরা নিতে পারি। আরএমজির বাইরে আমাদের আরো অনেক খাত আছে যেগুলো খুবই সম্ভাবনাময়। এর একটা হলো ফার্মাসিউটিক্যালস। তৈরি পোশাক খাতের চেয়েও এর অনেক বড় বাজার।

এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ায় ২০০১ সাল থেকে আমরা পেটেন্ট লাইসেন্স ছাড়াই অনেক ওষুধ উৎপাদনের সুযোগ পেয়েছি। অভ্যন্তরীণ সুযোগটা আমরা কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে তৈরি পোশাক খাতের মতো দ্বিতীয় পণ্যের উৎস হিসেবে আমরা আবির্ভূত হতে পারিনি। কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ ছিল। এটা এখনো মাত্র ১৬০ মিলিয়ন ডলারের রফতানি।

অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কটা যদি দ্রুত করতে পারি এবং সেটা কাজে লাগাতে পারি যেটা আমাদের ১ বিলিয়ন ডলারের মতো উপাদান ভারত, চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানি করতে হয়, সেটাও একটা বড় সম্ভাবনাময় খাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে একটা সমৃদ্ধ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করতেই আমাদের বছরের পর বছর লেগে যাচ্ছে। এটা এখন দরকার হবে যখন আমরা ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাব, আমাদের এ ওয়েবারটা থাকবে না। আমাদের পেটেন্টকৃত যেসব ওষুধ আছে সেগুলো উৎপাদন করতে হবে। অবস্থাটা পাল্টে যাবে। সেজন্য ওষুধ শিল্প পার্কটা খুবই জরুরি।

চামড়া শিল্প কতটুকু সম্ভাবনাময়?

তারপর আমাদের লেদার পণ্যেরও বিশাল আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে। আমাদের কাঁচামালের মান খুবই ভালো। এ পণ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ বাজারে ভালো করছি, কিন্তু বিশ্ববাজারে আমরা সেভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। আমরা যদি লক্ষ করি যে গত অর্থবছরের পাঁচ মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে নভেম্বরে তৈরি পোশাকের রফতানি আগের বছরের তুলনায় ২ শতাংশ কমে গেছে। কিন্তু নন-রেডিমেড গার্মেন্টের ২২–২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আছে। এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে যে বিশ্ববাজারে যে সংকোচন হয়েছে সেটার প্রভাব কিন্তু নন-রেডিমেড গার্মেন্ট বাজারে পড়েনি। তাই ফার্মাসিটিউক্যালস ও লেদার ফুটওয়্যার বলি এগুলোর কিন্তু একটা ভালো সম্ভাবনা আছে।

আমাদের সেবাখাত। ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় যা ভারতের পরই আমাদের অবস্থান। এসব জায়গায় আমরা ব্যাকএন্ড থেকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি, যেমন সফটওয়্যার ইত্যাদি। তাই সেবা খাতের বাজারটাই কিন্তু দ্রুত বাড়ছে।

ই-কমার্স ও এফ-কমার্স এসব ক্ষেত্রে যদি আমরা ইন্টারনেট, ইন্টারনেটের গতি ও ব্যয় বাড়াতে পারি তাহলে সেবা খাতেরও অনেক বড় সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি। এর বাইরেও আমাদের অনেক কিছু আছে, যেমন সিরামিক, প্লাস্টিক ও ফার্নিশিংসহ বিভিন্ন পণ্য রফতানি হচ্ছে যা অল্প পরিমাণে। কিন্তু তৈরি পোশাকই প্রায় ৮৪ ভাগ। কিন্তু এসব পণ্যেরও বড় ধরনের বাজার আছে এবং আমরা সেগুলো রফতানিও করছি। এখানে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা ও সরবরাহ সক্ষমতাও আছে, কিন্তু এটাকে এখন ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে নিজস্ব বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি আমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারলে রফতানি বহুমুখীকরণ বাজারে একটা বড় ধাক্কা দিতে পারব। বিশেষত বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা বাজার সম্পর্কে জানে, তাদের কী ধরনের চাহিদা রয়েছে সে বিষয়ে তারা জানে। সুতরাং একত্রীকরণের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শ্রমঘন অনেক শিল্প আছে যেগুলো গড়ে ওঠতে পারে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছে?

অনেকেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অনেক সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর হয় কিন্তু এসবের গড় মৃত্যুহার অনেক বেশি। তাদের আগ্রহ ও উৎসাহকে কীভাবে আমরা বাস্তবে বিনিয়োগে রূপান্তর করতে পারি সেটার জন্য বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক জোন ও অন্যান্য উদ্যোগ নিচ্ছি, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা বড় ধরনের অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করেছি, বিশেষ করে ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি, ট্রেড কানেক্টিভিটি ও ইনভেস্টমেন্ট কানেক্টিভিটির ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ করার একটা সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে।

আমাদের এখন আঞ্চলিক বাজারের প্রসার ঘটাতে হবে। ভারত আমদানি করে ৭৫০ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু আমি সেই বাজারে রফতানি করি মাত্র ২ বিলিয়ন ডলারের মতো। অন্যদিকে চীন আমদানি করে ২ হাজার ৮০০ বিলিয়ন ডলারের, কিন্তু আমরা সেই বাজারে রফতানি করি ১ বিলিয়ন ডলারও না। অথচ আমি এসব দেশ থেকে আমদানি করছি। কিছু কিছু পণ্য আমরা বাইরের দেশে রফতানি করি কিন্তু এসব দেশে রফতানি করি না।

এগুলোকে শনাক্ত করে বাজার বৈচিত্র্যকরণ, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর দেশীয় উদ্যোক্তাদের ব্যবসা করার খরচ (কস্ট অব ডুয়িং) এবং ব্যবসা সহজীকরণ (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) ভালো করতে হবে। তাহলে আমি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সম্ভাবনাই আছে। ফলে আমাদের বড় ধরনের কর্মসংস্থানও তৈরি হবে। ভালো আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু এর জন্য আবার আমাদের

দক্ষতা, মানসম্মত শিক্ষার প্রতিও নজর দিতে হবে। মেডিকেল সার্ভিস ও নার্সিং এটারও বিশাল বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় এজিং সোসাইটি গড়ে উঠছে। এসব জায়গায় কিন্তু বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আরো ১৫ বছরের মতো আছে। এটাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারব।

তৈরি পোশাক শিল্পে লেবার রাইটস ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে কিনা? শ্রমিকরাও তাদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট নন—বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? এটা নিয়ে কোনো ঝুঁকি বা শঙ্কা আছে কিনা?

এটা খুবই চিন্তার বিষয়। এটা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে বলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও বলেছে। তারা সুনির্দিষ্টভাবে উদ্বেগের জায়গার কথাও জানিয়েছে। কত শতাংশ স্বাক্ষর হলে তারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে সেটাও বলছে। ট্রেড সম্পর্কিত ডিসপুট বা ট্রাইব্যুনাল দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বলেছে। শ্রমিকরা আন্দোলন করলে তাদের হয়রানি না করতে বলেছে। কারণ যতক্ষণ শান্তিপূর্ণ হয় ততক্ষণ তাদের আন্দোলন করার অধিকার আছে। সেসব বিষয়ে তারা এরই মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন সভায় অংশ নিই। তারা নানা ধরনের কথা বলে। আমরাও উত্তর দিই। এভাবেই চলছে। যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমরা উত্তরণ হচ্ছি, তারা কিন্তু এখন নমনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না। আমরা এরই মধ্যে এসবের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার মতে, এগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। আর শ্রমিকরাও আমাদের দেশেরই জনগণ। আমাদের দেশে বড় ধরনের আয়বৈষম্য, ধনবৈষম্যসহ বিভিন্ন বৈষম্য তো বাড়ছেই। এটাও তো ঠিক। সেদিকটায় তারা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকারটা রক্ষা করতে পারেন, শোভন কর্মসংস্থান, শোভন মজুরি যাতে পান সেটা আমাদের করতে হবে। কিন্তু এটা করতে গেলে এটার আবার ব্যয়ও আছে। উৎপাদনশীলতা না বাড়িয়ে উদ্যোক্তা তার বেতন বাড়াতে পারবেন না।

উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গেলে এখন যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োজিত আছেন তা দিয়ে হবে না। লেবার ডিসপ্লেসিং অনেক প্রযুক্তি আছে, যার ফলে শ্রমিকদের কাজ অনেকটা মেশিন নিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। যারা কাজ করবেন তাদের শোভন মজুরি দিতে পারবেন, কিন্তু বেশি লোকের মজুরি দিতে পারবে না। তাহলে তৈরি পোশাকের বাইরেও শিল্পের বিকাশ করতে হবে। সেটা না করলে তারা বেকার থেকে যাবেন। আরেকটা বিষয়, যত শিক্ষিত তত বেকারের হারও বেশি। শিক্ষিতদের যে বেকারত্ব সেটাও যদি আমাদের মোকাবেলা করতে হয় তাহলে মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে দক্ষতা দিয়ে কেবল দেশীয় শ্রমবাজার নয়, বৈদেশিক শ্রমবাজারেও আমরা খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারব। তাই এ বিষয়গুলো আমাদের নজরে রাখতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার, শোভন কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং হয়রানি যাতে না করা হয় সেগুলোর বিষয়েও নজরে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) অনেকগুলো কনভেনশন স্বাক্ষর করেছি সেগুলো আমাদের কার্যকর করতে হবে। কমপ্লায়েন্সের বিষয়গুলো শুধু শ্রমিক অধিকার নয়, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সুশাসন, লিঙ্গ অধিকার ও পরিবেশবান্ধব কিনা,

কার্বন ডাই-অক্সাইড কতটুকু নিঃসরণ হচ্ছে এসবও চলে এসেছে। সুতরাং কর্ম পরিবেশটা শ্রমিকদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাজারে প্রবেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘদিন ধরে চলা রাজনৈতিক সংকট অর্থনীতিতে কী ঝুঁকি তৈরি করেছে?

আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন হয়। এটাকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। আন্দোলনটা যারা করছেন তাদের কোনো যৌক্তিক দাবি আছে কিনা সেটাও আমাদের দেখতে হবে। আবার এ আন্দোলনের ফলে আমাদের যেন অর্থনৈতিক ক্ষতি না হয় সেদিকেও নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং এখানে যদি সমঝোতামূলক একটি পরিবেশ না রাখতে পারি তাহলে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক যে সমাজ চাই সেটা আমরা পাব না। আরেকটা হলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত যে বাংলাদেশ চাই, যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা কাজ করতে পারবেন, সেই পরিবেশও কিন্তু থাকবে না।

৭ জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার এসেছে। নতুন সরকারের সামনে কি চ্যালেঞ্জ আছে?

আমার মতে, উত্তরাধিকার সূত্রেই আমাদের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে। রিজার্ভ সংকট, বৈদেশিক মুদ্রামানের ক্রমাগত অবনমন, সেটাকে বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে, কিন্তু এগুলোর অভিঘাত থেকে যাবে। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা একটা চ্যালেঞ্জ হবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে একটা স্থিতিশীল জায়গায় নিয়ে এসে টাকার মানটাকে একটি স্থিতিশীল জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। সুদের হার যেটা অনেক দিন ধরে ‘ছয়–নয়’-এর মধ্যে বাঁধা ছিল। এটা এরই মধ্যে বাজারমুখী করা হচ্ছে, সেটাকে একটা যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেবা, বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহরণের সঙ্গে জড়িত যেসব প্রতিষ্ঠান আছে—সেটা এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক হোক সেগুলোর দক্ষতা ও সামর্থ্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

নতুন সরকার এ পরিস্থিতি কতটুকু সামাল দিতে পারবেন সেটা একটা বিষয়। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যত্যয় হলে আমরা যে অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটা আরো প্রকট হবে। এমনকি এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সুতরাং সংস্কার কর্মসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ঋণখেলাপি ও করখেলাপির বিরুদ্ধে যদি শক্ত পদক্ষেপ নেয়া যায় তাহলে পরিস্থিতিটাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। হয়তো একটা ভারসাম্যে যেতে পারব।

বণিকবার্তা
২১ জানুয়ারি ২০২৪

শ্রম ও প্রযুক্তিনির্ভরতা সমন্বয় করলে অগ্রগতি হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের প্রবৃদ্ধি আমরা লক্ষ করছি। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে আরো অনেক কিছু করার আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেসব মার্কেটে যাচ্ছে, সেখানে অনেক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং সেদিক থেকে আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করার সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ আগের তুলনায় বাড়ছে, তা আরো বাড়াতে হবে।

বাড়াতে গেলে যে ধরনের দক্ষতা—প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে, সেই জায়গায় আমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে। তবে বেশ কিছু বিদেশিও বাংলাদেশের এসব জায়গায় কাজ করছে। অন্যদিক থেকে আমরা যে দেখছি, উৎপাদনশীলতা আবার যেখানে বেড়েছে, সেসব জায়গায় শ্রম নিয়োগবিহীন একটা প্রবৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং অর্থনীতিতে যদি আরো দ্রুতভাবে প্রবৃদ্ধি না হয় তাহলে আরো শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি থেকে যাবে।

প্রবৃদ্ধির সঙ্গে নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করতে হবে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি খাতে পোশাকশিল্পে ৮৪ শতাংশ রপ্তানি করে। রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ যেভাবে হওয়ার কথা উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, শ্রম দক্ষতা বাড়িয়ে, পুঁজি দক্ষতা বাড়িয়ে, সে জায়গাটিতে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে; সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গবেষণায় আরো বিনিয়োগ করতে হবে।

এটাতে যেমন সরকারের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী দিক বিবেচনা করতে হবে, তেমনি বিনিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি যারা উৎপাদক-উদ্যোক্তা আছে, তাদেরও এসব জায়গায় আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, পঞ্চম শিল্প বিল্পব—

এগুলো আসছে, অনেক উৎপাদন দেখা যাচ্ছে যে ই-কমার্সের সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং সার্ভিস সেক্টরগুলোতেও আমাদের নজর দিতে হবে। পোশাকশিল্পের মধ্যে বৈচিত্র্যকরণ আনতে হবে।

মূলত আমাদের পোশাকশিল্প তুলানির্ভর উৎপাদন। একে এখন কৃত্রিম তন্তুর বৈচিত্র্যকরণের দিকে যেতে হবে। কারণ বৈশ্বিক বাজার এখন নন-কটনের দিকে বেশি যাচ্ছে। তাই এই জায়গাগুলোতে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। বাজেট বরাদ্দও বাড়াতে হবে। অন্যদিকে আমাদের আঞ্চলিক বাজারে অনেক সুবিধা রয়েছে।

শোভন কর্মসংস্থান এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এবং এটা শ্রমিকদের উৎপাদনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক বাজারের প্রেক্ষাপটেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বেশি পণ্যের বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে হলেও এসব জায়গায় বেশি নজর দিতে হবে। কারণ শোভন কর্মসংস্থানের সঙ্গে উৎপাদনের একটা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। আরেকটি বিষয়, যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আমরা যে দেশগুলোর কাছে আমাদের পণ্য বিক্রি করি সেসব দেশ শোভন কর্মসংস্থানের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। এখন এটি বাজার ধরার একটি অনুঘটক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তারা আমাদের কাছ থেকে পণ্য কিনবে না, যদি আমরা শোভন কর্মসংস্থান, শ্রমিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে গুরুত্বারোপ না করি। আর এ ধরনের শর্ত ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ বিষয়গুলোকে রপ্তানি সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতার অংশ হিসেবেই দেখতে হবে।

বাংলাদেশে এসডিজির সপ্তম বছর যাচ্ছে। আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচক, যেমন—খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে আমরা ইতিবাচক অবস্থানে ছিলাম। এই চলমান করোনা মহামারি এসব অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমাদের যে অর্জন হয়েছিল, সেসব যে বাধাগ্রস্ত হলো, এখন সেসব কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে তা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত প্রান্তিক মানুষ যাতে সুফল পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি ছিল, যেটি কভিডের কারণে পিছিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। বৈষম্য কমিয়ে আনার বিষয়ে এসডিজিতে আমাদের সূচক ছিল ১০। মহামারিতে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এভাবে নানা বিষয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই মধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়ন। সেটি হচ্ছে প্রথম ফেজ। এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার হয়তো পুরো অর্থ জোগান দিতে পারবে না। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, গণমাধ্যমসহ সব শ্রেণির ভূমিকা রয়েছে। সেটি

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সঠিকভাবে আমাদের এবারের বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান—এসব ক্ষেত্রে যেসব প্রণোদনা রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। আর যেটি করতে হবে, সংস্কারের কাজ করতে হবে। অনেক দিন ধরেই আমাদের রাজস্ব সংস্কার করা হয় না। প্রত্যক্ষ কর আইন, শুল্ক আইন—এসব বিষয়ের আইনগুলো সংস্কার করতে হবে।

কাজে লাগাতে হবে। এসডিজি ব্যাপক, রূপান্তরযোগ্য, সংহত এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তৈরি। এর লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের সময় নাগরিক অধিকারের প্রেক্ষাপটগুলো মাথায় রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এসডিজি অর্জনের জন্য মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো উপলব্ধি করা পথনির্দেশকের মতো কাজ করে। এগুলো নির্ভর করে উন্নয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যের ওপর।

অর্থপাচারে বৈষম্য অবশ্যই বাড়ে। কয়েকটি পর্যায়ে বৈষম্য হয়। যে পরিমাণ অর্থ একজন পাচার করছে, সেটির ক্ষেত্রে পাচারকারী হয়তো ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে অথবা কোনো দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতি করলে সে হয়তো সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে বা ঘুষ নিয়েছে। যেমন—বিদ্যুতের লাইন পেতে একজন যদি ১০০ টাকাও ঘুষ দেয়, সেটি তার আয় থেকে কমল। আর যে ঘুষ নিল তার আয় বাড়ল। এভাবেই বৈষম্যটা হয়। দুর্নীতি হচ্ছে বৈষম্যের একটি বড় উপায়। কারণ দুর্নীতি যে করছে সে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। ২০১০ ও ২০১৬ সালে আমাদের বিবিএস যে খানা জরিপ করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, আয়ের বিবেচনায় দেশের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশে এবং সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে বৈষম্য, সেটি ২৩ গুণের জায়গায় ১২১ গুণ হয়ে গেছে। দুর্নীতিটা যখন হয়, তখন এক ধরনের বৈষম্য হয় ধনী-গরিবের মধ্যে। আর এই বৈষম্যই হলো এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বড় বাধা। অর্থপাচারের অভিঘাত সমাজের ওপরে বিভিন্নভাবে পড়ছে। সুতরাং সেটিকে আমাদের থামাতে হবে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সঠিকভাবে আমাদের এবারের বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান—এসব ক্ষেত্রে যেসব প্রণোদনা রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। আর যেটি করতে হবে, সংস্কারের কাজ করতে হবে। অনেক দিন ধরেই আমাদের রাজস্ব সংস্কার করা হয় না। প্রত্যক্ষ কর আইন, শুল্ক আইন—এসব বিষয়ের আইনগুলো সংস্কার করতে হবে। অনেক দিন ধরেই আমরা এসব অর্ধেক করে রেখেছি। এসব দ্রুত সংস্কার করার বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে। ভ্যাট আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুন বাজেটে এসব বিষয়কে চিহ্নিত করার পাশাপাশি বাস্তবায়নের একটি সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এখন অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ যদি কিছুটা কমিয়ে আনা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পাবে। কর আদায়ের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করতে হবে। তবে সেটা করতে গিয়ে যেন সাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কারগুলো করতে হবে। কম আয়ের মানুষদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য গত বাজেটে যে সুযোগ রাখা হয়েছিল, সেটি এবারও অব্যাহত রাখতে হবে। কিছু কিছু ভোগ্য পণ্য রয়েছে, সেসবের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে। তাতে কিছুটা সাশ্রয় হবে সাধারণ মানুষের। আর সর্বোচ্চ করের হার যেটি শুরুতে ৩০ শতাংশ ছিল, পরে সেটি কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছিল, আমার মনে হয় এটি আবার ৩০ শতাংশ করা উচিত। কারণ এটি ছিল অধিক আয় যাঁরা করেন তাঁদের জন্য। এ ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু বৃদ্ধি করাই নয়, এর ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া ডিজিটাল ডিভাইসসহ ইন্টারনেট খাতের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে। এসব পদক্ষেপ নিয়ে যদি তার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করা যায় তাহলেই আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে যেতে পারব।

বণিকবার্তা
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

টাঙ্গাইল শাড়ির মালিকানা
সঠিক পথ কোন দিকে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও নাইমা জাহান তৃষা

গত ১ ফেব্রুয়ারি ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের ফেসবুক পেজে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য তাঁতি সমবায় সমিতি টাঙ্গাইল শাড়ির ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি পেয়েছে। এ খবরে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা এ ধরনের কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকারও প্রতিক্রিয়া জানায়। পরে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো টাঙ্গাইল শাড়িকে বাংলাদেশি পণ্য হিসেবে জিআই স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়। তবে এক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ অনুসৃত হয়েছে কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, ভারত ২০২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল শাড়ির জিআইর জন্য আবেদন করে। চার বছর ধরে ক্রমাগত যাচাই এবং সংশোধন শেষে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন 'দি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্ডিয়া পেটেন্টস ডিজাইন ট্রেডমার্ক জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তাঁতি সমবায় সমিতি লিমিটেডের অনুকূলে 'বাংলার টাঙ্গাইল শাড়ি' নামে জিআই সনদ ইস্যু করে। এই চার বছর বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অবগত ছিল না বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত ছিল। ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট ভারতের মেধাসম্পদ বিষয়ক অফিস ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্ডিয়া এ বিষয়ে জার্নাল প্রকাশ করে এবং জিআই সনদ দেওয়ার আগে কারও আপত্তি থাকলে তা জানানোর আহ্বান জানিয়ে জার্নালটি তাদের ওয়েবসাইটে পাঁচ মাস রাখা হয়। দুঃখজনক, বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন অনুমোদিত তিন মাস সময়ের (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০২৩) মধ্যে আপত্তি জানাতে ব্যর্থ হয়। নয়াদিল্লির দিক থেকেও ঢাকাকে সতর্ক করা হয়নি। সমনামি পণ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে অন্য পক্ষ জিআই দাবি করতে পারে; সতর্ক করার রেওয়াজ রয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পর বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ২০২৪ সালের ১৯ মার্চের মধ্যে সব নিবন্ধিত ও নিবন্ধনের উপযোগী জিআই পণ্যের তালিকা তৈরি করতে নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। শিল্প মন্ত্রণালয় টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গত ৫ ফেব্রুয়ারি জরুরি বৈঠক ডাকে। এর মাত্র এক দিন পর অর্থাৎ ৬ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল শাড়ির জিআইর জন্য ডিপিডিটিতে আবেদন করে। এর পর প্রধানমন্ত্রী গত ১১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোকে জিআই নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব তাঁর ব্রিফিংয়ে জানান, টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই বিষয়ে ভারতের সঙ্গে কোনো বৈরিতা হলে বাংলাদেশ যথাযথ আন্তর্জাতিক সংস্থায় (সম্ভবত ডব্লিউআইপিও তথা বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক) সমাধানের জন্য যেতে পারে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে।

সঠিক পথ কোন দিকে

মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার শেষ পর্যন্ত সমস্যাটিকে আমলে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, টাঙ্গাইল শাড়ির মালিকানা বিষয়ে সরকার কি সঠিক কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে? আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, সরকার এই ইস্যুতে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা না করে কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। সরকারের প্রতিক্রিয়ার ধরন অনেকটা জনসংযোগ চর্চার মতো। যদি আইনসম্মতভাবে এবং সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে টাঙ্গাইল শাড়ির ওপর আমাদের ন্যায়সংগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার সব চেষ্টা নিরর্থক হবে।

আমরা মনে করি, পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন, ২০১৩ (নিবন্ধন ও সংরক্ষণ)-এর নির্দেশিত প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করে টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া উচিত। ভারতের নিবন্ধনের প্রতিক্রিয়ায় ডিপিডিটি তাড়াহুড়ো করে টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করে। টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসন মাত্র এক দিনের মধ্যে আবেদনের কাজ সম্পন্ন করে; কেবল আগে থেকে প্রক্রিয়া এগিয়ে থাকলে যা সম্ভব বলে আমাদের কাছে মনে হয়। কিন্তু সেই প্রস্তুতি ছিল কিনা, আমাদের জানা নেই।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ডিপিডিটি টাঙ্গাইল শাড়িকে বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে ‘স্বীকৃতি’ দিয়েছে বলে ঘোষণা আসে। বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদ সংস্থা বাসস সংবাদ প্রকাশ করে। এখানে ‘স্বীকৃতি’ শব্দটি যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। মূলত ডিপিডিটি জেলা প্রশাসনের আবেদন অনুমোদন করে এবং ৯ ফেব্রুয়ারি জিআই জার্নাল প্রকাশ করে। এর অর্থ এই নয়– টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ অনুমোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন গণমাধ্যমে গত ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদ প্রকাশিত হয়, প্রধানমন্ত্রী টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ গ্রহণ করেছেন। বস্তুত ডিপিডিটি এখনও আইন অনুযায়ী টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শেষ করেনি। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এখনও জিআই পণ্য হিসেবে টাঙ্গাইল শাড়ি তালিকাভুক্ত হয়নি।

পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন, ২০১৩ (নিবন্ধন ও সংরক্ষণ)-এর অধ্যায় ৪-এর ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রার যদি মনে করেন, আবেদনে সব শর্ত পূরণ করা হয়েছে, তাহলে আবেদনটি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হবে। আইনের চার অধ্যায়ের ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আগ্রহী কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে পণ্যটির নিবন্ধন বিষয়ে আপত্তি জানাতে পারে। এর মানে, আইন অনুযায়ী শুধু ২০২৪ সালের ৯ এপ্রিলের পর ডিপিডিটি টাঙ্গাইল শাড়ির নিবন্ধন করতে সক্ষম হবে।

ভারতে আইনের আশ্রয়

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে টাঙ্গাইল শাড়ির নিবন্ধন ভারতকে এই পণ্যকে জিআই হিসেবে ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে না। তারা এর বাণিজ্যিক সুফল গ্রহণ করতে থাকবে। এদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিয়ে ফেসবুক ও টুইটার থেকে তাদের পোস্ট সরিয়ে নিয়েছে। তারা এই জিআই উদ্যোগ বাতিল করেছে মর্মে আমাদের দেশের কয়েকজন মন্ত্রী বক্তব্য দিয়ে আরও বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে এখনও 'বাংলার টাঙ্গাইল শাড়ি' জিআই পণ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।

আমরা মনে করি, স্থানীয় তাঁতিদের অন্যায্য প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করতে সরকারকে টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই ইস্যুতে ভারতকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। 'সুই জেনেরিস' শীর্ষক পদ্ধতিগতভাবে জিআই পণ্য যেহেতু জাতীয়ভাবে অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়, সেহেতু বাংলাদেশকে প্রথমে টাঙ্গাইল শাড়ির ওপর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের আদালতে যেতে হবে। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আপিলেট বোর্ডের (আইপিএবি) কাছে তিন মাসের মধ্যে আপিলের কথা বলা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশকে আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে আপিল করতে হবে।

অবশ্য ২০২১ সালে আইপিএবি ভেঙে দেওয়া হয় এবং দিল্লি হাইকোর্ট ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে মেধাসম্পদ বিষয়ে দুটি আলাদা শাখা গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনাল রিফর্মসের (র‍্যাশনালাইজেশনস অ্যান্ড কন্ডিশনস) অধীনে ভারতের রেজিস্ট্রার অব জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস বরাবর এবং দিল্লি হাইকোর্ট ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে যদি জিআই সম্পর্কিত কোনো আইনের লঙ্ঘন হয়, তাহলে রেজিস্ট্রার অথবা হাইকোর্টের জিআই বাতিল বা স্থগিত করার ক্ষমতা রয়েছে।

বাংলাদেশের এই ইস্যুতে শক্ত যুক্তি রয়েছে। ভারত তাদের জিআইতে 'টাঙ্গাইল শাড়ি' ব্যবহার করেছে। টাঙ্গাইল বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁতিদের অভিবাসনের মাধ্যমে দক্ষতা এবং জ্ঞান স্থানান্তরের যে যুক্তি দিয়ে ভারত টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিবন্ধন করেছে, তা বাস্তবভিত্তিক নয়। জিআই অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য হতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে সমাধান যেভাবে

মনে রাখতে হবে, বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা-ডব্লিউআইপিওর অধীনে টাঙ্গাইল শাড়ি ইস্যুতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আপাতত কোনো অবকাশ নেই। কেননা, বাংলাদেশ এবং ভারত কোনো দেশই দ্য লিসবন এগ্রিমেন্ট ফর দ্য প্রটেকশন অব অ্যাপলেশনস অব অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৮)-এর স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। লিসবন চুক্তি হলো জিআই সুরক্ষার জন্য একমাত্র আন্তর্জাতিক রক্ষাকবচ। বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে এ চুক্তিতে স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিতে পারে। উপরন্তু ডব্লিউআইপিওর সদস্য দেশগুলোর জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে।

দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে এবং ভারতের আদালতে কোনো ফলাফল না এলে বাংলাদেশ ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (ট্রিপস) চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে ডব্লিউটিওর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে পারে। ট্রিপস চুক্তির অধ্যায় ২২ অনুযায়ী ‘বাংলার টাঙ্গাইল শাড়ি’ শিরোনাম পণ্যের সঠিক উৎসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে– এ অভিযোগ আনা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই নিবন্ধন বাতিল এবং বাংলাদেশের পণ্য হিসেবে এর নিবন্ধন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং বহু ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরকারের এ তৎপরতাকে কার্যকর ও অর্থবহ করতে আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়কে সহায়তাকারী একটি ‘টাস্ক টিম’ গঠনের সুপারিশ করছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো ও নাইমা জাহান তৃষা, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি।

দৈনিক সমকাল
১২ মার্চ ২০২৪

আমাদের রক্তের ঋণ এখনো শোধ হয়নি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় মুক্তি আমরা পেয়েছি, তা আমাদের বহু কিছু দিয়েছে। দিয়েছে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা, তা সে সিদ্ধান্ত ভুল বা সঠিক যা-ই হোক না কেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ব্রিটেন আর তারপর পাকিস্তানের মতো শাসকদের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জনগোষ্ঠী তার প্রতিটি অংশে নিজস্ব উদ্যোগের স্পৃহা সঞ্চার করতে পেরেছে। এ কারণে আমাদের অর্থনীতির ওপর থেকে ব্রিটিশ এবং অবাঙালি ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীদের আধিপত্য হটে গিয়েছে। এই অর্থপূর্ণ পরিবর্তন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্র কৃষক, নারী-কর্মী, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা, অভিবাসী শ্রমিক, পোশাক রপ্তানিকারক, প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতির মধ্যে উদ্যোগী গতিশীলতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এসবের মধ্যে কিছু নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর ফলে আমরা ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দিয়ে উন্নীত হয়েছি একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতিতে।

আমাদের অর্থনীতি নানাভাবে অনেক বেশি বহুমুখী ও বিকশিত হয়েছে, রপ্তানি বেড়েছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে উন্নতি হয়েছে। এসব অর্জনের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রমাণ হলো পদ্মা সেতু। একই সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্য কমেছে, শিক্ষা ও চিকিৎসার বিস্তৃতি বেড়েছে।

তবে যা এখনো সত্যি হয়নি তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুরোপুরি সম্মান দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে জীবিত রাখা। আমাদের গণতান্ত্রিক পথযাত্রা বারবার ব্যাহত হয়েছে এবং কখনো কখনো উল্টো পথে চলছে। অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীর তুলনায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি ভালোভাবে বজায় রাখলেও আমাদের দেশের সংখ্যালঘু মানুষের মনে এখনো আমরা সমতার অনুভূতি নিশ্চিত করতে পারিনি। আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রমাণ দিয়েছি—এখন আমরা আর বিদেশি অনুদান অথবা পরামর্শের মুখাপেক্ষী নই। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৈষম্যমুক্ত

সমাজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি। ধনবানেরা এ দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করে নিয়েছে এবং রাজনীতি এখন ক্ষমতা ও টাকার জিম্মায় চলে গেছে। রাষ্ট্রের পরাক্রমশালী ক্ষমতার সামনে এসব অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে আমাদের আদালতগুলো ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের মূল ভাবনা ছিল বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া; আর এ দেশের জনতার, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতায়ন—যাতে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের পুরো সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ পায়। অর্ধশতক পার হয়ে গেছে, অথচ একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো উপেক্ষিতই থেকে গেল।

যে জনতা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং নিজের জীবন ও বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের রক্তের ঋণ আছে। ক্ষমতাবানেরা যেভাবে ক্ষমতা ও সম্পদ আত্মসাৎ করছে, তাতে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক ব্যবধান আর সামাজিক বৈষম্য ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের সে রক্তের ঋণ এখনো শোধ হয়নি।

আরও অনেকের মতো আমার নিজের জীবনে মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক সন্ধিক্ষণ। বাংলাদেশের জন্য বিদেশে ৯ মাস প্রচারণার কাজ চালানোর পর ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর যখন ঢাকার বিমানবন্দরে নামলাম, তখন এমন এক পরিপূর্ণতার অনুভূতি হয়েছিল যে সেটি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারা আমাকে একটি গৌরব ও আত্মমর্যাদার বোধ দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ এখনো আমাদের এমন স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে যে আমরা সেই ন্যায়পরায়ণ সমাজটি গড়ে তুলতে পারব, যার জন্য একদিন যুদ্ধ করেছি এবং বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন।

প্রথম আলো
২৬ মার্চ ২০২৪

বাংলাদেশ একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হবে ১৯৭১ সালে এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন

অধ্যাপক রওনক জাহান

রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি লাভ করেন তিনি। জাতিসংঘের এশিয়া-প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কুয়ালালামপুর) ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিসে (জেনেভা) নারী বিষয়ক কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার গবেষণার বিষয় হচ্ছে রাজনীতি, শাসন, নারী, উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য। বর্তমানে তিনি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বাপর নানা ইস্যু নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম

কোন কোন প্রেক্ষাপটে বা কার্যকারণে আপনার মনে হলো, পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিচ্ছেদটা অনিবার্য একটি পরিণতি?

যখন বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখন আমাদের প্রজন্ম স্কুলে পড়ে। আমরা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ওপর ক্রমাগত হতাশ, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। এক পর্যায়ে মনে হয়েছে, বিচ্ছেদটি অনিবার্য। কয়েকটি মাইলফলক সম্পর্কে আমি আমার বই ‘পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনে’ লিখেছি, যা এখন সবাই ইতিহাসের বইতে পড়ে, কিন্তু এসবের আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষদর্শী।

আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন শুনলাম বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে। অথচ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা আমাদের ন্যায্য দাবি ছিল। তখন আমাদের মনে হলো, পাকিস্তানি সরকার তো আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায্য ব্যবহার করছে। তার পরেই হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যেখানে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। কিন্তু কয়েক মাসের মাথায়

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। নির্বাচিত সরকারের ন্যায্য অধিকার ছিল দেশ শাসন করার।

আসলে ১৯৫০-এর দশক থেকেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ক্রমেই বেগবান হতে থাকে। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি তখন থেকেই আমরা করতে থাকি।

তারপর যখন একটা জাতীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে এবং আমরা বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে সরকার গঠনের একটা সুযোগ পাওয়ার কথা তখনই আবার হয়ে গেল ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল। এর মাধ্যমে সব ধরনের রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়া হলো। তখন আরেকটি ধাক্কা। আমরা লক্ষ করলাম, আমরা যতই গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করি না কেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের দাবিয়ে রাখছে।

তারপর ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন শুরু হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম থেকেই আমরা চেয়েছিলাম, যেহেতু বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখব। তার সঙ্গে যেহেতু আমাদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে, তাই আমাদের এখানে স্বায়ত্তশাসনও থাকবে। অতএব, একসঙ্গে আমাদের দুটো দাবিই ছিল। কিন্তু ক্রমেই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে কেন্দ্রে শাসন করার চেয়ে আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করাটাই জরুরি। তাই ছয় দফার যে দফাগুলো ছিল, যেখানে অর্থনীতিকে একদম আলাদা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল, তা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এরপর ১৯৬৬–৭০ মাত্র চার বছরে আমাদের জনসাধারণের মনোভাব খুব দ্রুত পাল্টে গেল।

এ বিষয়ে এর আগে আরেকটি সাক্ষাৎকারে আমি বলেছি, ১৯৬৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে যখন যাই তখন আইয়ুববিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। কিন্তু তখনো এ দেশের জনগণের মধ্যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মনোভাব লক্ষ করিনি। স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা রাজনীতিতে হয়তো যারা তরুণ নেতৃস্থানীয় বা কিছু বুদ্ধীজীবী ছিলেন তারা চিন্তা করছিলেন।

কিন্তু মাত্র তিন বছর পর যখন ১৯৬৮ সালে আমি আমার থিসিসের কাজের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে দেশে ফিরলাম তখন দেখলাম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও ভাবছে পাকিস্তানের সঙ্গে আর থাকা যাবে না। তখন আমার মনে হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা আসলেই তো একটা সময়ের ব্যাপার। পাকিস্তান কবে ভেঙে যাবে সেটা আমি জানি না। কিন্তু পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কারণ আমরা আইনসম্মত ও গণতান্ত্রিকভাবে যা-ই চাই বা চেষ্টা করছি, আইনসম্মত দাবিগুলো বলতে ও আদায় করতে কিছুতেই পারছি না। অতএব পাকিস্তানের সঙ্গে তো আর একসঙ্গে থাকা যাবে না। আমার হার্ভার্ডের থিসিস যেটা আমি শেষ করেছিলাম ১৯৬৯ সালে, যা পরে ‘পাকিস্তান : ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন’ শিরোনামে ১৯৭২ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশ হয়েছিল, যেখানে বাংলাদেশ স্বাধীনতা হওয়ার আগেই খুব স্পষ্টভাবে বিভাজনের এ ইঙ্গিত দিয়েছিলাম।

পাকিস্তান আমলে দুটো নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনগুলো নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

পাকিস্তান আমলে আমরা দুটো নির্বাচন দেখেছি, যেখানে জনগণ সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাদেশিক নির্বাচন, যেখানে প্রথম সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ ভোট দেয়ার অধিকার পায় এবং তারা তখন মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। এ নির্বাচনের পর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আর কোনো প্রত্যক্ষ নির্বাচন দেয়নি পাকিস্তান। তারা ভেবেছিল আবার নির্বাচন দিলে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তি ভোটে জয়ী হবে।

জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করেন। তারপরে আইয়ুবের শাসনকালে মৌলিক গণতন্ত্র চালু হয়, যেখানে জনগণকে পরোক্ষ ভোটের অধিকার দেয়া হয়েছিল। এরপর ১৯৭০ সালে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যখন সাধারণ মানুষকে সরাসরি ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়া হলো তখন দেখা গেল তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ভোট এল।

প্রশ্ন হলো ইয়াহিয়া খান কেন ১৯৭০ সালে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দিতে রাজি হলেন? তিনি তো সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কেন আইয়ুব খানের প্রদর্শিত পথে হাঁটলেন না? এখানে বুঝতে হবে, ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান এবং বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি দেখে ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন এখন আর বাঙালিদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যাবে না। তাদের সঙ্গে আলোচনা ও কিছুটা সমঝোতা করতে হবে। এছাড়া পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের কিছু নেতা ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিল যে বাঙালিরা এতটা ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদের অনুমান ছিল, পাকিস্তানপন্থী দলগুলো কিছু আসন পাবে এবং নির্বাচনে হয়তো আওয়ামী লীগ এত আসন পাবে না। পাকিস্তানপন্থী কিছু নেতাকে নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দমিয়ে রাখা যাবে। অতএব নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ কিছু বাঙালি নেতাকে হাত করলে ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে দিতে হবে না। কিন্তু সত্তরের জাতীয় নির্বাচনে দুটি ছাড়া সবক'টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করবে সেটা তারা কখনই ভাবেনি। এটা কিছুটা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা যে তারা বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোভাব সঠিক বুঝতে পারেনি।

৫০–৬০-এর দশকে কিছু বামপন্থী দল অনেক শক্তিশালী ছিল। ছয় দফা আন্দোলন তৎপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শক্তিশালী নেতা হিসেবে দাঁড়ান। কীভাবে বামপন্থী দলগুলো দুর্বল হয়ে গেল আর আওয়ামী লীগ একক মুখপাত্র হয়ে গেল?

কোনো একটি সময়ে জনসাধারণের মনে কোন ইস্যুটা প্রধান ইস্যু হয় তা ধরতে পারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ গুণ। ১৯৫৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থীরা যখন আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করে তখন তারা বেশ শক্তিশালী ছিল। তখন দেশে অনেক শক্তিশালী বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ছিল

যেমন ছাত্র ইউনিয়ন। কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে জনমনে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় বামপন্থীদের মধ্যে অনেক বিভাজন চলছিল; কেউ ছিল চীনপন্থী আবার কেউ রুশপন্থী। যখন দেশের মানুষের প্রধান চাওয়া ছিল স্বাধিকার ও স্বাধীনতা, তখন দেশের মানুষের মনের প্রধান ইস্যুকে বিবেচনা না করে তারা পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছিল। এখানে আমি বলব, তখন বামপন্থীরা একটা ভুল হিসাব করেছিল। তারা স্বাধিকার ইস্যুকে একমাত্র ইস্যু হিসেবে গণ্য না করাতে মাত্র চার-পাঁচ বছরে পুরো দেশের ওপর বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হলেন এবং ছয় দফার আন্দোলন শুরু করলেন তখন তিনি এ দেশের মুক্তিকামী জনসাধারণকে একত্র করতে পারলেন। মানুষের মধ্যে এ উপলব্ধি হলো যে আমাদের পিছিয়ে থাকা, আমাদের দরিদ্রতা মূলত পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনার কারণে।

একাত্তরের উত্তাল মার্চের কোন কোন স্মৃতি আপনার মনে হয়?

তখন আমি বিদেশ থেকে ফেরত এসে সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছি। আমার প্রথম স্মৃতি জাতীয় পরিষদের সভা মুলতবি করে দেয়ার পর দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ার দৃশ্য। স্বাধীনতার পক্ষে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন রাস্তায় মিছিল করছে মার্চের ২-৩ তারিখ থেকে। কিন্তু সবই শান্তিপূর্ণ। কোনো অরাজকতা নেই। মানুষ একদম একত্রিত। এ ধরনের ম্যাস-মবিলাইজেশন দেখা—এটা আমার প্রথম স্মৃতি। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশোর বিখ্যাত বই দ্য সোশ্যাল কনট্র্যাক্টে আলোচিত 'জনগণের ইচ্ছা'র কথা পড়েছি। এটা ছাত্রদেরও পড়াতাম। ওই সময় আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে একটা 'সাধারণ ইচ্ছা' সৃষ্টি হয়েছে। সেটা তখন আমার নিজের চোখে প্রতীয়মান। একটা বিষয় বইতে পড়া আর নিজের চোখে দেখা দুই রকমের অভিজ্ঞতা।

এরপর দ্বিতীয় স্মৃতি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ। আমরা তখন ভাবছি, কী হতে যাচ্ছে, সাতই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে দেয়া হবে নাকি? আমি তখনকার রেসকোর্স, যাকে এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বলা হয়, সেখানে গেলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। সেখানে হাজার হাজার লোক বসে আছে। কোনো জায়গায় অনেক লোক থাকলে অনেক সময় গোলযোগ হয়, কিন্তু সবচেয়ে অভূতপূর্ব বিষয় হচ্ছে, সেখানে কোনো ধরনের গোলযোগ নেই। একদম শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ অবস্থান করছে। আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সেই অভূতপূর্ব ভাষণ শোনা, যার স্মৃতি এখনো অম্লান।

তৃতীয় স্মৃতি ২৩ মার্চের দিন স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোর। আমরা নিজের বাসায় বসে স্বাধীনতার পতাকা নিজেরাই তৈরি করেছিলাম। এ পতাকার মধ্যে বাংলাদেশর মানচিত্র ছিল। ২৬ তারিখে এ পতাকাকে আমাদের নামাতে হয়েছিল। কিন্তু পতাকাকে আমরা ফেলে দিইনি।

লুকিয়ে রেখেছিলাম। ততদিনে আমরা জানতাম যে দেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং যখন স্বাধীন হবে তখন আবার এ পতাকা ওড়াব।

অবশ্যই মার্চের সবচেয়ে মর্মান্তিক স্মৃতি ২৫ মার্চের রাতের গণহত্যার এবং তার পরবর্তী দিনগুলোর। ২৫ মার্চ রাত্রে আমাদের এলিফ্যান্ট রোডের বাসা থেকেই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিলখানায়, তখনকার ইপিআরের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের শব্দ শুনেছি। বাবুপুরা বস্তি পুড়িয়ে দেয়ার পর আকাশে আগুন দেখেছি। মানুষের আর্তনাদ শুনেছি। তারপর ২৭ মার্চের পর থেকে হাজার হাজার মানুষকে ঢাকা ছেড়ে যেতে দেখেছি। এসব স্মৃতি কখনই ভোলার নয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ এবং আঞ্চলিক পরাশক্তিদের ভূমিকা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বিশেষ করে ভারত, চীন, রাশিয়া ও আমেরিকার ভূমিকা?

ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। ভারতের সাহায্যটা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯৭১ সালে ভারত মানবিকভাবে আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেছে। ভারত সরকারি পর্যায়ে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের মিত্র দেশগুলোর সমর্থন অর্জনে সাফল্য লাভ করেছিল। সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ হলো ডিসেম্বরে যখন সম্মুখযুদ্ধ শুরু হলো তখন ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে অংশ নিয়ে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বাংলাদেশের জন্ম ভারতের জন্যও ইতিবাচক হয়েছে। ভারতের পূর্ব দিকে একটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশ সৃষ্টি হলো।

১৯৭১ সালে ভারত, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা ও সমর্থন জানিয়েছিল। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মুসলিম বিশ্ব আমাদের বিরোধিতা করেছিল।

যেহেতু আমাদের আন্দোলন ছিল গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ এবং সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা জনগণের ম্যানডেটের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে আমাদের আক্রমণ করল তখন কেউ কেউ ভেবেছিল যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ উদার গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদের পাশে থাকবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সরকার তখন পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টায় ছিল। তাই ১৯৭১ সালে নিক্সন সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। কিন্তু মার্কিন অনেক কংগ্রেসম্যান ও সিনেটর বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। দেখা গেছে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সরকারি পর্যায়ে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আরেক ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল। সরকারি পর্যায়ে সমর্থন না পেলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। মনে রাখতে হবে পশ্চিমা গণমাধ্যম পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত জেনোসাইড নিয়ে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করে আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র যতই হুমকি-ধমকি দিক, সপ্তম নৌবহর

পাঠাবে এসব বলুক কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। চীনের কাছ থেকে সহায়তা আসবে পাকিস্তানি জান্তাদের এ রকম প্রত্যাশাও বাস্তব রূপ পায়নি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নতুন সরকারের কাছে কী কী চ্যালেঞ্জ ছিল?

যখন আমরা স্বাধীন হই তখন তো আমরা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। সেখানে আমাদের অবকাঠামো বিশেষ করে রাস্তাঘাট ও ব্রিজ সমস্ত কিছুই ভাঙা। ভারতে যারা শরণার্থী ছিল তারা দেশে ফেরত এসেছে। দেশের ভেতরে অনেক বাস্তুচ্যুত লোক ছিল যারা শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গেছে, তারা ফিরছে। আমাদের অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। আমাদের যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলো অবাঙালিদের হাতে ছিল। স্বাধীনতার পর অবাঙালিরা চলে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোর পুনর্গঠন ছিল একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন রাষ্ট্র গঠন করা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ছিল দুর্বল। বেশির ভাগ সরকারি কর্মচারীর অভিজ্ঞতা ছিল প্রাদেশিক সরকার চালানোর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার অভিজ্ঞতা ছিল না। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা পাকিস্তানে আটক ছিলেন। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা ছিলেন আপেক্ষাকৃতভাবে জুনিয়র।

দেশে তখন কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল। সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভাজন ও নানাবিধ কোন্দল ছিল। আওয়ামী লীগের ভেতরেও কোন্দল ছিল। আবার আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোন্দল ছিল। অনেক বামপন্থী সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার আগ পর্যন্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র সমর্পণ করতে চাননি। বঙ্গবন্ধু ফেরত আসার আগ পর্যন্ত কেউ কারো কথা শুনছিল না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু যখন ফেরত এলেন তখন সবাই আশ্বস্ত হলো যে তিনি একমাত্র নেতা যার কথা সবাই শুনবে।

স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে দেশের বাইরের লোকজন ভাবত এখানে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে না, সরকার ব্যবস্থা টিকে থাকবে না, গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু রাতারাতি না হলেও আমরা সেসব সমস্যা মোকাবেলা করেছি। গত ৫৩ বছরে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন, অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রশাসন গড়ে তোলা এসব সমস্যার অনেকগুলোর কিছু সমাধান আমরা করতে পেরেছি।

অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলোয় সোভিয়েত ঘেঁষা সোশ্যালিস্ট পলিসি বাংলাদেশকে বিপথে নিয়েছে। আপনি কী মনে করেন?

আমি পুরোপুরি এ মতের বিপক্ষে। সোশ্যালিস্ট পলিসি বলতে হয়তো তারা স্বাধীনতা-পরবর্তী জাতীয়করণ নীতিকে বোঝাচ্ছেন। আমি মনে করি এ সম্পর্কে মানুষের ধারণাটাই ভুল। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার আগে আমাদের এখানে যত ব্যবসায়ী পরিবার ছিল তারা বেশির ভাগই ছিল অবাঙালি। স্বাধীনতার পর তারা বাংলাদেশ থেকে চলে গিয়েছিল। তখন ফেলে যাওয়া

ওই ব্যবসাগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতে হয়েছে। স্বাধীনতার আগে বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণী ছিল খুবই ছোট। পাকিস্তানের সবচেয়ে ধনী ২২ পরিবারের মধ্যে মাত্র একটি ছিল বাঙালি পরিবার—চট্টগ্রামের এ কে খানের পরিবার। ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর মতো তো কোনো উদ্যোক্তা শ্রেণী তখনো গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ করা ছাড়া সরকারের তো আর কোনো উপায় ছিল না।

রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে কি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একে একে মিলিটারি ক্যুগুলো হয়েছিল?

রাজনৈতিক ব্যর্থতার কোরণে মিলিটারি ক্যু হয়েছে আমি এমনটা মনে করি না। স্বাধনতা-পরবর্তী সময়ে প্রথমে কোনো প্রতিষ্ঠানই তেমন শক্তিশালী ছিল না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। সামরিক বাহিনীর মধ্যেও অনেক দ্বিধাবিভক্ত ছিল। আমাদের সামরিক বাহিনী তখনো শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়নি। চেইন অব কমান্ড সুসংহত হয়নি। সে কারণে একের পর এক ক্যু সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে ক্যুগুলো হয়েছে এমনটা না। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছিল, উচ্চাভিলাষ ছিল, সে কারণে ক্যু হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আমাদের চারটি মূলনীতির কোনো কোনোটি একে অন্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আপনি কী মনে করেন?

আমি তেমন সাংঘর্ষিক দেখি না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, সবই একে অন্যের সম্পূরক। পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক হলো নর্ডিক দেশগুলো। এসব দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একই সঙ্গে উপস্থিত। তারা যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতে পেরেছে তার কারণ সেখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় হয়েছে বলেই।

আপনি কি এখনো বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে?

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ সেটাই ছিল ১৯৭১ সালে আমাদের স্বপ্ন। বাংলাদেশের পক্ষেও নর্ডিক দেশগুলোর মতো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব। আমি এখনো স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশ সেরকম রাষ্ট্র হবে।

বণিকবার্তা
২৬ মার্চ ২০২৪

১২ অর্থনীতিবিদের ঐতিহাসিক দলিল

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলি, হাতিল আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি । আমাদের সামনে আমাদের আজকের অতিথি, পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এই মূহুর্তে বাংলাদেশের আনাচে কানেচে সর্বত্র, দেশের বাইরেও যে নামটি আলোচিত হচ্ছে এই কারণে যে ইতিহাস রচনা করেছেন একটা। ইতিহাসটা হচ্ছে এইরকম যে ৯০ দিন সময় ছিল, এই ৯০ দিনের মধ্যেই তিনি একটা ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করেছেন। বারো জন অর্থনীতিবিদ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই পর্যন্ত কোনো তদন্ত কমিশন বা এই ধরনের কমিশনের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এর আগেও দেয়া হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউই দিতে পারেনি। এইজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর পুরো প্রয়াসের জন্যই এই অনুষ্ঠানের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরেকটা ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনার এই শ্বেতপত্র প্রকাশের পর এই প্রথম আমাদের অনুষ্ঠানে এলেন, এইজন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, মতি ভাই। আপনি জানেন আপনার এই অনুষ্ঠানে আসতে আমি পছন্দ করি এবং রাত-বিরেতে সবার ঘুম নষ্ট করেও আলোচনায় আমরা যুক্ত হই। মনে করি দেশের উপকার হবে। তো আজকেও এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় আমার পেশাগত জীবনের। আপনি ডেকেছেন, ধন্যবাদ।

মতিউর রহমান চৌধুরী: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শ্বেতপত্রে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে কী কী আছে এরমধ্যে। তবে আপনি পুরোটাই এখনো বলেননি। তবে আমরা আশা করবো যে দর্শকরা সবাই মুখিয়ে আছেন শোনার জন্য যে আসলে কী আছে এটার মধ্যে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মতি ভাই। আমি প্রথমে একটু ইতিহাস বলি। সেটা হলো যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করি যে একটি শ্বেতপত্র দরকার। কেন শ্বেতপত্র দরকার? কারণ একটা সরকার এখানে এসেছে। ধারাবাহিকতার সরকার না, একটা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সরকার। এই দেড় দশকের সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করেছে, কি রেখে গেল তাদের জন্য? কী নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করছে? এইটা পরিষ্কার হওয়া তাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। এই লেখাগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টিগোচর হয়। সামনাসামনি উনি আমাকে বলেন যে তুমি যখন বলেছো, তখন এটা করে দাও। এবং এইটা বাংলাদেশের এমন একটি ঐতিহাসিক দলিল হবে যেটা আগামীদিনের গণতান্ত্রিক পথকে সুগম রাখতে, শাসন করতে এই পুস্তকটা কাজে দিবে।

প্রয়োজন হলে পরে আমরা এটাকে পাঠ্যপুস্তক করবো। এইটা উনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তারপরে আমাকে উনি বলেন যে তাহলে তোমার লোকজন নাও। এটাতো একার কাজ না। তো আমি ১১ জনকে চয়ন করে, বিভিন্ন বিষয়ে যারা পারদর্শী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছেন তাদের একত্রিত করে নামগুলো প্রস্তাব করি। একটা নামও কেউ আপত্তি করেননি। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কতদিন তোমার সময় লাগবে? আমি ভয়ে ভয়ে ৩ মাস বললাম। পরে আফসোস করলাম ৪ মাস বলি নাই কেন। দেশ এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি দিনেরই দাম আছে। সেহেতু যত তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারি। আর তারপরে উনি জিজ্ঞেস করলেন কত খরচ হবে তোমার? আমি বললাম যে কোন মাইনা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা এটা দেশ এবং জাতির জন্য আমাদের অবদান হিসেবে এই সুযোগটাকে ব্যবহার করতে চাই। তো উনি বললেন যে তুমি নাহয় মাইনা নিবা না, অন্যেরা কী করবে? আমি বললাম আমার সহকর্মীদের আমি চিনি। তাদেরও এক পয়সা দেয়ার আপনার প্রয়োজন পড়বে না। এমনকি কোন সিটিং এলাউন্সও দেয়ার প্রয়োজন পড়বে না যে তারা মিটিংটা করবে। নিয়মগুলো কিন্তু অন্য কমিশনের চেয়ে আমার একটু ভিন্ন, এটা আপনারা লক্ষ্য করবেন। এবং সেহেতু, এই পুরো কাজটা দেশের জন্য বড় ব্যাপার ছিল। আবার আমার একটা পেশাগত গৌরবের ব্যাপার ছিল। সেটা হলো যে বাংলাদেশে এরকম একটা কাজ করার জন্য দাতাগোষ্ঠী, সরকার বিদেশী পরামর্শক নিয়ে এসে ভরে ফেলে। আমরা একটা হিসাব করেছি যে এই কাজটা যদি পরামর্শক দিয়ে করাতো তাহলে ২৫ কোটি টাকা খরচ হতো। প্রায় আড়াই মিলিয়ন ডলারের খরচ হতো। এবং এটার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের পেশাজীবীদের শক্তি, আমাদের অর্থনীতিবিদদের সক্ষমতা এইটা প্রমাণ করার আমাদের একটা দুর্লভ সুযোগ এসেছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে আমার সহকর্মীবৃন্দ, আমার সিপিডির যে তরুণ গবেষকরা তারা একটা বড় অবদান রেখেছেন এই কাজটা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে। এবং একই সাথে আমাদের যে এসডিজি নাগরিক কমিটি আছে, পুরো দেশব্যাপী প্রায় দেড়শ-দুইশ প্রতিষ্ঠান তারা এটার সাথে যুক্ত হয়েছে। আমরা প্রায় ৬০ টি মিটিং করেছি, ১৮ টি তার ভিতরে শুধু নিজেরাই মিটিং করেছি। চিন্তা করে দেখেন, ৯০ দিনে ৬০ টি মিটিং করা এবং এর বাইরেও আবার ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করতে হয়েছে। আমরা ঢাকার বাইরে গেছি, ঢাকার ভেতরে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে কথা হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তাদের

সাথে, বিদেশিদের সাথে, বিনিয়োগকারীদের সাথে। এবং ঢাকার বাইরে আমরা চিটাগং, রাজশাহী এবং সিলেটে গণশুনানীও করেছি। যে উনাদের মনের কথা কী আছে। সেগুলিও একটা উপলব্ধির বিষয় ছিল। আমরা একটি খোলা বাক্স খুলেছিলাম, সকলের জানানোর জন্য। ইমেইল দিয়ে আমরা প্রায় ৪০০, ৩৭০ বা ৮০ টি প্রস্তাব আমরা ওখানে পেয়েছি। যেটাও আমরা জনগণের মাধ্যমে এই তথ্য-উপাত্তগুলো উপকারী হয়েছে বলে মনে করি। আর আমরা অফিস করেছি প্ল্যানিং কমিশনে। সরকারের পক্ষ থেকে প্ল্যানিং কমিশনকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের আবাসস্থল হিসেবে কাজ-কর্মের জন্য। আর ওখানেই মিটিং ইত্যাদি যা হয় হয়েছে। আর যেটা ছিল যে ইউএনডিপি থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি গবেষণার জন্য। আর সিপিডির সহকর্মীদের কথা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। এবং আমার এই সহ-গবেষক যারা ছিলেন তাদের যেই টিমওয়ার্ক এবং একজন অপরজনের সাথে মিলে যেই একটা কেমিস্ট্রি ইংরেজিতে বলে, এই রসায়নটা আমার সারাজীবনের একটা বড় অর্জন হিসেবে থাকবে। তবে আপনি এখন প্রশ্ন আমাকে করবেন, রিপোর্ট তো হলো, এরপর কী?

মতিউর রহমান চৌধুরী: এই রিপোর্ট থেকে আমরা কী পেলাম?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার মনে হয় রিপোর্ট থেকে পেলাম, সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো যে অর্থনীতিকে পরিচালনা করার জন্য রাজনীতি কত গুরুত্বপূর্ণ। আমার ভূমিকাতে বলেছি যে ঘটনাটা কী দাঁড়ালো। ঘটনাটা দাঁড়ালো এই যে একটি কেন্দ্রায়িত স্বেচ্ছাচারী সরকার গড়ে উঠলো। এবং এই স্বেচ্ছাচারী সরকারের, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সূত্রপাত হলো ২০১৮ এর নির্বাচন। এবং পরপর এই তিনটি নির্বাচন, সেই অর্থে ফাঁকা নির্বাচন হলো, আপনারা যে ডামি নির্বাচন বলেন, ভোটারবিহীন নির্বাচন বলেন, প্রতিযোগীতাহীন নির্বাচন বলেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার বিষবৃক্ষ রচনা হলো আরকী। সেই অর্থে মূল উৎপাটন হয়ে গেল। এবং এটার ফলে দেশ চালানোর জন্য উনারা কী করলেন? উনারা কিছু আমলা জোগাড় করলেন। কেউ উর্দি পরে, কেউ উর্দি ছাড়া। আপনি জানেন উর্দি পরা আমলাদের সাথে কী হয়েছে। এবং এর সাথে আপনার কিছু ব্যবসায়ী যুক্ত হলো। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাদের যাতায়াত ছিল। এই আমলা, ব্যবসায়ী এবং এর সাথে রাজনীতিবিদ। এই ত্রিযোগের ভিত্তিতে উনারা একটা গোষ্ঠী তৈরি করলেন। এই গোষ্ঠী বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করতো, সমস্ত কনট্র্যাক্টকে নিজেদের কুক্ষিগত করতো। এবং একইরকমভাবে বিভিন্ন নিয়োগ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এগুলো সবগুলোর কিন্তু উৎস মুখ ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কারণ একটি কেন্দ্রায়িত সরকারের এইটিই হয়। এবং এখানে যারা যুক্ত ছিলেন তারা এটা করেছেন। তারা ব্যাঙ্গকের মালিকানা নিয়েছেন। তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দখল করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছেন। তারা দেখা গেছে যে আইসিটি সেক্টরের বিভিন্ন ধরনের অপরিচিত অঙ্গনে বিনিয়োগের নাম করে টাকা পয়সা নিয়ে গেছেন। তো এইজন্য শেষে এসে যেটা হলো এই সরকারের সেটা হলো যে তখন কতিপয় অলিগার্ক, অলিগার্ক শব্দটা চালু করলাম আমরা। এটার অর্থ হলো হাতে গোনা কতিপয় অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা শুধুমাত্র একটি খাতে থাকে না, তারা ব্যাংকেও থাকে, তারা বিমানে থাকে, তারা

বিদ্যুৎকেন্দ্রে থাকে, তারা দেখবেন যে করের বিশেষ সুবিধার ভিতরে থাকে, তারা রপ্তানিতে থাকে, তারা আদম ব্যাবসা করে, তারা একই সাথে আবার রাজনীতিবিদ হিসেবে আসে। এই মানুষগুলোর হাতে পড়ে গেল। এবং যার ফলে আমি বলেছি যে, চামচা পুঁজিবাদ ছিল, আগে শুধু আপনি নিজের পছন্দের লোকজনদের দিতেন। এখন ওই পছন্দের লোকরা আপনাকে পছন্দ করে কি করে না ওইটাতে চলে গেল। মানে চোরতন্ত্রে চলে গেল। অথবা চৌর্যতন্ত্র দেশ শাসন করার ভেতরে চলে গেল। এবং এইরকম একটা শাসন ব্যাবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে কোন আলাপ-আলোচনা, দ্বিমত, কোন বহুমতের জায়গা এখানে থাকে না। তখন একমাত্র টিকে থাকা যায় শক্তি প্রয়োগ করে। আপনি যদি অগাস্টের দিনগুলো দেখেন, জুলাইয়ের দিনগুলো দেখেন, এমন একটা রাষ্ট্রযন্ত্র হলো যেখানে কোন আলোচনার জায়গা নেই। যেখানে কোন আপোষ-মিমাংসার সুযোগ নেই। সেখানে দু'টো কথা বলার কোন ব্যবস্থা নাই। শুধুমাত্র আপনি শক্তি প্রয়োগ করে , গুলি করে মানুষ মেরে, আপনি ক্ষমতা রাখতে চান। এইটা টেকে না। বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাসের অংশ হিসেবে এখানে থেকে যাবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: দু'টো জিনিস আমার এখানে জানার আছে। একটা হচ্ছে যে আপনার রিপোর্টে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম বলেন নাই? এক। আর দুই নম্বর হচ্ছে আপনারা ঢাকার বাইরে চলে গেছেন, সিলেটে বা চট্টগ্রামে। কিন্তু আপনারা বিদেশে কোথাও যাননি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ। বিদেশে কোথাও যাইনি কিন্তু বিদেশের যারা আমার সহকর্মীরা আছেন, বিশেষজ্ঞরা আছেন, তারাও ওয়েবিনারে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রায় ৭-৮০০ বিশেষজ্ঞরা প্রথমদিকে সেখানে আমাদের মতামত দিয়েছেন। আর আমার আলোচনার আমি সূত্রপাত করেছিলেম ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নিয়ে। তারা আমার আলোচনার সূচনাতে ছিলেন। এবং তাদের যেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে সেটা হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা নাই বাংলাদেশে এবং দ্বিতীয়ত হলো শোভন কর্মসংস্থান নাই। উনারা বারবার আমাদের মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং শোভন কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি এই দু'টোর কথাই জোর দিয়ে আমাদের বলেছে । উনাদের রাষ্ট্র সম্বন্ধেও আরো বিভিন্ন ধরনের আলোচনার সেই অর্থে সুযোগ ছিল। খুবই উপকৃত হয়েছি উনাদের তেজ, সাহস এবং চিন্তা দেখে। আমি বারবারই বলেছি আমরা চোরধরা কমিটি না। আমরা চোর ধরতে আসিনি। আমরা চুরি চিহ্নিত করতে এসেছি। কীভাবে চুরি হয়েছে সেইটা আমরা বলতে চাই। প্রক্রিয়াটা আমরা বলছি। আর চোর ধরার কাজের জন্য সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা আছে, পুলিশ আছে, দুদক আছে, মানবাধিকার কমিশন আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে। এগুল সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্র। তার প্রথাগত ব্যবহার করে সরকার এটা করবে। আমরা যেটা করে দিয়েছি সেটা হলো যে কোথায় কোথায় তাদের দৃষ্টি দিতে হবে, সেই দৃষ্টির জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে দিয়েছি। এবং কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা হয়েছে সেইটা আছে। এবং এটার থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা, বাংলাদেশ তো হারিয়ে যাবে না। আগামী দিনের বাংলাদেশে যেন এই কাজগুলো আর কোনদিন না হয়, সেই অর্থে এটা একটা আমাদের সাবধান বাণী হিসেবে থাকবে। এইটা আমি প্রত্যাশা করি।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কিন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাটা কী ছিল?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা তো এখানে, বাংলা ভাষায় একটা শব্দ বলে না ন্যাক্কারজনক। সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক জায়গাটা এখানে ছিল। এটা আমরা অন্য জায়গায়ও বলেছি। যেই অলিগার্কদের কথা বলেছি, তারা পয়সা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের মতো উচ্চ পর্যায়ের লোককে রাখতো। এবং তারা ভেতরের খবর ইত্যাদি করতো। তাদের এই খেলাপী ঋণকে সুযোগ ঠিক করা, তাদের টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়া, তারা তো সব জানতো। কারা টাকা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, পাচার করছে। কিন্তু তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর শেষ পর্যন্ত অসহায় হয়ে সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছিল। মনে আছে আপনার? এখন এসে উনি কোথায় আছেন আমি বুঝে উঠতে পারি না। সেটা হলো যে বাংলাদেশের অর্থনীতি শেষ পর্যায়ে যদি নষ্ট করার চাবিকাঠি কার কাছে থেকে থাকে, এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কাছে ছিল। আর যেটা আছে সেটা হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের আমলা এটার সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিল।

মতিউর রহমান চৌধুরী: তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল? তাদের মূল লক্ষ্য ছিল টাকা লুট করা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না এদের তো আবার উচ্চাশা ছিল। রাজনৈতিক উচ্চাশা প্রচণ্ড ছিল। একদিকে তারা অর্থ চেয়েছে। সেই অর্থ-বিত্ত তারা বুঝেছে যে দেশের দীর্ঘমেয়াদে এটা নিরাপদ না, তাই তারা দেশের বাইরে টাকা নিয়ে গেছে। আর যেটা করেছে, তারা মনে করেছে যেভাবে বে-আইনী অর্থ তারা করেছে এই অর্থকে রক্ষা করতে হলে রাজনৈতিক শক্তি দরকার। এজন্য দেখবেন এমপি হয়েছে কীভাবে। সরকারী মনোনয়ন না পেলেও তারা তথাকথিত স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট হয়েছে। যাকে সরকার সহ্য করেছে। আমরা গত নির্বাচনে জানি না? সেহেতু এইটা একটা বড় জিনিস। কীভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আমলা একটা কলুষ সম্পর্কে চলে গেল। এই কলুষ সম্পর্ক, একেই তো আমি চোরতন্ত্র বলছি। রাষ্ট্রে যখন আইন সভাতে প্রাধান্য থাকে তস্করদের, যখন নির্বাহী বিভাগ তস্করদের দৌরাত্ম্য থাকে, বিচার বিভাগ যখন প্রভাবিত হয় তস্করদের দ্বারা, তখন তো সেই রাষ্ট্র অবশ হয়ে যায়। অকার্যকর রাষ্ট্র হয়ে যায়। সেই অকার্যকারীতাকে এমন একটা অবস্থায় আমরা নিয়ে গেছি যে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-বিপ্লব ছাড়া এর পরিবর্তনের আর কোনো রাস্তা তখন আমাদের কাছে খোলা ছিল না। এবং সেইটা যদি না হতো তাহলে আপনিও পত্রিকা চালাতে পারতেন না আজকে, আর আমিও হয়তো সিপিডি চালাতে পারতাম না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: দেশেই ফিরতে পারতাম না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশেই হয়তো ফিরতে পারতেন না। আপনাকে চলে যেতে হয়েছিল। এই দেশ বাংলাদেশ না। এই দেশ বাংলাদেশ হতে পারে না। আগামী দিনের বাংলাদেশ আমরা এরকম হতে দিবো না। এটাই।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এই রিপোর্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটা তো অনেক দুরুহ কাজ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দুরুহ কাজ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে যখন বলেছি উনি শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে। ওইখানে অর্থ উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। ওখানে গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। ওখানে বাইডা, বেজার চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। উনারা অন্যান্য সাচিবিক যারা দায়িত্বে তারা ছিলেন। তারাও শুনেছেন। আমি আপনাকে সময় থাকলে দুই-তিনটে জিনিস বলি। এক নম্বর জিনিস হলো, যেই জিনিসটা আমাদের উপলব্ধির ব্যাপার, কেন আমাদের এই মূল্যায়নটা গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো যে এক ধরনের উত্তরণকালীন সময়ের ভিতরে অস্থির সময়ে আমরা আছি। একদিকে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, অন্যদিকে উদ্বেগও আছে। একটু উদ্বিগ্ন আছে মানুষ। এর মূল কারণ হলো দুটো স্থিতিশীলতা নাই। একটা হলো বাজারে স্থিতিশীলতা নাই, জিনিসপত্রের দাম এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এটা একটা। সরবরাহের সমস্যা আছে। আরেকটা হলো মানুষের নিরাপত্তার অভাব আছে। মানুষ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর ভরসা রাখতে পারছে না। এটা আপনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বলেন, ব্যক্তি পর্যায়ে দোকানদারকে বলেন, কী নাগরিকদের রাত্রিবেলা ডাকাতি বলেন। সেহেতু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটা বড় জিনিস। এই বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং আইনশৃক্ষলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে যদি না রাখা যায় তাহলে আমাদের সংস্কারের যে উচ্চাশা এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের যে মহান আকাঙ্ক্ষা, ওই পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তাটা আমার বিঘ্নমুক্ত হবে না। এবং এটাকে ভেস্তেও দিতে পারে। আমি এই আশঙ্কাও করছি আজকে এখানে বসে। সেহেতু অর্থনীতি একটা অন্যতম স্থিতিশীলতার বড় জায়গা। এই অর্থনীতিতে সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর অনেক কিছু করেছে। এটা আমি বলতে পারি। টাকার পাচার বন্ধ করেছে, বিদ্যুতের বেআইনী আইনকে বাতিল করেছে, সুরক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা করছে, এগুলো করছে। কিন্তু এইগুলোর এই মুহূর্তে তো জবাবদিহির জায়গা নাই। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, একটা অনির্বাচিত কিন্তু অবৈধ সরকার না। জনগনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার। তাহলে সে জবাবদিহিটা কার কাছে করবে? তার তো সংসদ নাই। তাহলে সংবাদপত্র, তাহলে জনগণ। সরকার নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বুলেটিন দিতে হবে। আমি প্রথম যেটা উনাকে প্রস্তাব করেছি, আপনি ৫-৬ মাসে কী করলেন অর্থনীতির, সেইটার সালতামামী মানুষের সামনে তুলে ধরেন, যাতে আস্থা পায়। এইটে হলো এক নম্বর। দ্বিতীয়ত হলো যে তার পরের ৬ মাস আরো গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম ৫ মাস যা গেছে, এর পরের ৬ মাস কিন্তু আরো বেশী জটিল হবে বাংলাদেশের জন্য। সব লক্ষণ চারপাশে দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরে-বাইরে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বাজেট পর্যন্ত কী কর্মসূচি, অর্থনৈতিক কর্মসূচি? ব্যাংকের মালিকানা থেকে আরম্ভ করে আপনার সুরক্ষা কর্মসূচি কী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এর একটা পরিকল্পনা আপনি দেন। এই পরিকল্পনা থাকলে পরে যারা উপদেষ্টা আছেন তাদেরও কাজ-কর্মগুলোকে এর সাথে সমন্বয় করতে

পারবেন। নাহলে সমন্বয় থাকবে না। তৃতীয় বলেছি, বাজেট যে আসছে, প্রবৃদ্ধির দিকে চিন্তা না করে স্থিতিশীলতা দেখা এবং ব্যক্তিখাতে যাতে জ্বালানী এবং ঋণ সরবরাহ ইত্যাদি থাকে, এগুলোর কথা আমরা বলেছি। আর যেটা বলেছি সেটা হলো যে সরকার যদি এক বছরের বেশী সময় থাকে ক্ষমতায়, যেটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়, আমার না। তো এক-দুই বছরের জন্য একটা মধ্যমেয়াদী চিন্তা লাগবে। অনেক কর্মসূচি অর্থনীতিতে আছে যেখানে মধ্যমেয়াদি পরিস্থিতি না থাকলে বিনিয়োগ হয় না, বিদেশীরাও আমাদের সাথে যুক্ত হয় না। তারা নিশ্চয়তা চায়। একটা ধারাবাহিকতা চায়। সেহেতু একটা দুই বছরের পরিকল্পনা করার সুযোগ আছে কি না মধ্যমেয়াদি, এইটা। আর শেষ যেটা বলেছি, আপনি একটা উন্নয়ন ফোরাম ডাকেন। কারণ অনেক বিদেশীরা আছেন যারা এখনো নিশ্চিত না যে আগের সরকারের সাথে গঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প, নীতি সংস্কার, পদ্ধতি, বাণিজ্যচুক্তি এগুলি কার্যকর থাকবে কি থাকবে না। যদিও সরকারের থেকে বলা হয়েছে আমরা এগুলি সবই সম্মান করবো, তাদের ভিতরে দ্বিধা আছে এখনো। তো আমি একটা উন্নয়ন ফোরাম করার প্রস্তাব করেছি, যেখানে সরকার যারা বিদেশী দাতাগোষ্ঠী বা অর্থনৈতিক সাহায্য দেয় তাদের সাথে, আমরা এলডিসি থেকে বের হবো, বাজার সুবিধা যাদের সাথে পাই, তাদের সাথে, যেখানে আমাদের আমাদের ছেলেমেয়েরা চাকরির জন্য যাচ্ছে, প্রবাসী শ্রমিক, সেই বাজারের সাথে এবং বিনিয়োগকারীরা, এদের সাথে একটা সংলাপ দরকার। যাতে করে এরা আস্থার ভিত্তিতে ওই যে দুই বছরের কর্মসূচি এবং এইখানে এই সমস্ত বৈদেশিক সম্পর্ক, এইগুলোকে আমরা সমন্বয় করে আগামী দিনে আগাতে পারি।

মতিউর রহমান চৌধুরী: একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে এরপরে অন্য একটা প্রসঙ্গে যাবো। সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ফাইন্ডিংসে কি এটা আসছে যে কোন বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারের জন্য যুক্ত ছিল?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের এটার ভিতরে মূলত বাংলাদেশের কথাই আছে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেকেরই তো আজকাল দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। তাকে আপনি দেশী বলবেন না বিদেশী বলবেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারি না আরকী।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এছাড়াও অনেকে আছে যাদের নির্ভেজাল বিদেশী পাসপোর্ট আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটাও সেই অর্থে আছে। সেটা বিভিন্ন কম্পানির কন্ট্র্যাক্টের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিযোগিতাহীনভাবে কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছে। দামের ক্ষেত্রে উচ্চ রাখা হয়েছে। যেখানে প্রতিযোগিতা হয়েছে সেখানেও আগের থেকে বাড়িয়ে রেখে এটা টাকা পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদি হয়েছে। সেটার হিসাব আমাদের এখানে আছে। সেগুলো আপনারা দেখবেন। তবে আপনারা মনে রাখবেন, আমরা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে চাইনি। এইটার দায়িত্ব আমাদের না। আমরা চিহ্নিত করেছি দেশের সম্পদ কীভাবে চুরি হলো এবং এইটার প্রক্রিয়াগুলো কী ছিল। এগুলি আগামী দিনে আটকাতে হলে কী পদ্ধতিতে যেতে হবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে আপনার সহকর্মী যারা কাজ করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। সিপিডির যারা আপনার তরুণ গবেষকরা যেভাবে সহযোগিতা করেছে সেটার জন্যও আমাদের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে খুব উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ভূমিকায় গেলে আবার সময় চলে যাবে। কিন্তু আপনি জানেন যে আগরতলায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস আক্রান্ত হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কলকাতা-আগরতলা-বোম্বেতে ইত্যাদি। এখন আমাদের বাংলাদেশেও শুরু হচ্ছে। জিনিসটা খুব পরিষ্কার। আমি যেটা বুঝি আরকী। সেটা হলো যে ভারত সরকার, আমাদের আগের সরকারের উপরে অনেক বেশী বিনিয়োগ করেছিল। এবং সেই বিনিয়োগটা এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, ভেস্তে যাবে এইটা উনারা কল্পনা করেননি। কল্পনা তো করেননি, এই যে পরিবর্তনটা হয়েছে এটাও উনারা এখনো মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। এটিই হলো সমস্যা। যেহেতু উনারা, সরকারের ভেতরে যারা আছেন, রাজনীতিবিদরা যতখানি না, ওইখানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের আমলারা। কারণ তাদের একটা পরাজয় ঘটেছে। এইটা এখনো তারা মেনে নিতে পারেননি। এবং এইটার কারণে যত ধরনের সমস্যা দেখছেন, এইটা বিভিন্ন ধরনের অভিপ্রকাশ। যত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের নতুন বাস্তবতার সাথে উনারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারবেন এবং আমরাও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের সাথে সম্পর্ক আমরা নতুনভাবে তৈরি করতে না পারবো, ততদিন এগুলো চলতে থাকবে। এবং এইটার ভেতরে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে উভয় দেশের সংখ্যালঘু জনগন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু। মনে রাখতে হবে, আমার দেশের সংখ্যালঘু, ঐ দেশে সংখ্যাগুরু। আর ওই দেশের সংখ্যালঘু, আমার দেশের সংখ্যাগুরু। সেহেতু আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের ভেতরে সংখ্যালঘুর বিষয়টি একটি চলক হিসেবে থাকবে। সেহেতু দুই পক্ষই যদি নিজের দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা না দেয়, সম্মান না করে, তাদের চাকরি-বাকরি থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যদি জায়গা না দেয় শেষ বিচারে শাসনতন্ত্রের ভেতরে যদি সংবিধানেও তাদের স্থান না থাকে, তাহলে এই সমস্যা খুব দ্রুত মিটবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। এখন একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সময়। এইগুলির উপরে উঠে, আমার মনে হয় না যারা বিদেশ মন্ত্রক নিয়ে কাজ করেন এইটা শুধু তাদের কাজ। এটা আরেকটু উঁচুতে উঠে আমাদের রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। এবং আপনি দেখেন আমাদের প্রধান উপদেষ্টা প্রথম দিন থেকে মোদীর টেলিফোনে উনি দেখিয়েছেন, উনি বক্তব্য দিয়েছেন। এবং এখন সামনে ভারত সরকারের সচিব আসছে আমাদের এই মাসে ১১ তারিখে। সেই আলোচনার ফলাফলে আমরা এগোতে পারি কিনা জানি না। কিন্তু আরেকটা জিনিস বলে আমি শেষ করি সেটা হলো যে এইরকম একটা সময়ে সংবাদপত্র একটা বড় ভূমিকা পালন করে, সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করে। তারা যদি এই ধরনের উত্তেজনাকে আরো বাড়তে দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের সমাধানের পথ আরো জটিল হয়ে যাবে। আমরা সকলেই দেশপ্রেমী কিন্তু দেশপ্রেমের প্রকাশ যেন সংযতভাবে এবং দায়িত্বশীলতার সাথে আমাদের হয়।

মতিউর রহমান চৌধুরী: অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। আবারো দেখা হবে।

চ্যানেল আই
৩ ডিসেম্বর ২০২৪

গণতান্ত্রিক চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে নীতি গবেষণার রয়েছে এক অপ্রতিম সংযোগ। নীতি গবেষণার ফলাফলের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের কণ্ঠস্বরকে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য বাহক হচ্ছে গণমাধ্যম। সেই সূত্রেই সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন নানান বিষয়ে কলাম লেখার পাশাপাশি মন্তব্য, সাক্ষাৎকার ও মতামত দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। 'সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা-৯' ২০২৪ সালের বিভিন্ন সময়ে দেশের বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেওয়া নির্বাচিত কিছুসংখ্যক মতামতের একটি সংকলন।

এ লেখাগুলোতে সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাত, বাজার ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে। এছাড়াও জুলাই-আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও বিশ্লেষণ রয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ নীতি গবেষণা এবং সমসাময়িক উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোকপাতের মাধ্যমে সিপিডি'র গবেষকরা সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন এই প্রবন্ধ-সংকলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি এবারও উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

978-984-99136-2-7

978-984-99136-2-7